ভারতের ইতিহাসকথা

প্রথম খণ্ড

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী
এম্. এ., এল. এল. বি., পি. এইচ্. ডি.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ইতিহাসের প্রথম পত্র এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিয়া এই বই লেখা হইল। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় এই পাঠ্যসূচীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যে-হেতু বইখানি আগেকার মতই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর রচিত সেজন্য বইয়ের নাম পরিবর্তন না করিয়া 'ভারতের ইতিহাসকথা' রাখা হইল।

আমার অপরাপর বইয়ের মত যদি এই বইখানিও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর কাছে সমাদৃত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বইয়ের দোষত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বা কোনপ্রকার উপদেশ-নির্দেশ দিলে তাহা যথাযথ মর্যাদা সহকারে গৃহীত হইবে। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতের ইতিহাসকথা

প্রথম খণ্ড ঃ প্রথম ভাগ

সূচনা

(Introduction)

মানুষ ও ইতিহাস (Man & History) : যে সুদূর অতীত কাল হইতে মানব-সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে মানুষ তাহা অপেক্ষা প্রাচীনতর। মানুষের আবির্ভাব হইতে শুরু করিয়া মানুষের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অনলস চেষ্টায় ক্রমে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার কক্ষ উন্মোচিত হইতেছে সত্য, তথাপি বহু কিছু আজিও আমাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। বস্তুত, জানা অপেক্ষা অজানার পরিধিই বেশি।

মানব জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও অসম্পূর্ণ

সভ্যতার পথে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানব-সমাজ কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে বৃহত্তর মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণই হইল ইতিহাস।* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর সকল অংশের মানবগোষ্ঠী একই ধারায় বা একই গতিতে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। কোন কোন গোষ্ঠীর অগ্রগতি যেমন হইয়াছে দ্রুত তেমনি অপর অনেক গোষ্ঠীর অগ্রগতি হইয়াছে মন্থর পদক্ষেপে। এই অগ্রগতির ধারা ও গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা এবং ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মানুষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার মাতৃভূমির ভূ-প্রকৃতির দ্বারা, বলা বাহুল্য।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

মানুষ ও তাহার পরিবেশ

ধারাবাহিকতা ও সময়ানুক্রম (chronology) ইতিহাসের মূলসূত্র। এই সময়ানুক্রম তথা ধারাবাহিকতা বাদ দিলে ইতিহাস যোগসূত্রহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণে পরিণত হইবে, বলা বাহুল্য। উহাকে ইতিহাস বলা চলিবে না। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনার কাহিনীর ন্যায়ই সার্থকতাশূন্য হইয়া পড়িবে। এজন্য দেশের ভূ-প্রকৃতি ও সময়ানুক্রমকে ইতিহাস জগতের সূর্য ও চন্দ্র, দক্ষিণ ও বাম চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি ও সময়ানুক্রমের গুরুত্ব

মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্রস্থলের অন্যতম আমাদের ভারতভূমির ইতিহাসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সমগ্রতা ও অবিচ্ছিন্নতা। মিশর, সুমার, ব্যাবিলন,

---

*"History has been defined as 'the study of man's dealings with other men, and the adjustment of working relations between human groups." Vide, *The Vedic Age*, p. 37.

আসিরিয়া, আক্কাদ, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত ঐ সকল স্থানের আধুনিক সমাজের কোন যোগাযোগ নাই। এই সকল দেশের আধুনিক সমাজকে দেখিয়া বা তাহাদের আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায় না। ইহার কারণ সেই সকল সভ্যতার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না, কোন প্রেরণা বা প্রাণশক্তি ছিল না, সেগুলি ছিল বস্তু-আশ্রয়ী সভ্যতা, সৈন্যবলের সভ্যতা। কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল, আত্মা ছিল বলিয়াই ইহা আজও বাঁচিয়া আছে। মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহরে অংকিত দেব-দেবী—পশুপতি ও মহাদেবী—আজও হিন্দুসমাজে পূজিত হইতেছেন। সিন্ধুনদের তীরে প্রাচীন মুনিঋষি-উচ্চারিত বেদমন্ত্র আজও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত উচ্চারিত হইতেছে। ভারতের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য আজও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে নাই। সুতরাং ভারত-ইতিহাস তুষার-গোলক (snow ball)-এর ন্যায়-ই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতনকে গ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে বটে, কিন্তু প্রাচীনকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, কারণ প্রাচীনই তাহার অন্তস্তল। ইহা যেন স্তরে স্তরে সজ্জিত এক বিরাট সভ্যতা যাহার সামগ্রিক ধারণা লাভ করিতে গেলে কোন স্তরকেই বাদ দেওয়া চলে না।* কোন দেশই ভারতবর্ষের ন্যায় এত বেশি বার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের মত কোন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নাই।†

ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য :
(১) সমগ্রতা

প্রাচীন হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতীয় সভ্যতা নিজ ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিয়াছে। যাহা গ্রহণযোগ্য নহে তাহা সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যেখানেই সে নূতনের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে তাহার অন্তরের মিল সে খুঁজিয়া পাইয়াছে, সেখানে তাহা গ্রহণ করিতে সে দ্বিধাবোধ করে নাই। ঘরের জানালা-দরজা আমরা খুলিয়া রাখি বাহিরের বাতাসের জন্য, কিন্তু সেই বাতাস যদি আমাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে বা আমাদের ঘরের ভিতরের সবকিছু অব্যবস্থিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে চায় তাহা হইলে আমরা জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া থাকি। সেইরূপ ভারতীয় সভ্যতাও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অপরের দান গ্রহণ করিয়াছে। বহিরাগত কোন সভ্যতা বা কোন অবাঞ্ছিত প্রভাব ভারতীয় সভ্যতাকে ব্যবচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।

(২) স্বাতন্ত্র্য

---

*"She was like some ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie had been inscribed and yet no succeeding layer had been completely hidden or erased what had been written previously." *The Discovery of India* : Jawaharlal Nehru.

† Vide, Jean, Filliozat, *Political History of India*, p. 85.

ফলে ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর হারাইয়া যায় নাই। এই যে এক অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতা ইহা শুধু ভারতীয় সভ্যতারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক সভ্যতারই এক-একটি পৃথক্ সার্থকতা আছে। ভারতবর্ষের তথা ভারতীয় ইতিহাসের সার্থকতা হইল প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা ও আত্মীয়তাবোধ সৃষ্টি করা যদি সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হয়, বিভিন্ন মানব-সমাজের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া লইয়া মানব জাতির মধ্যে অন্তত খাপ খাওয়াইয়া (adjustment) লইবার মনোবৃত্তিকে যদি আমরা প্রকৃত সভ্যতার অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভারতবাসী প্রকৃত সভ্যতার পথেই আগাইয়া চলিয়াছে, কারণ এই উদার মনোবৃত্তিই হইল ভারতবাসীর প্রাচীনতম এবং চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।* এই বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় সভ্যতাকে যেমন এক সংমিশ্রিত (composite) চরিত্র দান করিয়াছে, তেমনি জাতি-বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক ঐক্যবন্ধরূপ বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

(৩) প্রভেদের মধ্যে ঐক্য

ইওরোপীয় সভ্যতার জন্মস্থল গ্রীস ও রোম-এর ভূ-প্রকৃতির ফলেই তথাকার সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক। প্রকৃতিকে শাসন করিয়া সেই সভ্যতা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলকথা হইল প্রকৃতিকে জয় করা। এই জয় করিবার মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুলিকে স্বভাবতই পাইয়া বসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৌঁছিয়াও এই জয় করিবার মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুলির যায় নাই। কিন্তু তপোবনোদ্ভূত ভারতীয় সভ্যতা প্রকৃতির সহিত মানুষের যোগসূত্রকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে।† জয়ের মনোবৃত্তি এখানে স্বভাবতই না জন্মিয়া বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকতার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার এবং এক সমন্বয়ের মনোবৃত্তি জাগিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা হয়ত ক্ষতিকারক হইয়াছে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য-ই ভারতবাসীকে ভারতবাসী করিয়া রাখিয়াছে, অপরের প্রভাবে সে নিজেকে হারায় নাই।

(৪) প্রকৃতি ও ভারতীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগ

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি (Geographical situation and nature):

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপটি-ই হইল ভারতবর্ষ। ইহা

* এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পৃথক শীর্ষকে করা হইবে।

†"The west seems to take a pride in thinking that it is subduing Nature; as if we are living a hostile world where we have to wrest everything we want from an unwilling and alien arragement of things. But in India the point of view was different; it included the world with the man as one great truth. India put all her emphasis on the harmony that exists between the Individual and the Universe." *Discourses delivered by Rabindranath Tagore at Chicago and Harvard Universities, 1912-13.*

নিজেই একটি মহাদেশ-প্রায়। মোট আয়তনের দিক দিয়া ইহা রাশিয়া বাদে সমগ্র ইওরোপ মহাদেশের সমান। ইহার আয়তন প্রায় ৪০,৯৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি মোটামুটি ২,৯০০ কিঃ মিঃ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২,৯১০ কিঃ মিঃ। এই বিশাল ভূখণ্ডের সীমারেখার মোট ছয় হাজার মাইল পর্বত দ্বারা এবং পাঁচ হাজার মাইল সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত।* ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হিমালয় পর্বতমালা এক উচ্চ রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল আরব সাগর দ্বারা বিধৌত।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষের পাঁচটি† প্রাকৃতিক বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি বিভাগ ছিল এইরূপ: (১) মধ্যদেশ: সরস্বতী নদীর অববাহিকা অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত এই ভূভাগটি বিস্তৃত ছিল। এই মধ্যদেশ-ই প্রাচীনকাল হইতে আর্যাবর্ত নামে পরিচিত। (২) উত্তরাপথ বা উদীচ্য: মধ্যদেশের উত্তরে অবস্থিত ভূভাগের নাম ছিল উত্তরাপথ বা উদীচ্য। (৩) প্রতীচ্য বা অপরান্ত: মধ্যদেশের পশ্চিমের অংশটির নাম ছিল প্রতীচ্য বা অপরান্ত। (৪) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য: মধ্যদেশের দক্ষিণে অবস্থিত অংশের নাম ছিল দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। (৫) প্রাচ্য বা পূর্বদেশ: মধ্যদেশের পূর্বের ভূভাগ প্রাচ্য বা পূর্বদেশ নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশ বা আর্যাবর্তের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ইহার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত অংশের নামকরণ হইতে আর্যাবর্তের প্রাধান্য ও গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগ

উপরি-উক্ত পাঁচটি প্রধান অঞ্চল ভিন্ন আরও দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে—যথা, পুরাণে পাওয়া যায়। এই দুইটি অঞ্চলের নাম ছিল পর্বতাশ্রয়ী অঞ্চল বা হিমালয় অঞ্চল ও বিন্ধ্য অঞ্চল। একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল।

আরও দুইটি বিভাগ

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতভূমিকে প্রধানত চারিটি ভাগে ভাগ করা

---

* Vide, *The Vedic Age*, p. 90; *Advanced History of India*, p. 1.
Also vide, V. A. Smith's *The Oxford History of India*, Edited by T. G. P. Spear, p. 1.

† প্রাচীন ভারতের আয়তনের হিসাব বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেওয়া হইয়াছে।
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের আয়তন ছিল [illegible] বর্গমাইল। দৈর্ঘ্য ১৮০০ ও প্রস্থ ১৩৬০ মাইল।

Vide, *Advanced History of India*, pp. 4-5.

হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া এই বিভাগ অধিকতর যুক্তিসম্মত, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক হইতে বিচার করিলেও এই বিভাগ-ই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। এই চারিটি প্রধান বিভাগ হইল ঃ (১) পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমভূমি, (৩) মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাপথের মালভূমি, (৪) সুদূর দক্ষিণের সংকীর্ণ উপকূলভূমি।

ভূ-প্রকৃতির বিচারে চারটি বিভাগ

(১) **পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চল ঃ** ভারতের উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় এক রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত এই পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। ইহা ভারতকে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও চীন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয় ভিন্ন, সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা ভারতবর্ষকে রাশিয়া, ইরান ও বেলুচিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তরাই অঞ্চল হইতে হিমালয়ের শীর্ষদেশ পর্যন্ত যে ক্রম-উচ্চতাবিশিষ্ট ভূভাগ রহিয়াছে তাহাতে কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি পর্বতাশ্রয়ী দেশ অবস্থিত। এই সকল পর্বতাশ্রয়ী দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান সহজ যোগাযোগের পরিপন্থী। এই কারণে সমতলে অবস্থিত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিবর্তনের প্রভাবে এই সকল দেশ তেমন প্রভাবিত হয় নাই। এগুলি স্বভাবতই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বহুকাল ধরিয়া বজায় রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পর্বতাশ্রয়ী দেশগুলির স্বাতন্ত্র্য

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমভূমি ঃ** সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমভূমি নামক বিশাল সমতল ভূভাগ সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া, সিন্ধু ও রাজপুতানার মরুভূমি, গঙ্গা ও যমুনা নদীর উর্বর সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষের মধ্যে এই ভূখণ্ডই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশাল ভূখণ্ডের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীনকালে যেমন আর্যজাতিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পরবর্তী কালেও তেমনি বহু বিদেশী আক্রমণকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। নদনদী-প্রধান এই বিশাল সমতলখণ্ডে যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনবহুলতা পর পর বহু সাম্রাজ্যের উত্থানের সহায়ক হইয়াছিল। এই সমতলখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করাই ছিল ভারতীয় সম্রাটদের এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য। এই কারণেই ভারতের ভাগ্য-নিরূপণকারী পাঁচটি যুদ্ধ—তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং পানিপথের তিনটি যুদ্ধ—এই সমতলখণ্ডে সংঘটিত হইয়াছিল।

নদীমাতৃক বিশাল সমতলখণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য

(৩) **মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাপথের মালভূমি ঃ** সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমির দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্যন্ত মধ্য-ভারতের মালভূমি বিস্তৃত। বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণের উপদ্বীপ দক্ষিণাপথের মালভূমি নামে পরিচিত। যদিও ভারত-ইতিহাসে এই অংশের ও আর্যাবর্তের মধ্যে কোন প্রভেদ করা চলে না, যদিও উত্তর অংশই ভারত-

ভারতবর্ষ
প্রাকৃতিক
হিন্দুকুশ
আফগানিস্তান
তিব্বত
হিমালয় পর্বত
সিন্ধু সমভূমি
দিল্লী
গাঙ্গেয় সমভূমি
গঙ্গা
মধ্য ভারতের মালভূমি
বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণী
বঙ্গদেশ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
সিংহল
৬০০০ ফুটের উপর
১৩০০ ,, ,,
সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১০০০ ফুট
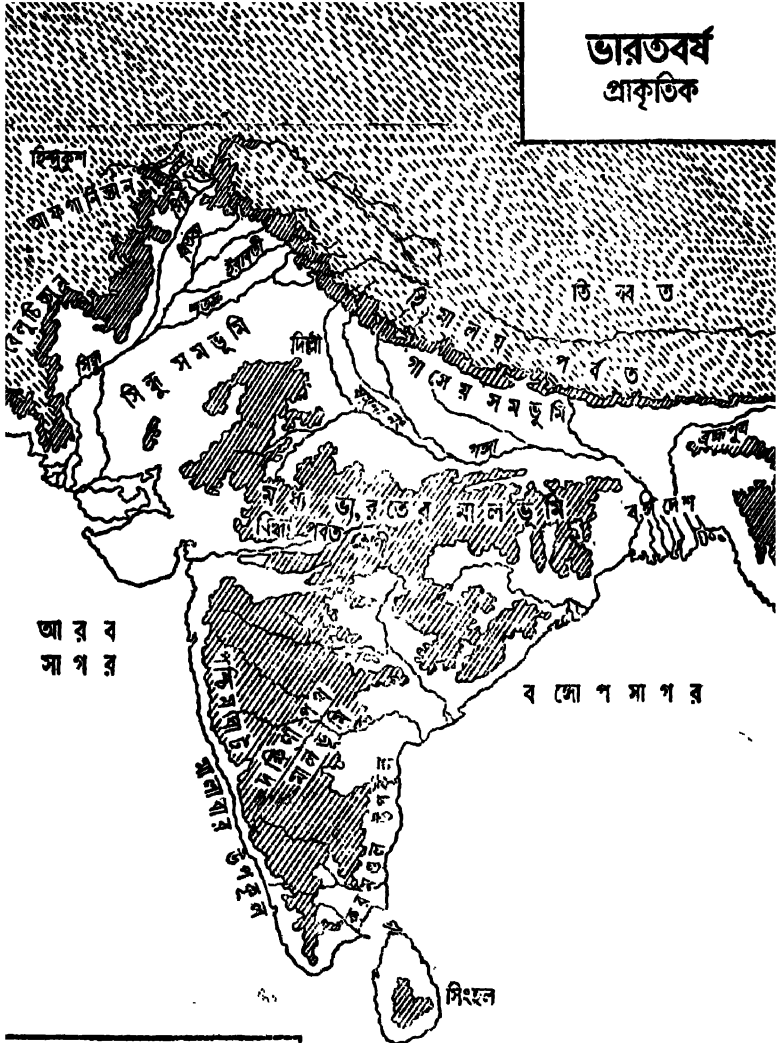
ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ তথাপি গুরুত্বের বিচার করিলে আর্যবর্ত চিরকালই প্রাধান্য ভোগ করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা আর্যাবর্তের অধিকতর গুরুত্ব

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস হইল দ্রাবিড়গণের ইতিহাস, কিন্তু এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ তথ্যাদি এখনও ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অনেক কিছুই এখনও অবিদিত রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা আর্যাবর্তের গুরুত্ব যে বেশি তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। ভারত-ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের কোন রাজা-ই আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই, অথচ আর্যাবর্তের বহু ক্ষমতাশালী রাজা দাক্ষিণাত্যে অন্তত সাময়িকভাবেও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুদূর দক্ষিণ : দ্রাবিড় সভ্যতার কেন্দ্র

(৪) **সুদূর দক্ষিণের সংকীর্ণ উপকূলভূমি :** পূর্ব ও পশ্চিমঘাট হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ ভূখণ্ড 'সুদূর দক্ষিণ' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে দ্রাবিড় সভ্যতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ আমরা দেখিতে পাই। উত্তরের কোন হিন্দু বা মুসলমান বিজেতা এই অঞ্চলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই।

ভারত-ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব (Influence of Geography on Indian History) :

ভারতবর্ষ 'হিমালয়ের দান'

মিশর দেশকে 'নীলনদের দান' বলা হইয়া থাকে; ভারতবর্ষকেও সেইরূপ 'হিমালয়ের দান' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উত্তরদিকে হিমালয় ভারতবর্ষকে একটি অতি সুদৃঢ় প্রাকৃতিক সীমারেখা দান করিয়াছে। এক অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় ইহা ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণ হইতে কেবল রক্ষাই করিতেছে না, এশিয়ার উত্তরাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া ইহা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের নদ-নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া ভারতভূমিকে সুজলা-সুফলা করিয়া তুলিয়াছে। নদীমাতৃক আমাদের এই দেশ শস্য ও অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদেরও অভাব এই দেশে নাই। প্রকৃতি যেন মুক্তহস্তে ভারতভূমিকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতভূমির নর-নারীর পক্ষে জীবনধারণের সমস্যা প্রাচীনকালে মোটেই ছিল না। অল্প আয়াসে জীবনধারণের সুবিধা থাকায় ভারতবাসী স্বভাবতই ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। ফলে ভারতবাসী ধর্মাশ্রয়ী, শ্রমবিমুখ, কাব্য-শিল্প-সাহিত্যপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভৌগোলিক কারণে স্থানীয়-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন অংশের ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা ইহাকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, উচ্চ মালভূমি, বিশাল নদ-নদী, বিস্তীর্ণ মরুভূমি প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানীয় (local) বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে এশিয়ার অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও বিদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগের কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমের খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথ ধরিয়া আর্যদের ভারত আগমন হইতে শুরু করিয়া আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী পর্যন্ত পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, আফগান, মোগল প্রভৃতি বহু বৈদেশিক জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরে তিব্বতের মধ্য দিয়া স্থলপথে নেপালের সহিত, পূর্বদিকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশ ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলের সহিত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিত প্রাচীনকাল হইতে ভারতের ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে বর্তমান আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পথ ধরিয়া মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিদেশের সহিত ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান অব্যাহত

ভারতের সুদীর্ঘ উপকূলভূমিতে সুদূর অতীতেই বহু বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমুদ্রপথে রোম, চীন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয়ের সহিত বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। এই বাণিজ্যপথ ধরিয়াই একদিন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রাধান্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হইয়াছিল। আবার এই বাণিজ্যপথ ধরিয়াই পরবর্তী কালে ইংরেজ বণিকগণ এদেশে আসিয়া অবশেষে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-ভারতের জনসমাজ সমুদ্র-উপকূল হইতে দূরে বসবাসের ফলে সমুদ্রের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। বাংলাদেশের উপকূল হইতে কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল বটে, কিন্তু সমুদ্র-প্রবণতা সুদূর দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র-উপকূলে বসবাসের ফলে তাহাদের সমুদ্র-প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল সর্বাধিক।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব : উপকূলস্থ ভারতীয়দের সমুদ্র-প্রবণতা

রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলেও প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। আর্যাবর্তের সমতলভূমি একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষে সহায়ক ছিল। ফলে ভারতের বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য এই বিশাল ভূখণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্যপর্বত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া রাজনৈতিক ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রকৃতি দ্বারা রাজনৈতিক ভাগ্য প্রভাবিত

প্রাকৃতিক ও বাণিজ্য সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ বিদেশীয়দের ঈর্ষা ও লোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে ভারতবর্ষকে বার বার বিদেশী আক্রমণকারীদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইভাবে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য, ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবন সব কিছুই প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতীয় সম্পদলোলুপ বিদেশীয়দের আক্রমণ

ভারতের নর-নারী ঃ পৃথিবীর এক বিশাল জনসংখ্যার বাসভূমি ভারতবর্ষ—জাতি, ধর্ম, আচার-আচরণের এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের 'হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হূণদল, পাঠান-মোগল এক দেহে হোল লীন'—ভারতীয় নর-নারীর জাতিগত বৈচিত্র্যের এক অতি সুন্দর বর্ণনা। ধর্মের দিক দিয়াও ভারতবাসীকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসিক প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করা চলে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। আচার-আচরণ, জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় নর-নারী এক বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতীয় নর-নারী ঃ এক বিচিত্র মানবগোষ্ঠী

বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity) ঃ

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র আমাদের এই ভারতভূমি। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে আমাদের মাতৃভূমিকে নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, এই দেশের কোন কোন অংশ নদ-নদী প্রবাহে সুজলা-সুফলা, আবার কোন কোন অংশ অনুর্বর বালুকাময়, বারিপাতের স্বল্পতাহেতু উষর মরুতে পরিণত। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নদীমাতৃক অঞ্চল উর্বর ও শস্য-শ্যামলা, কিন্তু রাজপুতানা অনুর্বর এবং প্রকৃতির কৃপণতাহেতু ঘনবসতির পক্ষে অনুপযুক্ত। বারিপাতের দিক হইতে বিচার করিলে আসামের চেরাপুঞ্জী অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ বারিপাতের জন্য বিখ্যাত, আবার সিন্ধু, রাজপুতানা অঞ্চল বৎসরে অতি সামান্য বারিপাতের জন্য অসুবিধাগ্রস্ত।* উচ্চতার দিক দিয়া, হিমালয়ের এভারেস্ট্ পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, আবার এমনও বহু স্থান আছে যাহার উচ্চতা সমুদ্রের জলের উচ্চতার প্রায় সমান।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় শীত, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ—তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। কোন কোন স্থানে হিমপ্রবাহ বারমাসই বিরাজিত, কোন কোন অঞ্চলের গ্রীষ্মোত্তাপ অসহনীয় আবার কোন কোন অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের চরম কঠোরতা বিদ্যমান।

আবহাওয়ার বিভিন্নতা

* চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪৮০ ইঞ্চি, রাজপুতনা ও সিন্ধু অঞ্চলে উহার পরিমাণ মাত্র ৩ ইঞ্চি।

লতাগুল্ম, অরণ্য, বৃক্ষ, পশুপক্ষী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তরাই ও কাশ্মীর অঞ্চলের ৮০ ফুট উচ্চ ফার্ গাছ অন্য কোথাও জন্মায় না। মধ্য-ভারতের সেগুন গাছও তেমনি অন্যত্র পাওয়া যায় না। জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য রহিয়াছে ; বাংলাদেশের সুন্দরবনের বাঘ শুধু বাংলাদেশের জঙ্গলেই পাওয়া যায়।

লতাগুল্ম ও জন্তু-জানোয়ারের পার্থক্য

ঐতিহাসিক স্মিথ্ ভারতবর্ষকে 'বিভিন্ন জাতির যাদুঘর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তিতে প্রাচীনকালে আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালে ইওরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ান্তরঙ্গে বিভিন্ন জাতির ভারত-প্রবেশের সত্যতা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ ; মধ্যযুগে আরব, তুর্কী, আফগান, মোগল এবং সবশেষে পোর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক জাতির বিরাট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে ভারতবর্ষ এক "মহামানবের সাগর"-স্বরূপ হইয়াছে। এই মানব সমুদ্রে স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন জাতির জাতিগত বিশুদ্ধতা আশা করা অনুচিত হইবে।

'জাতির যাদুঘর'

ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষকে মোট ১৪টি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে। এই সকল অঞ্চলের প্রতিটিরই নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে। ইহা ভিন্ন স্থানীয় ভাষার হিসাব করিলে ভারতে মোট দুই শতাধিক ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষা ও সাহিত্য

ধর্মের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমতের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র। হিন্দু, ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি নানা ধর্ম এই দেশে বিদ্যমান।

ধর্ম

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, অসংখ্য ভাষা, ধর্ম, জাতি, আচার-আচরণের বিভিন্নতা ভারতবর্ষকে একটি 'ক্ষুদ্র পৃথিবী'-সদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল দেশের এইরূপ বৈচিত্র্যের প্রকৃতিগত ফল হিসাবেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ইহার বিভিন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ ইতিহাস মাত্র। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের বিরাট অংশ একই রাজনৈতিক সংগঠনাধীন হইয়াছিল বটে, তথাপি মোগল এবং ব্রিটিশ যুগের পূর্বে রাজনৈতিক ঐক্য স্থায়িত্ব লাভ করে নাই।

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব

উপরি-উক্ত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ ও বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। আপাতদৃষ্টিতে এই সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে মনে হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব

বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য

ভারতবর্ষ সেইরূপ ঐক্য বন্ধনেই আবন্ধ। এই ঐক্য অপরের সহিত বিরোধে জয়লাভের মাধ্যমে গড়িয়া উঠে নাই। সেজন্যই রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক মূলগত ঐক্য ও এক ভাবপ্রবণতার ঐক্য ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"* সুতরাং রাজা বা সম্রাট সমগ্র দেশ জয় করিতে পারিলেন কি না তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতবাসীর এই ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই।

বিভিন্নতার অন্তরালে মৌলিক ঐক্য

প্রথমত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্য ভারতীয়দের একত্ববোধের সৃষ্টি করিয়াছে: 'ভারতবর্ষ" নামটিই এই ঐক্যের সহায়তা করিয়াছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে 'ভারতবর্ষ" নামের ব্যবহার এবং ভারতবাসীকে 'ভারতী সন্ততি' নামে অভিহিত করার মধ্যে সমগ্র ভারত যে একই দেশ সেই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে।† প্রাচীনকালের কবি, দার্শনিক প্রভৃতির রচনায় আসমুদ্রহিমাচল সহস্র যোজন বিস্তৃত ভারতভূমির বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর নির্ভরশীল নহে। 'ভারতবর্ষ" বলিতে আমরা বুঝি একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা-যুক্ত ভূখণ্ড। এশিয়ার অপরাপর দেশ হইতে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পৃথকীকৃত ভারতবর্ষ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়াও একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তার পরিচায়ক। ফলে ভারতবর্ষ নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা আমাদের মনে জাগে। এই ধারণাই ভারতবাসীর মনে এক গভীর একত্ববোধের সৃষ্টি করিয়াছে।

'ভারতবর্ষ' নামের প্রভাব

নির্দিষ্ট সীমারেখা

দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের মধ্যে যে একত্ববোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়া নহে, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়াও যে এই একত্ববোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ যদিও রাজনীতিক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছিল, তথাপি বৈদিক যুগের শেষ ভাগ হইতে ভারতীয় নৃপতিদের মনে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। 'একরাট্', 'সম্রাট্', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতিরূপে

প্রাচীন যুগের রাজগণের আদর্শ; একরাট্, সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী

---

* 'ইতিহাস': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৬।

† "উত্তরম্ যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষম্ তদ্ ভারতম্ নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ"। বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।১

সম্মান লাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছিল।* এই রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ, ভারতীয়দের মনে একত্ববোধ সৃষ্টির পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ এবং মোগল আমলে ভারতবর্ষের অধিকাংশই এক রাজনৈতিক সংগঠনাধীন হইয়াছিল। এইভাবে ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণের রাজনৈতিক সুখদুঃখের ইতিহাস একই প্রকার ছিল। সাময়িক কালের জন্য হইলেও বিভিন্ন সময়ে এইভাবে একই রাজনৈতিক অবস্থা, একই শাসনাধীনে বাস করা প্রভৃতি ভারতবাসীর মনে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাময়িকভাবে রাজনৈতিক ঐক্য

তৃতীয়ত, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, আচার-আচরণ ও ভাষার লোকদ্বারা অধ্যুষিত হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নিজস্ব রূপ আছে। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতি অপেক্ষা ইহা সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌। ইওরোপীয় সভ্যতা বলিলে জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা সম্পর্কেই একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রাচ্যের সভ্যতা বলিলে ঐরূপ মোটামুটি ধারণার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করা চলে না। ভারতীয় সভ্যতাকে 'ভারতীয়' নামেই পরিচয় দানের একমাত্র উপায়, কারণ ইহার একটি নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র রূপ রহিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় মৌলিক ঐক্যের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক সময়ানুক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জাতি ভারতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। বরঞ্চ ঐ সকল বিভিন্ন জাতির লোকগণ হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ভারত-সভ্যতার বিশাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন নদ-নদীর জলরাশি যেমন সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্রের জলে পরিণত হয় এবং নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে সেরূপ ভারত-সভ্যতা-সমুদ্রে বিভিন্ন মানুষের ধারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ভারত-সভ্যতাকেই পুষ্ট করিয়াছে। এইভাবে নানা সময়ে নানা জাতির লোকের অবদান-পুষ্ট-ভারত-সভ্যতা পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ সৃষ্টি করিয়াছে, বলা বাহুল্য।†

স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রভাব

বিভিন্ন জাতির অবদান-পুষ্ট হইলেও ভারতীয় মূল সভ্যতার কাঠামো অপরিবর্তিত

* The political unity of India, although never attained perfection in fact, always was the ideal of the people throughout the centuries. The conception of the universal sovereign as the *Raj Chakrovarty Raja* runs through Sanskrit literature and is emphasised in scores of inscriptions." *The Oxford History of India*; V. A. Smith, 3rd Edition (Edited by T. G. P. Spear), p. 6.

† "The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or civilisation utterly different from any other type in the world. The civilisation may be summed up in the term Hinduism." Ibid, p. 7.

চতুর্থত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও একই প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রায় একই প্রকার খাদ্য, পানীয়, একই ধরনের জীবনযাত্রার সামগ্রিক পরোক্ষ প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে।*

একই প্রাকৃতিক পরিবেশ

পঞ্চমত, মোগল সাম্রাজ্যের ও পরবর্তী কালে ব্রিটিশ যুগের শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, একই রাষ্ট্রভাষা, একই ধরনের মুদ্রার ব্যবহার প্রভৃতিও ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ সৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের তুলনায় প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা বা বিস্তৃতির দিক দিয়া ততটা সাফল্য অর্জন করে নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক অসুবিধা ও বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবের কথা স্মরণ রাখিলে প্রাচীন যুগে মৌর্য বা গুপ্ত যুগে যে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার গুরুত্ব মোটেই কম নহে।†

মোগল ও ব্রিটিশ যুগে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য

সর্বশেষে, ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতীয়দের একত্ববোধ বহগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশের স্বদেশপ্রেমিকগণ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ-ই ছিল তাঁহাদের আদর্শ, নিজ নিজ এলাকার স্বাধীনতা লাভ সেই সংগ্রামের আদর্শ ছিল না। বিভিন্ন অংশের ভারতীয়গণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয় আন্দোলনের পবিত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে শত শত মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকের মনে প্রেরণা জোগাইয়াছে, নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহারা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রিটিশ শক্তির আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়া অমর হইয়াছেন। এই দেশাত্মবোধও ভারতীয়গণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করিয়াছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম: 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব

সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিম ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে। রাজনৈতিক কূটচাল ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ইহাতে জয়যুক্ত হইলেও ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধারা যে তাহাতে ব্যাহত ও ছিন্ন হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য। এই কৃত্রিম রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসিগণের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য স্বার্থান্বেষী

দ্বি-খণ্ডিত ভারতবর্ষ: কৃত্রিম ব্যবস্থা

* "Vide, Sir J. N. Sarkar's article 'Unity of India': *Modern Review, Nov.,* 1942.

† Majumdar *Ancient India,* p. 3.

রাজনীতিকদের অসহিষ্ণুতার উপশম হইলে পুনরায় পরস্পর সৌহার্দ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য বর্তমানে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের নিকট ভারতবাসী চিরকাল এজন্য ঋণী থাকিবে। ব্রিটিশ শক্তি যে ভারতে সামগ্রিক রাজনৈতিক ঐক্য সাধনে অকৃতকার্য হইয়াছিল স্বাধীন ভারত সরকার তাহা সম্পন্ন করিয়া ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অমর কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্য

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকিলেও ভারতবাসীদের মধ্যে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ঐক্য* ভৌগোলিক একত্ব বা রাজনৈতিক একতা অপেক্ষা বহু গভীর ও অন্তরতর। এই ঐক্যমূলক সভ্যতাই হইল প্রকৃত সভ্যতা। ভারতবাসী তাহাই সৃষ্টি করিয়াছে।†

মৌলিক ঐক্য: ঐক্যতামূলক সভ্যতা

ভারত-ইতিহাসের উপাদান (প্রাচীন যুগ) (Sources of Ancient Indian History):

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করিয়া পাঠ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনায় প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগে কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গঠনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে মধ্য যুগের ও তৃতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান আলোচনা করা হইবে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-উপনিষদ ভারতবর্ষেই রচিত হইয়াছিল। সাহিত্য-কীর্তিতে ভারতবাসী অতি প্রাচীনকাল হইতেই মনীষা ও মননশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু হেরোডোটাস্, থুকিডিডিস, পলিবিয়াস, ট্যাসিটাস্ বা লিভির ন্যায় ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হয় নাই। ফলে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন

* "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect." Smith p. x, (2nd. Edn.)

† "ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া কাহাকেও দূর করে নাই, কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে, উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, মূলভাবটি ভারতবর্ষের"। ইতিহাস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৮-৯।

যুগের কোন সরাসরি ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রধানত পরোক্ষ উপাদানের উপর নির্ভর করিয়াই প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে। ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে, প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ নিজ নিজ রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত রাখিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আমলে রচিত ইতিহাস-সাহিত্য প্রাকৃতিক কারণ, কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ ও বহুসংখ্যক রাজনৈতিক বিপ্লব ও পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিলে ইতিহাস-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব আমাদের নিকট যতই আশ্চর্যজনক হউক না কেন, প্রাকৃতিক কারণ, কীট-পতঙ্গ বা রাজনৈতিক বিপ্লব কেবলমাত্র ইতিহাস-সাহিত্যকেই পৃথক ভাবে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে কেন ধ্বংস করিয়াছিল তাহার কারণ ডক্টর স্মিথের যুক্তি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-সাহিত্যের অভাব

যাহা হউক, ভারতীয়গণের ঐতিহাসিকবোধ বা সময়ানুক্রমের প্রয়োজনীয়তাবোধ যে ছিল না, এমন নহে। বেদ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হইতে ধারাবাহিকতা ও সময়ানুক্রমের গুরুত্ব তাঁহারা যে উপলব্ধি করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। হিউয়েন সাঙ্ ভারতীয় প্রদেশ মাত্রেই গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক ঘটনার সময়ানুক্রমিক বর্ণনা লিখিয়া রাখিবার রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিকবোধ বা ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব তখন ছিল না সত্য, কিন্তু এই সকলকে কাজে লাগাইয়া প্রকৃত ইতিহাস-সাহিত্য রচনার উপযুক্ত লেখকের তখন অভাব ছিল ইহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য যুক্তি।

ঐতিহাসিকবোধ ও সময়ানুক্রমের প্রয়োজনীয়তাবোধ স্বীকৃত

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির অভাব না থাকিলেও হেরোডোটাস্ বা থুকিডিডিস্, লিভি অথবা ট্যাসিটাসের ন্যায় ঐতিহাসিক ভারতে তখন ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান স্বভাবতই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ—এই দুই প্রকার উৎস হইতে খুঁজিতে হইবে।

ঐতিহাসিক প্রতিভার অভাব

(১) **প্রাচীন সাহিত্য (Literary Evidence) :** প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনার পরোক্ষ উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতে প্রদত্ত বংশ-পরম্পরায় রাজগণের তালিকা হইতে এবং ঐ সকল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপাদান ব্যবহারকালে বিশেষ সাবধানতা ও বিবেচনার প্রয়োজন, নতুবা ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনীয় কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে নিছক কাল্পনিক কাহিনী-কিংবদন্তী পৃথক করা দুষ্কর হইবে।

বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতের সুদূর অতীতের ইতিহাস-রচনায় বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি ও ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রচুর তথ্যাদি ব্যবহৃত

হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ জাতক, এবং পরিশিষ্টপার্বন প্রভৃতি জৈন ধর্মশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান রহিয়াছে। গার্গীসংহিতা নামক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, পাণিনি ও পতঞ্জলির ব্যাকরণ গ্রন্থাদি হইতেও কতক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব।

বৌদ্ধ, জৈন, ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ, ব্যাকরণ প্রভৃতি

প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ গুপ্ত যুগ হইতে প্রকৃত ইতিহাস-সাহিত্যের প্রাচুর্য না থাকিলেও স্থানীয় রাজাদের বংশাবলী ও জীবনচরিতে ইতিহাস-রচনার প্রচুর উপাদান রহিয়াছে। প্রাচীন যুগের মধ্যভাগের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এগুলি প্রাচীন কাহিনী-কিংবদন্তীর পর্যায়ভুক্ত নহে। এই সকল রচনার কাল এবং রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

রাজাদের বংশাবলী ও জীবনচরিত

এইরূপ গ্রন্থাদির মধ্যে কতকগুলি রাজা-মহারাজার প্রশস্তি ও শাসন-সংক্রান্ত নীতি প্রভৃতি রহিয়াছে। মৌর্য যুগে কৌটিল্য-রচিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে ঐ যুগের রাজনীতির পরিচয় লাভ করা যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির মধ্যে বাণভট্ট-রচিত 'হর্ষচরিত' নামক গ্রন্থে মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এবং তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। বাক্‌পতিরাজ তাঁহার 'গৌড়বহো' কাব্যে যশোবর্মন্ কিভাবে গৌড় জয় করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। কবি বিল্‌হণ্ চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের ইতিহাস তাঁহার 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত' নামক কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা রামপালের সময়ে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রাম-চরিত' রচনা করেন। এই গ্রন্থ হইতে রামপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। কাশ্মীরের কবি কল্‌হণ্ 'রাজতরঙ্গিণী' নামে একখানি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজবংশগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত আছে। পদ্মগুপ্তের 'নব সাহসাঙ্ক-চরিত' একখানি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

কৌটিল্য, বাণভট্ট, বাক্‌পতিরাজ, বিল্‌হণ্, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতির রচনা

এইগুলি ভিন্ন জয়সিংহের 'কুমারপাল-চরিত', হেমচন্দ্রের 'দ্বাশ্রয়কাব্য', ন্যায়চন্দ্রের 'হাম্মির কাব্য', বল্লাল-রচিত 'ভোজ-প্রবন্ধ', চাঁদবরদৈ-এর 'পৃথ্বীরাজ-চরিত' এবং একজন অজ্ঞাতনামা রচয়িতার 'পৃথ্বীরাজ-বিজয়' প্রভৃতি 'চরিত' গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। এই সকল রচনা প্রকৃত ঐতিহাসিক রচনার পর্যায়ভুক্ত না হইলেও এগুলিতে ইতিহাস রচনার প্রচুর উপাদান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

জয়সিংহ, হেমচন্দ্র, ন্যায়চন্দ্র, চাঁদবরদৈ

স্থানীয় বংশাবলী-সংক্রান্ত সাহিত্যের মধ্যে কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজবংশগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের রচনার মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস-সাহিত্য বলিতে একমাত্র

কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী

কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরের প্রাচীনতম ইতিহাস সম্পর্কে কল্‌হণের রচনা খুব বেশি নির্ভরযোগ্য না হইলেও তাঁহার সমসাময়িক কাল ও উহার নিকটবর্তী সময়ের ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তথ্য, সমালোচনামূলক আলোচনা, সাধারণ জীবনযাত্রা-সম্পর্কে বর্ণনা প্রভৃতিতে উহা পরিপূর্ণ। কল্‌হণের রচনাভঙ্গীতে প্রকৃত ঐতিহাসিকসুলভ মনোবৃত্তি ও নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।*

কল্‌হণের নিরপেক্ষতা

কল্‌হণ ইতিহাস-রচনার যে ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক জনরাজ অনুকরণ করিয়াছিলেন। জৈনুল আবেদিনের রাজত্বকালে শ্রীধর, প্রাজ্যভট্ট, শুক প্রভৃতি লেখকগণ কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

কল্‌হণের উত্তরসাধকগণ : জনরাজ, শ্রীধর, প্রাজ্যভট্ট, শুক

কাশ্মীরের ন্যায় গুজরাটের বংশাবলীও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। সোমেশ্বরের 'কীর্তিকৌমুদী', 'রাসমালা', রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ' প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থে গুজরাটের স্থানীয় রাজবংশগুলির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। এমনকি সিন্ধু, নেপাল প্রভৃতি অপরাপর স্থানেরও স্থানীয় রাজবংশের বর্ণনাসংবলিত সাহিত্যিক রচনা পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের নন্দিকাকলম্বকম্ নামক তামিল রচনা প্রভৃতিও ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

গুজরাট : সোমেশ্বর, রাজশেখর প্রভৃতি

কাশ্মীর, গুজরাট, সিন্ধু, নেপাল প্রভৃতি স্থানের স্থানীয় বংশাবলীর ধারাবাহিক তালিকা হইতে ভারতীয় রাজগণ যে বংশাবলী-রচনার পক্ষপাতী ছিলেন—হিউয়েন সাঙ্‌-এর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনা হইতেও ভারত-ইতিহাসের তথ্যাদি পাওয়া যায়।

হিউয়েন সাঙ্‌-এর উক্তির সত্যতা; তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ

(২) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান** (Archaeological Evidence) : প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্য ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বহুলাংশেই অজ্ঞাত থাকিত।†

*"That virtuous poet alone is worthy of praise who, free from love or hatred, ever restricts his language to exposition of facts." *Kalhana* quoted, Vide, *The Vedic Age*, p. 50.

†"It is almost from a patient examination of the inscriptions that our knowledge of the ancient political history of India has been derived. But we are also ultimately dependent on the inscriptions in every other line of Indian research. Hardly any dates and indentifications can be established except from them." Fleet, vide, Sinha & Banerjee : *History of India*, p. 17.

"Inscriptions have proved a source of the highest value of the reconstruction o the political history of ancient India." *The Vedic Age*, p. 52.

"Inscriptions have been given the first place in the list (of sources of Ancient

(Contd.)

অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকার্য মাত্র একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে শুরু হইয়াছে। কয়েকজন উৎসাহী ইওরোপীয় পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ঐতিহাসিকদের হস্তগত হইয়াছে। এ-বিষয়ে ডক্টর বুকানন হ্যামিল্‌টন্‌, জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ্‌, সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, জেম্‌স্‌ বার্জেস্‌, ভাইসরয় মার্কুয়েস কার্জন, সার জন মার্শাল, অ্যরেল স্টাইন, এবং ভারতীয়দের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে. এন. দীক্ষিত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা

বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকগণ

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানকে (ক) লিপি, (খ) মুদ্রা, (গ) সৌধ, স্মৃতি-স্তম্ভ প্রভৃতি, এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

লিপি, মুদ্রা ও সৌধ, স্মৃতি-স্তম্ভ প্রভৃতি

লিপি (Inscription) : প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে লিপি বা লেখ-ই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর অতীতের ইতিহাস-রচনার নির্ভরযোগ্য উপাদানই হইল এগুলি। এই সকল লিপি নানা প্রকারের এবং নানা বিষয়-সংক্রান্ত পাথর, সোনা, রূপা, লোহা, ব্রোঞ্জ ও তামার পাত প্রভৃতি স্থায়ী জিনিসের উপর খোদাই করা লিপি ঐতিহাসিক সত্যের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য, কারণ কোনকালেই এগুলিকে পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। অবশ্য এই সকল লিপি বা লেখ পাঠ করিয়া উহাদের অর্থ উদ্ধার করা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছে সেগুলি হইতে সময়, ঘটনা প্রভৃতি সম্পর্কে অভ্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি আবার প্রধানত তিন প্রকারের : রাজপ্রশস্তি (prasasti *i.e.* eulogy of kings), শাসন-সংক্রান্ত ঘোষণা, অনুশাসন, দানপত্র প্রভৃতি (official documents like royal rescripts, boundary marks etc.) এবং বে-সরকারী ব্যক্তিগত দানপত্র, উৎসর্গপত্র (private records of a votive, donative of dedicative type)।

লিপি—সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান

লিপি প্রধানত তিন প্রকারের : (১) রাজ-প্রশস্তি, (২) দানপত্র

(৩) ব্যক্তিগত দানপত্র

এই সকল লিপি প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহারই প্রধানত পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মী লিপি বাম হইতে ডান দিকে এবং খরোষ্ঠী লিপি ডান হইতে বাম দিকে লেখা হইত। গুপ্ত যুগের পূর্ববর্তী কালের লিপিগুলির শতকরা ৯৫ ভাগ-ই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। গুপ্ত যুগ হইতে অবশ্য সংস্কৃত ভাষা-ই এজন্য বেশি ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন লিপির ভাষা : প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি : ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার

Indian History), because they are, on the whole, the most important and trustworthy source of our knowledge." V.A. Smith ; *Oxford History of India*, p. 13 (3rd Edn.)

"Unquestionably the most copious and important sources of Indian history is the epigraphic." V. A. Smith : *Early History of India*. p. 16.

বিভিন্ন ধরনের লিপি হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্যাদি জানা যায়। প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান সরবরাহ করিলেও এই সকল লিপি হইতে ঐ সময়কার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কেও যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

লিপি হইতে প্রধানত রাজনৈতিক তথ্যাদি এবং অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ সম্ভব

কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী লিপি বা লেখ (Inscription) হইতেও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। এশিয়া মাইনরস্থ বোঘাজ-কোয় (Boghaz-koi) নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখ হইতে আর্যদের ভারত আগমনের ইতিহাস সম্পর্কে কতক পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। পারস্যের বেহিস্তান, পার্সেপলিস নামক প্রাচীন রাজধানী এবং নাক্‌শ-ই-রুস্তম নামক স্থানে প্রাপ্ত লিপি হইতে ভারতবর্ষ এবং পারস্য দেশের যোগাযোগ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়।

বিদেশী লিপি হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান : বোঘাজ-কোয়, বেহিস্তান, পার্সেপলিস, নাক্‌শ-ই-রুস্তমে প্রাপ্ত লিপি

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে, পিপ্‌রাওয়ার লিপিই ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সোহ্‌গোর তাম্রলিপি (Sohgaura copper plate) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপি, এই সিদ্ধান্তই বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য। এই তাম্রলিপি সম্রাট অশোকের আমলের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করা হয়।

সোহ্‌গোর তাম্রলিপি প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি : অশোকের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ববর্তী

প্রাচীন ভারতের লিপিগুলির মধ্যে অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি সর্ব-শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপকরণ। অশোকের রাজত্বকালের বিষদ ও সম্পূর্ণ বিবরণ এই সকল লিপি হইতেই জানা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, কলিঙ্গরাজ খারবেল, শকক্ষত্রপ রুদ্রদামন প্রভৃতির লিপি, গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি, গুপ্ত যুগের খালিমপুর ও ভাগলপুরে প্রাপ্ত অনুশাসনসমূহ ইতিহাস-রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মহারাজ অশোকের লিপি

মুদ্রা (Coins) : প্রাচীন আমলের মুদ্রা হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। প্রাচীন যুগের হাজার হাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাটির নীচ হইতে এক এক স্থানেই বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রা হইতে সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা, মুদ্রানীতি, ধাতুশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। ইহা ভিন্ন মুদ্রায় অংকিত মূর্তি হইতে শিল্প-নিপুণতা ও রাজা-মহারাজাদের আচার-আচরণ, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতির ধারণা জন্মে। আবার মুদ্রার তারিখ প্রভৃতি দেখিয়া সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা চলে। মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে রাজ্যের বিস্তৃতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ মুদ্রা, বীণাবাদনরত মুদ্রা, সিংহহন্তা

মুদ্রা হইতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা, ধাতু-শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণালাভ

রাজা-মহারাজাদের আচার-আচরণ ও অনুরাগ সম্পর্কে ধারণা : সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

মূর্তি-সংবলিত মুদ্রা হইতে তাঁহার আমলের অশ্বমেধ যজ্ঞ, তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ ও তাঁহার শিকারপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়।

রাষ্ট্রীয় গ্রীকগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন হইতে গ্রীকরাজগণ যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেগুলিতে রাজার নাম ও রাজার চেহারার ছাপ অঙ্কিত থাকিত। ইহার পূর্বেকার মুদ্রায় মূর্তি, সাংকেতিক চিহ্নাদি থাকিত, কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একটি কথাও লেখা থাকিত। শক, পহ্লব, কুষাণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রা হইতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এ সকল রাজার মুদ্রা গ্রীক ও রোমান মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গ্রীকমুদ্রা : ইহার অনুকরণ

সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি (Monument) : দালান-কোঠা, সমাধি সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতেও স্থাপত্য-শিল্পের প্রগতির ইতিহাস উপলব্ধি করা যায়। নানা প্রকার আলঙ্কারিক কারুকার্য-খচিত সৌধাদির ভগ্নাবশেষ, মৃৎশিল্প প্রভৃতিও এই পর্যায়ের অধীনে বিবেচনা করা চলে। কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভের পক্ষে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেও সুদূর অতীতের সভ্যতার উন্নতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত সভ্যতার চিহ্নাদি হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা, উহার প্রকৃতি এবং বহির্জগতের সহিত উহার যোগাযোগ সম্পর্কে বহু কিছু জানা গিয়াছে।

স্থাপত্য-শিল্প নিদর্শন : ইহার গুরুত্ব

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার খননকার্য : ভারতের প্রাচীন যুগের উপর নূতন আলোকসম্পাত

তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অপরাপর ঐতিহাসিক তথ্যাদির সমর্থক বহু নূতন নূতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ফলে সমসাময়িক ইতিহাস অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের খননকার্য

(৩) **বিদেশীয়দের বর্ণনা (Foreign Accounts) :** সুদূর অতীতের ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিদেশীয়দের বর্ণনা হইতে পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপাদান-ব্যবহারে কতকটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ বিদেশীয়দের বর্ণনায় তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি-ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের স্বাভাবিক অসুবিধা, অপরের বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া বর্ণনাদান, স্থানীয় ভাষা বুঝিবার অক্ষমতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে বিদেশীয়দের বর্ণনার অনেক কিছুই ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। এইরূপ বর্ণনা বাদ দিয়া অপর যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপকরণ সন্দেহ নাই।

বিদেশীয়দের বর্ণনা গ্রহণে সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা

হেরোডোটাস্ ও টেসিয়াস্

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ (Herodotus) ও পারস্য-সম্রাট আর্টাজারেক্সস্-এর গ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াস্ (Ctesias) পর্যটকদের মুখে ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুনিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশের যোগাযোগ সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। হেরোডোটাসের বর্ণনায় কতক ঐতিহাসিক উপকরণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু টেসিয়াসের বর্ণনায় কাল্পনিক কাহিনীরই প্রাচুর্য অধিক।

আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গ

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে যে-সকল গ্রীক তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে নিজ নিজ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা হইতেই সর্বপ্রথমে ইওরোপে ভারতবর্ষ সম্পর্কে খবরাদি বিস্তার লাভ করে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর সেলিউকস্ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিসকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস সমসাময়িক ভারতবর্ষ, মৌর্যশাসন প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থের বহু কিছুই অবশ্য পরবর্তী লেখকগণের রচনায় উল্লিখিত ছিল। এই সকল বিভিন্ন লেখকের রচনা হইতে মেগাস্থিনিসের পুস্তকখানি মোটামুটিভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রীকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, সিরিয়ার রাজা ডেইমেকস্ (Deimachos) নামে একজন গ্রীক রাষ্ট্রদূতকে মৌর্য রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডেইমেকস্ ও ডাইওনিসাসের বিবরণে মেগাস্থিনিসের বিবরণের বহু কিছুর সমর্থন পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস

ডেইমেকস্ ও ডাইওনিসাস্

'পেরিপ্লাস্' (Periplus of the Erythraean Sea)

জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক 'পেরিপ্লাস্' (Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে ভারতীয় বন্দর, পোতাশ্রয়, সমুদ্রবাহী বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি মূল্যবান বর্ণনা লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন (৮০ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থ হইতেই প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

নিয়ারকসের নৌ-অভিযান, টলেমির ভূগোল, প্লিনির খনিজ ও অরণ্য-সম্পদ সম্পর্কে বর্ণনা

আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ারকস্ (Nearchos) সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদ্র অভিযান ও খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি-রচিত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ভূগোল সম্পর্কে বহু তথ্যাদি জানা গিয়াছে। অবশ্য অপরের মুখে শুনিয়া ভূগোল রচনার যাবতীয় ত্রুটি তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ভারতবর্ষের খনিজ ও অরণ্য-সম্পদ এবং জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে প্লিনির বিবরণও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবহেতু ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি এই সকল লেখকদের রচনা হইতে বহু মূল্যবান উপকরণ পাওয়া গিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তৎকালীন গ্রীক লেখক ভিন্ন কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ (Quintus Curtius), ডায়োডোরাস্ (Diodorus), এ্যারিয়ান (Arrian), স্ট্রাবো (Strabo), প্লুটার্ক (Plutarch) প্রভৃতি অপরাপর গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা হইতে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রীক ও রোমান লেখক: কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস, ডায়োডোরাস, এ্যারিয়ান, স্ট্রাবো, প্লুটার্ক প্রভৃতি

পারসিক, গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা ভিন্ন চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনাও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। অবশ্য অধিকাংশ চীনা পরিব্রাজকই তীর্থভ্রমণ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; সেইজন্য তাঁহাদের রচনায় ধর্ম-সংক্রান্ত বর্ণনারই প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। তথাপি এই সকল বর্ণনার স্থানে স্থানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুও যে না রহিয়াছে, এমন নহে। 'চীন দেশের হেরোডোটাস্' সু-মা-কিয়েন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। সু-মা-কিয়েন ছিলেন 'চীন দেশীয় ইতিহাসের জনক' (Father of Chinese History)।

চৈনিক ঐতিহাসিক: সু-মা-কিয়েন

চৈনিক বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষে পর পর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম (৩৯৯-৪১৪ খ্রীঃ) শতকে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়া সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ্ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উপাদান এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া গিয়াছে। হিউয়েন সাঙ্ নামক অপর একজন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতেও সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। ই-সিং (I-Tsing) নামক অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজকও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের ন্যায় ই-সিং-ও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনায়ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও অপরাপর তথ্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ: ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, ই-সিং

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে আরব লেখকগণের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব ব্যবসায়িগণ ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু প্রদেশের কতক অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই আরবদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আরব লেখকদের মধ্যে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত আল্‌বিরুনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং 'তহ্‌কিক্-ই-হিন্দ্' (An Enquiry into India) নামক মূল্যবান

আরব লেখকগণ:

আল্‌বিরুনী: তহ্‌কিক্-ই-হিন্দ্

গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দু আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে এই গ্রন্থে অতি মূল্যবান বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ সময়কার ইতিহাস-রচনায় আল্‌বিরূনীর গ্রন্থখানির সহায়তা অপরিহার্য। আল্‌বিরূনী ভিন্ন আল্‌ বিলাদূরী, হাসান নিজামী, আল্‌ মাসুদি, ইবন্‌-উল্‌-আথির প্রভৃতি অপরাপর আরবীয় মুসলমানগণের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ রহিয়াছে।

আল্‌ বিলাদূরী, হাসান নিজামী, আল্‌ মাসুদি, ইবন্‌-উল-আথির

প্রথম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

(Pre-Historic Age)

প্রাচীন-প্রস্তর যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ (Palaeolithic & Neolithic Ages) ঃ

এক সময়ে ধারণা ছিল যে, আর্যদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা বহুদিন পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, আর্যদের আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষে অনার্য জাতির বাস ছিল। অনার্য জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে অধিক কিছু আমাদের জানা নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং বেদ ও প্রাচীন তামিল সাহিত্যে অনার্যদের সম্পর্কে যে-সকল পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনার্যদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যাইতে পারে।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতের অনার্য অধিবাসীদের অস্তিত্ব

ভারতের আদিম অধিবাসিগণ ছিল প্রাচীন-প্রস্তর যুগের (Palaeolithic men) লোক। তাহাদের নির্মিত পাথরের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে ভারতের পূর্ব-উপকূলে এই সকল অতি সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া আমরা ঐ যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতক অস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারি। এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র যাহারা ব্যবহার করিত তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, বলা বাহুল্য। কৃষি, রন্ধনকার্য প্রভৃতিও তাহাদের জানা ছিল না। মৃৎপাত্র-নির্মাণ প্রভৃতি কাজও তাহারা জানিত না। আগুন জ্বালিবার উপায়ও তাহাদের জানা ছিল না বলিয়া-ই মনে করা হয়। মাছ ও পশুর কাঁচা মাংস, ফল-মূল প্রভৃতি ছিল তাহাদের খাদ্য। অনেকে মনে করেন যে, অনার্যগণ আধুনিক কালের আন্দামানবাসীদের ন্যায় কৃষ্ণকায়, পশমের মত চুলযুক্ত, অনুন্নত নাসা ও খর্বাকৃতি ছিল।

প্রাচীন-প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)

কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে এই সকল লোক প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইতে শিখিল। প্রাচীন-প্রস্তর যুগের মানুষ নব্য-প্রস্তর যুগে পদার্পণ করিল।* এই যুগের লোকেরাও কোন ধাতুর ব্যবহার জানিত না, তাহারা একমাত্র সোনার কিছু ব্যবহার শিখিয়াছিল।

* 'Palaeolithic'=Old Stone; 'Neolithic'=New Stone; *Advanced History of India*, p. 9-11.

তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পাথরের ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি ছিল মসৃণ ও উন্নত ধরনের। প্রাচীন-প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র হইতে এ-যুগের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র অতি সহজেই পৃথক করা চলে। ভারতের প্রায় সকল অংশেই নব্য-প্রস্তর যুগে নির্মিত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। নব্য-প্রস্তর যুগের ভারতীয়রা কৃষিকার্য ও গরু-ছাগল জাতীয় পশুপালন জানিত। কাঠে কাঠ ঘষিয়া তাহারা আগুন জ্বালিতে পারিত। নিজেদের বসবাসের গুহার দেওয়ালগাত্রে তাহারা শিকার, নৃত্য প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া রাখিত। মৃৎ-শিল্পও তাহাদের অজানা ছিল না। মাটির পাত্রের গায়ে তাহারা নানাপ্রকার নকশা আঁকিতে পারিত। এই যুগের বহু সংখ্যক কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব কবর হইতে যে-সকল কঙ্কাল উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐ যুগের মানুষের দেহসৌষ্ঠব ধারণা করা যায়। নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতা প্রাচীন প্রস্তর যুগের-ই পরবর্তী উন্নত পর্যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার অপর অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন-প্রস্তর যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতার মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছান এখনও সম্ভব হয় নাই।

নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)

নব্য-প্রস্তর যুগের পর আসিল ধাতু-ব্যবহারের যুগ। নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতাই ক্রমে ধাতু-ব্যবহারের যুগে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, এ-বিষয়ে সকলেই একমত। নব্য-প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত ধাতু-ব্যবহারের যুগের প্রথম ভাগে নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতু-ব্যবহারের যুগে ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে একই ধরনের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইত এমন নহে। যাহা হউক, নব্য-প্রস্তর যুগের পর সাধারণত তামার ব্যবহার এবং উহার পর লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্রোঞ্জ নির্মিত জিনিসপত্র তাম্রযুগেই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত। তাম্রযুগ ও লৌহ-যুগের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে (Historical Age) পেঁছিতে হইবে।

ধাতু-ব্যবহারের যুগ—তাম্রযুগ ও লৌহযুগ

ভারতীয় জনসমাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ রহিয়াছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ভারত সরকার একপ্রকার যুক্তিহীনভাবেই ভারতবাসীকে সাতটি বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর জে. এইচ. হাটন্ (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে আটটি বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করেন। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর বি. এস. গুহ (Dr. B. S. Guha) তাঁহার 'Racial Affinities of the Peoples of India', ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'An Outline of the Racial Ethnology of India' এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Racial Elements in the Populations' গ্রন্থে অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে ভারতবাসীকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ

ভারতীয়দের জাতি-বিভাগ-সংক্রান্ত মতভেদ

ডক্টর বি. এস গুহ কর্তৃক ছয়টি জাতির উল্লেখ

করিয়াছেন। যথা ঃ নিগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রল্যয়ড্, মোঙ্গল্যয়ড্, মেডিটারেনিয়ান, ওয়েস্টার্ণ ব্র্যাকিসিফ্যালস ও নর্ডিক।

নিগ্রিটো

নিগ্রিটো (Negrito) জাতির লোক ভারতবর্ষে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। একমাত্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বংশধরদের দেখা যায় ঃ

প্রোটো-অস্ট্রল্যয়ড্

প্রোটো-অস্ট্রল্যয়ড্ (Proto-Australoid) জাতির লোক ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর (lower castes) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোঙ্গল্যয়ড্

মোঙ্গল্যয়ড্ (Mongoloid) জাতির মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ রহিয়াছে। আসাম, ভারতবর্ষ-ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিগণ, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা এই জাতির লোক।

মেডিটারেনিয়ান্

মেডিটারেনিয়ান্ (Mediterranean) জাতির লোক আবার নানা বিভাগে বিভক্ত। কানাড়া, তামিল, মালয়ালম অঞ্চল, পাঞ্জাব, গঙ্গা-উপত্যকা অঞ্চল, সিন্ধু, রাজপুতানা ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্র্যাকিসফেল

ব্র্যাকিসিফেল্ (Brachycephallous) জাতির লোক বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর-প্রদেশের পূর্বাংশ, গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া ও তামিল অঞ্চলের কোন কোন স্থান, চিত্রল, গিলগিট, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

নর্ডিক

নর্ডিক (Nordic) জাতির লোক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে এ জাতির লোকের বাস। মারাঠাদের মধ্যে চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণ এই জাতিসম্ভূত।

জাতি ও বাসস্থান-বিভাগের কঠোরতাহীন

উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাস সম্পর্কে স্থান-বিভাগের কোন কঠোরতা নাই। প্রত্যেক অঞ্চলেই বিভিন্ন জাতির লোক অল্পবিস্তর বসবাস করিতেছে।*

সিন্ধু-সভ্যতা (The Indus Valley Civilisation) ঃ

কয়েক বৎসর পূর্বাবধি ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতেই প্রকৃতভাবে শুরু হইয়াছে। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক

* "It must be clearly understood that no rigid separation is possible as there is considerable overlapping of types." Dr. B. S. Guha, Vide, *The Vedic Age*, p. 145.

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর সার্ জন মার্শালের চেষ্টায় এক নূতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সভ্যতা প্রাক্-বৈদিক যুগের সভ্যতা, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা, সুমার, আক্কাদ, ব্যাবিলন, মিশর ও অ্যাসিরিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সভ্যতা সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া 'সিন্ধুসভ্যতা' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। সময়ানুক্রমের দিক হইতে বিচার করিয়া এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সিন্ধু-সভ্যতা: ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা: সুমার, আক্কাদ, ব্যাবিলন, মিশর, আসিরিয়া প্রভৃতি স্থানের সভ্যতার সমসাময়িক

সিন্ধু প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) লার্‌কানা জেলার মহেঞ্জোদরো* এবং পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) মণ্টগোমারি জেলায় হরপ্পা নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এক অতি উন্নত ধরনের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর, লোথাল প্রভৃতি স্থানেও এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর, বিকানীর প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলেও এই সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিমলা পাহাড়ের পাদদেশে রুপার নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আরবসাগরের তীরস্থ সুৎকাজেন-দোর পর্যন্ত মোট আশীটিরও অধিক স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া সিন্ধু-সভ্যতার যুগের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্য কোনরূপ ধারণা করা সম্ভব হয় নাই।

সিমলা পাহাড়ের পাদদেশে রুপার নামক স্থান হইতে আরবসাগর তীরস্থ সুৎকাজেন-দোর পর্যন্ত সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত শহর দুইটি-ই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি শহরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগও ছিল। ইহা হইতে অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগট্ মনে করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে দুইটি রাজধানী হয়ত ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা একটি অপরটির বিকল্প রাজধানী ছিল এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছান অনুচিত হইবে বলিয়া সার মর্টিমার হুইলার (Sir Mortimer Wheeler) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা বিকল্প রাজধানী (?)

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত শহর দুইটির ভগ্নাবশেষ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই দুই স্থানের মধ্যে চারিশত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও উভয় স্থানের সভ্যতা

* মহেঞ্জোদরো = মড়ার ঢিপি (Mound of the dead)
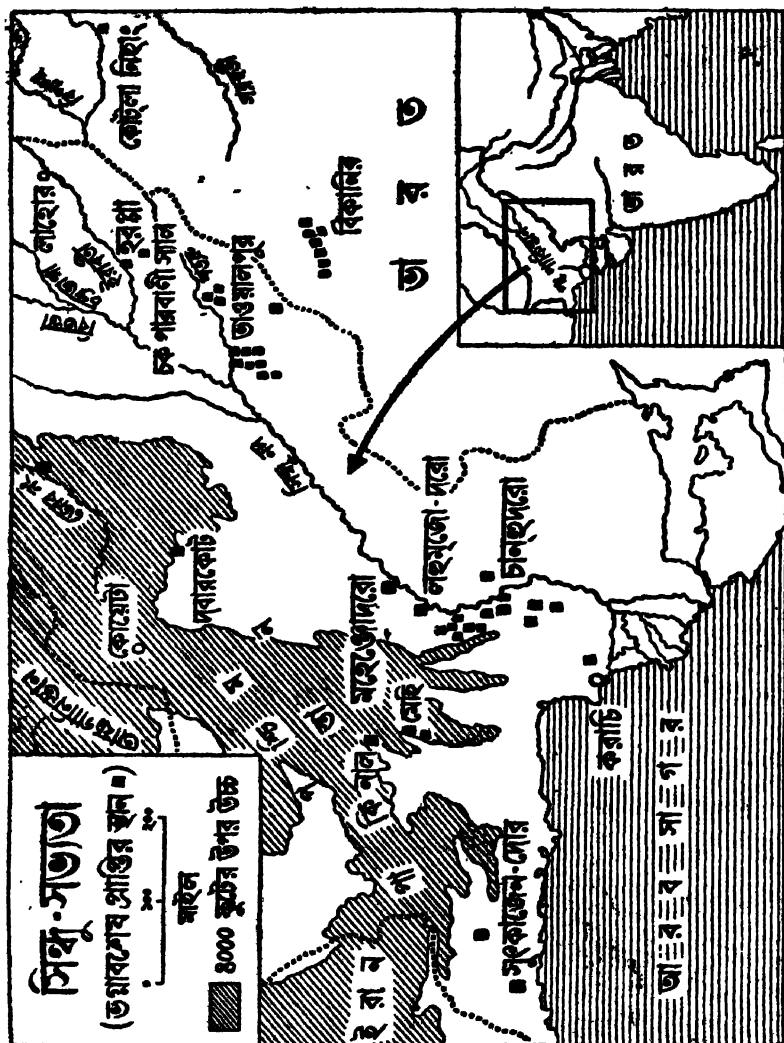
একই ধরনের। শুধু তাহাই নহে, সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতারই বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। সময়ানুক্রমের দিক দিয়া সিন্ধু-সভ্যতাকে তাম্র-প্রস্তর যুগে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। লোহার ব্যবহার সিন্ধু-সভ্যতার কালে জানা ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কাল নির্ণয় মেসোপটামিয়ার উর্, কিশ্, টেল্ আস্মার, ইলাম প্রভৃতি স্থানে সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার উপর নির্ভর করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইলাম (Elam), মেসোপটামিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার নানা প্রকার সামঞ্জস্যও রহিয়াছে। চান্হু-দরোতে যে-সকল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের ৩৫০০ বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।* কেহ কেহ আবার সিন্ধু-সভ্যতাকে ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বের অন্তর্বর্তীকালে স্থাপন করেন।†

সিন্ধু-সভ্যতার কাল নির্ণয়

শহর ঃ মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই প্রায় ২০ ফুট উচ্চ কাঁচা ইট দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তির উপর নির্মাণ করা হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরো শহরের ভগ্নাবশেষের উপর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে একটি বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপ খনন করিতে গিয়াই মহেঞ্জোদরো শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা শহর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত

মহেঞ্জোদরো শহরের পরিকল্পনা ও পূর্তকার্যাদির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সভ্যতা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।‡ শহরের রাস্তাগুলি যেমন ছিল সরল তেমনি প্রশস্ত। ৯ ফুট হইতে ৩৪ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাস্তার দুই পাশ ধরিয়া সরকারী ও বেসরকারী গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল। রাস্তার দুই পাশের দালানগুলি সুমার দেশের দালানের মতো রাস্তার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত নহে। দালানগুলি এক লাইনে সারিবন্ধভাবে নির্মিত হইয়াছিল। দালানের গঠন ও পরিসর হইতে ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য বুঝা যায়। সামান্য দুই-কক্ষযুক্ত দালান হইতে আরম্ভ করিয়া বহু-কক্ষযুক্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন দালান দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল। দালানের মেঝে মসৃণ ছিল, জানালা-দরজার সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেক দালানেই স্নানাগার,

মহেঞ্জোদরো শহরের ভগ্নাবশেষ উন্নত ধরনের সভ্যতার পরিচায়ক

নানা পরিসর ও উচ্চতার দালান

*"The civilisation for all we know may well reach beyond 3500 B. C." *The Vedic Age*, p. 196.

† *The Cultural Heritage of India*, Vol. I, p. 124.

‡"These and smaller trial excavations at various other sites in Sind and in Baluchistan have proved beyond doubt that some five thousand years ago a highly civilised community flourished in these regions." *Advanced History of India*, p. 15.

কূপ, আঙ্গিনা ইত্যাদি ছিল। মহেঞ্জোদরোর তুলনায় হরপ্পায় কূপের সংখ্যা কম ছিল। হরপ্পার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দালান হইল একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৯ ও প্রস্থে ১৩৫ ফুট ছিল। ইহা ভিন্ন শ্রমিকদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত এইরূপ মোট চৌদ্দটি ছোট ছোট দালানের একটি ব্লক্ পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদরোতে ৮৫ × ৯৭ ফুট একটি বিরাট দালানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট কক্ষযুক্ত একটি দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন একটি দালানের অভ্যন্তরে একটি বিরাট স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হরপ্পার বিশাল শস্যাগার মহেঞ্জোদরোর বিরাট স্নানাগার

প্রত্যেক দালান হইতেই জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। জল-নিকাশের জন্য রাস্তার তলদেশ দিয়া নর্দমা নির্মাণ করা হইয়াছিল। জলের সহিত যে-সকল আবর্জনা যায় সেগুলি আটকাইবার জন্য নর্দমার স্থানে স্থানে গর্ত (soak-pit) রাখা হইত। সিন্ধু-সভ্যতার স্থাপত্যকার্য শিল্পকৌশল অপেক্ষা ব্যবহারিক সুবিধার দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার নির্মাণ-শিল্পের মূল কথা ছিল ঐশ্বর্য ও উপযোগ বৃদ্ধি করা, সৌন্দর্য বর্ধন করা উহার লক্ষ্য ছিল বলা চলে না। মহেঞ্জোদরো বা হরপ্পায় কোনপ্রকার মন্দিরের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাস্তাঘাট, নর্দমা, কূপ, দেওয়াল, দালান সব কিছুই পোড়া ইটের দ্বারা নির্মিত ছিল। কেবলমাত্র দালানের ভিত্তি-নির্মাণে রোদে পোড়ান ইটের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শহর ও দালান-কোঠার ভগ্নাবশেষ হইতে এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সিন্ধু-উপত্যকাবাসী অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত।

পয়ঃপ্রণালী

উপযোগ-ই নির্মাণ শিল্পের মূল উদ্দেশ্য

পোড়া ইটের ব্যবহার, ভিত্তি-নির্মাণে কাঁচা ইটের ব্যবহার

উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা

খাদ্য ও গৃহপালিত পশু : মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার ন্যায় বৃহৎ ও জনবহুল নগর গড়িয়া উঠিবার প্রধান কারণই ছিল উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক জীবন। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য, উপযুক্ত পরিবহন-ব্যবস্থা প্রভৃতি না থাকিলে এইভাবে শহর-নগর গড়িবার সুযোগ হইত না, বলা বাহুল্য।

সিন্ধু-সভ্যতা উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচায়ক

সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিবৃন্দ গম, বার্লি খেজুর প্রভৃতি প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিত ; খেজুর ভিন্ন অপরাপর ফলমূল ও নানা প্রকারের শাক-সবজিও তাহারা ব্যবহার করিত। হরপ্পায় কড়াইশুঁটির চাষ হইত এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শূকরের মাংস, ভেড়া, কচ্ছপ, হাঁস প্রভৃতির মাংস সিন্ধু-উপত্যকাবাসিগণ ব্যবহার করিত। টাটকা মাছ, শুকনা মাছ প্রভৃতিও তাহারা খাইত। দুধ তাহাদের প্রধান খাদ্যের অন্যতম ছিল।

গম, বার্লি, ধান, শাক-সবজি, মাংস, মাছ, শুকনা মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত

ভেড়া, গরু, মহিষ, ষাঁড়, হাতী, উট প্রভৃতির কঙ্কাল ও খোদাই-করা প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, এই সকল পশুর মধ্যে অন্তত কতকগুলি গৃহপালিত ছিল। একমাত্র মহেঞ্জোদরোতে ঘোড়ার একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে ঘোড়ার ব্যবহার খুব ব্যাপক ছিল বলা যায় না। মাটির প্রস্তুত খেলনায় বাইসন, গণ্ডার, বাঘ, বানর, ভল্লুক, খরগোশ, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গিয়াছে। ঐসকল সিন্ধু-উপত্যকা-বাসীদের নিকট অবশ্যই জ্ঞাত ছিল। টিয়াপাখী, মুরগী, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতি পাখীও তাহারা পালন করিত বলিয়া মনে হয়।

গৃহপালিত ও বন্য পশুপক্ষী

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ঃ সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সূতীবস্ত্র, পশমবস্ত্র প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইত। ঐ সময়ের কোন পোশাকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। একটি শ্বেতপাথরের মূর্তিতে খোদাই-করা পোশাক হইতে মনে হয় যে, তখনকার পোশাক সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। শালের ন্যায় একখণ্ড বস্ত্র চাদরের মত ডান হাতের নীচ দিয়া বাম কাঁধের উপর জড়াইয়া রাখা হইত। পরিধানের বস্ত্র কতকটা ধুতির মত ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে হাড়ের সূচ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে করা হয় যে, তথাকার লোকেরা সেলাই-করা পোশাক-পরিচ্ছদও হয়ত ব্যবহার করিত।

সূতী ও পশমের পোশাক

পোশাকের দুই প্রধান অংশ

পুরুষেরা লম্বা চুল রাখিত। স্ত্রীলোকেরা আধুনিক কালের ভারতীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করিত। হার, কান-পাশা, নাকের অলঙ্কার, অঙ্গুরীয়, বলয় প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন। পাঁচটি কোমরবন্ধ মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে দুইটির গড়ন অতি অপূর্ব। স্ত্রীলোকেরা কোমরে কোমরবন্ধ এবং পায়ে মল পরিতেন। প্রসাধন-সামগ্রীও যে ঐ সময়ে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চানহু-দরোতে আবিষ্কৃত জিনিসপত্রের মধ্যে স্ত্রীলোকদের ঠোঁটে লাগাইবার লিপ্‌স্টিক্ জাতীয় একটি পদার্থ পাওয়া গিয়াছে।*

স্ত্রী-পুরুষ কর্তৃক অলঙ্কারের ব্যবহার

প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঃ মহেঞ্জোদরোতে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের বহু প্রকার জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। অপরাপর স্থান হইতেও নানা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাটির পাত্র, তামার পাত্র, চীনামাটির পাত্র, রূপা ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত পাত্র দৈনন্দিন জীবনের কাজে ব্যবহৃত হইত। সূচ, মাছ ধরিবার বঁড়শি, চিরুনি, কুঠার, কাস্তে, ক্ষুর, আয়না, থালা, বাটি, জগ প্রভৃতি নানাকিছু দুষ্টে তখনকার দৈনন্দিন জীবনের মান যে খুব উন্নত ছিল, সে-বিষয়ে

মাটি, চীনামাটি, রূপা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির পাত্র

আয়না, চিরুনি, কুঠার, থালা, বাটি, ক্ষুর, খেলনা, মার্বেল, বল, পাশা

* 'It is interesting to note that Chanhu-daro finds indicate the use of lip-stick.' Vide. *The Vedic Age*, p. 175.

সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। শিশুদের খেলার সামগ্রীর মধ্যে ঠেলাগাড়ী, চেয়ার প্রভৃতির ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। মার্বেল, বল, পাশা প্রভৃতি ছিল তখনকার প্রধান খেলা।

চেয়ার, টুল, খাট, চারপাই, মাদুর প্রভৃতি নানাপ্রকার আসবাবপত্র ঐ সময়ে ব্যবহৃত হইত। মোমবাতির ব্যবহারও ঐ যুগে জানা ছিল বলিয়া মনে হয়।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র : সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরা কেবল আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। ছুরি, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভৃতি আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু ঢাল, বর্ম প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক কোন জিনিস পাওয়া যায় নাই। সামরিক দ্রব্যাদির নিদর্শন সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে খুব বেশি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহা হইতে সিন্ধু-সভ্যতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।* গুলতি (sling) আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। গুলতির ব্যবহারের জন্য পোড়া মাটির ছোট ছোট বল ও একপ্রকার লম্বা ধরনের গুলি প্রস্তুত করা হইত।

আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র : আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব

যন্ত্রপাতির মধ্যে কাস্তে, বাটালি, করাত, মুচির সূচ (awl), ছোট ছুরি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সাধারণ যন্ত্রপাতি

শিল্পকলা : সিন্ধু-সভ্যতার কালে কাঠ হইতে খোদাই করিয়া মূর্তি নির্মাণ কৌশল জানা ছিল বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এগুলির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ-নির্মিত নর্তকী-মূর্তি ও বহুসংখ্যক পশুর প্রতিকৃতি হইতে তথাকার শিল্পীদের অতি উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত মস্তক ও হস্তপদহীন একটি প্রস্তর মূর্তি হইতে শরীরের গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে শিল্পীগণের সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের খেলনা প্রস্তুত ব্যাপারেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের শিল্পীগণ অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। মাটির প্রস্তুত ছোট ছোট পাখী বাঁশীর (whistle) ন্যায় বাজান চলিত। ইহা ভিন্ন ভিতর-ফাঁপা মাটির বলের মধ্যে ছোট ছোট পাথর পুরিয়া ঝুনঝুনি তৈয়ার করা হইত। মাথা নাড়াইতে পারে এইরূপ ষাঁড়, হাত নাড়াইতে পারে এইরূপ বাঁদর প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রীড়নক ঐ সময়ে প্রস্তুত হইত, ইহা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

ব্রোঞ্জ-নির্মিত নর্তকী-মূর্তি

শিল্পিগণের অসাধারণ শিল্প-কৌশল

মহেঞ্জোদরোতে দাড়িযুক্ত, ঠোঁট-কামানো একটি মূর্তির উপরিভাগ পাওয়া গিয়াছে।

*"......it is to be supposed that the wide extent of the civilisation was initially the product of something more forcible than peaceful penetration. True, the military element does not loom large amongst the extant remains." Wheeler: *The Indus Age* p. 53.

এই ধরনের মূর্তি মহেঞ্জোদরোতেই নির্মিত হইত এইরূপ মনে করা ভুল হইবে না। মেসোপটামিয়া, মিশর, ক্রীট প্রভৃতি দেশে এইরূপ মূর্তি নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত মেসোপটামিয়া হইতে এইরূপ মূর্তি নির্মাণ-পদ্ধতি ক্রমে সিন্ধু-উপত্যকায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তবে মেসোপটামিয়া অঞ্চলের মূর্তি হইতে ইহার গড়ন সম্পূর্ণ পৃথক।

মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত মূর্তি

সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে মোট প্রায় দুই হাজারেরও বেশি সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির উপরে অঙ্কিত মানুষ ও পশুর মূর্তিগুলিও ঐ যুগের শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক। এই সকল সীলমোহরে কতকগুলি চিত্র-লিপিও রহিয়াছে, কিন্তু এগুলির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

সীলমোহর

শিল্প: নানাপ্রকার উৎপাদন-শিল্পের মধ্যে কৃষিকার্য-ই ছিল প্রধান। ইহা ভিন্ন মৃৎপাত্র-নির্মাণ, বয়ন-শিল্প, অলঙ্কার-নির্মাণ, ভাস্কর্য, ধাতু-শিল্পাদিও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থা: সিন্ধু-সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্জ, রুপা ও সোনার ব্যবহার ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় তামা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু দক্ষিণ-ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করিয়া সিন্ধু-উপত্যকাবাসিগণ তামার প্রয়োজন মিটাইত বলিয়া মনে করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র, ছুরি, ক্ষুর প্রভৃতি তামা দ্বারা প্রস্তুত হইত। সিন্ধু-সভ্যতা অঞ্চলে টিন পাওয়া যাইত না। বস্তুত ভারতবর্ষে টিন অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। সুতরাং সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা টিন ও তামার সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করিত কি না সে-বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। নদীর বালি হইতে সোনা সংগ্রহ করিয়া এবং দক্ষিণ-ভারত ও আফগানিস্তান হইতে আমদানি করিয়া অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সোনা যোগাড় করা হইত। অলঙ্কার ও পাত্রাদি প্রস্তুতের জন্য রুপার প্রয়োজন হইত। সীসা হইতে রুপা পৃথক করিয়া লওয়া হইত। রাজপুতানা, দক্ষিণ-ভারত, পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে সীসা আমদানি করা হইত। এইভাবে মূল্যবান পাথরও বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। চানহু-দরোতে অবশ্য কতক পরিমাণ মূল্যবান পাথর পাওয়া যাইত।

তামার আমদানি

ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহার সোনা ও রুপার আমদানি

মূল্যবান পাথরের আমদানি

শ্বেতপাথরের আমদানি

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার রাজপুতানা হইতে আমদানি করা হইত।

মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা, গুজরাট, বেলুচিস্তানের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের সহিত মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা, গুজরাট ও বেলুচিস্তানের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, একথা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহা ভিন্ন মেসোপটামিয়ার সহিতও যে যোগাযোগ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত পরিবহন স্থলপথ বা জলপথে পরিচালিত হইত সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত দুইটি সীলমোহরে অংকিত নৌকার প্রতিকৃতি হইতে নৌচালনা সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের যে জানা ছিল, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। নৌকাগুলির গঠন-ভঙ্গিমা সুমার, ক্রীট্ ও মিশরের নৌকার মত ছিল। স্থলপথে পরিবহনকার্য উটের সাহায্যে চলিত। মহেঞ্জোদরোতে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, ইহা ভিন্ন উত্তর-বেলুচিস্তানের রাণাঘুন্দাই নামক স্থানে ঘোড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিক হুইলার মনে করেন যে, সম্ভবত উট, ঘোড়া ও গাধা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের প্রধান পরিবাহক ছিল।* হাতীর সাহায্যে পরিবহন-কার্য চলিত কিনা সেই সম্পর্কে কোন কথা সঠিকভাবে বলা যায় না; তবে সেকালে হাতীর দাঁতের অলংকারাদি নির্মিত হইত।

জলপথ ও স্থলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা

ধর্ম-জীবন: সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা তিনটি শৃঙ্গযুক্ত এক পরম যোগী-পুরুষের পূজা করিত। এই যোগী-পুরুষের তিনটি মস্তক ছিল এবং তিনি নানাপ্রকার পশু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। পরবর্তী কালের হিন্দু-দেবতা মহাদেব বা পশুপতি শিবের পূর্ব-সংস্করণ আমরা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের যোগী-পুরুষের মধ্যে দেখিতে পাই। পরবর্তী কালে শিবের ত্রিশূল যোগী-পুরুষের তিনটি শৃঙ্গের উন্নত সংস্করণ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিগণ এক মহা-মাতৃদেবীর পূজা করিত। ইহা পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মের শক্তি-উপাসনার পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতা যে সকল অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির নানা অংশে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এগুলি শিবলিঙ্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং ঐ সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সিন্ধু-উপত্যকাবাসিগণ ভক্তিবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পরম যোগী-পুরুষ শিবের পূর্ব-সংস্করণ

মাতৃদেবীর পূজা পরবর্তী শক্তি-উপাসনার পূর্বাভাস

শিবলিঙ্গের উপাসনা, ভক্তিবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ, অর্থনৈতিক জীবন, শিল্প-জ্ঞান, বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সবকিছুর আলোচনা করিলে ঐ সময়ে ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত ধরনের প্রাক্-আর্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-বিষয়ে জানিতে পারা যায়। ঐ সময়কার জনসাধারণ যে অতি উন্নত ধরনের সুসভ্য ও কৃষ্টি-সম্পন্ন জীবন যাপন করিত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা

* "It is likely enough that camel, horse and ass were, in fact, all a familiar feature of the Indus caravans." Wheeler: *The Indus Age*. p. 60.

সিন্ধু-সভ্যতার সহিত অপরাপর সভ্যতার যোগাযোগ : সিন্ধু-সভ্যতার রচয়িতাগণ (Relation of the Indus Valley Civilization with other Civilizations : Authors of the Indus Civilization) :

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই সিন্ধু-সভ্যতা ও অপরাপর সভ্যতার যোগাযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

সিন্ধু-সভ্যতা ও সুমার-মেসোপটামীয়া সভ্যতার যোগাযোগ

সুমার ও মেসোপটামিয়া অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিন্ধু-সভ্যতার সহিত প্রাচীন সুমার-মেসোপটামিয়া অঞ্চলের সভ্যতার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করেন। ফলে সিন্ধু-সভ্যতার প্রথম নামকরণ হইয়াছিল ইন্দো-সুমারীয় (Indo-Sumerian) সভ্যতা। কিন্তু ক্রমে এই দুই সভ্যতার সামঞ্জস্যগুলির উপর যে অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং দুইয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

উভয় সভ্যতার সাদৃশ্য

সিন্ধু-সভ্যতা ও সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতার যোগসূত্র প্রমাণ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, মৃৎকারের চক্র (potter's wheel), পোড়া ইটের ব্যবহার, চিত্রমূলক লিখনভঙ্গী এবং সর্বোপরি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন উভয় সভ্যতারই পরিলক্ষিত হয়। ইহা ভিন্ন মহেঞ্জোদরোর কয়েকটি সীলমোহর ইলাম (Elam) ও মেসোপটামিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। অপর দিকে, সুমারীয় ও মেসোপটামীয় সীলমোহর মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল সাদৃশ্য হইতে সুমার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ (Sumerologists) সিন্ধু-সভ্যতা ও সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতাকে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই সব সাদৃশ্য সত্ত্বেও সিন্ধু-সভ্যতার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলি সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতায় পরিলক্ষিত হয় না। যাহা হউক,

Sumerologist-দের অভিমত

সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ

এইরূপ কতিপয় সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সিন্ধু-সভ্যতা ও সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতার যে নিকট-সম্পর্ক ছিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান অনুচিত হইবে। অবশ্য এই দুই সভ্যতার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।* সুমারীয় একটি শ্বেতপাথরের সীলমোহর, পাথরে খোদাই করা একটি পাত্র, লাল রঙের পাথর, মাটির পাত্র প্রভৃতি সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার প্রভাবও কতক পরিমাণে ঐ অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সিন্ধু-উপত্যকার স্ত্রীলোকদের কেশবিন্যাস-রীতি যে সুমার অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এ-বিষয়ে তাহা উল্লেখযোগ্য।†

মিশরীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ

*"At any rate there is an overwhelming mass of evidence showing that a flourishing trade, probably through the land routes in Baluchistan, existed between the Indus Valley and Sumer in ancient times." *The Vedic Age*, p. 196.

†"The most important piece of evidence testifying to the influence of the Indus valley on Sumer is the fashion of hair-dressing adopted by Sumerian women from the Indus Valley." *The Vedic Age*, p. 196.

ও নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই। কিন্তু মিশর ও সিন্ধু-উপত্যকার মধ্যে যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, তাহা সিন্ধু-উপত্যকায় কতকগুলি মিশরীয় জিনিসপত্রে যথা, ষাঁড়ের পায়ের অনুকরণে নির্মিত পা-যুক্ত টুল, স্তন্যপানরত শিশুসহ মাতৃমূর্তি, দীপাধার (candle stand) প্রভৃতির আবিষ্কার হইতেই অনুমান করা যায়।

মিশরের সহিত সিন্ধু-উপত্যকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ

কেহ কেহ মনে করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার ও বৈদিক-সভ্যতার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক-সভ্যতার পরবর্তী। ডক্টর মজুমদার, ডক্টর রায়চৌধুরী ও ডক্টর দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের যুক্তি হইল এই যে, প্রথমত, সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক ও বৈদিক-সভ্যতা ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক। উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন সিন্ধু-সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু এইরূপ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৈদিক যুগে জানা ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতাকে বৈদিক যুগের পরবর্তী বলিয়া যদি মনে করা হয় এবং সিন্ধু-সভ্যতার নাগরিক জীবন যদি বৈদিক-সভ্যতারই উন্নত সংস্করণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী কালে বৈদিক-সভ্যতার অপরাপর বৈশিষ্ট্য হইতে নগর-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি বিলুপ্ত হইল কি করিয়া? সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক-সভ্যতারই অংশ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়া আকস্মিকভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, বৈদিক যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল, কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। একমাত্র মহেঞ্জোদরোতে ঘোড়ার একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ঘোড়ার ব্যবহার একেবারে অবিদিত ছিল বলা চলে না, * কিন্তু বৈদিক যুগে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত, মাতৃদেবী ও পশুপতির পূজা সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, অথচ এই সকল পূজা-অর্চনা বৈদিক যুগে ছিল না। শিবলিঙ্গের পূজা সিন্ধু-সভ্যতার কালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ পূজা নিষিদ্ধ ছিল। চতুর্থত, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ষাঁড় পূজা পাইত, কিন্তু বৈদিক যুগে গাভী পূজিত হইত। এই সকল বৈষম্যের দিক হইতে বিচার করিলে সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক-সভ্যতার পরবর্তী এই মত গ্রহণ করা যায় না।

সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক-সভ্যতার সম্পর্ক

সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক যুগের পূর্ব বা পরবর্তী ?

ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি বৈদিক-সভ্যতা। এই ধারণা এযাবৎ অনেকেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা ভারত-সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি ছিল এই কথা অনস্বীকার্য।†

ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি : সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক-সভ্যতা

---

*Vide, *The Indus Civilisation*, Wheeler, p. 60.

†".....there is not the least doubt that we can no longer accept the view, now generally held, that Vedic civilisation is the sole foundation of all subsequent civilisa-
(contd.)

সিন্ধু-উপত্যকায় কোন্ জাতি এইরূপ উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়েও মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা ছিল সুমারীয় জাতির লোক। আবার অপর অনেকে ইহাদের দ্রাবিড় বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আবার দ্রাবিড় ও সুমারীয়দের একই জাতি বলিয়া মনে করেন। শেষোক্ত মতানুযায়ী দ্রাবিড়গণ এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারের পর ক্রমে মেসোপটামিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বসতি বিস্তার করে। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই জাতির লোকেরা এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, এই যুক্তি এই মতবাদের সমর্থনে প্রদর্শন করা হয়। এতদ্ভিন্ন পণি, অসুর, ব্রাত্য, দাস, নাগ এমন কি আর্যগণ এই সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল বলিয়াও ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

সিন্ধু-সভ্যতা সুমারীয় বা দ্রাবিড়গণ কর্তৃক সৃষ্ট

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সিন্ধু-উপত্যকাবাসিগণ ছিলেন দ্রাবিড় ভাষাভাষী। কিন্তু শব-সৎকার-ব্যবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে সিন্দু-উপত্যকাবাসীদিগকে দ্রাবিড় জাতির লোক বলা চলে না। কারণ দ্রাবিড়গণ মৃতদেহকে প্রধানত কবর দিত। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ-ভারতে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সামগ্রীর মধ্যে সিন্ধু-সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ব্রাহুই জাতি দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলিলেও তাহারা তুর্কী-ইরানীয় জাতিসম্ভূত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জাতির দিক হইতে বিচার করিলে অপরাপর দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক হইতে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রাহুই জাতির লোক সিন্ধু-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। পণি, ব্রাত্য, অসুর প্রভৃতি জাতির সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ প্রমাণ করিবার কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।

'দ্রাবিড়' মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি

অপরাপর মতবাদ

সার জন মার্শাল সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক-সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যুক্তিসহ প্রমাণ করিয়াছেন। বর্তমানে সার জন মার্শালের মতই প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য।

সার জন মার্শালের মতবাদই সর্বজনগ্রাহ্য

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের জাতি নিরূপণ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপযুক্ত তথ্যাদি এখনও পাওয়া যায় নাই। অধিকতর নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে এ-বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নহে।* সিন্ধু-সভ্যতার রচয়িতা কাহারা সে-বিষয়ে একমাত্র নৃতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া একটি মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

উপসংহার : স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অসুবিধা : আর্য-অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ

---

tions in India. That the Indus Valley civilisation has been a very important contributory factor to the growth and development of civilisation in this country admits of no doubt." *Advanced History of India*, p. 23.

*"It is impossible, at the present state of our knowledge to come to any definite conclusion" *The Vedic Age*, p. 194.

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যে কতকগুলি নর-কঙ্কাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে সিন্ধু-সভ্যতাকালের অধিবাসিগণ মোট চারিটি জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। এই চারিটি জাতি হইল: অস্ট্রিক, ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গলীয় ও এলপাইন। অবশ্য মহেঞ্জো-দরোর অধিবাসিবৃন্দ প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোক ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, সিন্ধু-সভ্যতাবাসী ছিল বিভিন্ন জাতিসম্ভূত এবং তাহাদের অনেকেই ছিল মিশ্রিত জাতির লোক। সিন্ধু-সভ্যতার আমলের অস্ট্রিক জাতির লোকের মাথার খুলির সহিত মেসোপটামিয়ার কিশ্, উর, অল্-উবাইদ্ প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত মাথার খুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সেগুলির সহিত দক্ষিণ-ভারতের আদিত্যানালুর ও সিংহলের ভেদ্দা সম্প্রদায়ের লোকের মাথার খুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোকের যে-সকল মাথার খুলি সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত বেলুচিস্তান, মেসোপটামিয়া এবং তুর্কীস্তানে প্রাপ্ত কয়েকটি মাথার খুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। মোঙ্গলীয় জাতির লোকের মাথার খুলি যে কয়টি সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সহিত নাগা অঞ্চলের মোঙ্গলীয় জাতির লোকের মাথার খুলির সাদৃশ্য আছে। আবার এলপাইন জাতির লোকের যে-সকল মাথার খুলি সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সহিত মেসোপটামিয়ার কিশ্ নামক স্থানে আবিষ্কৃত মাথার খুলির সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে একথা অনুমান করা হয় যে, সিন্ধু-পাঞ্জাব সেই কালে বিভিন্ন জাতির এক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতা কোন একটি বিশেষ জাতির লোক গড়িয়া তুলিয়াছিল বলা হয়ত ঠিক হইবে না। নানা জাতির লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্য ও অনার্যদের সভ্যতার সংমিশ্রণেই সিন্ধু-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এইরূপ মনে করা অনুচিত হইবে না।*

সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের কারণ:

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে। সঠিক তথ্যাদির অভাবে স্বভাবতই পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মোটামুটিভাবে সিন্ধু-সভ্যতার অবসানের কারণ হিসাবে সেই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বর্তমানে সিন্ধু-অধিত্যকার সিন্ধু-নদের এবং উহার শাখা নদীর অববাহিকা অঞ্চল ভিন্ন অপরাপর অংশ শুষ্ক মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সেখানে জলাশয়, অরণ্য, বন্য জন্তু-জানোয়ারের যে অভাব ছিল না তাহা সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন

ভূ-প্রকৃতির ক্রম-পরিবর্তন

* "It represents the synthesis of the Aryan and non-Aryan cultures," *Ibid*, p. 195.

হইতে, বিশেষভাবে সীলমোহরগুলি হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু নগর সভ্যতার প্রয়োজনে, বনজঙ্গল, বৃক্ষাদি জ্বালানী হিসাবে, বিশেষভাবে পোড়া ইট প্রস্তুত করিতে গিয়া অরণ্যের যে ধ্বংসসাধন করা হইয়াছিল উহার ফলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা হ্রাস পাইয়া ক্রমে সেই অঞ্চল উষর মরু অঞ্চলে পরিণত হইতে থাকিলে প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা টিকিয়া থাকিতে পারিল না। অবশ্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনই সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান বা একমাত্র কারণ একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতায় ক্রমে কৃষির গুরুত্ব ও উৎকর্ষ হ্রাস পাইতে থাকিলে অর্থনৈতিক কারণও এই সভ্যতার ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

বন-বৃক্ষের ধ্বংসসাধন

কৃষি ও অপরাপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি

মহেঞ্জোদরো শহরটি পর পর সাতটি স্তরে একই স্থানে বারবার নির্মিত হইয়াছিল। সিন্দু-নদের জল-নিকাশের শক্তি পলিমাটি জমিবার ফলে ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিলে মহেঞ্জোদরো শহরটি প্লাবনের কবলে পড়ে। এজন্য পর পর উহার উচ্চ হইতে উচ্চতর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়। অন্তত তিনবার এই শহরটি প্লাবনে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঁধ-নির্মাণ ও জল-নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা তৈয়ার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার ঠিকমত না করিবার ফলে প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ আর ছিল না।

ইহা ভিন্ন, সিন্ধু-সভ্যতার শহর-নগরগুলির পূর্বেকার নাগরিক উৎকর্ষ ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বড় বড় দালানের ঘরগুলিকে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। দরিদ্রদের বাসস্থান ঘিঞ্জী বস্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরো শহরটি ক্রমে উহার পূর্বেকার সৌষ্ঠব হারাইয়া এক শ্রীহীন, শৃঙ্খলাহীন শহরে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু সংখ্যক কঙ্কাল একই স্থানে স্তূপীকৃতভাবে পাওয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির সম্মুখে অথবা রন্ধনশালায় রন্ধনের বাসনপত্রের সম্মুখে মৃতের কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। এগুলি হইতে অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতা বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি কোন আকস্মিক দুর্দৈবের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ সিন্ধু-সভ্যতা বহিরাগত আক্রমণ অর্থাৎ আর্যদের আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতা প্রকৃত কি কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল সে-সম্পর্কে উপরি-উক্ত মতবাদ কেহ কেহ গ্রহণ করিলেও সেগুলিকে সঠিক কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

আর্যদের আক্রমণ

উপসংহার

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্যদের আগমন ঃ বৈদিক সভ্যতা

(Coming of the Aryans : The Vedic Civilisation)

আর্যগণের আদি বাসস্থান (Original Home of the Aryans) :

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মতবাদ রহিয়াছে। এ-বিষয়ে এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'আর্য' একটি ভাষার নাম, 'আর্যজাতি' বলিয়া কিছু নাই। আর্যভাষায় যাঁহারা কথা বলিতেন তাঁহারাই 'আর্যজাতি' নামে সাধারণত অভিহিত হইয়া থাকেন।* গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, জার্মান, কেল্‌টিক্‌, পারসীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আর্যভাষার অন্তর্গত।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে মতানৈক্য

সংস্কৃত ভাষা ও ইওরোপীয় আর্যভাষার প্রধান কয়েকটির মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য সর্বপ্রথম ফিলিপ্পো স্যাসেটি (Filippo Sassetti) লক্ষ্য করেন। আষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮৬ খ্রীঃ) সার্‌ উইলিয়াম জোন্‌স্‌ (Sir William Jones) গ্রীক, ল্যাটিন, পারসীক, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এগুলি একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, এইরূপ অভিমত দান করেন। সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্যগণের সহিত ইওরোপীয় অপরাপর আর্য-ভাষাভাষীদের যে মূলগত ঐক্য ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত মূল আর্য-ভাষা হইতে উৎপন্ন ঃ ইওরোপীয় ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতির সহিত মৌলিক সাদৃশ্য

যাহা হউক, আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষই আর্যদের মূল বাসস্থান। এই মতবাদ গণনাথ ঝা, ত্রিবেদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত। তাঁহারা মনে করেন যে, মুলতানের দেবকী নদীর অববাহিকা অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। বৈদিক যুগের আকর্ষণ 'সপ্ত সিন্ধু' তাঁহাদের নিজ দেশ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের রচনায় ভারতবর্ষ ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন আদি বাসস্থান সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এক দেশ হইতে অপর দেশে বসতি-বিস্তারের পর মানুষ সাধারণত বহুকাল ধরিয়া নিজ মূল বাসস্থানের কথা ভুলিয়া

আর্যদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষে ?

*"Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language ; and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than X+Aryan speech." Max Muller : Vide, *The Vedic Age*, p. 201.

যায় না। ভারতের পার্শীদের কথা এ-বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলেও, তাঁহারা বলেন যে, মূল আর্যভাষার সর্বাধিক শব্দসংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এরূপ অপর কোন আর্যভাষায় নাই। বেদের ন্যায় গ্রন্থাদি রচনার প্রয়োজনীয় মানসিক উৎকর্ষ আর্যজাতির অপর কোন শাখার ছিল না; ইহা হইতেও তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ হইতে উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যাই দেশত্যাগ করিয়া ইওরোপের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই উদ্বৃত্ত লোকসমাজের মধ্যে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ মেধাযুক্ত আর্যগণ ছিলেন না। এই কারণে ভারতীয় আর্যগণই বেদের ন্যায় উচ্চস্তরের সাহিত্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর আর্যগণ তাহা পারেন নাই। ঋগ্বেদের ভৌগোলিক তথ্যাদি হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাঞ্জাব ও উহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল-ই 'ঋগ্বেদ যুগে' আর্যদের বাসস্থান। অপর কোন দেশের উল্লেখ তাহাতে নাই। আর্যভাষাগুলির মধ্যে লিথুয়ানিয়ার ভাষা-ই প্রাচীন আর্যভাষার অনুরূপ। এ-বিষয়ে তাঁহারা বলেন যে, অগ্রগতির মন্থরতা বা অপরাপর জাতি ও ভাষার সহিত যোগাযোগের অভাবহেতুই লিথুয়ানিয়ার ভাষা মূল আর্যভাষার সহিত নৈকট্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। সর্বশেষে, আর্যদের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল এই যুক্তি খণ্ডনের তেমন কোন বিরুদ্ধ যুক্তি নাই, এই কথাও তাহারা বলিয়া থাকেন।

যুক্তি

কিন্তু ডক্টর বি. কে. ঘোষ* প্রধানত তিনটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্যদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমত, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইওরোপীয় মহাদেশের অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিসর এলাকার মধ্যে আর্যভাষার বিভিন্ন শাখা বিস্তারলাভ করিয়াছে, কিন্তু ইওরোপের বাহিরে এই ভাষা ততটা ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে নাই। এক সংকীর্ণ পথ ধরিয়া আর্যভাষা ঋগ্বেদের যুগে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে, আর্যগণ ভারতবর্ষ হইতে ইওরোপের দিকে অগ্রসর না হইয়া ঠিক বিপরীত গতি, অর্থাৎ ইওরোপ হইতে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মূল আর্যভাষার সহিত লিথুয়ানিয়ার ভাষার নিকটতম সম্পর্ক হইতেও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়া থাকে। লিথুয়ানিয়ার ভাষা-ই আর্যভাষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, সংস্কৃত ভাষা নহে। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষই যদি আর্যসভ্যতার আদি নিবাস ছিল, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে। আর্যদের আদিবাস এদেশে হইলে বাহিরে বিস্তারের পূর্বে আর্যগণ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সর্বত্র নিজ অধিকার বিস্তার করিতেন, কিন্তু ভারতের দক্ষিণ এবং উত্তরের কোন কোন অংশে অদ্যাবধি অনার্য বা দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন আর্যদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষে এবং এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে। ইহা ভিন্ন অপরাপর আর্যভাষা

ডক্টর ঘোষের অভিমত

যুক্তি

* Vide, *The Vedic Age*, pp. 201-204.

অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার মূর্ধন্য বর্ণ (cerebrals), যথা, ঋ, ঋৃ, ট্, ঠ্, ড্, ণ, র্, ষ্ প্রভৃতির প্রাধান্য ভারতীয় আর্যভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য ভাষার প্রভাব নির্দেশ করে। যাহা হউক, মহেঞ্জোদরো বা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও আর্যভাষার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মহেঞ্জোদরো সভ্যতাকে যদি আর্যসভ্যতা বলিয়া প্রমাণ করা চলে, অথবা ঐ সময়কার ভাষাকে যদি সংস্কৃত ভাষার আদি সংস্করণ বলিয়া প্রমাণ করা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই ভারতবর্ষ আর্যদের আদি বাসস্থান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলিবে। এ-বিষয়ে সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরের পাঠোদ্ধারের পূর্বাবধি কোন কিছু বলা সম্ভব নহে।

আর্যগণ বিদেশ হইতে আগত

এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর ঘোষ বলেন যে, আর্যগণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মত-ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আর্যদের আদি বাসস্থান তাহা হইলে কোথায় ছিল—এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে।

আর্যদের একশাখার প্রাচ্যের দিকে, অপরটির পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রগতি

আর্যদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে মতানৈক্য

আর্যদের অর্থাৎ ইন্দো-ইওরোপীয়দের (Aryan = Indo-European) যে শাখা প্রাচ্যের দিকে বসতি-বিস্তার করিয়াছিল উহা ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) নামে পরিচিত। ইন্দো-ইরানীয় শাখা ইরান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে অগ্রসর হয়। কোন্ আদি স্থান হইতে আর্যগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

ক্যাপাডোসিয়ায় আর্যদের ইন্দো-ইরানীয় শাখার পূর্ব-পুরুষদের সাময়িক অবস্থিতি—এই মত গ্রহণযোগ্য নহে

Cambridge Ancient History-তে বলা হইয়াছে যে, ইন্দো-ইরানীয় আর্য শাখার পূর্বপুরুষগণ চতুর্দশ (খ্রীঃ পূঃ) শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia) স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত ক্যাপাডোসিয়ায় থাকিলে ১০০০ খ্রীঃ পূর্বে ঋগ্বেদীয় আর্যঋষিগণ সম্পূর্ণ ভারতীয় হিসাবে ঋগ্বেদ রচনা করিলেন কিভাবে? ইহা ভিন্ন ঋগ্বেদে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় উহা অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সমসাময়িক। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ও ইরানীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ ক্যাপাডোসিয়ায় ছিলেন একথা গ্রহণযোগ্য নহে।

হার্জ্‌ফেল্ড-এর মতে খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পশ্চিম-এশিয়ায় আর্যগণের বসতি

আবার খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৬০ খ্রীঃ পূঃ) ক্যাসাইট্‌গণ (Kassites) যখন ব্যাবিলন দখল করে তখন তাহারা 'সুরিয়াস্' (সূর্য) শব্দটি ব্যবহার করিত, সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিক হার্জ্‌ফেল্ড (Harzfeld) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ক্যাসাইট্‌গণ আর্যদের নিকট হইতে ঐ শব্দটি শিখিয়াছিল এবং স্বভাবতই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে

পশ্চিম-এশিয়ায় আর্যগণ বসবাস করিতেন। কিন্তু এইরূপ সামান্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছান যুক্তিযুক্ত হইবে না। ঐতিহাসিক হার্ট (Hirt) 'সুরিয়াস্' শব্দের ব্যবহার ও সিরিয়ার রাজগণের আর্যসুলভ নামকরণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বে আর্যগণের এক শাখা - ইন্দো-ইরানীয়গণ, ইওরোপ হইতে ককেশাস পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রথমে ইরান এবং পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু এডোয়ার্ড মেয়ার (Edward Meyer) বলেন যে, আর্যগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া পামীর মালভূমিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং সেখান হইতে তাঁহাদের এক শাখা ইরান ও ভারতের দিকে অগ্রসর হয়, অপর শাখা মেসোপটামিয়া প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার দেশগুলিতে বসতি বিস্তার করে। ইন্দো-ইরাণীয়দের পশ্চিম-এশিয়ায় বসতি বিস্তারের মতবাদ ওল্‌ডেন্‌বার্গ, কীথ, ফ্রেড্‌রিক, ব্র্যাণ্ডেন্‌স্টিন্‌ (Brandens ein) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও সমর্থন করেন। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইন্দো-ইরানীয়গণ তাঁহাদের আদি বাসস্থান পামীর মালভূমি (হার্‌জ্‌ফেল্ড-এর মতে রুশ-তুর্কীস্তান) হইতে মোটামুটি ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতের দিকে এবং পশ্চিম-এশিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সময়ের দিক দিয়া এইরূপ হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কারণ ভারতীয় আর্যদের ঋগ্বেদীয় সভ্যতা ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেই সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছিল।

হার্ট-এর মতে ইওরোপ হইতে আর্যদের ককেশাস পর্বত অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে অগ্রগতি

এডোয়ার্ড মেয়ারের মতে পামীর মালভূমি ইন্দো-ইরানীয়দের সাময়িক বাসভূমি

২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আর্যদের ইরান ও ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তৃতি

কিন্তু আর্যদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নের জবাব ইন্দো-ইরানীয়দের ভারতবর্ষ ও পশ্চিম-এশিয়ার দিকে বিস্তার হইতে পাওয়া যাইবে না। পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় পথে পামীর মালভূমি বা বিকল্প মতে রুশ-তুর্কীস্তানে ইন্দো-ইরানীয় আর্যশাখা কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন্ আদিস্থান হইতে তাহারা এবং যে শাখা ইওরোপের দিকে গিয়াছিল সেই শাখা প্রথমে বসতি বিস্তারের জন্য বাহির হইয়াছিল ?

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ?

ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া ঐতিহাসিক হার্ট (Hirt) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আর্যগণ তাঁহাদের বসতি-বিস্তারে বাহির হইবার পূর্বে ভিস্টুলা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বাস করিতেন। লিথুয়ানিয়াবাসীদের ভাষার সহিত মূল আর্যভাষার নিকটতম সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ আর্যদের আদি বাসস্থান লিথুয়ানিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে ছিল বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ জার্মানি আর্যদের আদি বাসস্থান বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু

ভিস্টুলা নদীর অববাহিকা অঞ্চল

লিথুয়ানিয়ার নিকটবর্তী কোন্ স্থান ? জার্মানি ?

ব্র্যান্ডেন্‌স্টিনের মতে প্রাচীনতম আর্যভাষা আলোচনা করিলে উহার শব্দগুলি হইতে আর্যদের আদি বাসভূমি পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত ছিল, এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকে। ব্র্যান্ডেন্‌স্টিন্ মনে করেন যে, এই পর্বতসঙ্কুল দেশ হইল আরল সাগরের দক্ষিণস্থ খির্‌ঘিজ্ পার্বত্য অঞ্চল। এই আদি বাসস্থান হইতে ইন্দো-ইরানীয়গণ পূর্বদিকে এবং অপর এক শাখা পশ্চিমদিকে নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। পশ্চিমদিকে যে শাখা অগ্রসর হইয়াছিল উহা অল্পকালের মধ্যেই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুইয়ের এক দল উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্তী কালে নর্ডিক (Nordics) নামে পরিচিত হয় এবং অপর দল ইউক্রেন এবং উহারও দক্ষিণ এবং পশ্চিমে বিস্তার লাভ করে।

আরল সাগরের দক্ষিণে খির্‌ঘিজ্ পার্বত্য অঞ্চলে আর্যদের আদি বাসভূমি

আর্যদের দুই শাখায় বিভক্ত : ইন্দো-ইরানীয় ও ইওরোপ-অভিমুখী শাখা

ইওরোপ-অভিমুখী শাখা নর্ডিক ও ইউক্রেন এবং উহার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের আর্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত

প্রাচীন আর্যদের বসতি-বিস্তার (The Early Aryan Settlements) :

প্রাচীন আর্যদের উত্তর-ভারতে বসতি-বিস্তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক তথ্যাদি ঋগ্বেদের স্তোত্র হইতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তোত্রে আর্যদের বাসভূমির ভৌগোলিক নাম ও বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতে আর্যদের বসতি ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঋগ্বেদ ভূগোল-গ্রন্থ নহে, সুতরাং ঋগ্বেদে যে সকল স্থানের উল্লেখ নাই, সে সকল স্থানে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয় নাই, এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

ঋগ্বেদে আর্যদের বসতিস্থানের উল্লেখ

ঋগ্বেদে উল্লিখিত পর্বত, নদী, জাতি, দেশ, রাজ্য প্রভৃতির পরিচয় হইতে আর্যদের বসতিস্থান নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রেই সঠিক হওয়া সম্ভব নহে, বলা বাহুল্য। ইহা ভিন্ন যে সকল স্থানের উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই, সে সকল স্থানেও যে আর্যগণ বসতি বিস্তার করেন নাই, এইরূপ মনে করাও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত স্থানসমূহের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে : ঋগ্বেদে অনুল্লিখিত স্থানেও আর্যবসতি অসম্ভব নহে

হিমালয় পর্বতের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। হিন্দুদের ধর্ম ও জীবনের উপর নদ-নদীর প্রভাব যে অত্যধিক, তাহা বেদে মোট ৩১টি নদ-নদীর উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায়। এই ৩১টির মধ্যে ২৫টির নাম-ই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত নদ-নদীর মধ্যে অধিকাংশই সিন্ধুনদের শাখা-উপশাখা। সিন্ধু-উপত্যকার নদ-নদী ভিন্ন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সরযূ প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের পঞ্চ-নদীর উল্লেখও বেদে পাওয়া যায়। যথা : শুতুদ্রী (শতদ্রু) বিপাশ

ঋগ্বেদে উল্লিখিত পর্বত ও নদ-নদী

পাঞ্জাবের পঞ্চনদী

(বিপাশা), পরুষ্ণী (রাভী), অসিক্নী (চিনাব) ও বিতস্তা (ঝিলাম)। এই সকল নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ঋগ্বেদে 'সপ্তসিন্ধব' নামে যে দেশের উল্লেখ রহিয়াছে উহা পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া মনে করা হয়। লাড্‌উইগ্ (Ludwig), ল্যাসেন (Lassen), হুইট্‌লি (Whitley) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ 'সপ্তসিন্ধব'-এর সাতটি নদীর মধ্যে সরস্বতীর স্থলে আমুদরিয়া নদী যোগ করিবার পক্ষপাতী। ঋগ্বেদে উল্লিখিত কুভা (কাবুল), গোমতী (গুমাল), ক্রুমু (কুররম্) প্রভৃতি হইতে আমুদরিয়া নদীর পরিচয় বৈদিক আর্যদের যে জানা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

'সপ্তসিন্ধব' অঞ্চল

বৈদিক যুগের আর্যদের বসতির ও কার্যকলাপের প্রধান অঞ্চল ছিল পাঞ্জাব। এ-বিষয়ে অবশ্য মতানৈক্য রহিয়াছে। বাংলাদেশে বৈদিক আর্যগণ বসতি বিস্তার করেন নাই বলিয়াই অনুমান করা হয়। কারণ ঋগ্বেদে সিংহের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাঘ্রের উল্লেখ তাহাতে নাই। বাংলাদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তার পরবর্তী যুগের ঘটনা, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগে বাংলা, আসাম, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয় নাই

ঋগ্বেদে 'দাস' বা দস্যুদের সহিত আর্যদের অবিশ্রাম যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে আর্যগণ 'দাস' বা দস্যুগণ—অর্থাৎ অনার্যদের পরাজিত করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে, ক্রমে পাঞ্জাবের গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব-ভারতীয় দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধির পরিচয় 'ব্রাহ্মণ'-গুলিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-রচনার যুগে অর্থাৎ ১৫০০ হইতে ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে মধ্যদেশ অর্থাৎ সরস্বতী নদী হইতে গঙ্গার দোয়াব পর্যন্ত সমতলখণ্ড আর্যদের প্রধান বসতিস্থল হিসাবে বিবেচিত হয়। কুরুক্ষেত্র, মগধ, কোশল, কাশী, বিদেহ, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য ঐ সময়ে গুরুত্ব অর্জন করে। ব্রাহ্মণ যুগে কুরু ও পাঞ্চালগণ-ই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আর্যশাখা। বিদেহ বা উত্তর-বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-বিহার, পূর্ব-বিহার, বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পূর্বে আর্যদের অধিকার স্থাপিত হয় নাই বলিয়া মনে করা হয়। এই অঞ্চল প্রাচ্য বা প্রাচী নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে এই অঞ্চলে এবং ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর উপত্যকায়ও আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয়। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের সৌরাষ্ট্র, অবন্তী অর্থাৎ বর্তমান মালব প্রদেশ এবং সিন্ধু-উপত্যকার নিম্নে অবস্থিত সৌবীর রাজ্যে আর্য অধিকার বিস্তৃত হইতে আরও কিছুকাল বিলম্ব হইয়াছিল।

আর্য-অনার্যদের সংঘর্ষ : আর্যদের পূর্বদিকে বিস্তৃতি

মধ্যদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি

প্রাচ্যদেশে, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর উপত্যকা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতিতে আর্যদের বসতি-বিস্তার

আর্যদের বসতি বিস্তার
0 ২০০ ৪০০
মাইল
হিমালয় পর্বত
তিব্বত
লৌহিত্যনদ (ব্রহ্মপুত্র)
সিন্ধু নদ
গান্ধার
খাইবারগিরিপথ
তক্ষশিলা
বিপাশা
বোলান
গিরিপথ
সিন্ধু
কুরুক্ষেত্র
অহিচ্ছত্র
হস্তিনাপুর
কোশল রাজ্য
কান্যকুব্জ
অযোধ্যা
বিদেহরাজ্য
মিথিলা
অঙ্গরাজ্য
বৈশালী
বঙ্গ রাজ্য
শূরসেন রাজ্য
প্রয়াগ
কৌশাম্বী
শোন
রাজগৃহ
মগধ রাজ্য
চম্পা
পুণ্ড্র রাজ্য
অবন্তী
সুরাষ্ট্র
নর্মদা
তাপ্তী
বিদর্ভ
গোদাবরী
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
কৃষ্ণা
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দের মধ্যে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আর্যদের অধিকার স্থাপিত হয়। ঐ সময় হইতেই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্যাবর্ত নামে পরিচিত।

আর্যাবর্তে আর্যদের অধিকার বিস্তার

কালক্রমে আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। অগস্ত্য মুনির কাহিনী এবং রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের কাহিনী হইতে আর্যদের দক্ষিণ-ভারতে অভিযান সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। অবশ্য আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে সর্বত্র অধিকার বা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন নাই। দাক্ষিণাত্যের যে-সকল আর্যবসতি স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির পাশাপাশি বহু অনার্যরাজ্যও টিকিয়া ছিল। অন্ধ্র, পুলিন্দ, নিষাদ প্রভৃতি অনার্যজাতির বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বিন্ধ্যপর্বতের শবর নামে অপর একটি অনার্য শাখার উল্লেখ রহিয়াছে। একেবারে দক্ষিণ সীমায় তামিল, কানাড়া ও মালয়ালম্ ভাষা-ভাষী দ্রাবিড়গণ বাস করিত।

দাক্ষিণাত্যে অনার্যদের বসতির পাশাপাশি আর্যদের বসতি

আর্যদের সাহিত্য : আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ। 'বিদ্' শব্দের অর্থ (জ্ঞান) হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি। বেদ চারিটি : যথা :—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চারিটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রথম রচিত হয়। ইহাতে এক হাজারেরও বেশী স্তোত্র আছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাকৃতিক দেবদেবীর স্তুতিগানই বেদের বিষয়বস্তু। সামবেদের স্তোত্রগুলির অধিকাংশই ঋগ্বেদ হইতে সংকলিত। যজ্ঞের সময় সামবেদের স্তোত্রগুলি গানের ন্যায় সুর সহযোগে উচ্চারিত হইত। যজুর্বেদে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রাদি রহিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের চতুর্থ গ্রন্থ হইল অথর্ববেদ। ইহাতে সৃষ্টিরহস্য পৃথিবী-স্তব, চিকিৎসার মন্ত্র এবং নানাপ্রকার রহস্যজনক সংকেত ও মন্ত্রাদি রহিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, বেদ ভগবানের বাণী ; বেদের মন্ত্রগুলি মানুষের রচনা নহে। এজন্য বেদ গোঁড়া হিন্দুদের নিকট 'অপৌরুষেয়', 'নিত্য'। ভগবানের নিকট হইতে শ্রুতবাক্য বলিয়া বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। কিন্তু পরবর্তী কালে রচিত বেদাঙ্গ ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী ছিল না। সেগুলি ঐতিহ্য হিসাবে স্মরণ করিয়া রাখা হইত বলিয়া 'স্মৃতি' নামে পরিচিত।

আর্যদের সাহিত্য : চতুর্বেদ : ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব

বেদ অপৌরুষেয়

প্রত্যেকটি বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, এই চারি ভাগে বিভক্ত। সংহিতা অংশ পদ্যে লিখিত। দেবতাদের স্তুতিগান লইয়া সংহিতা রচিত। চারিটি বেদের চারিটি সংহিতা আছে। এইভাবে চারিটি বেদের চারিটি ব্রাহ্মণ আছে। ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের বিধি বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যে লিখিত। পরবর্তী যুগে আরণ্যক ও উপনিষদ—এই দুইটি ভাগ রচিত হয়। বৈদিক রীতি অনুসারে যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যাগ-যজ্ঞের জটিল অনুষ্ঠান পালন করিতে

বেদের চারিভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

সমর্থ হইতেন না। তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের জন্যই আরণ্যক রচিত হইয়াছিল। আরণ্যকের সারাংশের উপর ভিত্তি করিয়া যে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ নামে পরিচিত। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগ বলিয়া উহা বেদান্ত (অর্থাৎ বেদের অন্ত) নামেও পরিচিত।

বেদাঙ্গ ও দর্শন

বিশুদ্ধভাবে বেদপাঠ ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞের নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্তসার হিসাবে পরবর্তী কালে ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শন (ষড়দর্শন) রচিত হয়। বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন একত্রে সূত্র-সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বেদাঙ্গ : (১) শিক্ষা, (২) ছন্দ, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) জ্যোতিষ, (৬) কল্প

বেদপাঠের জন্য যে ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন ছিল তাহা বেদাঙ্গ নামে পরিচিত। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হইল : (১) শিক্ষা : এই শাস্ত্র পাঠ করিলে বৈদিক বর্ণগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা যায়। (২) ছন্দ : ইহাতে বৈদিক স্তোত্রগুলির ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। (৩) ব্যাকরণ : এই শাস্ত্রপাঠে বিশুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার করিবার নিয়ম জানা যায়। (৪) নিরুক্ত : শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহা নিরুক্তসূত্রে দেওয়া আছে। (৫) জ্যোতিষ : এই শাস্ত্র হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। (৬) কল্প : কল্পসূত্রে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, গৃহস্থের কর্তব্য, আর্যদের সমাজে পালনীয় নিয়মগুলি বর্ণিত আছে। কল্প নানা অংশে বিভক্ত ; যথা : শ্রৌতসূত্র—এগুলি যাগ-যজ্ঞের নিয়মগুলির সঙ্কলন। গৃহ্য-সূত্র—গৃহীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রণালী, নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী এগুলিতে পাওয়া যায়। ধর্মসূত্র ইহাতে সমাজ ও রাষ্ট্র-শাসন সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। এই ধর্মসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল ধর্মশাস্ত্র 'স্মৃতি' নামেও পরিচিত। ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন আর্যগণ অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, হস্তিশাস্ত্র, অশ্বসূত্র, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। শুল্বসূত্রে যজ্ঞবেদী নির্মাণের নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা হইতেই হিন্দু-জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছে।

ষড়দর্শন : (১) সাংখ্য, (২) যোগ, (৩) ন্যায়, (৪) বৈশেষিক, (৫) পূর্ব-মীমাংসা, (৬) উত্তর-মীমাংসা

উপনিষদের গভীর তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনা হইতেই হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দু দর্শন ছয়টি ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) কপিলের সাংখ্যদর্শন, (২) পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্র, (৩) গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র, (৪) কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, (৫) জৈমিনীর পূর্ব-মীমাংসা, (৬) বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন।

প্রাচীন হিন্দুগণ বেদের শ্লোকগুলি শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। তখন

এগুলি লিখিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বেদের ন্যায় বিশাল চারিটি গ্রন্থ তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা হইতেই বেদের প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের হিন্দুগণ আজিও বৈদিক গ্রন্থগুলির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-কলাপ, যথা : আহ্নিক, পুজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির মন্ত্রাদি প্রায় সবই বৈদিক সাহিত্য হইতে গৃহীত।

বেদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের শ্রদ্ধা

ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি (Religion, Society, Culture, Political setup and Economy during early Vedic Period)

ধর্ম : তপোবনে ভারতীয় আর্যসভ্যতার জন্ম হইয়াছিল। স্বভাবতই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রভাব তাঁহাদের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত করিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। আর্যগণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতেন। আলোর উৎস সূর্য বা মিত্র, সূর্যালোকে উদ্ভাসিত সুনীল আকাশের দেবতা দ্যোঃ, জলের দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা মরুৎ, ঊষা, পৃথিবী, সরস্বতী, অগ্নি প্রভৃতি ছিলেন আর্যদের উপাস্য দেব-দেবী। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র ও বরুণ। প্রাচীন রোমান ও গ্রীকদের সহিত আর্যদের ধর্ম বিষয়ে কতক কতক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক দেবতা এ্যাপোলো (Apollo) ছিলেন সূর্যদেবতা। তাঁহাদের আকাশের দেবতা ছিলেন জিউস (Zeus)। রোমানদেরও সেইরূপ আকাশের দেবতা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল 'জুপিটার' (Jupiter)। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করিলেও আর্যরা বিশ্বাস করিতেন যে, সকল দেবতাই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

আর্যদের দেবতা

স্তব-স্তুতির সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দান ছিল আর্যদের ধর্মাচরণ প্রণালী। বেদীর উপর হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তব-স্তুতির পর মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, দুগ্ধ, পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হইত। যাগ-যজ্ঞের সময় পশুবলী দেওয়া হইত এবং সোমলতার রস পান করা হইত। সোমরস ছিল একপ্রকার মাদক পানীয়। যাগ-যজ্ঞাদির কালে পশুবলি দেওয়া এবং মূর্তি-পুজা অনার্যদের ধর্মাচার হইতেই ক্রমে আর্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য-অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণেই হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ক্রমে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি এত দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া উঠে যে, পুজা ও যজ্ঞাদির জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে আর্যসমাজে পুরোহিত সমাজের উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে ইঁহারা ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি নির্দেশক এবং ধর্মের রক্ষক হইয়া উঠিলেন।

আর্যদের ধর্মাচরণ প্রণালী

যজ্ঞ, পুরোহিত

সমাজ : বর্ণাশ্রম : আর্যগণ যখন প্রথমে এদেশে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাদের মধ্যে কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, উন্নত নাসিকাযুক্ত এবং দেখিতে সুন্দর। ভারতের আদিম অধিবাসীরা ছিল কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া আর্যগণ যখন ভারতে অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন তখন আর্য ও অনার্য এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। প্রথমে কেবলমাত্র বর্ণ অর্থাৎ দেহের রংয়ের ভিত্তিতেই শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবন জটিল হইতে লাগিল এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে কর্মক্ষমতা ও বৃত্তি অর্থাৎ গুণ-কর্ম অনুসারে সমাজ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। পূজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ এবং শাস্ত্রপাঠে যাঁহারা পারদর্শী ছিলেন তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ ; অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, দেশরক্ষা ও দেশশাসনে যাঁহারা পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন করিতেন তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য। এই তিন শ্রেণীর সেবার কার্যে যাহারা রত ছিল তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের বা শ্রেণীর উদ্ভব হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতিপ্রথার কোন কঠোরতা ছিল না। এক শ্রেণীর লোক নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপর শ্রেণীর বৃত্তিগ্রহণ বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি-সম্বন্ধ স্থাপনের কোন বাধা ছিল না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ, ক্ষত্রিয় কন্যা সুকন্যার চ্যবনের সহিত বিবাহ জাতি বা জন্মের উপর নির্ভরশীল ছিল না—কাজ ও কাজের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত ইহা প্রমাণ করে।

হিন্দুসমাজে চারি শ্রেণী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

শ্রেণীবিভাগের কঠোরতার উদ্ভব

আর্যদের সমাজ : চতুরাশ্রম : আর্য সমাজের উপরস্থ তিনটি বর্ণ বা শ্রেণীর, যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—জীবন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই চারিটি পর্যায় চতুরাশ্রম নামে পরিচিত। এগুলির প্রত্যেকটির জন্যই কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের এই সকল মানিয়া চলিতে হইত। প্রথম আশ্রম বা জীবনের প্রথম পর্যায়ের নাম ব্রহ্মচর্য। এই সময়ে প্রত্যেক পুরুষকে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে গুরুর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিয়া ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অতি সাধারণ-ভাবে অনাড়ম্বর ও ভোগবিলাসহীন পবিত্র জীবন যাপন করিবার রীতি ছিল। এইভাবে থাকিয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পর্যায় শেষ হইলে স্বগৃহে ফিরিয়া গার্হস্থ্য আশ্রম অর্থাৎ গৃহীর জীবনে প্রবেশ করিতে হইত। বিবাহাদি করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ সংসারধর্ম পালন করাই ছিল এই সময়ের প্রধান কর্তব্য। প্রৌঢ় অবস্থায় তৃতীয় আশ্রম—বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। এই সময়ে সাংসারিক দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বনে

জীবনের চারি পর্যায় : (১) ব্রহ্মচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস

কুটীর বাঁধিয়া সংসার হইতে কতকটা নির্লিপ্তভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। ইহার পর চতুর্থ পর্যায় বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জপ-তপে জীবন যাপন করিতে হইত। এইভাবে আর্যসমাজের প্রথম তিনটি শ্রেণী ধর্মকে বাস্তব জীবনে রূপদান করিতেন।

আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন ঃ বৈদিক সভ্যতা, অর্থাৎ আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। ঋগ্বেদে 'পুর' নামক সামরিক প্রয়োজনে সংরক্ষিত স্থানের উল্লেখ পাওয়া গেলেও নগর বা শহরের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তী কালে অবশ্য আসন্ধিবত, কাম্পিল্য প্রভৃতি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষাংশে নগরাদি স্থাপিত হইলেও বৈদিক সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। স্বভাবতই বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। প্রত্যেক পরিবারেরই একখণ্ড কৃষিজমি ছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামের একটি করিয়া 'খিল্য' অর্থাৎ পশুচারণভূমি ছিল। ইহা ছিল সকলের সাধারণ সম্পত্তি। সকলেরই ইহাতে পশু চরাইবার সমান অধিকার ছিল।

বৈদিক সভ্যতা গ্রাম-কেন্দ্রিক

কৃষি ও পশুপালন প্রধান বৃত্তি

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গাভী হইতে দুগ্ধ পাওয়া যাইত। দুগ্ধ ছিল আর্যদের খাদ্যদ্রব্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ষাঁড়ের সাহায্যে জমি চাষ করা হইত। যমুনা উপত্যকা গাভীর দুগ্ধের জন্য এবং গান্ধার অঞ্চল পশমের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গৃহপালিত পশু

প্রধানত কৃষি ও পশুপালন বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈদিক যুগে যে ছিল না, এমন নহে। বৈদিক যুগের জনসমাজ নানাপ্রকার শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিত। অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানত অনার্যদের হাতেই ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, চারুশিল্প, ধাতুশিল্প এবং আরও নানাপ্রকার কারু-কার্যের দ্বারা প্রাচীন বৈদিক সমাজের বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। ঐ সময়ে আধুনিক কালের ন্যায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না। গরু এবং 'নিষ্ক' নামক একপ্রকার স্বর্ণখণ্ড ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। ঋগ্বেদের যুগে 'মনা' নামক একপ্রকার স্বর্ণখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে ব্যাবিলনের 'মানা' এবং ল্যাটিন 'মিনা'র ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া অনুমান করেন।

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

বিনিময়ের মাধ্যম

বৈদিক যুগের পরিবহন-ব্যবস্থা ছিল রথ ও গরুর গাড়ী। ঘোড়ার সাহায্যে রথ টানা হইত। বৈদিক যুগে সমুদ্রপথে চলাচল বা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা হইত কিনা সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। ঋগ্বেদে সমুদ্রের উল্লেখ হইতে এবং 'মনা' নামক স্বর্ণখণ্ডের সহিত

পরিবহন ব্যবস্থা

ব্যাবিলনের 'মানা' ও ল্যাটিন 'মিনা'র সাদৃশ্য হইতে অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রপথে চলাচল ঐ সময়ে অবিদিত ছিল না।

আর্যদের আহার্য ও পানীয়

প্রাচীন আর্যগণ যব, গম প্রভৃতি শস্য, দুগ্ধ, ফলমূল, মৎস্য ও মাংস আহার করিতেন। সুরা বা সোমরস নামক একপ্রকার মাদক পানীয় তাঁহাদের অতি প্রিয় ছিল। যাগ-যজ্ঞের কালে বা উৎসবাদিতে সোমরস পানের রীতি ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ

আর্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ তুলা ও পশম উভয় প্রকারের জিনিস হইতে প্রস্তুত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ার পোশাকও ব্যবহারের রীতি ছিল। আর্যদের পরিচ্ছদ তিনটি সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত ছিল। 'নীবি' নামক এক খণ্ড কৌপিন জাতীয় বস্ত্রখণ্ডের উপর 'পরিধান' অর্থাৎ বস্ত্র এবং 'অধিবাস' উত্তরীয় আর্যগণ পোশাক হিসাবে ব্যবহার করিতেন। আর্য নারী ও পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার-নির্মাণে প্রধানত স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু অন্যান্য ধাতুর অলঙ্কারের উল্লেখও পাওয়া যায়।

শিক্ষা

আর্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞান : আর্যগণ লিখিতে জানিতেন না, ইহাই সাধারণত মনে করা হইয়া থাকে। এই কারণেই তাঁহারা বেদ বংশ-পরম্পরায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে বৈদিক আর্যগণ যে পারদর্শী ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋক্‌সংহিতা আর্যদের কবিত্বশক্তির চরম প্রকাশ সন্দেহ নাই।

স্থাপত্য

গৃহনির্মাণ শিল্পে আর্যগণ যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। সহস্র স্তম্ভ ও দ্বারযুক্ত বিশাল প্রাসাদের উল্লেখ হইতে আর্যগণের গৃহনির্মাণ অর্থাৎ স্থাপত্য-শিল্পজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্রও আর্যদের জানা ছিল। নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। ভেষজ বা চিকিৎসক রোগ দূর করিবার জন্য মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। লোহ-নির্মিত পদের উল্লেখ হইতে ঐ সময়ে শল্য বা অস্ত্রচিকিৎসাও যে অবিদিত ছিল না, তাহা অনুমান করা যায়।

জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রে আর্যগণ পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র ঐ যুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্রাদির নামকরণ আর্যগণই করিয়াছিলেন।

পরিবার ও গৃহপতি

আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা : আর্যদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। প্রত্যেকটি পরিবার এক একজন গৃহপতির অধীনে থাকিত। পরিবারের সর্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তি-ই ছিলেন গৃহপতি। তাঁহার আদেশ পরিবারের অপরাপর সকলেই মানিয়া চলিত। কয়েকটি

পরিবার লইয়া এক-একটি গ্রাম গঠিত ছিল। গ্রামের শাসনকার্য যিনি পরিচালনা করিতেন তাঁহাকে 'গ্রামণী' বলা হইত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক-একটি 'বিশ্' বা 'জন' গঠিত হইত। বিশ্ বা জনের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন 'বিশ্পতি' বা রাজন্, অর্থাৎ রাজা। রাজা বা রাজন্ রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইলেও বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে রাজগণ রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও জনসাধারণের মতামত লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া 'সভা' গঠিত হইত। 'সমিতি'তে রাজপরিবারের ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ যোগদান করিতেন। রাজা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। রাজপদ সাধারণত বংশানুক্রমিক ছিল, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারা-ই রাজা নির্বাচন করিত। ঐ সময়ে 'গণ' অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও চালু ছিল। গণরাজ্যগুলির কর্মকর্তাকে 'গণপতি' বা 'গণজ্যেষ্ঠ' বলা হইত।

গ্রাম ও গ্রামণী

বিশ্ ঃ বিশপতি বা রাজন্

সভা ও সমিতি

রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল জাতির সম্পত্তি ও প্রাণ রক্ষা করা এবং সেজন্য রাজ্য কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, বিচারপ্রার্থীদের আবেদন শোনা এবং যথাযথ ব্যবস্থা করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য ছিল। অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য যাহাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য রাজা নানাপ্রকারের রাজকর্মচারিগণের সাহায্য লইতেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বপ্রধান। সেনানী ছিলেন সৈন্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী। আর্যদের সামরিক বাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথারোহী সৈন্য ছিল। তীর-ধনুক ছিল তখনকার যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। বর্শা, তরবারি, কুঠার প্রভৃতিও যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের সময় সামরিক বাদ্য সঙ্গে লইয়া চলিবার রীতি ছিল।

রাজকর্মচারিগণ

বৈদিক যুগের রাজগণের রাজস্ব সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায় উহা হইতে জানা যায় যে, স্বাধীন প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজগণ 'বলি', 'শুল্ক' ও 'ভাগ'—এই তিন প্রকারের কর আদায় করিতেন।

রাজস্ব

আর্য সমাজে নারীর মর্যাদা ঃ ভারতবর্ষে নারীজাতি চিরকালই শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক যুগেও হিন্দু নারীরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজ নারীদের করিতে হইত, কিন্তু অন্তঃপুরের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। স্ত্রীলোক কেবল পুরুষের সহকর্মিণী-ই ছিলেন এমন নহে, বিবাহের পর তাঁহারা স্বামীর সহধর্মিণীও হইতেন।

নারীর মর্যাদা

স্ত্রী-শিক্ষা আর্য সমাজের এক অতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে পিতৃগৃহে সুশিক্ষা দানের রীতি ছিল। বেদপাঠেও স্ত্রীজাতি

অংশগ্রহণ করিতেন। বৈদিক যুগের আর্য-নারীদের মধ্যে মমতা, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

নারীশিক্ষা

বৈদিক যুগে নারীদের দৈহিক উৎকর্ষের জন্য নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধবিদ্যা, অসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। বিবাহের উপযুক্ত বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত না। পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী অথবা নিজ ইচ্ছামত মেয়েরা স্বামী নির্বাচন করিতে পারিতেন। অবিবাহিতা থাকা দূষণীয় ছিল না। মেয়েরা অধ্যাপনার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

নারীদের দৈহিক ও সামরিক শিক্ষা

পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি (Society and Culture of the Later Vedic Age) :

বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বসতি প্রধানত পাঞ্জাবের নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন কোন স্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে আর্যবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে আর্যবসতি বিস্তারলাভ করে। আর্যদের আগমনের পূর্বেকার ভারতীয় অধিবাসীরা অনেকে ভারতের আরও দক্ষিণে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয় আবার অনেক আর্যসমাজে শূদ্রদের স্থান অধিকার করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলেই থাকিয়া যায়।* উত্তর-ভারতে আর্যবসতি বিস্তৃত হইলে পূর্বাংশে যে-সকল রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল ও বিদেহ রাজ্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিন্ধ্যপর্বতেরও দক্ষিণে আর্যবসতি কোন্ সময় শুরু হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নহে, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ চারি শত বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে আর্যবসতি বিস্তারলাভ করে। অবশ্য উত্তর-ভারতে আর্যবসতি যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল সেরূপ বিস্তৃতি দক্ষিণে সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যবসতি বিস্তার

রাজনৈতিক পরিবর্তন : আর্যবসতির বিস্তৃতির আনুষঙ্গিক কতকগুলি পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছিল। প্রথমে যে দলীয় ও উপদলীয় ব্যবস্থা ছিল উহার পরিবর্তে শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিল। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল। একচ্ছত্র রাজশক্তি গঠনের দিকে অর্থাৎ রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার দিকে শক্তিশালী রাজগণ সচেষ্ট হইলেন।

শক্তিশালী রাজ্যের উত্থান

* R. C. Majumder : *Ancient India*, p. 65.

যে-সকল রাজা রাজ্যবিস্তার এবং রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইতেন তাঁহারা অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ভরত দৌশন্তি ও শাতনানিক সাত্রাজিৎ নামে দুইজন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং গঙ্গা ও যমুনা পর্যন্ত রাজ্য-বিস্তার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে।* বস্তুত সেই সময়কার সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতির মাধ্যমেই প্রতীত হইত। এই সাম্রাজ্যবাদের যে ধারণা তখন জন্মিয়াছিল তাহার প্রকাশ সম্রাট, বিরাট, একরাট, সার্বভৌম প্রভৃতি নূতন উপাধি রাজগণ কর্তৃক গ্রহণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। রাজগণের সম্রাটে অর্থাৎ রাজ্যের সাম্রাজ্যে পরিণতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে নূতন নূতন পদস্থ রাজকর্মচারী পদের সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হইল সংগ্রাহিত্রী (Treasurer), ক্ষত্রী (Chamberlain) প্রভৃতি। পূর্বেকার পুরোহিত, সেনানী ও গ্রামণী পরবর্তী বৈদিক যুগেও গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী পদ হিসাবে বিবেচিত হইত।

রাজার সম্রাটে পরিণতির চেষ্টা

নূতন নূতন রাজ-কর্মচারী পদের সৃষ্টি

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, রাজসূয় যজ্ঞের কালে রাজা কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করিয়া দেশে প্রচলিত আইনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন এবং ফলে আইন অনুযায়ী তাহার বিচার করা সম্ভব হইত না। অর্থাৎ রাজা এই অনুষ্ঠানের ফলে আইনের উর্ধ্বে স্থাপিত হইতেন (Rex above the Lex)। রাজশক্তির বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সভা ও সমিতির ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজশক্তি ও রাজ্যবৃদ্ধির ফলে অনেকটা বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণ কর্তৃক রাজাকে পদচ্যুত করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীঞ্জয় নামক জাতি তাহাদের রাজা দুষ্টঋতু পৌংসায়নকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যজুর্বেদে রাজার অভিষেক কালে তাহাকে শপথ (Coronation Oath) গ্রহণ করিতে হইত। এই শপথবাক্যে রাজা শক্তিশালী ও দুর্বল, উচ্চ-নীচ সকলকেই সমানভাবে বিচার করিবেন, নিরলসভাবে দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন এবং সকল প্রকার আপদ-বিপদ ও দুর্দৈব হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবেন এই অঙ্গীকার করিতে হইত। মোট কথা, পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইলেও রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ-স্বৈরাচারতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় নাই।

রাজশক্তি বৃদ্ধি

রাজা স্বৈরাচারী নহে

সমাজের দিক দিয়াও কতক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরবর্তী বৈদিক যুগে ঘটিয়াছিল। পূর্বেকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যেখানে জাতিভেদের

* R. C. Majumdar, *Ancient India*: p. 68

কঠোরতা ছিল না, এই চারিটি শ্রেণী একই সমাজব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিদ্যমান ছিল, পরবর্তী বৈদিক যুগে সেগুলি বহুলাংশে রক্ষণশীল পৃথক জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। শ্রম-বিভাজনের ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভরশীল পূর্বেকার শ্রেণী-বিভাগ এখন পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ জাতি সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ও মর্যাদার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পূর্বেকার ব্যবহারিক উদারতা হ্রাস পাইয়া এক শ্রেণীর লোকের সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ ক্রমে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। এক শ্রেণীর অর্থাৎ এক জাতির লোক অপর জাতিতে প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রেণীবিভাগ জাতি-বিভাগে রূপান্তরিত

জাতিগত রক্ষণশীলতা

সমাজে স্ত্রীজাতির যে স্বাধীনতা বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হইত তাহা পরবর্তী কালে আর রহিল না। পূর্বে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক কিছুই স্ত্রী-জাতির উপর ন্যস্ত ছিল। স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত অর্ধাঙ্গিণীরূপেই মর্যাদালাভ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে সেই মর্যাদা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পূর্বে স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক সমিতিতে অংশগ্রহণে কোন বাধা ছিল না, শাস্ত্রালোচনায় অনেকেই পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে গৃহকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই স্ত্রীজাতির গুরুত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। অবশ্য নৃত্য-গীতাদিতে পারদর্শিতা পরবর্তী বৈদিক যুগে অনেকেই অর্জন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রেই প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা পূর্বেকার তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল।

স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস

গার্গী, মৈত্রেয়ী

বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি ছিল সেই সময়কার পাঠ্যবিষয়। নীতিশাস্ত্র, ভৌতবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিও পাঠ্যবিষয় ছিল। গুরুগৃহে বাসবাস করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন এবং গুরুর জীবনের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও আদর্শ অনুসরণ করা তখনও প্রচলিত ছিল।

শিক্ষা- বিষয়বস্তু

পরবর্তী বৈদিক যুগে উন্নত ধরনের বস্ত্রাদি বয়ন, নানাপ্রকার স্বর্ণ অলঙ্কার এবং ধাতু নির্মিত অস্ত্রাদি নির্মাণ করা হইত। অশ্ব দ্বারা রথ টানান হইত। রথ চালাইবার জন্য, গরুর গাড়ীর জন্য এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য পৃথক পৃথক ধরনের রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছিল বলিয়া অথর্ববেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। নৌবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি পরবর্তী বৈদিক যুগে পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক জীবন :

কৃষি, পশুপালন ছিল পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রধান উপজীবিকা। কোন

পরিবারের নিজস্ব গাভী না থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান উপজীবিকা বলিয়া বিবেচিত না হইলেও অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশের সহিত স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চলিত। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, নৌ ও রথ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসকদের বৃত্তিও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বিভিন্ন বৃত্তি

বিভিন্ন শিল্প

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্নাংশের রাজ্যগুলির মধ্যে কতক কতক পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও মোটামুটিভাবে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতি ও ঋগ্বেদ যুগের সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতির মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট ছিল।

মৌলিক ঐক্য

আর্য সমাজের উপর অনার্য প্রভাব ঃ আর্যগণ প্রথম যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহাদিগকে আদিম অধিবাসী অনার্য জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অধিকার স্থাপন করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দ্বন্দ্বের ফলে অনার্যগণ যখন আর্যগণ কর্তৃক পদানত হইল তখন হইতে আর্য ও অনার্যদের পরস্পর সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদান শুরু হইল। ক্রমে অনার্যদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদিও কতক কতক আর্যসমাজ গ্রহণ করিল। আর্য ও অনার্যদের সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলেই হিন্দু সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। অনার্যগণ আর্যদের অপেক্ষা কম সভ্য হইলেও তাহারা অসভ্য ছিল মনে করিবার কোন কারণ নাই। উপরন্তু বিভিন্ন অনার্যজাতির মধ্যে দ্রাবিড়গণের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। আর্যগণ কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদিগকে 'অনার্য' নামে অভিহিত করিতেন।

আর্য ও অনার্যদের রীতি-নীতির সংমিশ্রণ

হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আর্য ও অনার্যদের কোন্ পক্ষের কতটুকু দান রহিয়াছে বলা কঠিন। তথাপি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আর্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশু-পালন। কিন্তু অনার্যগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহারা যখন এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করিলেন তখন তাঁহারা অনার্যদের নিকট হইতে কৃষিকার্য, জলসেচ প্রভৃতি কৃষির প্রয়োজনীয় যাবতীয় পন্থা শিখিয়া লইলেন। খাদ্যশস্য, ফলমূল, আখ প্রভৃতির চাষ অনার্যদের নিকট হইতেই তাঁহারা শিখিয়াছিলেন। গুড় প্রস্তুত প্রণালী, নৌচালনা, ঘরবাড়ী তৈয়ারি করা, মাটির পাত্রে নানাপ্রকার ছবি ও নকশা আঁকা, নানা ধরনের পোশাক তৈয়ার করা, ইট ব্যবহার করা প্রভৃতি দ্রাবিড়গণ হইতে আর্যরা শিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। ঘোড়ার ব্যবহার, লোহার দ্বারা জিনিসপত্র প্রস্তুত করা, দুগ্ধ ও মাদক পানীয় ব্যবহার করা, রথ-চালনা, সেলাই-এর কাজ প্রভৃতি আর্যদের দান।

অনার্যদের দান

আর্যদের দান

আর্যগণ প্রথমে কোন দেবমূর্তির পূজা করিতেন না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে তাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। কিন্তু অনার্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ক্রমে অনার্যদের নিকট হইতেই মূর্তিপূজার রীতি হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। মহাদেব, মহাদেবী বা মহামায়ার পূজা অনার্যদের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মূর্তিপূজার প্রচলন

খাদ্যদ্রব্যের দিক দিয়াও অনার্যদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর্যগণ মাংস ও মাখন প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ক্রমে ভাত, ডাল, ঘৃত, দধি, তৈল, মাছ প্রভৃতির ব্যবহার অনার্যদের নিকট হইতেই গৃহীত হয়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সিন্দুর, নারিকেল, পান ও গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার অনার্যদের সামাজিক রীতির অনুকরণ মাত্র।

নূতন খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবহার

এইভাবে আর্য ও অনার্যদের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলে যে সভ্যতা ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল পরস্পর সৌহার্দ্য, অহিংসা ও সহিষ্ণুতা। আর্য ও অনার্যদের দানে হিন্দু সভ্যতা এক অতি শক্তিশালী উন্নত ধরনের সভ্যতায় রূপলাভ করিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামো হইল আর্য-অনার্যদের মিশ্র-সংস্কৃতি।

আর্য-অনার্যদের রীতিনীতি হইতে ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামোর উৎপত্তি

মহাকাব্য রচনা (Composition of the Epics): আর্যদের সাহিত্য রচনায় মহাকাব্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগের শেষদিকে রচিত সূত্র সাহিত্যে মহাকাব্যের উল্লেখ রহিয়াছে। গৃহ্য সূত্রে উল্লিখিত 'গাথা' ও 'নারাশংসি' অর্থাৎ মানব গুণগাথা হইতেই ক্রমে মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে। মহাভারত বা রামায়ণ কোন এক ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ নহে।* যুগ যুগ ধরিয়া গাথা-জাতীয় কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অবশেষে এগুলি মহাকাব্য গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করে। সুতরাং মহাভারত বা রামায়ণ কোন একটি বিশেষ যুগের বিবরণ নহে।

বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের উল্লেখ

* "............*The Mahabharata* and *the Ramayana* are not the old heroic songs as those court singers and travelling minstrels of ancient India sang them compiled into unified poems by great poets or at least by clever collectors, but accumulation of very diverse poems of unequal value, which have arisen in course of centuries owing to continual interpolations and additions." Winternitz, vide Sinha & Banerjee, pp. 46-47.

"The *Mahabharata* could not have been the work of any single person, and in order to be brought upto its present size the process of Interpolation must have gone on for several centuries. It cannot, therefore, be said that the *Mahabharata* depicts the state of India at any particular period." R. D. Banerjee: *Prehistoric Ancient and Hindu India*, p. 47.

সাধারণত 'মহাকাব্যের যুগ' নামে একটি যুগের নামকরণ করা হইয়া থাকে ; বস্তুত মহাকাব্যের যুগ বলিয়া কোন যুগের উল্লেখ করা অনুচিত হইবে। কারণ, প্রথমত, মহাভারত বা রামায়ণ কোন একটি নির্দিষ্ট যুগের কাহিনী নহে, দ্বিতীয়ত, মহাভারত 'বৈদিক সাহিত্যের অংশ বিশেষ।'* বেদের ব্রাহ্মণ রচনার যুগে মহাভারতে উল্লিখিত—জন্মেজয়, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সুতরাং, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ 'মহাকাব্যের যুগ' নামকরণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করেন।

'মহাকাব্যের যুগ' নামকরণ ভ্রান্তিমূলক

রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালের কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে। কিন্তু রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের কবিতাগুলির অপকর্ষতা এবং বৈদিক সূত্র সাহিত্যে মহাভারতের মূল বিষয়বস্তুর উল্লেখ হইতে অনেকে মনে করেন যে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই পূর্বে রচিত হইয়াছিল। মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু রামায়ণের বর্ণনায় যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় উহা মহাভারতের সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর।† Advanced History of India গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ-ই সম্ভবত প্রাচীনতর, কারণ মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু অশ্বলায়ন, পাণিনি প্রভৃতির রচনায় মহাভারত সম্পর্কে উল্লেখ থাকিলেও রামায়ণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।†† এখানে বলা যাইতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রক্ষেপের ফলে যদি মহাভারত ও রামায়ণ উভয় মহাকাব্যই বর্তমান রূপে পরিণত হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্তমান রূপে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এমন কিছুকাল গিয়াছে যখন উভয় মহাকাব্যই লোক-মুখে গীত হইয়াছে। ইহা হইতে মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ বা রামায়ণে মহাভারতের উল্লেখ দ্বারা কোন্‌টি পূর্বে রচিত তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের

মহাভারত ও রামায়ণে কাল নির্ণয়ের প্রশ্ন

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত প্রাচীনতর (?)

---

* "The majority of a writers on history of India have been obsessed with the idea of an epic age following the later Vedic Age. It is now quite clear that there is no epic age proper in India. The *Mahabharata* is a story or a hero-land belonging to the later Vedic period". Ibid, p. 47.

† "The verses of the *Mahabharata* are less polished than those of the *Ramayana*. There are many tales in both the epics which depict similar economic conditions, and the social usages recorded are indentical but the *Ramayana* betrays a later or a more advanced stage of civilisation." Ibid, 47, also vide *Cambridge Ancient History of India*, Vol. I. p. 264.

†† "Of the two ancient Sanskrit epics the *Ramayana* is alluded to in, and was probably completed before the extant *Mahabharata*. But while the *Mahabharata* was known to Asvalayana and Pan'ni, there is no similar early reference to the *Ramayana*." *Advanced History of India*, p. 92.

ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত মহাভারতই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হইবে না। যাহা হউক এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান এখনও সম্ভব হয় নাই।

ইতিহাস রচনায় মহাভারতের গুরুত্ব

ইতিহাস রচনার দিক হইতে বিচার করিলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইহার বর্ণনার ঐতিহাসিক ভিত্তি রহিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ নিছক কবির কল্পনা।* মহাভারতে বর্ণিত নায়কদের অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী

মহাভারত : মহাভারতের মূল কথা হইল শ্রীকৃষ্ণ ও পাঞ্চালরাজ্যের সাহায্যপুষ্ট পাণ্ডবদের হস্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রাদি, অর্থাৎ কুরুবংশের পরাজয়। প্রাচীনকালে বর্তমান মীরাট জেলায় হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। উহার রাজা ছিলেন বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজ হইলেও জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডু সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশায়-ই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত। অপর দিকে, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিলেন। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। অর্জুন মথুরা ও দ্বারকার যাদব রাষ্ট্রসংঘের নেতা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ পৈতৃক সম্পত্তির দাবী করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে কুরুরাজ্যের দক্ষিণে খাণ্ডব অরণ্য দান করিয়া হস্তিনাপুর রাজ্য নিজ পুত্রদের জন্য রাখিয়া দেন। নির্লোভ পাণ্ডবগণ খাণ্ডব অরণ্য পাইয়াই খুশি হইলেন। তাঁহারা বর্তমান দিল্লীর নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী নির্মাণ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই পাণ্ডবগণ মগধরাজ জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়া এবং রাজ্যের চতুর্দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যকে চরম মর্যাদার অধিকারী করিয়া তুলিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া সম্রাটপদের মর্যাদালাভের জন্য রাজসূয় যজ্ঞেরও আয়োজন করিলেন। তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদাবৃদ্ধি কৌরব অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের

* "While the *Ramayana* is solely the production of a poet's brain, the *Mahabharata* possesses a solid substratum of historical truth. Most of its heroes were real men and much of the framework of the story is historically correct." R.D. Banerjee, *Prehistoric Ancient and Hindu India*, pp. 47-48.

"The *Ramayana* is in truth artificial in both senses, for one cannot believe the tale : whereas the *Mahabharata* makes its tale real. *Camb. History of India*, Vol. I. p. 264.

পুত্রদের ঈর্ষার কারণ হইল। তাঁহারা তাঁহাদের মাতুল শকুনির কূট পরামর্শে পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীসহ সর্বস্ব হারাইলেন। ফলে কৌরবগণ দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পাশাখেলার শর্তানুসারে যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করিয়া বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবগণ নিজ রাজ্য দাবী করিতে আসিলেন। দুর্যোধনাদি ভ্রাতাগণ এই দাবী অস্বীকার করিলে, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ কৌরব-সৈন্য পরিচালনার ভার লইলেন। আর পাণ্ডবপক্ষের নেতৃত্ব করিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হইলেন অর্জুনের রথের সারথি। আঠার দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল, অবশেষে কৌরবদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

রামায়ণ : বর্তমান অযোধ্যার ফৈজাবাদ জেলায় প্রাচীনকালে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল রামচন্দ্র। উত্তর-বিহারের বিদেহরাজ জনকের কন্যা জানকী বা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রকে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে হইয়াছিল।

রামায়ণের মূল কাহিনী

গোদাবরী নদীর তীরস্থ পঞ্চবটী বনে বাস করিবার কালে লঙ্কার (সিংহল) দ্রাবিড় রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন। কিষ্কিন্ধ্যার (বর্তমান বেলারি জেলা) বানর-নেতা ও হনুমান ও অন্যান্য অনেক স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে লইয়া রাবণের রাজ্যে উপস্থিত হন। যুদ্ধে রাক্ষসরাজ (দ্রাবিড়) রাবণ পরাজিত ও সবংশে নিহত হন। এইভাবে রাবণকে শাস্তি দান করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভরত তাঁহারই প্রতিনিধি হিসাবে অযোধ্যার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কারণ ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের বনবাসের শোকে বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

রাক্ষসের গৃহে বন্দিনী অবস্থায় থাকিবার কারণে অযোধ্যার জনসাধারণ সীতাকে রাণী হিসাবে গ্রহণ করিতে আপত্তি জানাইলে প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করিয়া প্রজার ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যশাসনে হিন্দু আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রামায়ণ হইতে তেমন কোন ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব বলিয়া মনে হইবে না। অবশ্য মহাভারতে বহু ঐতিহাসিক তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ইহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন।

ঐতিহাসিক তথ্য

যাহা হউক, মহাভারত ও রামায়ণ—বিশেষভাবে মহাভারত হইতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাবিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত না হইলেও এই সকল তথ্য হইতে ঐ সময়কার রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ

করা সম্ভব হয়। ইহা ভিন্ন রামচন্দ্রের গোদাবরী তীরে বাস ও লংকা আক্রমণ হইতে সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত আর্য অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাভারত ও রামায়ণের রাজতন্ত্রের প্রচলন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতের কালে রাজগণ যে স্বৈরাচারী ছিলেন না তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকার্য পরিচালনার যোগ্যতাই ছিল রাজপদ লাভে প্রধান শর্ত। অনুপযুক্ত রাজপুত্রকে সিংহাসন লাভে বঞ্চিত করিবার দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে উপজাতিগুলিকে নির্বাচন দ্বারা রাজা নিযুক্ত করিতেও দেখা যায়। রাজা রাজকার্যে তাঁহার স্বজাতি ও মন্ত্রিবর্গের সাহায্য লইতেন। রাজসভার উল্লেখও মহাভারতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাভারতের যুগে ঐ সভা সামরিক পরামর্শ সভায় পরিণত হইয়াছিল। রাজধানী এবং রাজ্যের প্রধান নগরগুলি প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ঐ যুগের সামরিক বাহিনী তীরন্দাজ, প্রস্তর-নিক্ষেপক, রথারোহী, হস্তিবাহিনী ও অশ্ববাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধে যে-সকল সৈন্য প্রাণ হারাইত তাহাদের পরিবারকে ভাতা দেওয়া হইত। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে রাষ্ট্রজোট গঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। দিগ্বিজয়ী রাজগণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন।

রাজনৈতিক অবস্থা

সামরিক সংগঠন

রাজপ্রাসাদে বিচারকক্ষ, পণ রাখিয়া পাশা প্রভৃতি খেলার জন্য পৃথক কক্ষ এবং জন্তু-জানোয়ারের লড়াই-এর জন্য কক্ষ প্রভৃতি থাকিত। নর্তকী ও স্ত্রী-পরিচারিকা-বৃন্দ সমভিব্যাহারে রাজা প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন।

মহাভারত ও রামায়ণে রাজনীতিক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়শ্রেণীর সর্বাত্মক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামগুলিকে শাসন-পরিচালনার স্বাধিকার দেওয়া হইত। সামাজিক ক্ষেত্রে তখন শ্রেণীবিভাগের কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে চতুর্বর্ণের পরস্পর সম্প্রীতি ও অবাধ বৈবাহিক সম্বন্ধের স্থলে এখন জাতিভেদের কঠোরতা দৃষ্ট হয়। আর্যশ্রেণীসম্ভূত ব্যক্তি-গণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অনার্য এবং উপদলীয় ব্যক্তিগণ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত ছিল।

ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য

সামাজিক অবস্থা

ঐ যুগের কতকাংশ লোকের জীবনধারণের বৃত্তি ছিল পশুপালন ও শিকার। অপর সকলেই কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত। দুর্গ প্রভৃতি সুরক্ষিত স্থানের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গঠন করিয়া সাধারণ লোক বসবাস করিত এবং বিদেশী আক্রমণ বা কোন বিপদ দেখা দিলে তাহারা ঐ সুরক্ষিত স্থানের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিত। দেশের একাংশ হইতে অপরাংশে সামগ্রী লইয়া যাওয়া-আসার সময় নির্দিষ্ট শুল্ককেন্দ্রে শুল্ক দিতে হইত। বণিকদের সঙ্ঘগুলি রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বণিক-সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি রাজগণের কাম্য ছিল। ব্যবসায়ীরা ওজনে কম দেওয়ার চেষ্টা করিত বলিয়া বাজার পরিদর্শনের সরকারী ব্যবস্থা ছিল।

সরকারী কর জমির ফসল দ্বারা বা অপর যে-কোন উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারা দেওয়া চলিত, কিন্তু জরিমানা প্রভৃতি অপরাপর দেয় অর্থ তাম্র মুদ্রা দ্বারা দিতে হইত।

খাদ্য ও পানীয়

মাংসভক্ষণ, মদ্যপান প্রভৃতি তখন প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমাজ-জীবন তখন সহজ ও সরল ছিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পিতৃ আজ্ঞা পালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সত্যরক্ষার জন্য বনবাস গমন প্রভৃতি ঐ সময়ের সমাজ-জীবনের উন্নত নৈতিক চেতনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান, বীর সন্তানের মাতা হিসাবে স্ত্রীজাতির গৌরব প্রভৃতি সেই সময়ে সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। একই স্ত্রীর একাধিক স্বামী গ্রহণ বা একই পুরুষের একাধিক স্ত্রী বিবাহ তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই সকল প্রথা অনার্য প্রভাবের পরিচায়ক। স্ত্রীজাতির স্বয়ম্বরা হাওয়ারও স্বাধীনতা ছিল।

ধর্ম

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে আরাধনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি ঐ সময়ের ধর্মজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

ধর্মশাস্ত্র : পরবর্তী কালে যখন ধর্মশাস্ত্র বা সংহিতা রচনা শুরু হয় তখন আর্য সমাজব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ হইলেন সংহিতার রচয়িতা। এ-সকল রচনার কাল নির্ণয় করা সম্ভব নহে তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতকের মধ্যে এগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

ধর্মশাস্ত্রের বা সংহিতার যুগে সামাজিক পরিবর্তন

সংহিতা রচনার যুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ধর্মশাস্ত্রানুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম পালন করা একান্ত প্রয়োজন হইত। এই যুগে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মনু স্ত্রীজাতিকে বাল্যাবস্থায় পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়া স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্যহীনতার ইঙ্গিত দিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ এবং স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিলাভ ধর্মশাস্ত্রের যুগ হইতেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

অষ্টাদশ পুরাণ : অষ্টাদশ উপ-পুরাণ

পুরাণ : আর্যরাজগণের বংশ-পরম্পরায় রাজত্বের কাহিনী পুরাণে বর্ণিত আছে। মোট আঠারটি পুরাণ এবং প্রায় সমসংখ্যক উপ-পুরাণ আছে। নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগযুক্ত রচনাকে পুরাণ বলা হয়, যথা : সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশচরিত। পুরাণ আখ্যা প্রাপ্তির জন্য রচনায় উপরি-উক্ত পাঁচটি বিভাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আঠারটি পুরাণের মধ্যে কোনটিতেই উপরি-উক্ত রীতি অনুসৃত হয় নাই। পুরাণ হিন্দুদের নিকট অপৌরুষেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমে পুরাণগুলি কেবল বংশাবলীর বর্ণনা মাত্র ছিল, কিন্তু ক্রমে এইগুলিতে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেব-স্তোত্র ও

পবিত্র স্থানগুলি সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তী সন্নিবিষ্ট হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি পুরাণেরই দুইটি অংশ গড়িয়া উঠে—প্রথম অংশে ঐতিহাসিক কাহিনী-কিংবদন্তী ও রাজবংশাবলী ও দ্বিতীয় অংশে তীর্থ-মাহাত্ম্য বা হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলির বর্ণনা। অধিকাংশ পুরাণ-ই গুপ্তযুগে অথবা গুপ্তযুগের অব্যবহিত পরে বর্তমান আকারে লিপিবন্ধ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।*

উপ-পরাণগুলি স্থানীয় কাহিনী-কিংবদন্তী বা স্থানীয় কোন দেবদেবীর উপাসনার বর্ণনা মাত্র।

পুরাণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পুরাণগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে হইলেও ক্ষত্রিয় রাজবংশ-সম্পর্কিত কাহিনী-কিংবদন্তী ও বংশাবলীর পরিচয় দান করে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক রাজগণকে পুরাণে বংশ-পরম্পরায় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন পুরাণে একই বংশের রাজগণের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। তথাপি ইতিহাস রচনায় পুরাণ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়। মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশের তালিকা এবং মৎস্যপুরাণে অন্ধ্ররাজগণের তালিকার ঐতিহাসিক মূল্য নেহাত কম নহে। বৌদ্ধ ও জৈন কাহিনী-কিংবদন্তীতে পুরাণে উল্লিখিত নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

*Vide, R. D. Banerjee, pp. 4'-51.

তৃতীয় অধ্যায়

ষোড়শ মহাজনপদের যুগ

(The Age of the Sixteen Mahajanapadas)

ষোড়শ মহাজনপদ (The Sixteen Mahajanapadas) :

বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায় ও জৈন ভগবতীসূত্রে উল্লিখিত ষোড়শ মহাজনপদ

অঙ্গুত্তর নিকায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য

ষোড়শ মহাজনপদ

(খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ বিদেহ রাজ্যের পতন কাল (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে) হইতে ঐ শতকের মধ্যভাগে মগধরাজ্যের উত্থান পর্যন্ত ষোড়শ মহাজনপদের যুগ নামে অভিহিত হইয়াছে।) বৌদ্ধ 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (Anguttara Nikaya) নামক গ্রন্থে এই যুগের ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ রহিয়াছে। জৈন ভগবতীসূত্রেও ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থদ্বয়ে প্রাপ্ত জনপদগুলির তালিকায় কতক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রধান জনপদগুলির নামের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। ঐতিহাসিক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ভগবতীসূত্রের মধ্যে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থখানিই ষোড়শ মহাজনপদের যুগের নিকটবর্তী কালে রচিত। সুতরাং এই গ্রন্থে উল্লিখিত তালিকাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া তিনি মনে করেন। ষোড়শ মহাজনপদগুলির নাম ছিল : (১) কাশী, (২) কোশল, (৩) অঙ্গ, (৪) মগধ, (৫) বজ্জি বা বৃজি, (৬) মল্ল বা মালব, (৭) চেদী, (৮) বংশ বা বৎস, (৯) কুরু. (১০) পাঞ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) শূরসেন, (১৩) অস্মক, (১৪) অবন্তী, (১৫) গান্ধার, (১৬) কম্বোজ।

কাশীর প্রাধান্য : রাজধানী বারাণসী

কাশী : ষোড়শ মহাজনপদ যুগের প্রথম দিকে কাশী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল বলিয়া মনে করা হয়। ইহার রাজধানী বারাণসী সমসাময়িক রাজ্যগুলির রাজধানী অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিল। কাশীরাজ্য বিদেহরাজ্যের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিল বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী অনুমান করেন। কাশীর রাজগণের অনেকেই সমগ্র জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেন। বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থেও কাশী-রাজ্যের প্রাধান্যের ও প্রতিপত্তির উল্লেখ রহিয়াছে। একাধিক কাশীরাজ কোশলরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশীরাজ, মনোজ কোশল, অঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জাতকে উল্লিখিত আছে। পার্শ্ববর্তী রাজগণের

নিকট কাশীর সমৃদ্ধি ঈর্ষার কারণ ছিল। একবার সাতটি রাজ্যের রাজগণ কাশীর রাজধানী বারাণসী অবরোধ করিয়াছিলেন।*

কোশল: গন্ডমতি, সর্পিকা ও সদানীরা এই তিনটি নদী ও নেপাল পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত কোশলরাজ্য কেশপুত্র ও কপিলাবস্তু রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কপিলাবস্তু রাজ্যটি কোশল-রাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অযোধ্যা, সাকেত, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরী কোশলরাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচায়ক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ কোশলে রাজত্ব করিতেন। শ্রাবস্তী ছিল কোশল-রাজ্যের রাজধানী।

কোশল: রাজধানী শ্রাবস্তী

অঙ্গ: রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমে এবং মগধের পূর্বে অঙ্গরাজ্য অবস্থিত ছিল। অঙ্গরাজ্য যে একদা খুব পরাক্রমশালী ছিল এবং নানা দেশ জয় করিয়া নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহার পরিচয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও চম্পা (বর্তমান চন্দন) নদীর সংযোগস্থলে চম্পা নগরী ছিল অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। গৌতমবুদ্ধের নির্বাণলাভের কাল পর্যন্ত অঙ্গরাজ্য ভারতবর্ষের প্রধানতম ছয়টি রাজ্যের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বাণিজ্য ও নানাবিধ সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। চম্পা হইতে নাবিকগণ সুবর্ণভূমিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জলপথে যাতায়াত করিত। এই নগরের নামানুকরণেই পরবর্তী কালে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ আনাম ও কোচিন-চীনের নাম চম্পা রাখিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

অঙ্গ: রাজধানী চম্পা

মগধ: বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর দ্বারা মগধ রাজ্য পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার প্রাচীনতম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। পরবর্তী কালে পাটলিপুত্র নগরে ইহার নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। মগধে যে-সকল রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে শৈশুনাগ বংশ-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌতমবুদ্ধের সময়ে বিম্বিসার ছিলেন মগধের রাজা। বিম্বিসার ছিলেন হর্যঙ্কবংশ-সম্ভূত।

মগধ: প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজ; পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্র

বজ্জি বা বৃজি: গঙ্গা নদীর উত্তর কূল হইতে নেপাল পর্বত পর্যন্ত বজ্জি বা বৃজি রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বজ্জি আটটি উপজাতির একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় রাজ্য ছিল। এই আটটি উপজাতির মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, যাত্রিক ও বৃজি বা বজ্জি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী।

বজ্জি: রাজধানী বৈশালী

---

* "Benares in this respect resembled ancient Babylon and medieval Rome, being the coveted prize of its more warlike but less civilised neighbour." Raychoudhury, *Political History of Ancient India*, p. 98.

মল্ল বা মালব ঃ মল্লরাজ্য দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুইয়ের একটির রাজধানী ছিল কুশীনগর বা কুশীনারা, অপরটির রাজধানী ছিল পাবা। কুশীনগরে গৌতমবুদ্ধ দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুরের প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্বে বর্তমান কাশিয়া গ্রামে কুশীনগর অবস্থিত বলিয়া উইল্‌সন্‌, কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। কুশীনগরের দশ মাইল পূর্বদিকে পাবা অবস্থিত ছিল। মালব বা মল্লরাজ্য প্রথমে রাজতন্ত্রের অধীন ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে মালবরাজ্য প্রজাতান্ত্রিক ছিল।

মালবরাজ্য ঃ রাজধানী কুশীনারা ও পাবা

চেদী ঃ যমুনা নদীর অনতিদূরে চেদীরাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল শুক্তিমতী। ঋগ্বেদে চেদী অধিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্য বা কাশী রাজ্যের সহিত চেদী রাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চেদী হইতে বারাণসী পর্যন্ত একটি রাজপথ ছিল, কিন্তু এই পথে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না।

চেদী ঃ রাজধানী শুক্তিমতী

বংশ বা বৎস ঃ গঙ্গা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত বংশ বা বৎসরাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। বৎসরাজ্যের রাজগণ কাশীর রাজবংশসম্ভূত ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ভারতকুল নামক রাজবংশসম্ভূত বলিয়া ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামক নাটকে উল্লেখ পাওয়া যায়। উদয়ন গৌতমবুদ্ধ, অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ এবং মগধের বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন।

বৎসরাজ্য ঃ রাজধানী কৌশাম্বী

কুরু ঃ কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপৎ বা ইন্দ্রপ্রস্থ। এই রাজধানী সাত যোজন ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।* পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কুরুরাজ্যে যুধিষ্ঠির-এর বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধ-জাতকে অবশ্য ধনঞ্জয় কোরব্য ও সুতসোমা প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

কুরু ঃ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ

পাঞ্চাল ঃ মধ্য-ভারতের দোয়াব অঞ্চলের অংশ ও রোহিলখণ্ড লইয়া পাঞ্চালরাজ্য গঠিত ছিল। ভাগীরথী নদীর উত্তরস্থ অংশের পাঞ্চালগণ উত্তর-পাঞ্চাল এবং দক্ষিণতীরস্থ পাঞ্চালগণ দক্ষিণ-পাঞ্চাল নামে অভিহিত হইত। উত্তর-পাঞ্চালের অধিকার লইয়া প্রাচীনকালে কুরুরাজ ও পাঞ্চালরাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। উত্তর-পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র এবং দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।

পাঞ্চাল ঃ রাজধানী অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য

---

* "The reigning dynasty according to Pali texts belonged to the *Yuddhitthila gotta*, that is the family of Yudhisth'ra". Vide, Raychoudhury, p. 138.

ষোড়শ মহাজনপদ
মহাজনপদ
রাজধানী
০
৩০০
৬০০
মাইল
সোগডিয়ানা
ব্যাক্ট্রিয়ানা
পামীর মালভূমি
রাজপুর
গন্ধার
আরাকোসিয়া
কুরু
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
শূরসেন
বিরাট
মৎস্য
অবন্তী
উজ্জয়িনী
চেদী
শুক্তিমতী
কৌশাম্বি
বৎস
বারাণসী
কাশী
মগধ
অঙ্গ
চম্পা
রাজগৃহ(১)
পাটলিপুত্র(২)
বৈশালী
কোশল
মল্ল
কাম্পিল্য
অহিচ্ছত্র
শ্রাবস্তী
প্রাগজ্যোতিষপুর
লোহিত্য
কিরাত
বঙ্গ
নর্মদা
তাপ্তী
বিদর্ভ
অশ্মক
পৈঠান
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা
কাবেরী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

মৎস্য ঃ চম্বল ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ অরণ্যের মধ্যবর্তী বর্তমান জয়পুর রাজ্য লইয়া মৎস্যরাজ্য গঠিত ছিল। সাময়িকভাবে মৎস্যরাজ্য চেদীরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে মৎস্যরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মৎস্যরাজ্যের মধ্যস্থলে পরবর্তী কালে সম্রাট অশোকের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিরাট নগর বা বৈরাট ছিল মৎস্যরাজ্যের রাজধানী।

মৎস্য ঃ রাজধানী বিরাটনগর বা বৈরাট

শূরসেন ঃ যমুনা নদীর তীরে শূরসেনরাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল মথুরা। গ্রীক লেখকদের রচনায় 'সৌরসেনই' (Souraseno:) এই রাজ্য ভিন্ন অপর কোন দেশ নহে। যদু বা যাদববংশ এই স্থানে রাজত্ব করিত।

শূরসেন ঃ রাজধানী মথুরা

অস্মক ঃ গোদাবরী নদীর তীরে অস্মকরাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল পোটালি, পোটান বা পোদান। বায়ুপুরাণে অশ্মকের রাজগণ ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অস্মকজাতক হইতে জানা যায় যে, এককালে অস্মকরাজ্য কাশীরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অস্মক ঃ রাজধানী পোটালি, পোটান বা পোদান

অবন্তী ঃ উজ্জয়িনী এবং নর্মদা উপত্যকার কিয়দংশ লইয়া অবন্তীরাজ্য গঠিত ছিল। বিন্ধ্যপর্বত এই জনপদটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। উত্তরাংশের প্রধান নদী ছিল শিপ্রা এবং রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। দক্ষিণাংশের প্রধান নদী ছিল নর্মদা এবং রাজধানী ছিল মাহিস্মতী বা মাহিসমতী পুরাণে অবন্তী-রাজগণকে যদুবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

অবন্তী ঃ রাজধানী উজ্জয়িনী ও মাহিসমতী

গান্ধার ঃ তক্ষশিলা ও কাশ্মীর উপত্যকা লইয়া গান্ধাররাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গান্ধাররাজ্যের রাজা ছিলেন পুক্কুসাতি। তিনি মগধরাজ বিম্বিসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতকের (খ্রীঃ পূঃ) শেষাংশে গান্ধার পারস্যরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। পারস্য সম্রাট দরায়ুসের বেহিস্তান লিপিতে গান্ধাররাজ্যটিকে পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গান্ধাররাজ্যের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, বর্তমান রাওলপিণ্ডি।

গান্ধার ঃ রাজধানী তক্ষশিলা

কম্বোজ ঃ উত্তর-পশ্চিম সীমায় গান্ধারের অনতিদূরে কম্বোজরাজ্য অবস্থিত ছিল। বৈদিক যুগোত্তর ভারতে কম্বোজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংক্রান্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। কম্বোজরাজ্যের সহিত গান্ধাররাজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা হিউয়েন সাঙ বহু শতাব্দীর পরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্তর্দেশের আর্যগণ হইতে

কম্বোজ ঃ রাজধানী রাজপুর

কম্বোজদের আচার-আচরণ বহুলাংশে পৃথক ছিল। প্রথমে কম্বোজে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে রাজতন্ত্রের স্থলে কৃষক, পশুপালক, ব্যবসায়ী ও সৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের এক সমবায় বা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। কম্বোজের রাজধানী ছিল রাজপুর।

উপরি-উক্ত রাজতান্ত্রিক প্রধান রাজ্যগুলি ভিন্ন সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত উপজাতির পরিচয়ও ঐ যুগে পাওয়া যায়। কপিলাবস্তুর শাক্যজাতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন, রামগ্রামের কোলিয়া, পিপ্পলিবনের মৌর্যজাতি প্রভৃতিও স্বায়ত্তশাসিত উপজাতীয় দল ছিল। ভগ্‌গ নামে অপর এক জাতির উল্লেখও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াছে। এই সকল জাতি প্রথমে রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে রাজতন্ত্রের স্থলে অভিজাততান্ত্রিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অধীনে আসিয়াছিল। মেগাস্থিনিসও এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

স্বায়ত্তশাসিত উপজাতি

প্রাচীন রোম বা গ্রীসে যে-সকল কারণে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া অভিজাততান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল অনুরূপ কারণেই ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের স্থলে বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজগণের শাসনকার্যে অক্ষমতা এবং অত্যাচার এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের কারণ ছিল সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল সমাজতান্ত্রিক শাসনাধীনে থাকিবার ফলেও জনসাধারণের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা যে বিলুপ্ত হয় নাই ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা হেতু মানসিক স্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছিল। স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলি হইতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রবর্তকদের উত্থান হইতেই একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

রাজতন্ত্রের অবসানের কারণ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন চেতনা মানসিক স্বাধীনতার সহায়ক

ষোড়শ মহাজনপদের যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এই সকল মহাজনপদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় এবং ক্রমে এগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইয়া এক-একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাশীরাজ্যটিরই সর্বপ্রথম পতন ঘটে। কাশী ও কোশল রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। প্রথমে কাশীরাজ্য এই দ্বন্দ্বে জয়যুক্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত কোশল-ই জয়ী হইয়াছিল। কোশলরাজ্যের পর মগধরাজ্যের উত্থান ঘটে। কোশলরাজ মহাকোশলের সমসাময়িক ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসার। মগধরাজ্যের রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

কাশী-কোশল দ্বন্দ্ব: মগধের উত্থান

ষোড়শ মহাজনপদ যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : ষোড়শ মহাজনপদের যুগে উত্তর-ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের একাংশ যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ষোড়শ মহাজনপদ নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। ষোড়শ মহাজনপদগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ঐ যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি তেমন পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, জাতক. পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া এই যুগের জাতীয় জীবন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

রাজনৈতিক অনৈক্য

রাজনৈতিক : ঐ সময়ের শাসনব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং এই বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপরিচালকগণের বিভিন্ন নাম ছিল যথা : সম্রাট্, বিরাট্, স্বরাট্ প্রভৃতি। যে শাসক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তাঁহাকে বলা হইত রাজা। রাজা আবার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সম্রাট্ হইতে পারিতেন। যিনি ইন্দ্রের অভিষেক লাভ করিতেন তাঁহাকে বিরাট্ বলা হইত। প্রত্যেক রাজাই নিজ রাজ্য-সীমা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া একচ্ছত্র অধিপতি বা একরাট্ হইবার চেষ্টা করিতেন। রাজগণ সাধারণত বংশ-পরম্পরায় রাজত্ব করিতেন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। রাজগণ সাধারণত চারিজন পর্যন্ত রাণী গ্রহণ করিতেন। প্রধান রাণী রাজমহিষী নামে অভিহিত হইতেন।

রাজা, সম্রাট্, বিরাট্

আইনত রাজক্ষমতা ছিল অসীম এবং স্বৈর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ-শ্রেণী মন্ত্রিবর্গ, রাজসভা ও গ্রামবাসীদের মতামত ভিন্ন রাজগণ শাসন-কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় রাজগণকে সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে হইত। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণশ্রেণী বিদ্যা ও কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

রাজক্ষমতা আইনত স্বৈর ও সীমাহীন, কার্যত নিয়ন্ত্রিত

রাজগণ ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মন্ত্রিগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে মন্ত্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ব্রাহ্মণশ্রেণী ও মন্ত্রিসভা ভিন্ন 'সমিতি' নামে জনসাধারণের সভার মতামতও রাজাকে গ্রহণ করিতে হইত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের সমিতির মতামতের মূল্য ছিল অত্যধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের 'সমিতি' অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, এমন কি তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

জনসাধারণের সমিতির গুরুত্ব

রাজতন্ত্র ভিন্ন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও যে ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া যায়। লিচ্ছবি, বৃজি, ভোগ, কৌরব, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি প্রজাতান্ত্রিক শাসনাধীন ছিল।

প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

সামাজিক : ভারতবর্ষের সর্বত্র আর্যগণের বসতি বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে লাগিল। গঙ্গানদী অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের গ্রহণযোগ্য ছিল না। গঙ্গা-উপত্যকায় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের স্ত্রীজাতি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।

গঙ্গা-উপত্যকার সামাজিক রীতি-নীতির সহিত অন্যান্য অঞ্চলের বৈষম্য

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গঙ্গা-উপত্যকায় এই প্রথা কোন কোন স্থানে পরিলক্ষিত হইলেও উহা শাস্ত্রকার-গণের অনুমোদিত ছিল না। একই স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী গ্রহণের প্রথা মহাকাব্যের কোন কোন স্থানে পরিলক্ষিত হইলেও বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালে উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ঐ সময়ে ছিল। স্ত্রীলোকেরা নিজ ইচ্ছামত স্বামী নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগকে পারিবারিক আওতার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না বটে, কিন্তু সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে সতীদাহ প্রথার প্রচলন

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা

তখনকার সমাজ ছিল কৃষিপ্রধান, সুতরাং জনসাধারণের প্রায় সকলেই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত। কেবলমাত্র রাজগণ, রাজকর্মচারিগণ ও সভা-সদ্‌গণ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত, সুরক্ষিত শহরে বাস করিতেন। শহরের প্রাচীরের স্থানে স্থানে উচ্চ রক্ষী-স্তম্ভ থাকিত। বাহিরের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। শহরের অভ্যন্তরে প্রশস্ত রাস্তা, প্রমোদ-উদ্যান, বিচার-ভবন, দ্যূত ক্রীড়া-ভবন, নৃত্যশালা প্রভৃতি থাকিত। রাজপ্রাসাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাষ্ঠনির্মিত ছিল। রাজকন্যাগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাগণ 'কুণ্ডুক' নামক একপ্রকারের বল খেলিতে ভালবাসিতেন। যুবসম্প্রদায় 'কুণ্ডুক' (বল) এবং 'ভিটা' (হকি) খেলিতে ভালবাসিত। শিকার, দ্যূত-ক্রীড়া, অস্ত্রখেলা, যুদ্ধের কাহিনী শ্রবণ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল।

জনসাধারণের বসবাস গ্রামাঞ্চলে

রাজা ও রাজকর্মচারি-গণের বসবাস সুরক্ষিত শহরে

পুরুষদের পোশাক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল, যথা আভরণ, ওড়না ও শিরাভরণ। পুরুষরা দাড়ি রাখিতেন এবং গহনা পরিধান করিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা হার, বলয় প্রভৃতি গহনা পরিধান করিতেন। ছাতা ও জুতার ব্যবহারও ঐ সময়ে জানা ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ

জাতিভেদ তখনও শ্রেণীগত বিদ্বেষ বা ঘৃণায় পর্যবসিত না হইলেও জাতিভেদ প্রথা ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের কোন বাধা ছিল না বটে, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা তখন হইতেই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই

জাতিভেদ প্রথা

যুগের শেষদিকে অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য এই যুগে কতকটা স্বৈরাচারিতায় পরিণত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক : অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। জমির উৎপন্নের দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সেচকার্য, কৃষিকার্য ও জল সংরক্ষণের জন্য সমবায়-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। দুর্ভিক্ষ একেবারে অবিদিত ছিল না বটে, তথাপি উহা খুব কদাচিৎ ঘটিত। কৃষিকার্য ভিন্ন পশুপালনও তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। হাতির দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ, দেওয়ালচিত্র ঐ সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রমাণও আমরা পাইয়া থাকি। ভারুচ্ বা ভৃগুকচ্ছ তাম্রলিপ্ত, সোপারা প্রভৃতি তখনকার প্রধান বন্দর ছিল। বণিকগণ জলপথে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। রেশম, সোনা, সূচের কাজ প্রভৃতি বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী ছিল। তামা ও রূপা-নির্মিত 'কার্শপণ' নামক মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। রূপার 'কার্শপণ' 'ধরণ' নামে পরিচিত ছিল। বৈদিক যুগের মুদ্রা 'নিষ্ক'-এর দশমাংশ মূল্য ছিল রৌপ্যনির্মিত কার্শপণের।

অর্থনৈতিক জীবন : কৃষিপ্রধান

পশুপালন

ব্যবসার-বাণিজ্য

মুদ্রা

ধর্মনৈতিক : ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সময়ে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নূতন দেবদেবীর উপাসনা, ভক্তিবাদ প্রভৃতি ঐ সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। কোন কোন দেবদেবীর নিকট পশুবলি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু বহু যোগী পুরুষ পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করিতেন। এই সময়কার ধর্মনৈতিক জীবনের প্রাধান বৈশিষ্ট্য ছিল কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির উপাসনা ঐ সময়ে আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। ঐ সময়ের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম জটিল ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের স্বৈরাচারিতা ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, সহজ ও সরল ধর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনকে স্বভাবতই আলোড়িত করিতেছিল।

নূতন দেবদেবী ও ভক্তিবাদ

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদিক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনীতির বিবর্তন
(Post-Vedic Religious & Political Evolution)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি (Reaction against Vedic Brahmanism : Origin of Jainism and Buddhism) :

বৈদিক যুগের শেষভাগে বিশেষত বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ'গুলির রচনাকাল হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম কতকগুলি প্রাণহীন জটিল যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছিল। আন্তরিক ভক্তি, সততা ও ধর্মবুদ্ধির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছিল ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিতগণ ধর্মবিধি অনুযায়ী কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিলেই গৃহস্থের পাপক্ষয় এবং পুণ্যলাভ হইতে পারে এই ধারণা সমাজের উপর পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের এক সর্বাত্মক প্রাধান্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণগুলিতে ব্রাহ্মণশ্রেণীর এই প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের জটিলতা ঃ ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকার, যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ ধর্মকার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তেমনি নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর ঘৃণাপ্রদর্শন অন্যায় বলিয়া মনে করা হইত না। জীবহিংসা এবং মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ধর্মের অংশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের ধর্মজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও মানবহিতৈষণা স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিল। পশুবলি, যাগযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এই যুক্তি তাহারা মানিল না। উপনিষদে ঋষিগণ যে স্বাধীন ধর্মচিন্তা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা দিল। ইওরোপে রেনেসাঁস (Renaissance)-এর ফলে যে স্বাধীন চিন্তার সূচনা হইয়াছিল তাহার ফলেই ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠান ও ধর্মযাজকশ্রেণীর অনৈতিকতা ও সর্বাত্মক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম (Protestantism) দেখা দিয়াছিল। ভারতবর্ষে আরণ্যক বিশেষত উপনিষদে ধর্মবিষয়ে যে স্বাধীন চিন্তার সূচনা হইয়াছিল, তাহারই ফলস্বরূপ বহু প্রতিবাদী ধর্ম দেখা দিয়াছিল। এগুলির মধ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মই প্রধান। প্রতিবাদী ধর্মের নেতৃত্ব পুরোহিতশ্রেণীর হস্তে ছিল না, ক্ষত্রিয়শ্রেণী হইতেই এগুলির নেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শ্রমণ ও পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পশুবধের নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাসক্তির প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

জীবের প্রতি হিংসা, মানুষের প্রতি ঘৃণা

আরণ্যক ও উপনিষদে স্বাধীন চিন্তার সূচনা

প্রতিবাদী ধর্মের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য

জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে সাধারণত 'বেদ-বিরোধী' ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কোনটিকেই বেদ-বিরোধী বলা যায় না। এই উভয় ধর্মেরই সূচনা উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারায় পরিলক্ষিত হয়। জৈন এবং বৌদ্ধধর্মকে বৈদিক ধর্মের অনুবৃত্তি বলা উচিত হইবে, যদিও কালক্রমে এই দুই ধর্মের আদর্শ, উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদির অনেক কিছুই বৈদিক আদর্শ, অনুষ্ঠান ও উপাসনা হইতে পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে।*

জৈন বা বৌদ্ধধর্ম বেদ-বিরোধী নহে

ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে, মহাবীর ও গৌতম উভয়েই তিব্বতীয়, গুর্খা ও ভুটিয়াদের ন্যায় মঙ্গোল জাতির লোক ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও মঙ্গোলীয় ধর্মের মধ্যে বৈষম্য ছিল বলিয়াই মহাবীর ও গৌতম ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্মিথের এই মতবাদ আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের ধর্মচিন্তার স্বাধীনতার পরোক্ষ ফল হিসাবেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

ডক্টর স্মিথের মতবাদ: আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অস্বীকৃত

মহাবীর ও জৈনধর্ম: জৈনদের মতে মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক নহেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে পর পর চব্বিশজন তীর্থংকর বা মুক্তির পথনির্মাতা (ford makers) জৈনধর্মের প্রবর্তক ও প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম তীর্থংকর ছিলেন ঋষভদেব। মহাবীর ছিলেন সর্বশেষ তীর্থংকর। তিনি জৈন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না, তিনি উহার পরিবর্ধন সাধন করিয়াছিলেন যদিও জৈনধর্ম তাঁহার নামানুসারেই সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু জৈনধর্মের প্রকৃত স্থাপয়িতা বা প্রবর্তক ছিলেন ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ। ইনি ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু পূর্ববর্তী তীর্থংকরগণ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন না।

চব্বিশজন তীর্থংকর: পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক

মহাবীর কুন্দপুর নামক স্থানের জ্ঞাত্রিক দলপতির পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সিদ্ধার্থ এবং মাতা ছিলেন ত্রিশলা। সিদ্ধার্থ জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়। আর ত্রিশলা মগধ ও বৈশালীর রাজপরিবারের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে জড়িত ছিলেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের জন্মকাল হইল ৫৯৯ খ্রীঃ পূর্ব। কিন্তু মহাবীরের জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় নাই, তবে তিনি যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরিচয়

* "It would be a mistake to regard the rise of Jainism and Buddhism as a breach with the Vedic view of life, although in course of time both these religions developed certain ideals and rituals inconsistent with Vedic philosophy and worship." Vide, Sinha & Banerjee, p. 50.

মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শ্বেতাম্বর জৈনদের কিংবদন্তীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাবীর যশোদা নাম্নী এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর গৃহীর জীবন যাপন করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দীর্ঘ বারো বৎসর দিগম্বর সন্ন্যাসীর তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি গোসাল নামে একজন সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁহার সহিত কঠোর তপশ্চরণে কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু বারো বৎসর কঠোর তপস্যার পরও তিনি কোন দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু পর বৎসর—অর্থাৎ তাঁহার সন্ন্যাসের ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি পূর্ব-ভারতের ঋজুপালিকা নদীর তীরে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানেই তিনি 'কৈবল্য' অর্থাৎ চরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি 'কেবলীন' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় হন। ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'জিন' নামে পরিচিত হন। তিনি 'নির্গ্রন্থ' (অর্থাৎ গ্রন্থিহীন, সম্পূর্ণ মুক্ত) নামে এক ধর্মের প্রচার করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই ধর্মের নাম তাঁহাব 'জিন' উপাধির অনুসরণে জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বলিয়া কথিত আছে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, কোশল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে জৈনধর্ম প্রচার করিয়া মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে পাবা-পুরীতে দেহরক্ষা করেন।

বিবাহ, গৃহীর জীবন যাপন: গৃহত্যাগ

'কৈবল্য' জ্ঞান লাভ: 'জিন' নাম গ্রহণ

মৃত্যু

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাবীর জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক নহেন। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন পার্শ্বনাথ। পার্শ্বনাথ এই ধর্মের মূলে নীতি নির্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন, যথা: 'অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না-করা এবং অনাসক্তি।' মহাবীর উপরি-উক্ত চারিটি নীতির সহিত ব্রহ্মচর্যনীতি যোগ করেন। মহাবীর পার্থিব সব কিছু ত্যাগ করিয়া এমন কি পরিধানের বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া চরম অনাসক্তি প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তাঁহার ধর্মমত যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা 'দিগম্বর' নামে পরিচিত। পরে (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে) শ্বেতাম্বর নামে জৈনদের মধ্যেই অপর এক শাখার উদ্ভব হয়।

জৈনধর্মের মূলনীতি অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না-করা, অনাসক্তি ও ব্রহ্মচর্য

জৈনদের চরম উদ্দেশ্য হইল 'সিদ্ধশীলা' বা 'নির্বাণ' লাভ করিয়া আত্মার পুনর্জন্মের কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। জৈন ধর্মমত অনুসারে সিদ্ধশীলা প্রাপ্তির তিনটি পন্থা রহিয়াছে, যথা: সৎকর্ম, সৎজ্ঞান ও সৎব্যবহার। জৈনরা বেদকে ভগবানের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে না। জীবহিংসা ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান জৈনধর্মানুসারে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এগুলি তাহাদের নিকট মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহাদের

নির্বাণলাভ জৈনধর্মের চরম উদ্দেশ্য

মতে বস্তুমাত্রেরই প্রাণ রহিয়াছে। ধাতু, পাথর, গাছপালা প্রভৃতিরও প্রাণ আছে বলিয়া তাহারা মনে করে। জৈনরা বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, জাতিভেদও মানে না। তাহাদের মতে শুদ্ধ এবং পূর্ণ-বিকশিত মানব-আত্মাই হইল দেবতা। পুনর্জন্ম ও কর্মবাদে জৈনরা হিন্দুদের ন্যায়ই বিশ্বাসী। সৎকর্ম, কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর সংযমের মধ্য দিয়া আত্মার উন্নতিবিধান এবং অবশেষে আত্মার পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ নির্বাণলাভ-ই হইল জৈনধর্মের আদর্শ।

জৈন ধর্মমত

শ্বেতাম্বর জৈনদের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, মহাবীরের মূল ধর্মোপদেশ চৌদ্দটি খণ্ডে সংরক্ষিত হয়। এগুলি 'পূর্ব' (Purvas) নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে দক্ষিণ-বিহারে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহুসংখ্যক জৈনধর্মাবলম্বী ভদ্রবাহু নামক একজন নেতার নেতৃত্বে মহীশূর অঞ্চলে চলিয়া যায়। ঐ সময়ে বিহারে জৈনধর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া গেলে জৈনগণ পাটলিপুত্র নগরীতে এক জৈন ধর্মসভা আহ্বান করে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জৈনধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। এই সভার সিদ্ধান্ত দ্বাদশখণ্ডে সঙ্কলিত হয়। এগুলি 'অঙ্গ' নামে পরিচিত। আরও কয়েক শত বৎসর পর আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে গুজরাটে অপর একটি জৈন ধর্মসভা আহূত হয়। এই সভার সংকলন অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশ যথা : গঙ্গ, কদম্ব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় জৈন সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল। বীরসেন, জীনসেন, গুণ-ভদ্র প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

জৈন গ্রন্থাদি : অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সূত্র

জৈনধর্ম প্রথমে দক্ষিণ-বিহারে বিস্তার লাভ করে বটে, কিন্তু ক্রমে উহা পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতেও প্রচারিত হয়। মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ বয়সে শ্রবণবেলগোলা চলিয়া যান এবং কৃচ্ছ্রসাধনে দেহত্যাগ করেন বলিয়া 'রাজাবলীকথে' নামক জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন সন্ন্যাসী দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন। মহীশূরের শ্রবণবেলগোলা ছিল তাহাদের প্রচারকেন্দ্র। চন্দ্রগুপ্তের নামানুসারে একটি পার্বত্যগুহা নির্মিত হয়। উহা চন্দ্রগিরি নামে এখনও বিদ্যমান।

জৈনধর্মের বিস্তৃতি

গৌতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম : কপিলাবস্তুর শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন গৌতম। কপিলাবস্তু নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। গৌতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ। শুদ্ধোদনের আসন্নপ্রসবা পত্নী মায়াদেবীর পিতৃগৃহে যাইবার পথে লুম্বিনী গ্রামে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরে মায়াদেবীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার বিমাতা ও মাতৃস্বসা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। গৌতমী

গৌতমের জন্ম ও বাল্যকাল

কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম গৌতম। রাজপুত্রসুলভ বিলাস ও ঐশ্বর্য ভোগের সুযোগ পাইয়াও গৌতম বাল্যকাল হইতেই কতকটা অন্তর্মুখী হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, ষোল বৎসর বয়সে গোপা, বিম্বা, যশোধরা, সুভদ্রকা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক রাজকন্যার সহিত গৌতমের বিবাহ হইল। বিবাহের পর কিছুকাল রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যেই কাটিল। কিন্তু জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি মরণশীল মনুষ্য-জীবনের দুঃখ-কষ্ট গৌতমকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। প্রাসাদ-জীবনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য গৌতমের মনে শান্তি আনিতে পারিল না। ইহলৌকিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। তিনি জীবাত্মার মুক্তির পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মিল। এই পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল। পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মায়া বৃদ্ধি পাইতেছে মনে করিয়া গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন বা রাজ্যের মায়া তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। গৌতমের বয়স তখন মাত্র ২৯ বৎসর।

গৃহত্যাগ

গৃহত্যাগের পর গৌতম সত্যের সন্ধানে একাধিক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, নানাভাবে আত্মপীড়ন, যোগাভ্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন এবং সত্যের সন্ধানে নানা-স্থানে পর্যটনও করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। নানাস্থানে পর্যটনের কালে তিনি রাজগৃহ ও উরুবিল্ব নামক স্থানেও গিয়াছিলেন। গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে গৌতম সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজ দেহকে অস্থিচর্মসার করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে (বর্তমান লীলাজান) অবগাহন করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন। এখানেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন; যে অশ্বত্থমূলে বসিয়া তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন উহা বোধিদ্রুম নামে পরিচিত হয় এবং ঐ স্থানটির নামকরণ করা হয় বোধগয়া। অতঃপর বুদ্ধ সারনাথের নিকটবর্তী মৃগশিখাবনে তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পরবর্তী দীর্ঘ ৪৫ বৎসরকাল তিনি বিহার ও অযোধ্যায় তাঁহার বাণী প্রচার করেন এবং বৌদ্ধ-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ধর্মপ্রচার উপলক্ষে মগধরাজ বিম্বিসার, কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ৮০ বৎসর বয়সে গৌতমবুদ্ধ কুশীনগর নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার তিরোধান সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে ঘটিয়াছিল। সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধের তিরোধানের কাল ৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ বলা হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে। বুদ্ধের তিরোধানকে বৌদ্ধগণ 'মহাপরিনির্বাণ' নামে অভিহিত করেন।

দিব্যজ্ঞানের সন্ধানে

জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

বৌদ্ধধর্মের প্রচার

মহাপ্রয়াণ

গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত ছিল অতি সুন্দর, সরল এবং নীতিআশ্রয়ী। যেমন, অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকা, মনকে পবিত্র রাখা এবং যাহা কিছু ভাল তাহা অন্তরে সঞ্চয় করা। গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত চারিটি মহান্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা, দুঃখ-কষ্ট, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষ মাত্রেরই ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক দুঃখেরই কোন-না-কোন কারণ আছে, এই দুঃখ-কষ্ট মোচন করা প্রয়োজন এবং সেজন্য উপযুক্ত পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার। বুদ্ধদেবের মতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ হইল অজ্ঞতা ও আসক্তি। অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাবহেতুই মানুষের পুনর্জন্ম ঘটিয়া থাকে এবং সৎকর্মের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই আত্মার পুনর্জন্ম রোধ করা সম্ভব হয়। বুদ্ধদেব হিন্দুদের ন্যায় কর্মবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ নিজ কর্মফল অনুসারে বার বার পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়া থাকে এবং কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। সৎকর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া নির্বাণলাভ বা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব। তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন: সদ্ব্যবহার (শীল), একাগ্রতা (সমাধি) ও অন্তর্দৃষ্টি (প্রজ্ঞা)।

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি

পুনর্জন্ম ও কর্মবাদে বিশ্বাস

নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্থা বুদ্ধদেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দুদের জটিল যাগযজ্ঞ, উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন শান্তিলাভ করা সম্ভব নহে তেমনি জৈনদের ন্যায় কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মপীড়নের দ্বারাও মুক্তিলাভ করা যায় না—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। হিন্দুদের পশুবলি প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা ও জীবহিংসা তিনি যেমন সমর্থন করিতেন না, তেমনি পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ আছে এইরূপ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না। গৃহীর পক্ষে অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন বা ধাতু, পাথর প্রভৃতির প্রাণ আছে মনে করিয়া দৈনন্দিন জীবনে চলা সম্ভব নহে ভাবিয়াই বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মকে বহুল পরিমাণে বাস্তববাদী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি মধ্য-পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কোন কিছুরই আতিশয্য পছন্দ করিতেন না।

মধ্য-পন্থা

নির্বাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গিক মার্গের অর্থাৎ আটটি পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই আটটি পথ হইল: সৎ-বাক্য, সৎ-দৃষ্টি, সৎ-চিন্তা, সৎ-শ্রম, সৎ-মনোবৃত্তি, সৎ-আদর্শ, সৎ-ব্যবহার ও সৎ-জীবন। এই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করিলে যে-কোন ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং ফলে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। নির্বাণ লাভ করা-ই বৌদ্ধ ধর্ম-মতের চরম উদ্দেশ্য। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভিন্ন অপর কতকগুলি নীতি অনুসরণের উপদেশও বুদ্ধদেব দিয়াছিলেন, যথা—হিংসা ত্যাগ করা, চুরি না-করা, মিথ্যা না-বলা, ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করা, পরনিন্দা ত্যাগ করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, পশুবলি ত্যাগ করা, অর্থলিপ্সা ত্যাগ করা প্রভৃতি। তিনি এ কথাও

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া অবশেষে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য গভীর ধ্যানেরও প্রয়োজন আছে। গভীর ধ্যানের ফলেই প্রজ্ঞা লাভ করা সম্ভব হয়, প্রজ্ঞা লাভের পর প্রকৃত জ্ঞান এবং সর্বশেষে নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। বৌদ্ধধর্মে ভগবান ও দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। বেদ ভগবানের বাণী একথাও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা হয় না। বৌদ্ধধর্মে জৈনধর্মের ন্যায় জাতিভেদ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের লইয়া একটি সংঘ স্থাপন করেন। ক্রমে 'সংঘ' বৌদ্ধধর্মের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়।

নির্বাণ

বৌদ্ধ-সংঘ

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মনীতিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে মৌখিক উপদেশ দিতেন। তখনকার কথ্য ভাষা ছিল পালি। তাঁহার উপদেশগুলি যাহাতে লোকে বিস্মৃত না হয় সেজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহ নামক স্থানে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেন। এই সভা প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি (Council) নামে পরিচিত। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্মনীতিগুলি তিনটি 'পিটক' (Basket)-এ বিভক্ত করা হয়। এই তিনটি পিটক হইল: (১) সূত্র পিটক—ইহাতে বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার কার্যাবলীর বিবরণ রহিয়াছে। (২) বিষয় পিটক—ইহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। (৩) অভিধর্ম পিটক—ইহাতে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বাদির আলোচনা রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য: ত্রিপিটক

পরবর্তী কালে বুদ্ধের বাণী সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূর করিবার জন্য পর পর আরও তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে পাটলিপুত্র নগরীতে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ কণিষ্কের কালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে)* চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ সঙ্গীতি

বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মমতের পার্থক্য: জৈন ও বৌদ্ধধর্ম উভয়-ই হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী (Protestant) ধর্ম। উভয়ই ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতে বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকৃত হয় না। কিন্তু উভয় ধর্মমতে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয়। উভয় ধর্মেরই চরম উদ্দেশ্য হইল নির্বাণ বা মোক্ষলাভ। অহিংসা নীতি উভয় ধর্মেরই মূল ভিত্তি।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য

উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকিলেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের পার্থক্য নেহাত কম নহে। জৈনধর্ম মতে তপশ্চর্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে গৃহীর পক্ষে মূল জৈনধর্ম পালন করা সম্ভব নহে। একমাত্র গৃহত্যাগী

* "This conference is said to have met in Kashmir or Jullundur." R. D. Banerjee, *Pre-historic, Ancient & Hindu India*, p. 128.

সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রকৃত জৈন ধর্মমত পালন করা চলিতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অনেকটা বাস্তববাদী। গৃহীর পক্ষেও বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা ও অপরাপর নীতি পালন করা দুঃসাধ্য নহে। ইহা ভিন্ন জৈনগণ অহিংসা নীতিকে অত্যধিক সম্প্রসারিত করিয়া ধাতু, পাথর প্রভৃতিতে প্রাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইলেও অচেতন পদার্থের প্রাণ আছে, বিশ্বাস করেন না। বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের কোন যোগাযোগ স্বীকার করেন না বা মানিয়া চলেন না। হিন্দুদের দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত, কিন্তু জৈনধর্মাবলম্বিগণ লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। 'সংঘ' বৌদ্ধধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ কিন্তু জৈনধর্মে সংঘ বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বৈসাদৃশ্য

জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতে হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল বিশ্বাস করা হয়। ইহা ভিন্ন অহিংসা নীতি কেবলমাত্র জৈন ও বৌদ্ধধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নহে। হিন্দুধর্মেও অহিংসা নীতির স্থান আছে। হিন্দুগণ গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ কোন কোন দেব-দেবী, যথা—লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি জৈন ও হিন্দুধর্মাবলম্বী উভয়েই পূজা করিয়া থাকেন।

জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য

কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যও আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেন না, কিন্তু ইহা হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি বলা যাইতে পারে। হিন্দুগণ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধগণ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। হিন্দুগণ জাতিভেদ মানেন, কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধগণ জাতিভেদ মানেন-না।

জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বৈসাদৃশ্য

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সংগঠন : জৈনধর্মে বৌদ্ধধর্মের ন্যায় 'সংঘ' একটি অপরিহার্য অঙ্গ না হইলেও জৈনদেরও অসংখ্য মঠ, বিহার প্রভৃতি যে ছিল সে-বিষয়ে দ্বিমত নাই। জৈনধর্ম মূলত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের ধর্ম। গৃহীর পক্ষে জৈনধর্মের কঠোর অনুশাসন মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। এই কারণে গৃহত্যাগী জৈন সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য বহু মঠ, বিহার, সংঘারাম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল মঠ, বিহার বা সংঘারামে বাস করিয়া জৈন ভিক্ষুগণ চতুর্যাম অর্থাৎ চারি প্রকারের সংযম পালন করিতেন। অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না-করা ও অনাসক্তি—এই চারিটি ব্রতকেই চতুর্যাম বলা হয়। মহাবীর এই চারিটির

জৈন মঠ, বিহার প্রভৃতি

সহিত ব্রহ্মচর্য ব্রতটি যোগ করিয়াছিলেন। এই মোট পাঁচটি সংযমনীতি জৈন ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের চিন্তা, আলাপ-আলোচনা ও কার্যে মানিয়া চলিতেন।

বৌদ্ধধর্মে 'সঙ্ঘ' হইল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সংসার-ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে বাস করিতেন। বৌদ্ধ-সঙ্ঘভুক্ত হইবার কতকগুলি নিয়ম ছিল। প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করিয়া গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত এবং পীতবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপ দ্বারা ভিক্ষু শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইত। এইভাবে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলেই ঊর্ধ্বতন ভিক্ষুদের আস্থাভাজন হওয়া চলিত এবং সঙ্ঘের সভ্য শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বলিয়া অভিহিত হওয়া যাইত। দীক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধগণ ও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের বৌদ্ধ বিহার বা মঠে বাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, ঔষধ প্রভৃতি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের গৃহী শিষ্য-শিষ্যার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেন। রাজগণও ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি যোগাইতেন।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ

বৌদ্ধ সঙ্ঘে অত্যধিক কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। প্রতি পক্ষে একবার অর্থাৎ মাসে দুইবার করিয়া ভিক্ষুগণ একত্রে সমবেত হইয়া কেহ কোন অন্যায় বা অপরাধ করিয়া থাকিলে উহার বিচার করিতেন। অন্যায় আচরণ বা অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করা হইত বা শাস্তি দেওয়া হইত। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। সমগ্র ভিক্ষুসমাজের মতামত গ্রহণ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একেবারে প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে সেই অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা

জৈন ও বৌদ্ধ শিল্প-কলা : প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শিল্প-কলা গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। বোধগয়া, সাঁচী, ভারহুত, সারনাথ, অমরাবতী ও আরও বহুস্থানে বৌদ্ধ স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল মঠ, স্তূপ, স্তূপের রেলিং বা আবেষ্টনী, তোরণ প্রভৃতি। সাঁচীর স্তূপ উহার রেলিং ও তোরণ বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে অদ্যাপি টিকিয়া আছে। বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, রেলিং, তোরণ, স্তূপ ও মঠের প্রাচীরগাত্রে খোদিত চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা

বৌদ্ধ স্থাপত্য : মঠ, স্তূপ, তোরণ, রেলিং

বিশেষভাবে জাতকের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। গান্ধার, মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে বুদ্ধদেবের নিখুঁত মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ শিল্প-রীতির সংমিশ্রণ গন্ধারের বৌদ্ধ-ভাস্কর্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সূত্রসাহিত্যে বহু নগরের বর্ণনা হইতে সে-যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতি সেই সকল নগর নির্মাণে অনুসৃত হইয়াছিল সে-কথা অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পে ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতির ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো', 'মেগাস্থিনিসের বিবরণ' প্রভৃতিতে বৌদ্ধ শিল্প-রীতি প্রভাবিত স্থাপত্যের বর্ণনা রহিয়াছে। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজধানী পেশোয়ার বা পুরুষপুরে ৪০০ ফিট উচ্চ কাষ্ঠ নির্মিত চৈত্যটির বর্ণনা চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে পাওয়া যায়। পাথরের পাহাড় কাটিয়া গুহা নির্মাণ বৌদ্ধ শিল্প-কৌশলের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বরাবর পাহাড় ও নাগার্জুন পর্বতের বৌদ্ধ গুহাগুলি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ-ভাস্কর্যে স্তম্ভ নির্মাণ শিল্প-কৌশলের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি। শত শত বৎসরের পর আজিও সেই সকল স্তম্ভ দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

নগর নির্মাণ

কাষ্ঠ-নির্মিত চৈত্য : গুহা-মন্দির

চিত্র-শিল্পেও বৌদ্ধ শিল্প-রীতির প্রকাশ পাইয়াছিল। রাজা প্রসেনজিতের প্রমোদ-কক্ষ নানাপ্রকার চিত্রাংকন দ্বারা সুসজ্জিত ছিল সে-কথা বৌদ্ধ-ধর্ম-সাহিত্য বিনয়-পিটকে উল্লিখিত আছে। সে-যুগে 'লেপ্য-চিত্র', 'লেখ্য-চিত্র' ও 'ধূলি-চিত্র'—এই তিন প্রকার চিত্র-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চিত্র-শিল্প

জৈনধর্ম-প্রভাবিত স্তূপ, মঠ, বিহার প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ন্যায় রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় নাই বলিয়া জৈনধর্মের শিল্প-কলা বৌদ্ধ শিল্প-কলার ন্যায় ততটা উন্নত হইতে পারে নাই। তথাপি উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ের জৈন গুহাগুলি, ইলোরার জৈন মন্দির, জুনাগড়ের জৈন মন্দিরগুলি, আবু পর্বতের জৈন মন্দির, জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাগজের উপর চিত্রাংকনে জৈনগণ-ই ভারতে সর্বপ্রথম পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন।

জৈন স্তূপ, মঠ, বিহার—গুহা-মন্দির

চিত্রাঙ্কন

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীনকালে আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, চীন, ইন্দো-চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল সেই সূত্রে ভারতীয় শিল্প-রীতি—বিশেষত বৌদ্ধ শিল্প-রীতি সেই সকল অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ, কুচি (বর্তমান কুচা), তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্ন-তাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বহু মন্দির, দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীর-চিত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত

মধ্য-এশিয়া, চীন, সুবর্ণভূমি, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে বৌদ্ধ শিল্প-রীতির বিস্তৃতি

হইয়াছে। এগুলি যে বৌদ্ধ শিল্প-রীতির অনুসরণে নির্মিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। এই সকল অঞ্চলের স্তূপ, বিহার প্রভৃতিও বৌদ্ধ শিল্প-রীতির অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। খোটানের গোমতি বিহার ছিল মধ্য-এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহার। চীন, তিব্বত, সিংহল,, ইন্দো-চীন, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি অঞ্চলেও বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, মঠ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধধর্ম প্রচারক কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন চীনদেশে আমন্ত্রিত হইয়া গেলে তাঁহাদের জন্য 'শ্বেত অশ্ব বিহার' নামক একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হইয়াছিল।

গোমতি বিহার, শ্বেত অশ্ব বিহার

নানকিং-এর বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় বৌদ্ধ-শিল্পের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। টনকিনে মোট কুড়িটি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছিল সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ভারতীয় শিল্প-রীতিও সিংহলে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও অর্থাৎ সুবর্ণভূমিতে বৌদ্ধ-শিল্পের অনুকরণে নির্মিত মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারত ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব ঃ সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় সহজ ও সরল জীবনাদর্শ জৈন ও বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইয়াছে। নৈতিক চরিত্র-গঠন, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার ভিত্তিতে পরস্পর ব্যবহার ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করাই হইল এই দুই ধর্মের মূল কথা। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের জটিলতার স্থলে সহজবোধ্য ভাষায় জাতিভেদশূন্য সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়া মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ মাত্রকেই সমঅধিকার দান করিয়াছিলেন। রাজা, মহারাজগণের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম স্বভাবতই জৈনধর্ম অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু মূল সত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে উভয় ধর্মই উদার জীবনাদর্শের প্রচার করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম শ্রেণীবিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং সকল শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া সকলকে সমানভাবে বুকে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল। মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বণিক সারিপুত্ত মোগ্‌গলান ও অনাথপিণ্ডদ্‌ এবং আনন্দ ও উপালির ন্যায় বহু সাধারণ শ্রেণীর লোকও এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সহজ সরল জীবনাদর্শ

মানবধর্মী আদর্শ

ইতিহাসের গতিপথ ধরিয়া চলিতে গিয়া, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে আজ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল পূর্বেই প্রাধান্য হারাইয়াছে বটে, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের মূল বাণী—ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা ভারতীয় জীবনের চিরন্তন আদর্শ হইয়া আছে।

ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী—ভারতীয় জীবনাদর্শে পরিণত

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ও বিলুপ্তি : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-প্রচারের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম একটি স্থানীয় ধর্ম হিসাবেই প্রচলিত ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুবর্ণভূমি, মিশর, ম্যাসিডনিয়া, সীরিয়া, কাইরিনি, ইপাইরাস প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের একটি স্থানীয় ধর্ম হইতে একটি জগৎ-ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে কুষাণরাজ কণিষ্কের (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। ইহা ভিন্ন ভারতেও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার সাধিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম-জীবন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলার পালবংশের শাসনাধীনে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। সেই যুগেই বাঙালী মনীষী অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে গিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার

পরবর্তী কাল হইতে ক্রমে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে। ইহার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে স্বভাবতই জনসাধারণের উপর উহার প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কারণ : রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিলে এবং বৌদ্ধগণ হিন্দু-ধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণে বুদ্ধের মূর্তিপূজা প্রভৃতি শুরু করিলে হিন্দুধর্মের পক্ষে বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণকে হিন্দুধর্মের গণ্ডিতে ফিরাইয়া আনা সহজতর হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা

তৃতীয়ত, শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে, হিন্দুধর্মের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল উহা সহজেই ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সাধনে সমর্থ হইল।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন

চতুর্থত, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্মের উপর চরম আঘাত আসিল তুর্কী আক্রমণকারীদের নিকট হইতে। তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ পাইল। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের আদি তীর্থ ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইলেও চীন, জাপান, কোরিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিদেশে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি পৃথিবীর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গৌতম বুদ্ধের শরণাগত।

তুর্কী আক্রমণ

জৈনধর্ম রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হয় নাই বলিয়াই কোন কালে ভারতে উহা প্রাধান্য বিস্তার করে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যেমন ব্যাপক প্রসার সাধিত হইয়াছিল তেমনি উহার বিলুপ্তিও ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ম অদ্যাপি ভারতে বিদ্যমান আছে। হিন্দুধর্মের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার এবং কোন কোন হিন্দু দেব-দেবী জৈনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইবার ফলে হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্ম এখনও ভারতের নানা অংশে টিকিয়া থাকিবার ইহাই হইল প্রধান কারণ। বর্তমান ভারতে জৈনদের সংখ্যা বৌদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষা সহস্রগুণে বেশি।

জৈনধর্মের প্রসারের কারণ

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্যের পথে মগধ
(Rise of Magadhan Imperialism)

ষোড়শ মহাজনপদের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ যে হইত না এমন নহে। কাশী-কোশলের দ্বন্দ্ব এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একমাত্র মগধ রাজ্য-ই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। এই কথা প্রাচীন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সমভাবে সমর্থিত। পুরাণে মগধরাজ্য এবং মগধের রাজবংশগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণ অপেক্ষা সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে প্রদত্ত মগধরাজগণের তালিকা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই মনে করেন।

মগধরাজ্যের সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস

বিম্বিসার (Bimbisara) : পুরাণে মগধরাজ বিম্বিসারকে শৈশুনাগ বংশের পঞ্চম নৃপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণের মতে মগধে বার্হদ্রথ বংশের পর প্রদ্যোৎ বংশ এবং উহার পর শৈশুনাগ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রদ্যোৎ বংশ মগধের রাজবংশ নহে, এই বংশ অবন্তীরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহারা বলেন যে, বিম্বিসার বার্হদ্রথ বংশের শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয়ের পরই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শৈশুনাগ বংশ বিম্বিসারের পূর্বে রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিম্বিসার শৈশুনাগ বংশের পঞ্চম নৃপতি একথা গ্রহণযোগ্য নহে। শিশুনাগ বিম্বিসারের পরবর্তী রাজা ছিলেন। 'বুদ্ধ-চরিত' রচয়িতা অশ্বঘোষ বিম্বিসারকে হর্যঙ্ক-কুলসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর রায়চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পুরাণ অপেক্ষা বৌদ্ধগ্রন্থের তথ্যাদি অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন। হর্যঙ্ক-কুলের উত্থান সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না।

বংশ পরিচয়

হর্যঙ্ক-কুলসম্ভূত

সিংহলে বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, বিম্বিসার মাত্র পনর বৎসর বয়সে নিজ পিতা কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন। বিম্বিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টিয় বা মহাপদ্ম।* বিম্বিসারের পিতা অঙ্গরাজ্যের অধিপতি ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। বিম্বিসার তাঁহার পিতার পরাজয়ের গ্লানি দূর করিবার জন্য মগধের সেনাবাহিনীর সংগঠনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেন।

পিতৃ-পরিচয়

* "Turnover, N. L. Dey and others mention Bhatiya or Bhattiya as the name of the father. Tibetans on the other hand call him Mahapadma." Vide, *Political History of Ancient India*, p. 117 *footnote* (5).

পূর্বে বিভিন্ন উপদল হইতে সৈনিক নিয়োগ করা হইত। স্বভাবতই রাজক্ষমতার উপর সেই সকল উপদলের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেহাত কম ছিল না। নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার পক্ষে এই ধরনের সৈনিক নিয়োগে সীমাবদ্ধতা মোটেই সহায়ক ছিল না। এজন্য বিম্বিসার রাজার প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে সাধারণ লোক হইতে সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের পক্ষে এই ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন যুবরাজকে প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাজতন্ত্রের তথা রাজবংশের ক্ষমতা তিনি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।* তারপর তিনি অঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া অঙ্গরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ এবং বৈবাহিক সূত্রে কাশী রাজ্যের একাংশ লাভের পর হইতেই মগধরাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হয় এবং পরবর্তী কালে মৌর্যসম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর যুদ্ধ-নীতি ত্যাগ করিলে মগধের সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ঐ সময়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছয়টি নগরের অন্যতম ছিল। বিম্বিসার তাঁহার পুত্র কুণিক বা অজাতশত্রুকে নববিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত বরেন।

সেনাবাহিনী সংগঠনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন

অঙ্গরাজ্য জয়

বিম্বিসার একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন।† কাশীরাজ প্রসেনজিৎ-এর ভগিনী কোশলদেবী ছিলেন তাঁহার প্রথমা পত্নী। এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তিনি কাশী রাজ্যের বিরাট একটি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের মোট রাজস্ব ছিল বাৎসরিক এক লক্ষ মুদ্রা। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন লিচ্ছবি দলপতি চেতকের কন্যা চেল্লনা; তৃতীয় পত্নী ছিলেন বিদেহ রাজকন্যা বৈদেহী বাসবী এবং তাঁহার চতুর্থ পত্নী ছিলেন মধ্য-পাঞ্জাবের অন্তর্গত মদ্ররাজ্যের রাজকন্যা খেমা। বিম্বিসারের বৈবাহিক সম্বন্ধ যে তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মধ্য-পাঞ্জাব, কাশী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া মগধের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক ভিন্ন তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও মগধের সাম্রাজ্য বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি সুদূর গান্ধার রাজ্যের রাজা পুক্কুসাতির নিকট প্রীতি ও মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সহিতও তাঁহার মিত্রতা ছিল। একবার বিম্বিসার অসুস্থ হইলে তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রদ্যোৎ নিজ চিকিৎসক জীবক-কে মগধে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

গান্ধাররাজ পুক্কুসাতির নিকট দূত প্রেরণ : অবন্তীরাজের সহিত মিত্রতা

---

* 'Bimbisara introduced within Magadha a revolutionary instrument—a new type of army without tribal basis and loyal only to the king..." Michael Edward ; *A History of India*, p. 42.

† "According to *Mahavogga* Bimbisara had 500 Wives." *The Age of Imperial Unity*, p. 19.

বিম্বিসারের সাম্রাজ্য তিনশত যোজন ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যে অসংখ্য সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই সকল গ্রামের মধ্যে সেনানীগ্রাম, একনালা, খানুমাতা, নালকগ্রাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নালকগ্রামে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বিম্বিসারের সাম্রাজ্য

বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে বিম্বিসারের শাসনব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রামগুলি স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করিত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণকে 'গ্রামক' বলা হইত। গ্রামকগণ গ্রাম্য সভায় সমবেত হইয়া গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কেন্দ্রীয় শাসনকার্যাদি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা: (১) 'সর্বার্থক—অর্থাৎ কার্যনির্বাহক বিভাগ, (২) 'ভোহারিক'—অর্থাৎ বিচার বিভাগ, (৩) 'সেনানায়ক'—অর্থাৎ সামরিক বিভাগ। বিম্বিসার উপরি-উক্ত তিন বিভাগের উপরই ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখিতেন। তখনকার শাস্তি ছিল কারাদণ্ড, হস্তপদ ছেদন প্রভৃতি।

গ্রামের শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

বিম্বিসার জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বিম্বিসার ও মহাবীরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে বিম্বিসারকে জৈনধর্মালম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সাত বৎসর পূর্বে গিরিব্রজে বিম্বিসার ও গৌতমের সাক্ষাৎকার এবং পরে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বিসারের বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের কথা উল্লিখিত আছে। বিম্বিসার চিকিৎসক জীবক-কে বৌদ্ধ-সঙ্ঘ এবং বুদ্ধদেবের চিকিৎসার ভার দিয়াছিলেন।

বিম্বিসারের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রীতি

বিম্বিসারের মৃত্যু সম্পর্কেও জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী রহিয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের সম্পর্কিত ভ্রাতা দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশত্রু নিজ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে রাণী চেল্লনার পরিচর্যায় বিম্বিসারের অঙ্গুলির ক্ষত নিরাময় হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অজাতশত্রু পিতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে স্বয়ং অগ্রসর হইলে বিম্বিসার মনে করিলেন যে, অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। যাহা হউক, বিম্বিসারের মৃত্যুর ব্যাপারে অজাতশত্রু দায়ী ছিলেন এই কথা মনে করা অনুচিত হইবে না।

বিম্বিসারের মৃত্যু

অজাতশত্রু (Ajatsatru): অজাতশত্রু একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। সিংহাসন লাভের পর তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। প্রথমেই তাঁহাকে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতে হইল। বিম্বিসার প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে কোশলদেবী স্বামীর শোকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রসেনজিৎ নিজ ভগিনী ও ভগ্নীপতির এইরূপ মৃত্যুর জন্য অজাতশত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে অজাতশত্রু জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে সৈন্যসহ আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। অবশ্য এক শান্তিচুক্তির ফলে দুইপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল এবং অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যা ভজিরা-কে বিবাহ করিলেন।

কোশলরাজ ও প্রসেনজিতের দ্বন্দ্ব

কোশলরাজের সহিত মিত্রতা পুনঃস্থাপন

অতঃপর অজাতশত্রু পূর্ব-ভারতের শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই রাষ্ট্রসংঘ ৯টি মল্লক, ৯টি লিচ্ছবি এবং ১৮টি কাশী ও কোশলের গণরাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে অজাতশত্রুর যুদ্ধের কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গা নদীর তীরে একটি মূল্যবান পাথরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র ও মগধরাজ্যের মধ্যে এই খনি হইতে উৎপন্ন মূল্যবান পাথর সমভাবে বণ্টিত হইবে স্থির হয়। কিন্তু লিচ্ছবিগণ এই শর্ত ভঙ্গ করিলে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু জৈনগ্রন্থে অন্যরূপ কাহিনী রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বিম্বিসার 'সেথঙ্ক' নামে একটি হাতী এবং একটি অতি মূল্যবান মণি-হার তাঁহার পুত্রদ্বয় হল্ল ও বেহল্লকে দিয়াছিলেন। অজাতশত্রু ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতী, মণি-হার আত্মসাৎ করিতে চাহিলে হল্ল ও বেহল্ল লিচ্ছবিরাজ চেতকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চেতক ছিলেন হল্ল ও বেহল্লের মাতামহ। অজাতশত্রু চেতকের নিকট হল্ল ও বেহল্লের সমর্পণ দাবি করিয়া অকৃতকার্য হইলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু চেতক-কে পরাজিত করা সহজ হইল না। গণরাজ্যগুলি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এমতাবস্থায় অজাতশত্রু নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কূটকৌশলে গণরাজ্যগুলির একতা বিনষ্ট করিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি নিজ রাজধানী রাজগৃহের দুর্গগুলিকে দৃঢ়তর করিলেন এবং গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নগরীতে এক বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিলেন। গণরাজ্যগুলির একতা বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার মন্ত্রী বর্ষকা বা ভস্মকার-কে প্রেরণ করিলেন। ভস্মকার লিচ্ছবিদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়া গণরাজ্যগুলিকে দুর্বল করিয়া দিলেন। ইহার পর স্বভাবতই অজাতশত্রুর পক্ষে গণরাজ্যগুলিকে পদানত করা সম্ভব হইল। এই যুদ্ধ দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল বলিয়া জৈনগ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। অজাতশত্রু এই যুদ্ধে 'মহাশিলাকণ্টক' ও 'রথমুশল' নামক দুইটি নূতন মারণাস্ত্রের ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্ব-ভারতের গণরাজ্য সঙ্ঘের সহিত যুদ্ধ

যুদ্ধের কারণ

রাজগৃহের নিরাপত্তা বৃদ্ধি : পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠা

বর্ষকা বা ভস্মকারের কূট-কৌশল

মহাশিলাকণ্টক ও রথমুশলের ব্যবহার

অজাতশত্রু মগধের সাম্রাজ্য আরও দুই শত যোজন বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজগৃহ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সমর্থ হইলেন না। অজাতশত্রু বৈশালী ও কাশীরাজ্যের একাংশ দখল করিয়া এবং কোশলরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক বিশাল সম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

অজাতশত্রু কর্তৃক রাজ্যসীমা বিস্তার

জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রুকেও জৈন এবং বৌদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈনগ্রন্থাদিতে বলা হইয়াছে যে, অজাতশত্রু নিজে পরিবার-পরিজন সহ মহাবীরের সহিত প্রায়-ই সাক্ষাৎ করিতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অজাতশত্রু প্রথমে শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্তরে যে অনুশোচনা দেখা দেয় তাহা হইতে শান্তিলাভের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বুদ্ধের সহিত অজাতশত্রুর সাক্ষাৎকারের একটি খোদাই করা চিত্র ভারহুত নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার ধর্মজীবনের বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তিনি কুশীনারা বা কুশীনগরে দ্রুত উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের দেহাবশেষের অধিকাংশ উপযুক্তভাবে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাজগৃহের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক ধাতুনির্মিত চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি রাজগৃহের ১৮টি মহাবিহারের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর রাজগৃহে যে প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্গীতি আহুত হইয়াছিল উহাতে অজাতশত্রু গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোট পাঁচ শত প্রধান ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, ঔষধ, বস্ত্রাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রুর ধর্মমত

রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্গীতি

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদির মতে অজাতশত্রুর পর উদয়ভদ্র এবং তাঁহার পর অনুরুদ্ধ, মুণ্ড ও নাগদাসক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উদয়ভদ্র পুরাণে উল্লিখিত উদায়িন ভিন্ন অপর কেহ নহেন বলিয়া-ই মনে করা হয়। উদয়ভদ্রও অজাতশত্রুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থমতে অজাতশত্রু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক রাজাই পিতৃহন্তা ছিলেন। এই কারণে উদয়ভদ্র হইতে নাগদাসক পর্যন্ত রাজগণের মোট ৫৬ বৎসর রাজত্বের পর জনগণ পিতৃহন্তা রাজবংশের বিলোপ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া মন্ত্রী শিশুনাগকে রাজপদে নির্বাচিত করেন। এই বর্ণনা সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে পাওয়া যায়।

অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজগণ—উদয়ভদ্র, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড, নাগদাসক

শিশুনাগের সিংহাসন লাভ

শৈশুনাগবংশ (The Saisunagas) : শিশুনাগ মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহের সমৃদ্ধি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। অবন্তী, কাশী ও কোশল রাজ্যের আক্রমণ হইতে তিনি মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে অবন্তীর প্রদ্যোৎ বংশ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিল এবং অবন্তীরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বৎস ও কোশল রাজ্যও সম্ভবত তাঁহার আমলে মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে শিশুনাগ মগধকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন।*

সাম্রাজ্য বিস্তার

শিশুনাগের পর তাঁহার পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ রাজা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বাণের হর্ষচরিত, গ্রীক লেখক কুইণ্টাস কার্টিয়াস্ প্রভৃতির রচনায় কাকবর্ণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কার্টিয়াসের মতে কাকবর্ণের হত্যাকারী ছিল একজন ক্ষৌরকার। এই ক্ষৌরকার-ই নন্দবংশের স্থাপয়িতা। নন্দবংশের স্থাপয়িতা ক্ষৌরকার কালাশোক-কাকবর্ণের দশ পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কালাশোক-কাকবর্ণের রাণী এই ষড়যন্ত্রের সহায়তা করিয়াছিলেন।

কালাশোক-কাকবর্ণ
শিশুনাগ বংশের পতন
নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা

নন্দবংশ (The Nandas) : নন্দবংশের স্থাপয়িতা যে নীচকুলসম্ভূত ছিলেন সে-বিষয়ে পরিশিষ্ট পার্বণ, পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থ একমত। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে নন্দবংশের স্থাপয়িতার ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা : পুরাণে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে মহাপদ্ম নন্দ এবং মহাবোধি বংশে উগ্রসেন নামের উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকগণ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে মগধরাজের নাম Agrammes বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। উগ্রসেনের পুত্র ঔগ্রসেন্য হইতে হয়ত Agrammes করা হইয়াছে, আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। নন্দবংশের মোট নয় জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।†

নন্দবংশের স্থাপয়িতা
মহাপদ্ম নন্দ বা
উগ্রসেন

নবনন্দ

পুরাণে নন্দবংশের স্থাপয়িতা মহাপদ্ম নন্দকে 'দ্বিতীয় পরশুরাম' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ তিনি বহু ক্ষত্রিয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু, পাঞ্চাল, কাশী, কলিঙ্গ, অশ্মক, হৈহয়, কুরু, মিথিলা, শূরসেন, বীতিহোত্র প্রভৃতি

*"Probably both the kingdoms of Vatsa and Kosala were also annexed and thus Magadha absorbed almost all the important states in North India that flourished in the time of Gautama Buddha." *The Age of Imperial Unity*, p. 30.

† "They are named in Mahabodhivamsa as follows : (1) Ugrasena, (2) Panduka, (3) Pannugati, (4) Bhutapala, (5) Rashtrapala, (6) Govishanaka, (7) Dasasiddhaka, (8) Kaivarta and (9) Dhana." *The Age of Imperial Unity*, p. 31.

বিভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশকে পরাজিত করিয়া মহাপদ্ম নন্দ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগরে নন্দবংশকে অযোধ্যার রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা হইতে কোশলরাজ্যও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। খারবেল-এর হাতিগুম্ফা লিপিতে নন্দরাজের কলিঙ্গ-বিজয়ের কথা উল্লিখিত আছে। গোদাবরী নদীতীরে 'নবনন্দ ডেরা' নামক স্থানের উল্লেখ করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক নন্দরাজত্ব দাক্ষিণাত্যের কতক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মহীশূরে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি হইতে মহীশূরের কুন্তল নামক স্থান পর্যন্ত নন্দরাজত্ব বিস্তৃত ছিল, এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

নন্দবংশের সাম্রাজ্য

মহাপদ্ম নন্দ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য কেবল আয়তনেই বড় ছিল না, উহার সংহতি ও অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তাও যথেষ্ট ছিল। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু স্থাপিত সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপর নন্দরাজ মহাপদ্ম এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

সুদৃঢ় বিশাল সাম্রাজ্য

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাসে এক অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজগণ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অপরদিকে শূদ্র, রাজগণ, যথা, মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলিকে পরাজিত করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

ক্ষত্রিয় রাজগণের ধর্ম-প্রীতি : শূদ্ররাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য

মহাপদ্ম নন্দের পরবর্তী রাজগণ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ সম্পর্কে গ্রীক লেখক, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। শেষ নন্দরাজ ছিলেন অত্যধিক ধনলিপ্সু। এই কারণে তিনি ধননন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পাঞ্জাবের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস-এর বর্ণনায় ধননন্দের (ঔগ্রসেন্য : Agrammes) মোট ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২ হাজার রথ ও ৩ হাজার হাতী ছিল। অপরাপর গ্রীক লেখকগণ তাঁহার হাতীর সংখ্যা ৪ হইতে ৬ হাজার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ধননন্দ (Agrammes)

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও ধননন্দ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অর্থলিপ্সা স্বভাবতই প্রজাবর্গের উপর করের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধির প্রেরণা দান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন নীচবংশোদ্ভূত বলিয়াও তিনি ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এ-বিষয়ে আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গের নিকট মৌর্য বংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্তের উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণকে জানাইয়াছিলেন যে, আলেকজাণ্ডারের পক্ষে নন্দরাজকে পরাজিত করা খুবই সহজ হইবে। কারণ, নন্দরাজ ছিলেন শাসক হিসাবে

ধননন্দের প্রতি প্রজাবর্গের অশ্রদ্ধা

অপদার্থ এবং নীচবংশোদ্ভূত বলিয়া প্রজাবর্গের ঘৃণার পাত্র। পুরুরাজও ধননন্দ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ধননন্দ গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চাণক্য নামক এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ও চন্দ্রগুপ্তের হস্তে তাঁহার পতন ঘটিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক নন্দবংশের উচ্ছেদ

নন্দবংশের পতনের পরও মগধ সাম্রাজ্য টিকিয়াছিল। মৌর্যবংশের হস্তে মগধ সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিম্বিসারের আমল হইতে মৌর্যবংশের পতন পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া মগধ সাম্রাজ্যের টিকিয়া থাকিবার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। প্রথমত, মগধের ভৌগোলিক অবস্থান এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্র নগরী উত্তরে গোগ্‌রা ও গণ্ডক নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং শোন নদী উহার দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই সকল নদী উত্তর-ভারত এবং সমুদ্রের সহিত জলপথে যোগাযোগের পক্ষেও অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। পুরাতন রাজধানী রাজগৃহও সাতটি পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এইরূপ ভৌগোলিক অবস্থান স্বভাবতই রাজধানীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মগধ ছিল বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র। অপরাপর অংশের ন্যায় বৈদিক কৃষ্টির প্রভাব এখানে ততটা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মিলনক্ষেত্র মগধ স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারতা সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান ছিল। এই রাজনৈতিক উদারতা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের সহায়ক হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

মগধ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের কারণ

(১) ভৌগোলিক অবস্থান

(২) রাজনৈতিক উদারতা

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈদেশিক আক্রমণ
(Foreign Invasions)

পারসিক আক্রমণ (The Persian Invasion) : ইরানীয় আর্যগণ ও ভারতীয় আর্যগণ অতি প্রাচীনকালে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, তথাপি এই দুইয়ের পরস্পর সম্পর্ক বহুকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল। ইরানীয় অর্থাৎ পারস্যের আর্যগণ আফগানিস্তান সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না। ঐ সময়ে পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। সুতরাং দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইরানীয় ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ও ভাষার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ মহাজনপদের যুগে কম্বোজ ষোড়শ জনপদের অন্যতম ছিল। কম্বোজবাসীরা ইরানীয় আর্যদের ন্যায় কথা বলিত। ইহা ভিন্ন অক্ষু নদীর (The Oxus) অববাহিকা অঞ্চল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া বর্ণিত আছে, আবার প্রাচীন পারসিক সাহিত্যে ঐ অঞ্চলই পারস্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে সুদূর অতীতে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না।

প্রাচীন ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের পরস্পর সম্পর্ক

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র ছিল গান্ধার, কম্বোজ ও মদ্র। মগধ যখন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বিম্বিসার ও তাঁহার অনুবর্তী রাজগণের অধীনে ক্রমশ এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইতেছিল তখনও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (উত্তরাপথ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। পারসিক (গ্রীক একেমেনিয়ান : Achaemenian) সম্রাটদের পক্ষে এই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করা সহজ ছিল সন্দেহ নাই। পারসিক মহাকাব্য জেন্দাভেস্তায় নাকি উল্লেখ আছে যে, ষষ্ঠ শতকের (খ্রীঃ পূঃ) বহু পূর্বেই উত্তর-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পারসিক আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর-ভারতে পারসিক আধিপত্য-বিস্তারের কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত হইবে বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

পারসিক রাজগণের সাম্রাজ্যস্পৃহা

যাহা হউক, গ্রীক ঐতিহাসিক ও লেখক, যথা, হেরোডোটাস্, টেসিয়াস্, জেনোফোন্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, পারসিক সম্রাটগণ পশ্চিম-এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। কুরুস্ সাইরাস (Cyrus)* গান্ধাররাজ্য জয় করিয়া উহা পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। টেসিয়াসের মতে একজন ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক সাইরাস যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন : এবং এই ক্ষতের ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

সাইরাস কর্তৃক গান্ধার অধিকার (?)

---

* Cyrus : 558-530 B. C.

জেনোফোন্-এর রচনায় উল্লেখ আছে যে, একজন ভারতীয় রাজা সাইরাসের সভায় এক দূতের মারফত অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের নৌসেনা-নায়ক নিয়ারকাস্ (Nearchus)-এর রচনায় উল্লেখ আছে যে, সাইরাসের ভারত-আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস সাইরাস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রোমান লেখক প্লিনি সাইরাস কাপিস (গান্ধার) জয় করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য হইতে ইহাই মনে হয় যে, সিন্ধু ও কাবুলের মধ্যবর্তী স্থলে সাইরাস নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীকগণ সাধারণত সিন্ধু নদকে ভারতের সীমা বলিয়া মনে করিত এবং এই কারণেই হয়ত নিয়ারকাস্ প্রভৃতি সাইরাসের ভারত-আক্রমণের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রীক লেখকদের মধ্যে মতানৈক্য

যাহা হউক, সাইরাসের পৌত্র ড্যারিয়াসের (দরায়াস) সময়ে (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) পারসিক আক্রমণের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য উপাদান আমরা পাইয়া থাকি। ড্যারিয়াসের বেহিস্তান, পার্সেপোলিস ও নাক্‌শ্-ই-রুস্তম শিলালিপি হইতে উত্তর-পাঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এই কথা বলিতে পারা যায়। ইহা হইতে মনে হয় সাইরাস গান্ধাররাজ্য দখল করিয়াছিলেন এবং ড্যারিয়াস পারসিক সাম্রাজ্যের সীমা উত্তর-পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষ (অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ) পারসিক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশ হইতে দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর সমান মূল্যের স্বর্ণরেণু (Gold-dust) বাৎসরিক কর হিসাবে আদায় হইত। সমগ্র পারসিক সাম্রাজ্য হইতে পারসিক সম্রাট যে রাজস্ব পাইতেন উহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে আসিত। হেরোডোটাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ড্যারিয়াস স্কাইলাক্স নামে এক ব্যক্তিকে সিন্ধু নদের গতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ড্যারিয়াসের ভারতীয় সাম্রাজ্য

ভারতীয় প্রদেশ হইতে রাজস্ব : দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর সমমূল্যের স্বর্ণরেণু

ড্যারিয়াসের পুত্র জারেক্সিস্ (Xerxes)-এর* আমলেই পারসিক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জারেক্সিস্ গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানের কালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদিগের 'গান্ধার ও ভারতের সৈন্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে, পারসিক অধিকারভুক্ত গান্ধার প্রদেশ ছাড়াও ভারতের অপরাংশ হইতেও বহু সৈন্য জারেক্সিসের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সমরকুশলতার পরিচয় পাইয়া পরবর্তী কালেও পারসিক সম্রাট ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় ড্যারিয়াস আলেকজান্ডারকে বাধাদান করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্য

জারেক্সিসের অধীনে গ্রীসের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের অভিযান

* Xerxes : 468-465 B. C.

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ্যারিয়ানের বর্ণনায় ভারতীয় সৈন্য গোগমেলার যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট তৃতীয় ড্যারিয়াসের পক্ষে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আলেকজাণ্ডারের হস্তে ড্যারিয়াসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে (৩৩০ খ্রীঃ পূঃ) ভারতের উপর পারসিক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

তৃতীয় ড্যারিয়াসের পক্ষে গোগমেলার যুদ্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
(Alexander's Invasion of India)

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা (Political condition of the North-Western India on the eve of Alexander's Invasion) ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (উত্তরাপথ) এক রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সার্বভৌম শক্তির উত্থান সেই অঞ্চলে তখনও ঘটে নাই। ঝিলাম ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস ছিল।* এ-অঞ্চল তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের কতকগুলিতে রাজতান্ত্রিক আবার কতকগুলিতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় এই সকল রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির অধিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা ঃ (১) কাবুল নদীর উত্তরস্থ পর্বতসংকুল দেশের অশ্বায়ন জাতি (Aspasians),† (২) কাবুল ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলস্থ নিকিয়া বা নিকাইয়া (Nikia or Nicaea), (৩) গোরী বা পাঞ্জকোরা নদীর তীরবর্তী গোরীয়গণ (Garaeans), (৪) সোয়াট বা বুনার অঞ্চলের অশ্বকায়ন বা অশ্বক রাজ্য (Assakenos), (৫) বর্তমান পেশওয়ার জেলার পুষ্করাবতী (Peukelaotis), (৬) বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশিলা (Taxila), (৭) হাজরা জেলার উরশা (Arsakes), (৮) তক্ষশিলার উত্তরস্থ পর্বতসংকুল রাজ্য অভিসার (Abhisara), (৯) ঝিলাম ও চীনাব নদীর মধ্যবর্তী পোর অর্থাৎ পুরুর রাজ্য (Kingdom of Poros), (১০) প্রাচীন গান্ধার মহাজনপদের পূর্বাংশ—গান্ধার (Gandaris), (১১) কঠ (Kathaioi), (১২) ঝিলাম নদীর তীরস্থ সৌভূতির রাজ্য (Kingdom of

উত্তর-পশ্চিম ভারতে (উত্তরাপথ) রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র

* Vide : Smith's *Oxford History of India*, p. 91 (Revised 3rd Edn.)

† গ্রীক বিবরণে প্রাপ্ত নামগুলি বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজীতে দেওয়া হইয়াছে।

Sophytes) এবং ক্ষুদ্রক (Oxydrakai), মালব (Malloi), শূদ্র (Sodrai) প্রভৃতি আরও বহু রাজ্য ছিল।

রাজনৈতিক বিভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এই সকল রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের বিরাম ছিল না। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি, পুরু ও অভিসার রাজ্য প্রভৃতির সহিত সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। অম্ভি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির সহিতও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার সামর্থ্য বা মনোবৃত্তি তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। পৌরব রাজ্যের পুরু (Elder Poros) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং গান্ধার রাজ্যের পুরু (Junior Poros)-এর মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। ইহা ভিন্ন অপরাপর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যেও কোন একতা ছিল না।

পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান (Indian Campaigns of Alexander) : এ্যারিয়ান, কার্টিয়াস্, ডায়োডোরাস্, প্লুটার্ক, জাস্টিন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের রচনায় আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ৩৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পারস্য-সম্রাটকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমস্থ পূর্ব ইরানীয় অঞ্চল জয় করিলেন। ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে ব্যাক্ট্রিয়া, বোখারা ও শির্দরিয়া অঞ্চল ও নিকাইয়া জয় করিয়া তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নিকাইয়া নামক স্থান হইতে তক্ষশিলার রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভারত-অভিযানের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং বিনা যুদ্ধে ভারতীয় রাজগণের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সে-বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু এই দূত তক্ষশিলায় পৌঁছিবার পূর্বেই অম্ভি আলেকজাণ্ডারের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, তক্ষশিলা রাজ্য আক্রমণ করা হইবে না এই শর্তে তিনি আলেকজাণ্ডারকে সাহায্যদানে প্রস্তুত আছেন। ইহা ভিন্ন অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে ৬৫টি হাতী, বহু সংখ্যক ভেড়া ও ৩,০০০ ষাঁড় উপঢৌকন* হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে অম্ভি ভারত-ইতিহাসে সর্বপ্রথম কাপুরুষ দেশদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। পুরুরাজের প্রতি ঈর্ষাবশতই তিনি এইরূপ নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি নিজে পুরুকে দমন করিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং বিদেশী আক্রমণকারীকে

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের সূচনা

তক্ষশিলারাজ অম্ভির দেশদ্রোহিতা

* "This is the first recorded instance of an Indian king proving a traitor to his country ; what is worse, his treachery was instigated by a petty spirit of local hostility to his powerful neighbour Poros." *The Age of Imperial Unity*, p. 44.

সাহায্য দান করিয়া তিনি পুরুর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি নাশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেবল অম্ভির নিকট হইতেই নহে, আলেকজাণ্ডার কোফিউস (Cophaeus), সঞ্জয় (Sangaeus), অশ্ববজিৎ (Assagetes), শশীগুপ্ত (Sisikottos) প্রভৃতি রাজগণের নিকট হইতেও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতির পথে কোন বাধা না থাকায় তিনি তাঁহার ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অনায়াসে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

কোফিউস, সঞ্জয়, অশ্ববজিৎ, শশীগুপ্ত প্রভৃতির আনুগত্য

কিন্তু আলেকজাণ্ডার বাধা পাইলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ ও প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির জনসাধারণ হইতে। পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক (Astes) তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই বিদেশী আক্রমণকারীর পথরোধ করিলেন। দীর্ঘ ত্রিশদিন গ্রীকবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি যুদ্ধে প্রাণদান করিলেন।

বীরত্ব

অশ্বায়ন ও অশ্বকায়ন (Aspasio and Assakenio) জাতি আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। মশকাবতী (Massaga) ও অণ্ডক (Andaka) এই দুইটি সুরক্ষিত নগর জয় করিতে আলেকজাণ্ডারের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের পর একমাত্র অশ্বকায়ন প্রজাতন্ত্রের মোট ৭,০০০ সৈন্যকে আলেকজাণ্ডারের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড আলেকজাণ্ডারের চরিত্রকে কতকটা মসীলিপ্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

অশ্বায়ন, অশ্বকায়ন, মশকাবতী, অণ্ডক প্রভৃতির প্রতিরোধ

অতঃপর 'নিসা' (Nysa) নামক নগর-রাষ্ট্র, সিন্ধু ও পুষ্করাবতীর মধ্যবর্তী যাবতীয় শহর এবং 'বরণ' (Aornus) নামক পার্বত্য দুর্গ জয় করিয়া ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রথম প্রকৃত ভারতীয় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।* তক্ষশিলারাজ-প্রদত্ত পাঁচ হাজার সৈন্যসহ বিশাল গ্রীক সেনাবাহিনী সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলে তক্ষশিলায় আলেকজাণ্ডার এক দরবারের আয়োজন করিলেন এবং পার্শ্ববর্তী স্থানীয় দলপতিগণ সেই দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

নিসা, সিন্ধু ও পুষ্করাবতীর মধ্যবর্তী শহর ও বরণ দুর্গ জয়

আলেকজাণ্ডারের তক্ষশিলায় আগমন

কিন্তু ঝিলাম ও চীনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা পুরু ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি অপরাপর ভারতীয় রাজগণের দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মানবোধের অভাব দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অভিসারের রাজাও পুরুর পক্ষ অবলম্বনে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া তক্ষশিলায় আলেকজাণ্ডারের নিকট নিজ ভ্রাতাকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হীনচেতা,

পুরুরাজ মিত্রহীন

---

* "It was in spring of 326 B. C. that the Macedonian invader first set foot on Indian soil proper." Vide, *The Age of Imperial Unity*, p. 47.

ঝিলামের যুদ্ধক্ষেত্র
০ ৫ ১০
মাইল
ঝিলাম নদী
ভুনা
পিণ্ডি খেয়া
সিরওয়ালি
চর
যুদ্ধক্ষেত্র
পাকরাল
সুখচৈনপুর
দ্বিতীয় শিবির
পুরুর শিবির
আলেকজাণ্ডারের শিবির
ভারতবর্ষ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
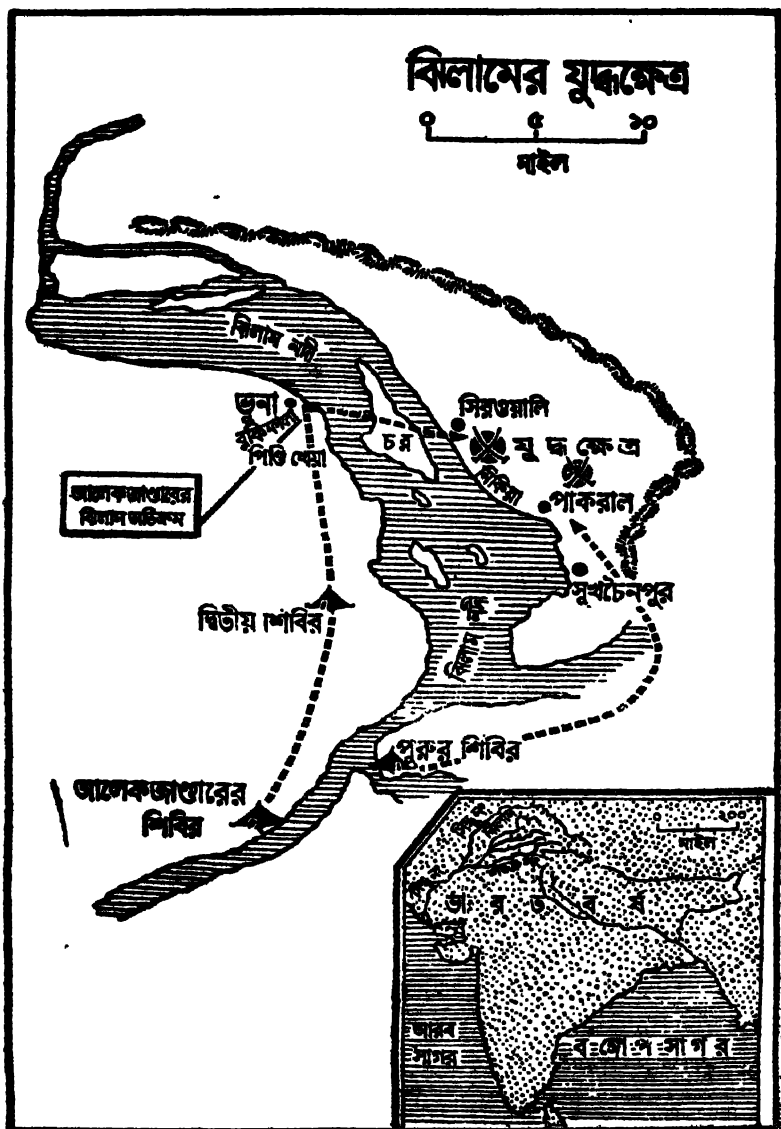
দেশদ্রোহী রাজগণের সাহায্য-সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া দেশপ্রেমিক বীর রাজা পুরু নিজ রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। অগ্রে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে দেশদ্রোহী রাজগণের রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় পুরুর এই সংকল্প, দেশাত্মবোধ ও প্রকৃত বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। পুরু নিজ সার্বভৌমত্ব এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না।

পুরু কর্তৃক আলেকজাণ্ডারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

আলেকজাণ্ডার তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে তক্ষশিলার দরবারে উপস্থিত হইতে জানাইলে পুরু সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া অসিহস্তে নিজ রাজ্যের সীমায় আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবেন বলিয়া জানাইলেন। বিনা যুদ্ধে পুরুরাজ্য দখল করা সম্ভব হইবে না দেখিয়া আলেকজাণ্ডার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুরু এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিলেন না।

পুরুকে মিত্র সংগ্রহের সময় ও সুযোগ না দিবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন (মে, ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ)। নদীর অপর তীরে পুরু তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিলেন। পুরুর নির্ভীক সৈন্যগণের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইতে সাহস না পাইয়া আলেকজাণ্ডার রাত্রির অন্ধকারে ঝিলাম নদী অতিক্রম করিতে মনস্থ করিলেন। প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার কূট-কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি নিজ শিবিরে আলো জ্বালাইয়া

ঝিলামের দুই তীরে দুই পক্ষের সৈন্য সমাবেশ

রাখিয়া গোপনে রাত্রির অন্ধকারে সসৈন্যে ঝিলাম নদীর গতিপথ ধরিয়া সতর মাইল অগ্রসর হইলেন এবং প্রত্যূষে একস্থানে গোপনে ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া পুরুকে আক্রমণ করিলেন। পুরু এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আলেকজাণ্ডারকে বাধাদানের জন্য তিনি নিজ পুত্রকে দুই হাজার সৈন্য ও ১২০টি রথসহ প্রেরণ করিলেন। পুরুর পুত্র আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। ইতিমধ্যে পুরু পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, চারি হাজার

আলেকজাণ্ডারের গোপনে ঝিলাম নদী অতিক্রম

অশ্বারোহী, তিনশত রথ এবং দুইশত হাতীসহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সামরিক শক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে পুরুর জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পূর্ব রাত্রির বৃষ্টিপাতে ঝিলাম নদীতীরের যুদ্ধক্ষেত্র পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ তাহাদের সুদীর্ঘ ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া তীর সংযোজন করিতে পারিল না। রথের চাকাগুলিও কাদায় আটকাইয়া

কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের অসুবিধা

গিয়া অচল হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে আলেকজাণ্ডারের অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুতবেগে পুরুর সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া পুরুর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। প্লুটার্কের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুরুর সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থায়ও সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা যুদ্ধ চালাইয়াছিল। পুরু পারস্যসম্রাট ড্যারিয়াস-এর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

পলায়ন করেন নাই, তিনি নিজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াও নিজে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। তাঁহার শরীরের নয়টি স্থান হইতে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে রক্তধারা বহিতেছে, এই অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইয়াছিল। পুরুকে আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে আলেকজাণ্ডার পুরুকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন জিজ্ঞাসা করিলে পুরু রাজোচিত সম্মান দাবী করিলেন।* আলেকজাণ্ডার ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং তদুপরি পূর্বদিকে অবস্থিত আরও পনরটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য পুরুকে দান করিলেন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার গ্লাচুকান্যক (Glauganikai) নামক প্রজাতান্ত্রিক দেশটি জয় করিয়া পুরুর রাজ্যের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ঝিলাম ও চীনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পুরু (২য়) (বীর যোদ্ধা পুরুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র) রাজ্য বিনা যুদ্ধেই দখল করিলে পুরু (২য়) নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া নন্দরাজের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই রাজ্যটিও আলেকজাণ্ডার পুরুকে দান করিলেন।

পুরু-আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার

আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পুরুরাজ্য প্রত্যর্পণ এবং অপরাপর বিজিত রাজ্য দান

অতঃপর আলেকজাণ্ডার রাভী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পার্শ্ববর্তী প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল কঠ (Kathaioi) প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি আলেকজাণ্ডারের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর আলেকজাণ্ডার সৌভূতি ও ভাগলা (Sophytes and Phegelas) নামক রাজগণের আনুগত্য লাভ করিলেন।

কঠ (Kathaioi) ও পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্রগুলির আনুগত্য লাভ

পর পর যুদ্ধ জয় করিয়া আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধজয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। তিনি সসৈন্যে বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ আর অধিক দূরে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। আলেকজাণ্ডারের অনুরোধ-উপরোধ কোন কিছুই তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে রাজী করাইতে পারিল না। বাধ্য হইয়াই আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা স্থির করিলেন। ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ঝিলাম নদী ধরিয়া জলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চীনাব ও ঝিলামের সঙ্গমস্থলে মালব (Malloi), ক্ষুদ্রক Oxydraki), অর্জুনায়ন (Agalassci) প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে

আলেকজাণ্ডারের বিপাশা নদীতীর পর্যন্ত অগ্রগতি

প্রত্যাবর্তন

* "He was conducted to Alexander who asked him how he should like to be treated. He (Poros) made the famous reply which has become classic : 'Act as a king.' When Alexander asked him to be more precise, he replied ; when I said 'as a king', everything was contained in that." Vide, *The Age of Imperial Unity*. p. 49.

আলেকজাণ্ডারকে আক্রমণ করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। শিবি (Sibae) প্রজাতন্ত্র অবশ্য যুদ্ধ না করিয়াই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

মালব, অর্জুনায়ন প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রের প্রতিরোধ

৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু নদ অঞ্চলের শূদ্র (Sogdre), মূষিক (Musicanus), পার্থ (Oxycanus or Porticanus) প্রভৃতি উপজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে অবশ্য সকলেই পরাজিত হইল। ইহার পর পটল নামক রাজ্যটির বশ্যতা গ্রহণ করিয়া আলেকজাণ্ডার ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গেড্রোসিয়ার (বেলুচিস্তান) মধ্য দিয়া ব্যাবিলনের পথে রওয়ানা হইলেন। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মূষিক, পার্থ প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রের প্রতিরোধ : পটল রাজ্যের বশ্যতা : আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগ

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের বর্ণনায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল এই যে, একমাত্র পুরু ভিন্ন অপর কোন শক্তিশালী রাজা তাঁহার বিরোধিতা করেন নাই। পুরু ভিন্ন অপর যাঁহারা আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যের জনসমাজ। মল্ল বা মালব, ক্ষুদ্রক, কঠ, অর্জুনায়ন, মূষিক, পার্থ প্রভৃতি জনসমাজের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শক্তিশালী রাজগণের স্বাধীন চেতনার অভাব : পুরুরাজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের দেশাত্মবোধ

উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের নৃপতিগণ যখন নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া, সামরিক সাহায্য দান করিয়া আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন জীবন-মরণ পণ করিয়া স্বাধীনচেতা রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে হইবে একথা তিনিও হয়ত জানিতেন, কিন্তু জয়-পরাজয় অপেক্ষাও বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিহত করিবার এক অত্যুচ্চ মনোবৃত্তি পুরুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তক্ষশিলার রাজা অম্ভির নীচ দেশদ্রোহিতার পার্শ্বে পুরুর দেশাত্মবোধ তাঁহাকে বহুগুণে সম্মানার্হ করিয়াছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহপ্রার্থী দেশদ্রোহী নৃপতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও পুরুর নির্ভীকতা তাঁহাকে এক অতুচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়াছে। দেশপ্রেমিক নৃপতি হিসাবে পুরু ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

পুরুর দেশপ্রেম

পুরুর কীর্তি

পুরু ভিন্ন উত্তরাপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের জনগণও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও ভারত-ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার

বলখ
ব্যাক্ট্রিয়া
কাবুল
কাশ্মীর
গজনী
কান্দাহার
আরাকোশিয়া
কোয়েটা
বোলান
গিরিপথ
কালাৎ
গেড্রোশিয়া
পাটল
আলেকজাণ্ডারের
ভারত অভিযান
অভিযান পথ
মাইল
আরব সাগর
আরব
মিশর
ভারতবর্ষ

সহিত স্মরণযোগ্য। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইবার কালে সামরিক শক্তি বা সামর্থ্য অপেক্ষা দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধই যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, একথা এই সকল ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের আলেকজাণ্ডারকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রগুলির কৃতিত্ব

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলাফল (Results of Alexander's Invasion): আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ অহেতুক উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। নিরপক্ষ বিচারে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ জয় সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ আলেকজাণ্ডারের ভারত-বিজয়ের মধ্যে এশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনায় ইওরোপীয় সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহারা একথা ভাবেন না যে, আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের কোন প্রথম পর্যায়ের নৃপতির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং পুরুর নিকট হইতে নন্দরাজের অকর্মণ্যতার সংবাদ পাওয়ার পরেও আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার অনিচ্ছার অন্যতম কারণ ছিল মগধের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাহাদের ভীতি। আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী মগধরাজের সামরিক শক্তির সংবাদ বিপাশা পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পূর্বেই পাইয়াছিল।*

আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে অহেতুক উচ্চ ধারণা

ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে উল্লেখ করিতে হয় যে, প্রথমত, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। আলেকজাণ্ডার বিজিত রাজ্যগুলিকে সাতটি† প্রদেশে (Satrapies) ভাগ করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে পাঁচটিকে প্রকৃত ভারতীয় বলা যাইতে পারে, এবং দুইটি ছিল ভারতের বাহিরে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে আলেকজাণ্ডার গ্রীক গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর অপর তিনটিতে ভারতীয় রাজগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা, উত্তর-পাঞ্জাবের অম্ভি, ঝিলাম অঞ্চলে পুরু, অভিসার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অভিসাররাজ। ইহা যে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নহে, সে-কথা আলেকজাণ্ডার নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় প্রদেশপালগণ স্বাধীন হইয়া যাইবেন। ইহা

ফলাফল

(১) রাজনৈতিক গুরুত্বহীনতা

it might have been overwhelmed by the mere number of his adversaries, and that mutiny only prevented the annihilation of the Macedonian army." *Early History of India*, p. 12.

† "He divided his conquests into seven satrapies." *The Age of Imperial Unity*, p. 52.

The Comprehensive History of India, puts the number at six, 'Greek India was governed by satrapies appointed by Alexander in charge of the six regions into which it was divided." p. 1.

অনুমান করিতে অধিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছান মাত্রই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এদেশে গ্রীক আধিপত্যের চিহ্ন লোপ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আলেকজাণ্ডারের অভিযান ভারতীয় সমাজ-জীবন, সাহিত্য বা রাজনীতিকে স্পর্শ করে নাই। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কোন প্রভাবই ছিল না। আচার-ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম বা সাহিত্য দূরের কথা, রক্ষণশীল, মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয় সমাজ আলেকজাণ্ডারের সামরিক পদ্ধতি পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। আলেকজাণ্ডারের অভিযানে উত্তরাপথের ভারতীয়দের উপর এক অবর্ণনীয় অত্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির জনসমাজের উপর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর নির্মম অত্যাচার, অর্জুনায়নদের শিশুগণসহ স্ত্রীলোকদের আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ,* মালবদেশের শহরগুলির স্ত্রীলোক ও শিশুদের নির্মম হত্যা† পরবর্তী কালের সুলতান মামুদ, তৈমুর ও নাদির শাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১) সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম বা সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাবহীনতা

(২) আলেকজাণ্ডারের নির্মম অত্যাচার

তৃতীয়ত, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের মাত্র তিনটি প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হয়, যথাঃ (১) উত্তরাপথে কয়েকটি যবন উপনিবেশ স্থাপনঃ আলেকজাণ্ডার যে-স্থানে ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন সেখানে বুকিফালা (Boukephala), পুরুর সহিত যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল সেখানে নিকিয়া বা নিকাইয়া (Nikaia), সিন্ধু ও চীনাব নদীর সঙ্গমস্থলে আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) এবং পাঞ্জাবের নদীগুলির সঙ্গমস্থলে সোগ্‌ডিয়ান আলেকজান্দ্রিয়া (Sogdian Alexandria) এই কয়টি ঔপনিবেশিক শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এই সকল উপনিবেশকে আলেকজাণ্ডার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রস্বরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি গ্রীকগণকে এই সকল উপনিবেশে বসবাসের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত উপনিবেশগুলিতে স্বভাবতই গ্রীকগণ বসবাস করিতে ইচ্ছুক ছিল না। ফলে, এগুলি অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(১) যবন উপনিবেশঃ বুকিফালা, নিকাইয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, সোগ্‌ডিয়ান আলেকজান্দ্রিয়া

(২) জলপথ ও স্থলপথের আবিষ্কার

---

* "In one of their towns the citizens numbering about 20,000, after a brave resistance, cast themselves with their wives and children into the flames, anticipating the Rajput *jauhar* of later days." *The Age of Imperial Unity* p. 51.

† "In trying to scale the wall of another stronghold, Alexander was severely wounded. When it fell, his infuriated soldiers massacared all the inhabitants, sparing neither women nor children." *Ibid.* p. 50.

(২) আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে তিনটি স্থলপথ ও একটি জলপথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সকল পথ ধরিয়া পরবর্তী কালে যোগাযোগের সুযোগ হইয়াছিল। (৩) আলেকজাণ্ডারের অনুচরবৃন্দের বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক ও অপরাপর জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

(৩) ভারতবর্ষ সম্পর্কে পাশ্চাত্যে ভৌগোলিক ও অন্যান্য জ্ঞান বৃদ্ধি

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পরোক্ষ ফল প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। (১) আলেকজাণ্ডারের অভিযানে ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একতার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পরিপন্থী, এই ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন পুরু, অম্ভি, অভিসার প্রভৃতি রাজগণকে আলেকজাণ্ডার তাঁহার বিজিত রাজ্যের অপরাপরগুলিও দান করায় উত্তরাপথের রাজনৈতিক ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার ফলে অল্পকালের মধ্যেই মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২) আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যে যোগাযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সূত্র ধরিয়াই পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গান্ধার শিল্প এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন গ্রীক ও ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যেও পরস্পর প্রভাব বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) আলেকজাণ্ডারের অভিযান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষ্টির আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। Gnostic বা তপশ্চর্যায় বিশ্বাসী খ্রীষ্টধর্ম পদ্ধতির উপর বৌদ্ধধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (৪) আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে স্থাপিত যোগাযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পকলা, বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর গ্রীক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞানও ঐ সূত্রেই পাশ্চাত্য দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে আলেকজাণ্ডারের অভিযান গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও উহার পরোক্ষ ফল নেহাত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।*

পরোক্ষ ফল :
(১) রাজনৈতিক ঐক্য

(২) শিল্পের উপর গ্রীক প্রভাব

(৩) খ্রীষ্টধর্মের উপর বৌদ্ধ প্রভাব

(৪) শিল্পকলা ও বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর গ্রীক প্রভাব

---

* "Although the direct effects of Alexander's expedition on India appear to have been small, his proceedings had an appreciable influence on the history of the country." V. A. Smith, *Oxford History of India* P. 66.

সপ্তম অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

(Rise & fall of the Maurya Empire)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, ৩২৪-৩০০ খ্রীঃ পূঃ (Chandragupta Maurya) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। আলেকজাণ্ডার যখন উত্তরাপথে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতেছিলেন তখন মগধের সিংহাসনে ধননন্দ (গ্রীক Agrammes) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধননন্দের প্রতি প্রজাবর্গের ঘৃণা ও আনুগত্যহীনতার কথা চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করা-ই ছিল চন্দ্রগুপ্তের উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তিনি গ্রীক সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু চাণক্য নামে তক্ষশিলার এক তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

মগধ রাজ্য ও চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিনের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্তকে নীচবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু পুরাণে কৌটিল্য (চাণক্য) নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্তের বংশের নীচতা বা আভিজাত্য সম্পর্কে পুরাণে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের ভাষ্যকার চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশসম্ভূত এই তথ্য সংযোগ করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা নন্দরাজের স্ত্রী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তীতে মুরা শূদ্রাণী ছিলেন এবং তিনি নন্দরাজের উপপত্নী ছিলেন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয় যোগ করা হইয়াছে।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় : মতানৈক্য

হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তী

মধ্যযুগের কতকগুলি শিলালিপিতে মৌর্যরাজগণকে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈন পরিশিষ্টপার্বণে চন্দ্রগুপ্তকে ময়ূর-পোষকদের এক প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দলপতির সন্তান বলা হইয়াছে। মহাবংশ, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বংশের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মহাপরিনির্বাণ সূত্র নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে মৌর্যদিগকে পিপ্পলিবনের ক্ষত্রিয় শাসকগোষ্ঠী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যযুগীয় শিলালিপি

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য

পরবর্তী কালের বিশাখদত্ত-প্রণীত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বৃশল ও কুলহীন বলা হইয়াছে। 'বৃশল' কথার অর্থ কেহ কেহ 'শূদ্র' মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু এই কথাটির অপর অর্থ হইল 'রাজগণের মধ্যে প্রধান'। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসাবে 'বৃশল' উপাধিলাভের যোগ্য ছিলেন, বলা বাহুল্য। 'কুলহীন' বলিতে আভিজাত্যহীনতা বুঝাইলেও জন্মের কোন অগৌরব বুঝায় না।

মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রদত্ত বর্ণনা

উপরি-উক্ত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধ গ্রন্থাদির বর্ণনা-ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তথা মৌর্যবংশকে ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

আধুনিক স্বীকৃত মত —ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত

বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহিত দ্বন্দ্বে প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। প্রথমে এক রাখাল চন্দ্রগুপ্তকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিকটবর্তী এক গ্রামে লইয়া যায়।† বালক চন্দ্রগুপ্তের রাজসদৃশ চিহ্নাদি দেখিয়া চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তাঁহাকে রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার শিক্ষা দান করিয়া ভবিষ্যতে রাজশক্তি লাভের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। কৌটিল্য (চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত) বিদেশী অধিকার হইতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং উদ্ধত, অকর্মণ্য নন্দবংশের শাসন হইতে প্রজাবর্গের নিষ্কৃতির জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। নন্দরাজের বিরুদ্ধে কৌটিল্যের ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল, কারণ নন্দরাজ কোন এক সময়ে চাণক্যকে প্রকাশ্য সভায় অপমান করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবন

চাণক্য কর্তৃক শিক্ষাদান

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গ্রীক সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া উপযুক্ত সুযোগে তিনি গ্রীকদের বিতাড়নের আশা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু রণমদে মত্ত দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে চন্দ্রগুপ্তের নির্ভীক আচরণ স্বভাবতই ঔদ্ধত্য বলিয়া

পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎকার

*Vide: *Political History of Ancient India*, Raychaudhuri pp, 266-67; *The Age of Imperial Unity*, pp. 54-56; *An Advanced History of India*, pp. 97-98.

† There are minor discrepancies in the details given in different works: e. g. Kautilya discoverd "Chandragupta in a village as the adopted son of a cowherd, from whom seeing in him the sure promise of his future greatness, he bought the boy paying on the spot 1000 *Karshapanas.*" *A Comprehensive History of India*, p. 2.

"The boy was brought up first by a cowherd, and then by a hunter." *The Age of Imperial Unity*, p. 56.

বিবেচিত হইল। আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত দ্রুত পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিলেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। ক্ষুদ্রক, মালব, অশ্মক প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করিবার সাহস দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত তাহাদিগকে একই শৃঙ্খলাধীনে সংগঠিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী প্রধানত এই সকল প্রজাতান্ত্রিক বীর যোদ্ধাদের লইয়াই গঠিত ছিল।* পাঞ্জাব ও তাহার পার্শ্ববর্তী প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি হইতেই চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত এক সেনাবাহিনী গঠন করিতে সমর্থ হইলেন।† চন্দ্রগুপ্ত হিমালয় অঞ্চলের জনৈক রাজা পর্বত-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ নিজ সেনাবাহিনী গঠনে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী শক, যবন, কিরাত, বাহ্লিক, কম্বোজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে চোর, ডাকাত, আটবিক, কিরাত প্রভৃতি জাতীয় লোক এবং শস্ত্রোপজীবী অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সৈনিক নিয়োগ করিবার নির্দেশ আছে।‡ ইহা হইতে একথা মনে করা যাইতে পারে যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সেনাবাহিনীতে চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদেরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন অথবা গ্রীক আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিনের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আলেকজাণ্ডারের শিবির হইতে পলায়ন করিবার অল্পকালের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপর গ্রীক আধিপত্য নাশে অগ্রসর হন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশের পতন প্রথমে সংঘটিত করিয়া পরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক প্রাধান্য নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন।††† ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ

নন্দবংশের উচ্ছেদ

* Thus the main strength of Chandragupta's army was derived from these heroic republican military clan." *A Comprehensive History of India*, p. 3.

† "Justin describes these recruits by a term which may mean 'robbers' or 'mercenaries'; he evidently means the republican Peoples of the punjab." Vide, *The Age of Imperial Unity*, p. 57.

‡ Vide, *The Age of Imperial Unity*, p. 57.
A Comprehensive History of India, p. 3.

††† "Sometime after his accession of sovereignty Chandragupta went to war with the prefects or generals of Alexander and crushed their power." Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, p. 269. "It appears probable that before he undertook the expulsion of the foreign garrisons, he had already overthrown......the Nanda king of Magadha," Smith, *Early History of India*, p. 124.

মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমেই পাঞ্জাবের গ্রীক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পরে মগধরাজ ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিতে অগ্রসর হন।* কিন্তু এখানে উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না যে, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি একাধিক স্থানে পরস্পর-বিরোধী। যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে নন্দরাজকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং পরে গ্রীক শাসকদের উৎখাত করেন এই মতই গ্রহণযোগ্য।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত

নন্দরাজের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষের কাহিনী মুদ্রারাক্ষস, মিলিন্দ-পঞ্হো, পুরাণ, মহাবংশ টীকা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়; নন্দরাজের সেনাপতি ভদ্রশাল চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। নন্দবংশ ধ্বংসের ব্যাপারে কৌটিল্য যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নন্দবংশের উচ্ছেদ

আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পর হইতেই গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হইয়াছিল। কান্দাহার জনৈক ভারতীয় নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। অশ্মক নামক স্থানের অধিবাসিবৃন্দ তাহাদের গ্রীক গবর্ণর নিকানোর (Nicanor)-কে এবং সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা গ্রীক গবর্ণর ফিলিপ্পোস (Philippos)-কে হত্যা করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিল। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘটিলে এবং সেই সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অবশিষ্ট গ্রীক গবর্ণরদের পরাজিত ও নিহত করিয়া বিদেশী অধিকার হইতে ভারতীয়দের মুক্ত করেন। এই যুদ্ধ কয়েক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল এবং ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউডিমস (Eudemos) নামক গ্রীক সেনাপতির সসৈন্যে ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল।†

গ্রীক শাসকদের উচ্ছেদ : বিদেশীয় শাসনের অবসান

সেলিউকসের আক্রমণ (Invasion of Seleukos) : আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিজিত সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। সেলিউকস সীরিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের

*"Chandragupta's fight against the Macedonians, however, must have began considerably earlier......Chandragupta's next task was to rid the country of the internal tyranny of king Nanda." *The Age of Imperial Unity*, Chapter IV; (article by Dr. R. K. Mukherjee), pp. 58-59.

† "India after the death of Alexander had shaken off the yoke of servitude and put his governors to death. The author of this liberation was Sandrokottos." Justin vide: *Political Hist. of Anct. India*, pp. 264-65. *The Age of Imperial Unity*, p. 58.

কোন চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না। সেলিউকস স্বভাবতই পুনরায় ভারতবর্ষে গ্রীক আধিপত্য স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। আলেকজাণ্ডারের সহচর হিসাবে সেলিউকস ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যের বিষয় অবগত ছিলেন। ইতিমধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ভারত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সংবাদ তাঁহার নিকট সম্ভবত পৌঁছায় নাই। যাহা হউক, আনুমানিক ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেলিউকস ব্যাবিলন ও ব্যাকট্রিয়া জয় করিয়া সিন্ধু অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক অতি সুকঠিন শক্তির বিরুদ্ধে যুঝিতে হইল। এই শক্তির স্রষ্টা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যুদ্ধের কোন বিশদ বিবরণ গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ-বিষয়ে গ্রীক লেখকদের নীরবতা সেলিউকসের শোচনীয় পরাজয়েরই ইঙ্গিত করে। যাহা হউক, গ্রীক বীর সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফলের বিবরণ গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায় পাওয়া যায়। সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মকরাণ—এই চারিটি প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাঁচশত হস্তী সেলিউকসকে দান করিয়া তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, সেলিউকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে এক বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মনে করা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ-বিষয়ে কোথাও কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। এই যুদ্ধের পর হইতেই ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশগুলির মধ্যে এক মিত্রতা স্থাপিত হয়। সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামে একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস কিছুকাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থান করিয়া তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবরণের অধিকাংশই উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।

সেলিউকসের প্রস্তুতি ও ভারত-অভিযান

যুদ্ধের ফলাফল

সেলিউকস-চন্দ্রগুপ্তের মৈত্রী

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (Extent of Chandragupta's Empire): চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদিগকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিতে হইবে। (১) চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া নন্দরাজ ধননন্দের সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। (২) তিনি গ্রীক শাসকগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অঞ্চল দখল করিয়াছিলেন। (৩) সেলিউকসের নিকট হইতে তিনি কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব স্বভাবতই পারস্য দেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। (৪) তামিল কবি মামুলার-এর রচনায় মৌর্য সাম্রাজ্য তিনেভেলি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। 'ভম্ভ মোরিয়ার' অর্থাৎ মৌর্য ভুঁইফোঁড় (upstart) শব্দটির উল্লেখ হইতে মনে হয় যে,

(১) নন্দরাজ্য
(২) পাঞ্জাব
(৩) কাবুল, কান্দাহার হিরাট ও মকরাণ
(৪) তিনেভেলি জেলা

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বথাই বলা হইয়াছে। কারণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই আকস্মিকভাবে সাধারণ অবস্থা হইতে সম্রাট-পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহীশূরে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপিতে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তর-মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

(৫) সৌরাষ্ট্র

(৫) মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন-এর জুনাগড় লিপি হইতে জানা যায় যে, সৌরাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের একটি প্রদেশ ছিল। পুষ্যগুপ্ত এই প্রদেশের প্রদেশপাল বা গবর্ণর ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ঐ সময়ে অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিন্দুসারের আমলে কোন নূতন রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী সম্রাট অশোকের আমলে একমাত্র কলিঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। সুতরাং অশোকের সাম্রাজ্য হইতে কেবলমাত্র কলিঙ্গ প্রদেশটি বাদ দিলে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল বুঝিতে পারা যাইবে।

(৬) সোপারা

(৬) অশোকের শিলালিপির একটি সংস্করণ সোপারা (বর্তমান থান জেলা) নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে মনে হয় সোপারা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। (৭) অশোকের রাজত্বকালে উত্তরাপথ, অবন্তী, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ ও প্রাচ্য—এই পাঁচটি প্রদেশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অশোক কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ ভিন্ন অপর চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল মনে করা ভুল হইবে না।

(৭) উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, অবন্তী, প্রাচ্য ও কলিঙ্গ

প্লুটার্ক ও জাস্টিনের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্লুটার্কের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত ৬০০,০০০ সৈন্যসহ সমগ্র ভারত জয় করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। জাস্টিনের রচনায় বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগুপ্ত 'ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন'। এইরূপ বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশই অর্থাৎ পারস্য হইতে সুদূর দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড চন্দ্রগুপ্তের অধিকৃত ছিল এই কথা অনুমান করা ভুল হইবে না।* সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহের উপরি-উক্ত তালিকার সহিত এই বর্ণনার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

প্লুটার্ক ও জাস্টিনের বর্ণনা

চন্দ্রগুপ্তের তথা মৌর্য শাসনব্যবস্থা (Chandragupta's i.e., Mourya Administration): মৌর্য শাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা ও উহার প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য তিন ভাগে ভাগ করা চলে: (১) মেগাস্থিনিসের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রীক ও রোমান লেখক যথা স্ট্র্যাবো, এ্যারিয়ান, জাস্টিন, ডায়োডোরাস, প্লিনি প্রভৃতির

'চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদির উৎস

* Vide: *A Comprehensive History of India*, p. 10.

রচনা। (২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং (৩) অশোকের শিলা ও স্তম্ভলিপি। অশোকের আমলে মৌর্য শাসনব্যবস্থায় কতক উন্নয়নমূলক পরিবর্তন করা হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল। সুতরাং অশোকের লিপি হইতেও চন্দ্রগুপ্তের শাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

শাসনব্যবস্থার দুই ভাগ—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

চন্দ্রগুপ্তের আমলে মৌর্য শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় তিনটি অংশ ছিল ; যথা, রাজা, অমাত্য ও সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ।

রাজা, রাজক্ষমতা ও কার্যাদি : বিচার-সংক্রান্ত সামরিক আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ও কার্য-নির্বাহক

রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক। রাজা ভগবান-প্রদত্ত শাসন ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মৌর্য রাজগণ নিজেদের 'দেবতাগণের প্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রাচীনকালে ব্যাবিলনের রাজগণও অনুরূপ উপাধি গ্রহণ করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা দেশের সর্বোচ্চ কার্য-নির্বাহক (executive), প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন-প্রণেতার কাজ করিতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতেও শাসন-ব্যাপারে মৌর্যরাজের ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। বিচারকার্য এবং অন্যান্য শাসন-সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনে চন্দ্রগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, এমন কি দিবা-নিদ্রা বা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য তিনি সময় নষ্ট করিতেন না।* যুদ্ধ, শিকার, পূজা-পার্বণে বলিদান ও বিচার এই চারিপ্রকার কার্যের কালে মৌর্যরাজ জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে মৌর্যরাজ সাধারণ স্ত্রীরক্ষীদের প্রহরাধীন থাকিতেন।† এ-বিষয়ে চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের নীতি পালন করিয়া চলিতেন। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, বিচারপ্রার্থীকে রাজা কখনও অপেক্ষমান রাখিবেন না। রাজা জনসাধারণ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া রাখিলে এবং কেবলমাত্র রাজকর্মচারী দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন করাইলে দেশের শাসনব্যবস্থায়

বিচার

আইন-প্রণয়ন

---

* "The king doss not sleep at day time but remains in the court whole day for purpose of judging causes and other public business which was not interrupted even when the hour arrived for massaging his body. Even when the king has his ha'r combed and dressed he has no respite from public business. At that time he gives audience to his ambassadors". Megasthenes, Vide: *The Age of Imperial Unity*. p. 63

† "The king usually remained within the palace under the protection of female guards and appeared in public only on four occasions, viz., in time of war, to sit in the court as judge: to offer sacrifice and to go on hunting expedition." Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, p. 276-77.

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।* আইন-প্রণয়নে তিনি 'পুরাণ-প্রকৃতি' অর্থাৎ পুরাতন রীতি-নীতি মানিয়া চলিতেন। তিনি রাজ-অনুশাসন (royal rescripts) প্রবর্তন করিয়া আইন-প্রণয়নের কার্য করিতেন। প্রধান সামরিক নেতা হিসাবে তিনি সেনাপতির যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিতেন। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকিতেন। শাসক হিসাবে তিনি হিসাব-পরীক্ষক, মন্ত্রী, পুরোহিত, পরিদর্শক এবং প্রহরী প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত বহু সংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল কর্মচারীর একমাত্র কাজ ছিল গোপনে সেনাবাহিনী ও রাজধানী সম্পর্কে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করা। বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে গুপ্তচর নিয়োগ করা হইত।

সামরিক

কার্য-নির্বাহক

গুপ্তচর

সচিব বা অমাত্যগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন মহামন্ত্রিগণ (High Ministers)। অশোকের শিলালিপিতে উল্লিখিত মহামাত্রগণই সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের আমলে 'মন্ত্রিন্' বা মহামন্ত্রী নামে অভিহিত হইতেন।

মহামন্ত্রিগণ

মহামন্ত্রিগণের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী ছিল। ইহারা জল সরবরাহ, রাস্তার দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন-স্থাপন, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি, অরণ্য, খনি, ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। নগর ও শহরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণকে 'নগরাধ্যক্ষ' এবং সেনাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণকে 'বলাধ্যক্ষ' নামে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সৎ কর্মচারীদের মধ্য হইতে বিচারক নিযুক্ত করা হইত।

ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজকর্মচারিগণ

মন্ত্রিপরিষদ নামে একটি মন্ত্রণাসভার পরামর্শ জরুরী পরিস্থিতি ও শাসন-সংক্রান্ত জটিল কার্যাদির ক্ষেত্রে রাজা গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রিপরিষদের মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু কৌটিল্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু মহামন্ত্রিগণ অপেক্ষা তাঁহারা নিম্নপর্যায়ের ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে মহামন্ত্রিগণও উপস্থিত থাকিতেন। ডায়োডোরাস, স্ট্র্যাবো, এ্যারিয়ান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের রচনা এবং মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মন্ত্রিসভার

মন্ত্রিপরিষদ—ক্ষমতা ও দায়িত্ব

* 'When in the court he (the king) shall never cause his petitioners to wait at the door, for when a king makes himself inaccessible to his people and entrusts his work to his immediate officers, he may be sure to engender confusion in business and to cause thereby disaffection and himself a prey to his enemies." Kautilya, Vide: *History of Ancient India*, p. 279

গুরুত্বের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সভা বা পরিষদ শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য দান করিত। গবর্ণর বা প্রদেশপাল, উপরাজ্যপাল, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, বিচারক, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে সামরিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পদাতিক বাহিনীতে ৬০০,০০০ সৈন্য ছিল। পদাতিক ভিন্ন অশ্বারোহী, রথারোহী, হস্তী-আরোহী সৈন্যও চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীতে ছিল। ইহা ভিন্ন নৌ-বাহিনীও মৌর্য সামরিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ত্রিশজন সভ্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর সামরিক বিভাগের পরিচালনার ভার ছিল। এই পরিষদ আবার পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। এক-একটি বোর্ড এক-একটি বিশেষ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। যথা (১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, (৩) যুদ্ধ-রথ, (৪) হস্তীবাহিনী, (৫) খাদ্যসরবরাহ ও পরিবহন, (৬) নৌ-বাহিনী। সৈনিকদের বেতন তাহাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সামরিক সংগঠন ঃ ছয়টি বোর্ড

রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সামরিক পরিষদের ন্যায় ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি নগর-পরিষদ ছিল। এই সকল সদস্যের প্রতি পাঁচজন লইয়া মোট ছয়টি বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। এই বোর্ডগুলির প্রতিটি এক-একটি বিশেষ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। প্রথম বোর্ড বা সমিতি ছিল শিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত। উৎপাদনকারিগণ সামগ্রী উৎপাদনে প্রথম পর্যায়ের কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে কিনা, উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য কি হওয়া উচিত এবং বিক্রয়ের উপযুক্ত বলিয়া সামগ্রীর উপর সরকারী ছাপ দেওয়া প্রভৃতি এই বোর্ডের কাজ ছিল। দ্বিতীয় বোর্ড বিদেশীয়দের অভ্যর্থনা, তত্ত্বাবধান, অসুস্থ হইলে তাঁহাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাহারো মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীকে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। তৃতীয় বোর্ডের কাজ ছিল পাটলিপুত্র নগরীতে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা। চতুর্থ বোর্ড বিক্রয়ার্থ সামগ্রীর ওজন, মাপ প্রভৃতি ঠিক আছে কিনা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সামগ্রীর দ্রব্যগুণ হ্রাস পাইবার পূর্বেই যাহাতে উহা বিক্রয় করা হয় সে-বিষয়ে নজর রাখিত। পঞ্চম বোর্ড শিল্পোৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের তদারক করিত। পুরাতন সামগ্রীর সহিত নূতন সামগ্রী কেহ যাহাতে মিশাইতে না পারে সে-বিষয়ে এই বোর্ড লক্ষ্য রাখিত। ষষ্ঠ বোর্ড ছিল বিক্রীত জিনিসের মূল্যের দশমাংশ কর হিসাবে আদায়ের ভারপ্রাপ্ত। করদানে কোনপ্রকার প্রতারণা-প্রবঞ্চনার

নগর পরিষদ ঃ ছয়টি বোর্ড

নগর পরিষদ বা পৌর-সভার বিভিন্ন সমিতি বা বোর্ডের বিভিন্ন দায়িত্ব

আশ্রয় লইলে বিচারে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরীর শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা কেবল পাটলিপুত্র নগরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, এমন নহে। তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, পুণ্ড্র নগর প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ছিল। এগুলিতেও পাটলিপুত্র নগরীর অনুরূপ পৌরসভা ছিল বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।

অপরাপর নগর

রাজস্ব প্রধানত 'বলি' ও 'ভাগ' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজার অংশ (ভাগ) হিসাবে দিতে হইত। 'বলি' উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইত। ইহা ভিন্ন বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের এক-দশমাংশ কর, জন্ম ও মৃত্যু কর, জরিমানা এবং বন, খনি প্রভৃতি হইতে সরকারী আয় হইত। মৌর্য শাসনব্যবস্থায়, বন, খনি, লবণ, উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল।

রাজস্ব : বলি, ভাগ, বিক্রয়ের দশমাংশ, জন্ম ও মৃত্যু কর, জরিমানা প্রভৃতি

অপরাধীর শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর। শিরশ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। অপরাধীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচার করা হইত।

শাস্তির কঠোরতা

চন্দ্রগুপ্তের আমলে উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, প্রাচ্য ও অবন্তী—এই চারিটি প্রদেশ ছিল বলিয়া মনে করা হয়। এই সকল প্রদেশ ভিন্ন এ্যারিয়ান্ ও কৌটিল্যের গ্রন্থাদিতে স্বায়ত্তশাসিত নগর ও গোষ্ঠী চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং মৌর্য শাসনব্যবস্থায় একক অধিনায়কত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা, একক অধিনায়কত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের সংমিশ্রণ

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন গবর্ণর বা প্রদেশপাল। প্রদেশপালগণ সাধারণত রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ হইতে নিয়োগ করা হইত। প্রদেশসমূহ কতকগুলি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদের শাসনভার 'প্রদেশাস্ত্রি' নামক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহায়তায় 'সমাহর্ত্রি' কর্তৃক পরিচালিত হইত। জনপদের এক-চতুর্থাংশের শাসনভার ছিল 'স্থানিক' নামক কর্মচারীর উপর। প্রতি পাঁচ হইতে দশটি গ্রামের শাসনভার 'গোপ' নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রতি গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত একজন 'গ্রামিক' নামক কর্মচারী গ্রামের শাসন পরিচালনা করিতেন। মৌর্যযুগে গ্রামের শাসন অত্যন্ত উন্নত ধরনের ছিল।

প্রদেশপাল, প্রদেশাস্ত্রি, সমাহর্ত্রি, স্থানিক, গোপ, গ্রামিক

জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈনধর্ম অবলম্বন করেন।

তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি নিজ পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মহীশূরে গমন করেন। আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে জৈন শাস্ত্রানুসরণে তিনি অনশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। [অশোক কর্তৃক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন 'অশোকের রাজ্যশাসন' শীর্ষে দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু

মেগাস্থিনিসের বিবরণ (Megasthenes' Account) : সেলিউকস কর্তৃক প্রেরিত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান কালে ভারতবর্ষ, মৌর্যশাসন, ভারতীয় জৈন-সমাজ প্রভৃতি নানাকিছু সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ডেইমেকস্ ও ডায়োনিসাস্ নামে অপর দুইজন গ্রীক দূত কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিসের সম্পূর্ণ বিবরণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন গ্রীক ঐতিহাসিক, যথা, ডায়োডোরাস, স্ট্র্যাবো, এ্যারিয়ান মেগাস্থিনিসের বিবরণের বিভিন্ন অংশ তাঁহাদের পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন পুস্তক হইতে মেগাস্থিনিসের বর্ণনার কতকাংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ডেইমেকস্ ও ডায়োনিসাস্ কর্তৃক সমর্থিত

ডায়োনিসাস্, স্ট্র্যাবো, এ্যারিয়ান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে মেগাস্থিনিসের বিবরণ সংগৃহীত

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা, উৎপন্ন শস্য ও সামগ্রী, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, পাটলিপুত্র নগর প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুকিছু তথ্য জানা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মেগাস্থিনিসের বিবরণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সন্দেহ নাই।

ভৌগোলিক অবস্থা, উৎপন্ন শস্য ও সামগ্রী, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ

শাসনব্যবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, রাজা বিচারকার্য, সমর-পরিচালনা, শিকার ও পূজা – এই চারিপ্রকার কার্যের জন্য প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন। রাজপ্রাসাদে স্ত্রী-রক্ষী থাকিত। অমাত্য ও সচিব (Councillors and Assessors) নামক রাজকর্মচারিগণের সহায়তা ও পরামর্শক্রমে রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

রাজকার্য সম্পর্কে বর্ণনা

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমর-পরিষদ ত্রিশজন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল, ইঁহাদের প্রতি পাঁচজন এক-একটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পাটলিপুত্র নগরের পরিচালনার ভার ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত এক পৌরসভার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রতি পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি বোর্ড গঠন করা হইয়াছিল। এক-একটি বোর্ডের এক-এক প্রকার কার্যের ভার ছিল।

সমর-পরিষদ ও পৌরসভা

পাটলিপুত্র নগর ও রাজপ্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায়। 'প্যালিমবোথ্রা' (Palimbothra) অর্থাৎ পাটলিপুত্র নগরকে

মেগাস্থিনিস ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৯১/২ মাইল (80 stadia) ও প্রস্থে ১১/২ মাইল (15 stadia) ছিল। পাটলিপুত্র নগরের চতুর্দিকে প্রশস্ত ও ৪ ফিট গভীর একটি পরিখা ছিল। ইহা ভিন্ন নগরটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে মোট ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি গম্বুজ ছিল। সমুদ্রের অথবা নদীর তীরবর্তী গৃহাদি কাষ্ঠনির্মিত ছিল। প্লাবন হইতে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে ইট ও সুরকি দ্বারা গৃহাদি নির্মাণ করা হইত।

পাটলিপুত্র নগর ও রাজপ্রাসাদের বর্ণনা

নগরের চতুর্দিকে পরিখা ও প্রাচীর

চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই প্রাসাদে বাস করিতেন। পারস্য সম্রাটদের রাজধানী সুসা বা ইক্‌বাটানা ও চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের সহিত তুলনার যোগ্য ছিল না। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সুসজ্জিত উদ্যান এবং উহাতে ময়ূর প্রভৃতি নানাপ্রকারের পোষা পাখী ছিল। উদ্যানের নানাস্থানে কৃত্রিম পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানাপ্রকারের মাছ পোষণ করা হইত। পাটনা জেলার বর্তমান কুম্‌রাহার গ্রামের নিকটে মৌর্যপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য

মেগাস্থিনিস কেবলমাত্র পাটলিপুত্র নগরীর বিশদ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৌশাম্বী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা, পুণ্ড্রনগর প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরগুলির নির্মাণ-কৌশল ও সৌষ্ঠব এবং পরিচালনার কাজ মোটামুটিভাবে পাটলিপুত্র নগরের অনুরূপ ছিল একথা মনে করা অনুচিত হইবে না।

মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল কর্মচারী নগর, গ্রামাঞ্চল ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপনে রাজার কর্ণগোচর করিত।

গুপ্তচর

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে জনসাধারণ এক সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত বলিয়া জানা যায়। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যহেতু জনসাধারণ বলিষ্ঠ ও সুস্থ দেহবিশিষ্ট ছিল। স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বসবাসের ফলে তাহারা কেবল সুস্থ ও সবল ছিল এমন নহে, নানাপ্রকার শিল্পকার্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া তাহারা সুস্থ মনেরও পরিচয় দিত। কৃষি, খনিজ সম্পদ সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষ তখন সমৃদ্ধ ছিল। নদীমাতৃক দেশ বলিয়া জমির উর্বরতা ছিল অত্যধিক। বৎসরে ভারতবাসী দুইবার ফসল তুলিত। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ কখনও ঘটে নাই, এই উক্তি করিয়াছেন। যুদ্ধবিগ্রহের কালেও কৃষিকার্য বা কৃষকের বৃত্তির কোনপ্রকার ব্যাঘাত করার রীতি ছিল না। অবশ্য দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে, কারণ ভারতবর্ষে প্রাচীনকালেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যে

জনসাধারণের জীবনযাত্রা

উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের শেষভাগেও এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।

মৌর্য আমলে জনসাধারণের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। স্বভাবতই তাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত। কিন্তু শহর এলাকায়ও যে বহুসংখ্যক লোক বাস করিত, তাহা অসংখ্য শহর-নগরের উল্লেখ হইতেই অনুমান করা যায়।*

গ্রামাঞ্চল ও শহর এলাকায় লোকবসতি

জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ। চুরি-ডাকাতি সাধারণত ঘটিত না। মিতব্যয়ী জীবন যাপন করিলেও জনসাধারণ অলংকার প্রভৃতির জন্য খরচ করিতে কুণ্ঠিত ছিল না। বণিক ও সওদাগরদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। ইহা হইতে তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত ছিল, বুঝিতে পারা যায়।

উন্নত অর্থনৈতিক জীবন

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সাতটি জাতিতে (Seven Castes) ভাগ করিয়াছেন। বস্তুত, তিনি ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বিভাগের প্রতি মনোযোগ না দিয়া বৃত্তি হিসাবে জনসাধারণকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পকার, সৈনিক, পরিদর্শক ও সভাসদ্।†

মেগাস্থিনিস কর্তৃক উল্লিখিত 'সপ্তজাতি' (Seven Castes)

ভারতবর্ষে তখন দাস-প্রথার প্রচলন ছিল না—মেগাস্থিনিসের এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নাই, কিন্তু ইহা হইতে অন্তত এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে দাসদের প্রতি যথেষ্ট উদার ব্যবহার করা হইত। এইরূপ উদারতা সমসাময়িক গ্রীসে দাসদের প্রতি প্রদর্শন করা হইত না বলিয়াই হয়ত মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দাস-প্রথার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

দাস-প্রথা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের উক্তি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (Kautilya's Arthasastra) : মৌর্য যুগের ঐতিহাসিক উপাদান গ্রীক ও রোমান লেখক, বিশেষত মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও অশোকের শিলালিপি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এগুলি ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (Science of Polity) হইতেও নানাবিধ তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

অর্থশাস্ত্র মৌর্য-ইতিহাসের অন্যতম উপাদান

অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থখানির অস্তিত্বের উল্লেখ প্রাচীনকালের রচনায় পাওয়া গেলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানির রচয়িতা ও রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। এই সম্পর্কে জার্মান পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া গ্রন্থখানি মৌর্য যুগের নির্ভরযোগ্য রচনা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত

* "The number of cities was so great that it cannot be stated with precision." Megasthenes Quoted, Vide : *The Age of Imperial Unity*, p. 63.

† Vide : *The Age of Imperial Unity*, p. 549.

হইয়াছেন। অধ্যাপক কীথ্ (Keith) অবশ্য কৌটিল্য এই গ্রন্থের রচয়িতা কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ্ অর্থশাস্ত্রকে প্রাক্-মৌর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক বর্ণনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে মৌর্য যুগ অপেক্ষাও প্রাচীনতম সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা যে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে পরবর্তী আকারে কালের ঘটনাও যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, মনে করা ভুল হইবে না।

অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্পর্কে মতানৈক্য : জার্মান পণ্ডিতগণের অভিমত

অর্থশাস্ত্রে প্রধানত রাজতান্ত্রিক শাসন-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য স্থানে স্থানে স্বায়ত্তশাসিত উপজাতি যথা, লিচ্ছবি প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থশাস্ত্রে মেকিয়াভেলির (Machiavelli) রাষ্ট্রনীতির সমর্থন রহিয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্রগুলি জয় করা যুক্তিযুক্ত, কারণ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রমাত্রই প্রচ্ছন্ন শত্রু। এইজন্যই শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করা দূষণীয় নহে। রাষ্ট্রের ব্যবহারে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ প্রয়োজনীয় বলিয়া অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ রহিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিতে কোনপ্রকার নৈতিকতার স্থান নাই, এই কথাই অর্থশাস্ত্রের মূল নীতি।

রাষ্ট্র ব্যবহার-নীতি

অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, শাসনব্যাপারে রাজা কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না এবং সকল বিষয়ে অবগত থাকিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিবেন। কিন্তু রাজা শাসনকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না বা বিচার-প্রার্থীদের অপেক্ষমান রাখিবেন না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুসারে রাজা অল্প অথবা অধিক সংখ্যক সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ (Privy Council) গঠন করিবেন। প্রত্যেকটি বিভাগের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য কৌটিল্য নানাপ্রকার অধ্যক্ষের নামকরণ করিয়াছেন। নগরের পরিচালনার দায়িত্ব 'নগরাধ্যক্ষ' এবং সৈন্যবিভাগের পরিচালনার ভার 'বলাধ্যক্ষ'-এর উপর ন্যস্ত থাকিবে, একথা বলা হইয়াছে। আর্থিক সচ্ছলতাই রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি। এইজন্য রাজকোষের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রাজস্ব, জলকর, স্বেচ্ছাকৃত দান, উপাধি-বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিক্রয়-কর প্রভৃতি সরকারী আয়ের পন্থা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরাধীর শাস্তির কঠোরতা, অপরাধীর নিকট হইতে অপরাধের স্বীকৃতি লাভের জন্য অত্যাচার প্রভৃতি অবলম্বনের নির্দেশও রহিয়াছে। রাষ্ট্রশাসনের জন্য নানা পর্যায়ের কর্মচারীর নাম, যথা, রাজুক, স্থানিক, সমাহর্ত্রি, সন্নিধাত্রি প্রভৃতি কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে স্ত্রী-রক্ষী নিয়োগের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রহিয়াছে।

রাষ্ট্র শাসন নীতি

মন্ত্রিপরিষদ

রাজকর্মচারিগণ

শাস্তির কঠোরতা
স্ত্রী রক্ষী

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসনব্যবস্থার বহু কিছুই মেগাস্থিনিসের বিবরণে সমর্থিত হইয়াছে। জনসাধারণের অবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়।

অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত শাসনব্যবস্থা মেগাস্থিনিস কর্তৃক কতকাংশে সমর্থিত

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব (Estimate of Chandragupta Maurya): প্রজাহিতৈষী, দেশপ্রেমিক রাজা হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয়। কেবল অত্যাচারী নন্দরাজবংশের অত্যাচার হইতে তিনি দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি আলেকজাণ্ডারের গ্রীক প্রদেশপালদের অধীনতা হইতেও পাঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের অন্যতম সেলিউকসের আক্রমণ হইতেও তিনি দেশরক্ষা করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার কর্তৃক একদা বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারকল্পে যুদ্ধ করিতে আসিয়া সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মকরাণ দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে আলেকজাণ্ডারের ভারত-বিজয়ের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে সেলিউকস পাইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের এই বীরত্ব গ্রীকদের নিকট তথা বহির্জগতে তাঁহার মর্যাদা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেলিউকস কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসের রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দেশরক্ষক ও প্রজাহিতৈষী শাসক

শুধু দেশরক্ষক হিসাবে-ই নহে, সংগঠক হিসাবেও চন্দ্রগুপ্ত নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা গ্রীকদূত করিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন, শাসনকার্যের প্রত্যেক বিষয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখা, আইন-প্রণয়ন প্রভৃতি বিবিধ কার্যে তিনি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলের সামরিক সংগঠন, নগর পরিচালনা প্রভৃতি আজও আমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়া থাকে। বিজেতা হিসাবে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ অবস্থা হইতে নিজ প্রতিভাবলে চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়া উহার পরিচালনার জন্য এক সুসংহত ও প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের স্থাপয়িতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

বিশাল সাম্রাজ্যের সংগঠক : মৌর্যবংশের স্থাপয়িতা

বিন্দুসার, ৩০০*—২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (Bindusara): চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত (Greek, Allitrochades)-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। হেমচন্দ্র ও তারনাথের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, চাণক্য কিছুকাল বিন্দুসারের মন্ত্রী ছিলেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে এক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। চাণক্যের সাহায্যে

বিন্দুসার কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

* 249 B. C. according to *A Comprehensive History of Inia*, p. 19.

বিন্দুসার এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিল। যুবরাজ অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

রাজা হিসাবে বিন্দুসার পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী না হইলেও তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য তাঁহার আমলে এতটুকুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। গ্রীকরাজগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য অটুট ছিল। মেগাস্থিনিসের পর সীরিয়ার রাজসভা হইতে ডেইমেকস্ (Deimachos)-কে বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণনায় মেগাস্থিনিসের বিবরণের বহুকিছুর সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। প্লিনির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মিশরের রাজা টোলেমি ফিলাডেল্ফাস্ (Ptolemy Philadelphus) ডায়োনিসাস্ (Dionysus) নামে এক রাষ্ট্রদূতকে মৌর্য রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডায়োনিসাস্ বিন্দুসার বা অশোকের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিক হেগেসেণ্ডার (Hegesender)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে, সীরিয়ার রাজা প্রথম এণ্টিয়োকাস্ (Antiocus I, Soter) ও বিন্দুসারের মধ্যে মিত্রতাপূর্ণ পত্রালাপ হইয়াছিল। বিন্দুসার এণ্টিয়োকাস্-এর নিকট মিষ্ট মদ, শুষ্ক ডুমুর ও একজন অধ্যাপক প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এণ্টিয়োকাস্ মদ ও ডুমুর প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রীক আইন অনুসারে কোন অধ্যাপককে দেশ হইতে বিদেশে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ, এই কারণে অধ্যাপক প্রেরণে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন।

গ্রীকরাজগণের সহিত সৌহার্দ্য বজায়

ডেইমেকসের বর্ণনা

মিশররাজ টোলেমি, ফিলাডেল্ফাস্ ও সীরিয়ার রাজা এণ্টিকোয়াসের সহিত আদান-প্রদান

বিন্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে অবন্তীর শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। দিব্যাবদান হইতে জানা যায় যে, বিন্দুসারের সুসীম ও বিগতাশোক নমে আরও দুইটি পুত্র ছিল।

বিন্দুসারের পুত্রাদি: অশোক, সুসীম ও বিগতাশোক

মহারাজ অশোক, ৭৩—২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (Emperor Asoka): বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোকের সিংহাসন লাভ ভারত তথা জগৎ-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ মৌর্য সম্রাট অশোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

সিংহাসন লাভ

বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে উল্লেখ আছে যে, বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক তীব্র উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই দ্বন্দ্বে অশোক তাঁহার ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। অশোকের সিংহাসনলাভ (২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ার (২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মধ্যে চারি বৎসরের ব্যবধান ভ্রাতৃবিরোধে

ভ্রাতৃবিরোধ (?)

অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত ভ্রাতৃবিরোধের বীভৎসতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত হইবে না।

অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁহারই আদেশে খোদিত লিপি হইতে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই সকল লিপিতে কোনপ্রকার ঘটনা প্রক্ষেপের সুযোগ ছিল না। সুতরাং অশোকের রাজত্ব সম্পর্কে সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। অশোকের শিলালিপি-গুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা, (১) পর্বতগাত্রে খোদিত শিলালিপি (Rock Edicts)—এগুলির চৌদ্দটি সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। (২) পর্বতগাত্রে খোদিত ক্ষুদ্র শিলালিপি (Minor Rock Edicts)—এগুলির দুইটি সংস্করণ আছে, একটি সংস্করণের লিপি দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। (৩) স্তম্ভলিপি (Piller Edicts)—এগুলি সাতটি স্তম্ভগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন গুহার দেওয়ালগাত্রে, সাধারণ স্তম্ভগাত্রে খোদিত আরও বহু লিপি পাওয়া গিয়াছে।

অশোকের লিপি ঃ শিলালিপি, ক্ষুদ্র শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও অপরাপর লিপি

অশোকের লিপি হইতেও তাঁহার জীবনী ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলিতে অশোকের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এ-সকল লিপিতে অশোক নিজেকে ‘দেবানাম্ পিয় পিয়দসী’ অর্থাৎ দেবতাগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেবলমাত্র একটি লিপি (MRE* Maski Version) ভিন্ন অন্যান্য সকল লিপিতে অশোক ‘দেবানাম্ পিয় পিয়দসী’ এই আখ্যা কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পৌত্র দশরথও ‘পিয়দসন’ (প্রিয়দর্শন) আখ্যা ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় মৌর্য রাজবংশ ‘দেবানাম্ পিয় পিয়দসী’ প্রভৃতি আখ্যা বা উপাধি ‘হিজ্ ম্যাজেস্টি’ (His Majesty) প্রভৃতির ন্যায় মর্যাদা-নির্দেশক উপাধি হিসাবেই ব্যবহার করিতেন।

অশোকের বাল্যকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব

দেবানাম্ পিয় পিয়দসী' আখ্যা গ্রহণ

বিন্দুসারের রাজত্বকালে যুবরাজ অশোক উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁহাকে তথাকার শাসনকর্তা হিসাবে প্রেরণ করা হয়। অশোক অনায়াসে সেই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার শাসক হিসাবে যুবরাজ অশোক

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায়

* RE=Rock Edict, MRE=Minor Rock Edict, PE=Pillar Edict.

আনুষ হইয়াছিলেন। যুবরাজসুলভ আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, যুদ্ধবিগ্রহাদি তিনি স্বভাবতই ভালবাসিতেন। সুতরাং সিংহাসনে আরোহণের পর মৌর্য সম্রাট-সুলভ সাম্রাজ্যজয়ের মনোবৃত্তি যে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে উল্লেখ আছে যে, অশোক স্বশ (Svasa) নামক দেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের শিলালিপিতে এই যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার শিলালিপিতে একমাত্র কলিঙ্গ যুদ্ধেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

সম্রাট-সুলভ মনোবৃত্তি

ত্রয়োদশ লিপিতে (RE XIII) কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলাফলের সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ইহাতে কিছুই উল্লেখ নাই। নন্দ-রাজত্বকালে কলিঙ্গের কতকাংশ মগধ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল বটে, কিন্তু প্লিনির বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কলিঙ্গ রাজ্য স্বাধীন ছিল। এই রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ছিল অত্যধিক। ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী, সাত শত হাতী লইয়া গঠিত কলিঙ্গ রাজ্যের সেনাবাহিনী মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। তদুপরি কলিঙ্গযুদ্ধে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অশোকের আমলে কলিঙ্গ রাজ্যের সেনাবাহিনী বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের গর্ব খর্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধ অশোকের অভিষেকের নয় বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং ইহা মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হইল। এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক অশোকের সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনুষঙ্গিক লুট-তরাজ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল।*

কলিঙ্গ যুদ্ধ : সম্ভাব্য কারণ

ফলাফল

কলিঙ্গ যুদ্ধের এই মর্মান্তিকতা ও বীভৎসতা অশোকের মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইল। অশোকের মধ্যে যে মহামানব সুপ্ত ছিলেন তিনি যেন জাগিয়া উঠিলেন। অশোক সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক ভগবান বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে অশোক উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোকের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা ত্রয়োদশ শিলালিপিতে (RE XIII) পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। দারুণ অনুশোচনায় তাঁহার মনপ্রাণ যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই শিলালিপি-

অশোকের অনুশোচনা

* ......even in such a small province as Kalinga, as many 100,000 were killed on the battlefield, many times as many died as the result of burning and sacking, and what is more, no less than 150,000 were seized as slaves." *Asoka : Bhandarkar*, p. 28.

পাঠে আজও অনুভব করা যায়। কলিঙ্গ যুদ্ধে মানুষের যে প্রাণহানি ও দুঃখকষ্ট ঘটিয়াছিল ভবিষ্যতে তাহার শতাংশও 'দেবানাম্ পিয়' অশোকের নিকট অতিশয় দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অশোকের মনের এই পরিবর্তন তাঁহার ধর্মমতের পরিবর্তনেই পরিলক্ষিত হইল না, মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতেও ইহার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইল।

অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

অশোক তাঁহার সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাহারা যেন মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ভয় না করে; কারণ অশোক হইতে তাহাদের আর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, এখন হইতে অশোক তাহাদের দুঃখের কারণ না হইয়া সুখের কারণ হইবেন। কলিঙ্গ বিজয়ের রক্তপাতের কথা স্মরণ করিয়া অশোক ঘোষণা করিলেন যে, ধর্মবিজয় অর্থাৎ সৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়া অপরের প্রীতি অর্জন করাই শ্রেষ্ঠ বিজয়। দিগ্বিজয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধর্মবিজয় জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। সামরিক বিজয়কেই তিনি প্রকৃত বিজয় বলিয়া আর মনে না করিয়া, ধর্মবিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলিয়া মনেপ্রাণে গ্রহণ করিলেন।* স্বভাবতই তিনি মৌর্য সম্রাটের চিরঅনুসৃত দিগ্বিজয়-নীতি পরিত্যাগ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র কেহ যাহাতে দিগ্বিজয়ের পথে আর অগ্রসর না হয় সেজন্য তিনি ঘোষণা করিলেন, 'অসু পুত্র প্রপৌত্র মে নবম্ বিজয়ম্ মা বিজেতব্যম্'—এখন হইতে আমার পুত্র, প্রপৌত্র কেহই নূতন কোন সামরিক বিজয়ে অগ্রসর হইবে না (RE VI)। তিনি যুদ্ধের 'ভেরী-ঘোষ'কে 'ধর্ম-ঘোষ' বা ধর্মের নিনাদে পরিণত করিলেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন: ধর্মবিজয়

ভেরী-ঘোষকে ধর্ম-ঘোষ-এ পরিণত

প্রথমেই নিজ দেশের প্রজাবর্গ ও বিদেশীয়দের নিকটে তিনি তাঁহার ধর্মনীতি প্রচারের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। অহিংসা, সংযম, সাম্য, বিনয় প্রভৃতি গুণ যাহাতে সকলের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, সকলেই যাহাতে এই সকল গুণ-প্রসূত মানসিক আনন্দ ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য তিনি ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার মৈত্রী-নীতি দ্বারা কেরল, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলির সৌহার্দ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে, সীরিয়ার রাজা এণ্টিয়োকাস্, মিশরের রাজা টোলেমি, কাইরিনির রাজা ম্যাগাস, মাসিডোনিয়ার রাজা এণ্টিগোনাস্ এবং ইপাইরাসের রাজা আলেকজাণ্ডারের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রের প্রতি অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী-নীতি গ্রহণ

* "And this conquest is considered to be the chiefest by the Beloved of the gods, which is conquest through Dhamma." (RE XIII)

রাজা হিসাবে অশোক নিজ কর্তব্য সম্পর্কে এক নূতন আদর্শ অনুসরণ করিলেন। রাজ-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহার এই আদর্শ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, "সকল মানুষই আমার সন্তান; আমি যাহা কিছু করিতেছি উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল তাহাদিগকে ইহজগৎ ও পরজগতে সুখী করা। এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া আমি জীবের প্রতি আমার ঋণ শোধ করিতে চাই।"* সুতরাং অশোক কেবল নিজ প্রজাদের প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, মানুষ মাত্রেরই উন্নতিবিধান ছিল তাঁহার আদর্শ। এই উন্নতি শুধু ইহজগতের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরলোকেরও উন্নতিসাধন তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন, রাজা হিসাবে তিনি নিজেকে জীবজগতের নিকট ঋণী বলিয়া মনে করিতেন। অপরাপর সমসাময়িক রাজগণ রাজপদকে নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও চরম ভোগের সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ রাজতন্ত্রের আদর্শের ইতিহাসে এক বিপ্লব আনিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

রাজ-কর্তব্য সম্পর্কে অশোকের ধারণা (Ideal of kingship)

অশোক নিজ কর্তব্য সম্পর্কে কেবলমাত্র উচ্চ আদর্শ পোষণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজের জীবনে তিনি সেই আদর্শকে কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। আদর্শ ও বাস্তব জীবনের কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে অশোক নানাবিধ পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন।

আদর্শ ও বাস্তব জীবনের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান

প্রজাবর্গের ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য তিনি শাসনব্যবস্থার কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রতি তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর 'রাজুক' বা রজ্জুক, 'যুত' প্রভৃতি রাজকর্মচারীদিগকে রাজ্য-পরিক্রমায় পাঠাইতেন। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুবিচার প্রভৃতির কোন ব্যতিক্রম হইতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব তাহাদের উপর ছিল। অশোক 'রাজুক' নামক রাজকর্মচারীদিগকে নিজ বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী উপস্থিত সমস্যা সমাধানের স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। উপরিস্থ কর্মচারীদের হস্তক্ষেপের ভয় হইতে মুক্তভাবে কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগলাভ করিবার ফলে শাসনকার্যে অযথা বিলম্ব হওয়ার পথ দূর হইয়াছিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই যাহাতে তিন দিনের অবকাশ পায় সেই ব্যবস্থা অশোক করিয়াছিলেন। পূর্বে এ-বিষয়ে বিভিন্ন নিয়ম ছিল। কোন কোন প্রদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নিকট প্রাণভিক্ষার সময় দেওয়া হইত, কোন প্রদেশে আবার এই সুযোগও দেওয়া হইত না। কিন্তু অশোক এজন্য সর্বত্রই এক নিয়ম প্রবর্তন

ইহলৌকিক মঙ্গল সাধন

ত্রৈবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিক্রমা

রাজুকদের স্বাধীনতা

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রাণভিক্ষার জন্য তিন দিনের অবকাশ দান

* "All men are my children; and just as I desire for my children that they may obtain every kind of welfare and happiness both in this and the next world, so do I desire for all men." (RE VI) Vide: *The Age of Imperial Unity*, p. 76.

অশোকের সাম্রাজ্য
অনুশাসনসমূহ প্রাপ্তির স্থান
শিলা লিপি
স্তম্ভ লিপি
০
৩০০
৬০০
মাইল
কাবুল
তক্ষশিলা
কাশ্মীর
ইন্দ্রপ্রস্থ
বৈরাট
মথুরা
সৌরাষ্ট্র
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
সিদ্ধপুর
চোল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
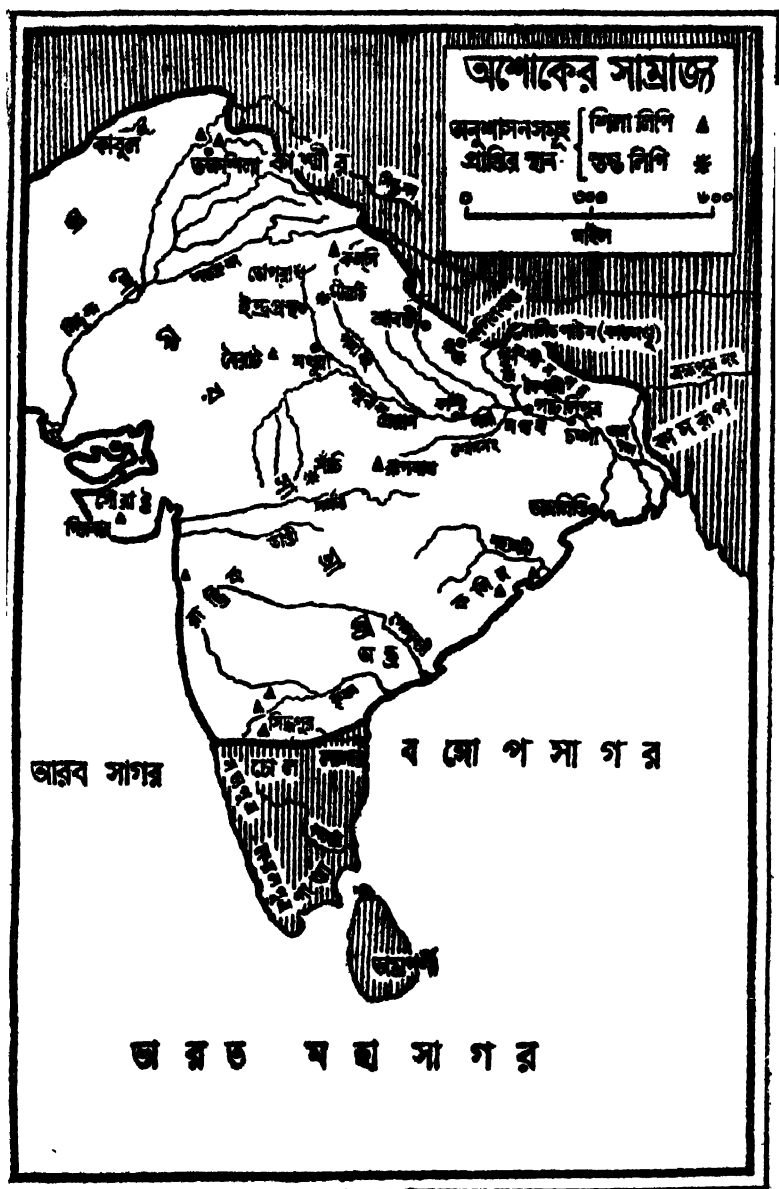
করিয়াছিলেন। আইনের চক্ষে সকলে-ই সমান এবং সম-অপরাধের জন্য সম-পরিমাণ শাস্তিদান—এই দুইটি নীতি প্রবর্তন করিয়া অশোক 'ব্যবহার-সমতা' ও 'দণ্ড-সমতা' স্থাপন করিয়াছিলেন।

দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা

জীব মাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতিবিধান করা ছিল অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ। এইজন্য তিনি শুধু মানুষের নহে, পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 'দেবানাং প্রিয়ম্ প্রিয়দর্শিন রাজ্ঞো দ্বে চিকিৎসাকতা মানুষ চিকিসা চ পশু চিকিসা চ' (RE I)। মানুষ ও পশুর সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে কূপ-খনন ও বৃক্ষরোপণ করাইয়াছিলেন। 'পংথেসু কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুশানাম' (RE I) সীমান্তবর্তী দেশগুলিতেও তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। মানুষ ও পশুর উপকারে আসিতে পারে এরূপ ঔষধি রোপণের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

মানুষ ও পশুর জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কূপ-খনন ও বৃক্ষরোপণ

রাজকর্মচারিবর্গ তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনে যাহাতে অবহেলা না দেখায় সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। 'প্রতিবেদক' নামক রাজকীয় বার্তাবহগণকে রাজ্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি জানাইবার জন্য যে-কোন স্থানে, যে-কোন সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি তিনি দান করিয়াছিলেন। উদ্যানে ভ্রমণরত অবস্থায়, আহারকালে, আরাধনারত অবস্থায়, এমনকি অন্তঃপুরেও প্রতিবেদকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত। প্রজাবর্গের প্রতি রাজ-কর্তব্য সম্পর্কে অশোকের এইরূপ দায়িত্ববোধ ছিল।*

রাজকর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দান

প্রতিবেদকদের রাজ-সাক্ষাতের স্বাধীনতা

প্রজাবর্গের ইহলৌকিক উন্নতিবিধান করিয়াই অশোক সন্তুষ্ট ছিলেন না: তাঁহার আদর্শ ছিল মানুষ মাত্রেরই ইহ-জাগতিক এবং পর-জাগতিক উন্নতিবিধান। পরজগতে মানুষ যাহাতে সুখী হইতে পারে সেজন্য তাহাদের ধর্মভাব ও ধর্মানুশীলন বৃদ্ধির জন্য তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাজের প্রতিস্তরের লোকের মধ্যে 'ধর্মমহামাত্র' নিয়োগ করা হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও 'স্ত্রী-মহামাত্র' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইবার উদ্দেশ্যে অশোক স্বয়ং নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্যাদি দেখাইতেন। ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মসমাজ প্রভৃতি যাহা বুদ্ধির সহায়ক বলিয়া তিনি মনে করিতেন সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রথাকে

প্রজাদের পারলৌকিক উন্নতিসাধনের আদর্শ

ধর্মমহামাত্র নিয়োগ

ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মসমাজ

* "At all hours, when I am eating, or in the hearm, or in the inner apartments or even in the ranches or in the place of religious instructions or in the parks, everywhere *Prativedakas* are posyted with instructions to report on the affairs of the people. In all places do I dispose of the affairs of the people." (RE VI) Vide: R. K. Mukherjee, *Asoka*. pp. 43-44.

তিনি উৎসাহিত করিতেন। দিগ্বিজয়, বিহার-যাত্রা, আমোদ-প্রমোদের জন্য 'সমাজ' প্রভৃতি যাহা কিছু অহিংস-নীতি বা নৈতিকতার পরিপন্থী তাহাই তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাতে রাজ্যে জীবহত্যা না হইতে পারে সেজন্য তিনি নানাপ্রকার নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এমনকি নিজেও, মাংসাদি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুধু দেশের প্রজাবর্গের ধর্মভাব বৃদ্ধি করিয়া-ই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, বিদেশে দূত পাঠাইয়া ধর্মপ্রচার করাইয়াছিলেন। জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগাইবার জন্য তিনি রাজ্যের সীমায় শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সমবায় ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। নিজে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, জৈন-নির্গ্রন্থ ও আজীবিক সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার দানে সম্মানিত করিতেন।

অহিংস-নীতির প্রয়োগ

বিদেশে দূত প্রেরণ, ধর্মক্ষেত্রে সমবায় ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

সম্রাট অশোক মানুষের সেবার জন্য স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ করিয়া পথের ধূলিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা হইয়াও তিনি ছিলেন ঋষি। পৃথিবীর রাজতন্ত্রের ইতিহাসে রাজ-কর্তব্যের এত বড় মহান্ আদর্শ আর কেহ স্থাপন করেন নাই, অথবা আদর্শ ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারেন নাই।

রাজর্ষি অশোক

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (Extent of Asoka's Empire)ঃ অশোক সিংহাসনে আরোহণের পর স্বশ (Svasa) নামক দেশ ও কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত নববিজিত রাজ্য সংযুক্তির পর তাঁহার সাম্রাজ্য প্রায় সর্বভারত ব্যাপিয়া বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানিবার আমাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটি উপায় আছে। (১) পরোক্ষ উপায়ঃ অশোকের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান; (২) প্রত্যক্ষ তথা অশোকের লিপি, দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকদের রচনায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানিবার দুইটি উপায়ঃ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ

(১) **শিলালিপির প্রাপ্তিস্থানঃ** অশোকের চৌদ্দটি শিলালিপির বিভিন্ন সংস্করণ তাঁহার রাজ্যের সীমার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। নিজ প্রজাবর্গ যাহাতে তাঁহার 'ধর্মলিপি' পাঠ করিয়া সেই নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করিতে পারে, সেজন্য তিনি শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। স্বভাবতই এগুলি তিনি নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্রে তিনি শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। সুতরাং শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নিরূপণ করিলে ভুল হইবে না।

পরোক্ষ উপায়ঃ শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান

এই সকল শিলালিপির একটি সংস্করণ পূর্বদিকে বর্তমান পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর

নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার জোগড়, দক্ষিণে মাদ্রাজের কারনুল জেলার জেরাগুদি এবং মহীশূরের চিতলদুর্গ জেলার মাস্কি, দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই রাজ্যের থান জেলার সোপারা ও সৌরাষ্ট্রের গিরনার, উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত মানসেরা ও শাবাজগড়ী এবং উত্তরে দেরাদুন জেলার কালসী নামক স্থানে অশোকের শিলালিপির বিভিন্ন সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপির এই সকল প্রাপ্তিস্থান অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল মনে করাই সমীচীন হইবে। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্বদিকে কামরূপ বা আসাম এবং দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলি ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে প্রাপ্ত শিলালিপি

(২) অশোকের শিলালিপি ও অপরাপর লেখকদের রচনায় উল্লিখিত স্থানসমূহ : শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা ধারণা পাইয়া থাকি, অশোকের শিলালিপি, দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকের রচনায় উহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। অশোক তাঁহার শিলালিপিতে (RE II, & XIII) তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশগুলির উল্লেখ করিতে গিয়া সীরিয়ার রাজা এণ্টিয়োকাস্-এর* রাজ্য, এবং দক্ষিণ-ভারতের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি তামিল রাজ্য ও তাম্রপর্ণীর উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট প্রদেশ দান করিয়াছিলেন। অশোকের আমলেও এই সকল প্রদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা সীমান্তবর্তী রাজা হিসাবে এণ্টিয়োকাসের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়।

প্রত্যক্ষ উপায় : সীমান্তবর্তী দেশ সীরিয়া, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণী

ইহা ভিন্ন অশোক তাঁহার শিলালিপিতে মগধ, খলটিক পর্বত, কৌশাম্বী, লুম্বিনী গ্রাম, কলিঙ্গ, অটবি, সুবর্ণগিরি, ইসিল, উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলা তাঁহার রাজ্যের অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলির উল্লেখ

গ্রীক লেখকগণ 'গঙ্গারিদে' অর্থাৎ বাংলাদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কলহণের রাজতরঙ্গিণী ও হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ হইতে কাশ্মীর রাজ্য যে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা জানিতে পারা যায়।

বাংলাদেশ ও কাশ্মীর

উপরি-উক্ত স্থানগুলির উল্লেখ হইতে আসাম বা কামরূপ ও তামিল রাজ্যগুলি ভিন্ন সমগ্র ভারতবর্ষের উপর অশোকের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পরোক্ষ উপাদান অর্থাৎ শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান ও প্রত্যক্ষ বর্ণনা অর্থাৎ স্থানগুলির উল্লেখ—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সহজ হইয়াছে, বলা বাহুল্য।

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

* Antiochus (II) Theos (261-264 B. C.) King of Syria.

অশোকের ধর্ম ও ধর্মনীতি (Asoka's religion [Dhamma] and religious Principles) : কলিঙ্গ যুদ্ধে যে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া গিয়াছিল তাহা অশোকের অন্তরে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে সুপ্ত মহামানব যুদ্ধের মর্মান্তিকতার রূঢ় স্পর্শে যেন জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। এক গভীর মনস্তাপ তাঁহার অন্তরকে যখন সম্পূর্ণ বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে, যখন কৃতকর্মের অনুশোচনায় তিনি মুহ্যমান, তখন শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক গোতমবুদ্ধের ধর্মে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অনুশোচনা : বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার ধর্মনীতি বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ছিল। এই কারণে উইলসন্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অশোকের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর ফ্লীট্ (Dr. Fleet) অশোকের ধর্মকে ধর্মনিষ্ঠ রাজগণের কর্তব্যকর্মের নীতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভাণ্ডারকর, বি. এম. বড়ুয়া প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। অশোকের শিলালিপিতে (MRE I) উল্লেখ আছে যে, "তিনি দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ উপাসক হইয়াছেন, কিন্তু এক বৎসর তিনি ধর্মব্যাপারে যেমন উদ্যম প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু সংঘের সহিত জড়িত হওয়ার পর হইতে প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি যথেষ্ট উদ্যমের সহিত ধর্মপালন করিতেছেন।" সংঘ অবশ্যই বৌদ্ধসংঘ এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।* এই শিলালিপি (MRE I) অশোকের অভিষেক-ক্রিয়ার দ্বাদশ বৎসরে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। সুতরাং ইহার দুই বৎসরের পূর্বেই অর্থাৎ নবম-দশম বৎসরে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অশোকের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ?

বৌদ্ধধর্ম পালন

অভিষেক-এর নবম বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

রোমিলা থাপর তাঁহার Asoka and the Decline of the Mauryas নামক গ্রন্থে অশোকের 'ধম্ম' (Dhamma)-কে তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ধম্ম বৌদ্ধধর্মের নামান্তর বলিয়া মনে করেন না। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, অশোকের ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল, কিন্তু অশোক তাঁহার ধম্মকে এমন একটি নৈতিক ও কার্যকরী জীবনাদর্শে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন যাহা অনুসরণ করা তদানীন্তন সমাজের পক্ষে সহজ ছিল।

রোমিলা থাপরের অভিমত

যাহা হউক, সার্বজনীনত্ব-ই হইল অশোকের ধর্মের মূলনীতি। তাঁহার ধর্ম

* "It is more than two years and a half that I am a lay worshipper, but did not exert myself for one year. But, indeed for more than one year tha I have been living with the Samgha I have exerted myself strenuously." (MRE I), Vide : Bhandarkar, *Asoka*, p. 81.

"We are of opin'on that Dhamma was Asoka's own invention. It may have been borrowed from Buddhist and Hindu thought, but 'was in esence an attempt on the part of the King to suggest a way of life which was both practical and convenient, as well as being highly moral." R. Thapar, *Asoka and the Decline of the Mouryas*, p. 149.

আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর উদার ও মানবধর্মী ছিল। সংসারত্যাগী গৃহীর ধর্ম হইতে ইহার মূলগত পার্থক্য ছিল। তিনি গৃহীর জন্যই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং পরিবার ও পারিবারিক জীবনই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলে ভিত্তি। স্বভাবতই অশোকের ধর্মনীতিতে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে। দাস-দাসীর প্রতি দয়াবান, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিনয়ী, ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তিবান্ হইতে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। সত্যকথন, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-দমন, কৃতজ্ঞতা, অচলাভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর অশোক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে (RE II) অশোক তাঁহার ধর্মনীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাপ যতই কম করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু সংসারধর্মীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ত অনেক সময় অধর্মের কাজ করিতে হয়। এজন্য সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজ, দয়া, দান, সত্যবাদিতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করা প্রয়োজন (অপাসুনভে, বহুকয়ানে, দয়া, দানে, সাচে, শোচয়ে)।

অশোকের ধর্মনীতির সার্বজনীনত্ব ও উদারতা

শ্রদ্ধা, বিনয়, দয়া, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয়-দমন, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, পবিত্রতা

যথাসম্ভব কম পাপ-কার্যকরণ, সৎকাজ, দান প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুষ্ঠান

আত্মপরীক্ষা, মিতব্যয়িতা, সামান্য সঞ্চয়, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, একথা অশোক বলিয়াছেন। অহিংসা ছিল অশোকের ধর্মের মূলনীতি। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও সহযোগ প্রভৃতির বৃদ্ধির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। অপরের ধর্মের উপর আঘাত হানিলে নিজধর্মের উন্নতির স্থলে অবনতি ঘটিবে, একথা তিনি বলিয়াছেন। তিনি সর্বধর্মের সার অর্থাৎ সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলির বহুল প্রচার ও বৃদ্ধির (ধম্মানুসতি, ধম্মবৃদ্ধি) জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি পরধর্ম সম্পর্কে সমালোচনা না করা, অপরাপর ধর্ম-সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রভৃতির নির্দেশ দিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি সমসাময়িক বহু ধর্ম সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগকে নানাপ্রকার দানে তুষ্ট করিতেন। বরাবর পর্বতের গুহাগুলি তিনি আজীবিক সম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

অশোকের ধর্মপ্রচার (Missionary Activities of Asoka): সম্রাটের পক্ষে ধর্মপ্রচারক হওয়া সহজসাধ্য নহে। রাজক্ষমতার সহিত ধর্মপ্রচারকদের দায়িত্ব মিলিত হইলে স্বভাবতই তরবারির প্রাধান্য ঘটে। রোমান সম্রাট কন্‌স্টানটাইন, পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) শার্লেম্যান-এর দৃষ্টান্ত এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু মৌর্য সম্রাট অশোক ছিলেন রাজর্ষি। তাঁহার ধর্মপ্রচারে সামরিক শক্তির প্রয়োগ বা প্রয়োজন ছিল না। পশুশক্তিকে দমন করিয়া মানবতার প্রাধান্য স্থাপনই ছিল এই ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মপ্রচার

দেশের অভ্যন্তরে অলৌকিক দৃশ্যাদি প্রদর্শন

অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মনে ধর্মানুরাগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে অশোক স্বয়ং নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য (হস্তী দশনা, বিমান দশনা, অগ্নিখণ্ডানি) দেখাইতেন। যে-সকল সমাজ অর্থাৎ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল পশুশিকার ও অন্যরূপ হিংসাত্মক কার্যাদি, সেগুলি তিনি নিষিদ্ধ করিয়া তৎস্থলে ধর্ম-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকেরা অর্থহীন যে-সকল মঙ্গলানুষ্ঠান করিতেন সেগুলির পরিবর্তে ধর্মমঙ্গলের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। পূর্বে রাজপুরুষগণ বিহার-যাত্রা অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের জন্য (Tours of pleasure) নানাস্থানে গমন করিতেন। অশোক বিহার-যাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করিলেন। ধর্মস্থান পরিভ্রমণ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ধর্মযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। অশোক স্বয়ং বুদ্ধের জন্মস্থানে এবং তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত বিভিন্ন স্থানে ধর্মযাত্রায় গিয়াছিলেন এবং সে-সকল স্থানে নানাপ্রকার দান-দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মস্থানে তিনি একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচার ও ধর্মের অনুশীলনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অশোক সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে 'ধর্মমহামাত্র' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, ধর্মস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পথের পার্শ্বে তিনি বটবৃক্ষ রোপণ, কূপ-খনন, সরাইখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া মানুষ ও পশুর সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় শিলালিপিতে অশোক বলিয়াছেন যে, তিনি রাজুক, যুত বা যুক্ত ও প্রাদেশিকদের তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর দেশ-পরিক্রমায় বাহির হইয়া তাঁহাদের রাজকীয় কর্তব্য ভিন্ন ধর্মোপদেশও দান করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ধর্ম-সমাজ, ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল

অশোকের ধর্মযাত্রা

ধর্মমহামাত্র, ধর্মলিপি, ধর্মস্তম্ভ, ধর্মশ্রবণ

বৃক্ষরোপণ, কূপ-খনন, সরাইখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন

ত্রৈবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক রাজ্য-পরিক্রমা

তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি, বিদেশে প্রচারক প্রেরণ

বৌদ্ধসংঘ যাহাতে বিনষ্ট না হইতে পারে, সে-বিষয়ে অশোক অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হইলে অশোক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন মোগ্‌গলিপুত্ত। এই সভার সিদ্ধান্ত সারনাথ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই সভা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাশ্মীর ও গান্ধারে মজ্জন্তিক নামক ধর্মপ্রচারককে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মহারক্ষিত নামে একজন ধর্মপ্রচারক সীরিয়া, মিশর, কাইরিনি, ম্যাসিডনিয়া, ইপাইরাস্‌ প্রভৃতি গ্রীকদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হিমালয়ের পার্বত্য দেশগুলিতে—নেপাল প্রভৃতিতে গিয়াছিলেন মধ্যম। ধর্মরক্ষিত নামে একজন যবন (গ্রীক?)

ধর্মপ্রচারককে প্রত্যন্ত নৃপতিদের রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মহাধর্মরক্ষিতকে মহারাষ্ট্রে, মহাদেবকে মহিষমণ্ডলে অর্থাৎ মহীশূরে, উত্তর-কানাড়ায় রক্ষিতকে, সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ ও উহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সোণ ও উত্তর নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে এবং মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। সিংহলের রাজা তিস্য সম্রাট অশোকের মিত্র ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার নেতৃত্বে একদল ধর্মপ্রচারক সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। জে. কে. স্যাণ্ডার্স (J. K. Saunders) নামে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপেক্ষা অধিক কৃষ্টিমূলক প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি ভারতের বাহিরে বিস্তার করিয়াছিলেন। অশোকের আমলে মৌর্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-রীতি সিংহলে অশোকের ধর্মদূত মহেন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল।

মহারক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, মহাধর্মরক্ষিত, মহাদেব, রক্ষিত, সোণ, উত্তর, মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা

অশোকের ধর্মদৌত্যের কৃষ্টিমূলক প্রভাব

অশোক তাঁহার নিজের জীবনের কার্যকলাপ, উন্নত ধরনের ধর্মনীতি পালন ও প্রবর্তন, বিদেশে কর্মদূত প্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা একটি স্থানীয় ধর্মকে জগদ্ধর্মে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া অপরাপর দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য না থাকিলেও জগতের এক বিশাল লোকসংখ্যা বুদ্ধের শরণাগত। ইহাতে রাজর্ষি অশোকের দান অপরিমেয়।

স্থানীয় ধর্ম জগদ্ধর্মে পরিণত

অশোকের রাজ্যশাসন (Administration of Asoka): সম্রাট অশোকের আমলে মৌর্য-শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ, প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁহার পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাশীলতা তাঁহার শাসনকে সর্বতোভাবে প্রজাহিতৈষী করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রজাহিতৈষী শাসন

শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে যেরূপ ছিল (চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা দ্রষ্টব্য) উহার কোন বিশেষ পরিবর্তন অশোকের আমলে সংঘটিত হয় নাই। উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, অবন্তী, প্রাচ্য ও কলিঙ্গ এই কয়টি প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রদেশগুলির শাসনকর্তাদের 'প্রাদেশিক' বলা হইত। যবন তুষাস্ক অশোকের কালে সৌরাষ্ট্রের প্রাদেশিক ছিলেন। 'উপরাজ' নামে এক শ্রেণীর সহকারী রাজা অশোকের আমলে ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। উপরাজ ভিন্ন যুবরাজ অগ্রামাত্য বা প্রধানমন্ত্রীর সহায়তাও তিনি গ্রহণ করিতেন বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের উপযুক্ত মূল্য অশোক

প্রদেশগুলি: উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, অবন্তী, প্রাচ্য ও কলিঙ্গ

প্রাদেশিক, উপরাজ, যুবরাজ, মন্ত্রিপরিষদ

দিতেন এবং এজন্য তিনি প্রতিবেদকগণকে মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত তাঁহাকে অনতিবিলম্বে জানাইবার আদেশ দিয়াছিলেন।

অশোকের অনুশাসনসমূহে তিনশ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা : রাজুক, যুত ও মহামাত্র। রাজুকগণকে অশোক কয়েক লক্ষাধিক ("many hundred thousand") প্রজাবর্গের শাসনভার দিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনই ছিল রাজুকদের দায়িত্ব। আধুনিক কালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বের সহিত রাজুকদের দায়িত্ব তুলনা করা যাইতে পারে। যুতগণ রাজকীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্ব-আদায় ও ব্যয় এবং হিসাব রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মহামাত্রগণ বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাজ্যাভিষেকের চতুর্দশ বৎসরে অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাদের কাজ ছিল ধর্মানুশীলন ও ধর্মবৃদ্ধির সহায়তা করা। সর্বজাতি ও সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে অশোক ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির তত্ত্বাবধানের জন্য স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র নামে কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিচার ব্যাপারে তিনি দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রাণভিক্ষার জন্য তিন দিনের অবকাশ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাজুক, যুত, মহামাত্র, ধর্মমহামাত্র

স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র

দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা

পৌরশাসনের ভার ছিল 'নগর-ব্যবহারিক' নামক কর্মচারীর উপর। পদমর্যাদার দিক দিয়া তিনি মন্ত্রী বা মহামাত্রদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। অশোক প্রতিবেদক নামে বার্তাবহদের উপর অত্যধিক নির্ভর করিতেন। প্রজাবর্গের অবস্থা সম্পর্কে জানাইবার জন্য তাঁহারা যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে এমনকি অন্তঃপুরেও অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। অশোক তাঁহাদিগকে এই স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন, কারণ প্রজার কাজে তিনি স্থান-কালের বিচার করিতেন না।* 'ব্রজভূমিক' নামে একজন রাজকর্মচারীর উল্লেখ অশোকের শিলালিপিতে (RE XII) পাওয়া যায়। কূপ-খনন, বৃক্ষরোপণ, ঔষধি রোপণ প্রভৃতি জলকল্যাণকর কার্যের ভার ব্রজভূমিকের উপর দেওয়া ছিল।

নগর-ব্যবহারিক

প্রতিবেদক

ব্রজভূমিক

অবিজিত-অন্ত অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাজ্যের যেগুলি মৌর্য সম্রাট কর্তৃক বিজিত হয় নাই, সেগুলির উপজাতিদের প্রতিও অশোক উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অবিজিত-অন্ত

অশোক প্রতি তিন বৎসর ও পাঁচ বৎসর অন্তর প্রাদেশিক, রাজুক, যুত, মহামাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের দেশের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমণে (অনুসংযান) প্রেরণ করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম ভিন্ন

ত্রৈবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিক্রমণ

* "People's business I do at all places," (RE VI).

ধর্মপ্রচারের কাজ করিতেন। বিচারের নামে কোনপ্রকার অন্যায় বা অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে কিনা এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও মহামাত্রদের দায়িত্ব ছিল।

প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রীয় শাসনের অনুরূপ

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। প্রাদেশিক কর্মচারিবর্গকেও রাজ্য-পরিক্রমণে বাহির হইতে হইত।

অশোকের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাবর্গের ইহ-জাগতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা। বলা বাহুল্য, রাজকর্তব্যের এইরূপ ব্যাপকতা প্রাচীনকালে কেন আধুনিক কালেও পরিলক্ষিত হয় না।

ইতিহাসে অশোকের স্থান (Place of Asoka in History) : মানুষ ও শাসক হিসাবে অশোক পৃথিবীর সর্বকালের রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিভিন্ন দেশ ও জাতির রাজগণের সহিত তুলনায় সকলেই একবাক্যে অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন, "সহস্র সহস্র নৃপতি যাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিড় করিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সম্রাট অশোকের নামই তারকার ন্যায় গৌরবোজ্জ্বল।"*

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজা

জনহিতকর কার্যের মোট পরিমাপের দ্বারা যদি রাজা বা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে অশোকের কার্যাদি অপরাপর রাজগণের তুলনায় যে সহস্র গুণ অধিক ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেবলমাত্র মুখের কথায়-ই নহে, বাস্তব ক্ষেত্রেও অশোক রাজ-কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। স্বীয় নীতি ও আদর্শকে তিনি নিজ জীবনে বর্ণে বর্ণে কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আদর্শ ও কার্যের সামঞ্জস্য

সম্রাট অশোক নিজেই ছিলেন মূর্ত বিপ্লব। কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিকতা তাঁহার অন্তরে যে বিপ্লব আনিয়াছিল তাহার প্রভাব অশোকের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরের বিপ্লব রাজ-কর্তব্যের এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। তিনি মৌর্য সম্রাট-সুলভ মনোবৃত্তি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। আমোদ-প্রমোদ, শিকার, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয় আড়ম্বর তিনি স্বভাবতই ভালবাসিতেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

* 'Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousnesses and serenities and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines and shines, almost alone as a star. From Volga to Japan his name is still honoured. China, Tibet and even India, though it has left his doctrine preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory today than have heard the names of Constantine or Charlemagne." H. G. Wells : *The Outline of History*, p. 402.

এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটের পক্ষে অহিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়া জনহিতকর কার্যে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা রাজতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন অভূতপূর্ব তেমনি বিস্ময়কর। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তপাত মন্ত্রের ন্যায় অশোকের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী, সাম্রাজ্যলোলুপ অশোকের যেন মৃত্যু ঘটিয়া রাজর্ষি অশোকের জন্ম হইয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্য সম্রাট অশোকের পূর্ব পরিচয়ের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া নব পরিচয়ে অশোককে প্রকাশ করিয়াছিল। অশোকের জীবনের এই পরিবর্তন শুধু ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন নয়, ইহা ভারতের জাতীয় জীবনের ও ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তন।

দিগ্বিজয়ী অশোকের রাজর্ষি অশোকে পরিণতি

ভারত-ইতিহাসের পরিবর্তন

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের সংস্কার, প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত হয়। প্রজাদের পার্থিব উন্নতিবিধানের জন্য অশোক নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিলেন। রাস্তার পাশে কূপখনন, বৃক্ষরোপণ, সরাইখানা স্থাপন প্রভৃতি পশু ও মানুষের উভয়েরই উপকারার্থে করা হইল। মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য অশোক দুই প্রকারের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিবেদকগণকে রাজ্যের সকল স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সকল সময় সকল অবস্থায় সম্রাট অশোককে জানাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

অশোক রাজপদকে ঐশ্বর্য উপভোগ ও নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জনসেবার বিরাট সুযোগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রজাবর্গের হিতসাধনে—এমন কি মানুষ মাত্রেরই হিতসাধনে তিনি রাজক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন 'সব মুনিসে পজা মমা' —সকল মানুষই আমার সন্তান। মানুষ মাত্রেরই, এমন কি, জীব মাত্রেরই কল্যাণসাধন ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি নিজেকে প্রজাবর্গের নিকট ঋণী মনে করিতেন এবং দিবারাত্র তাহাদের উন্নতিসাধনের কথা চিন্তা করিয়া এবং তাহাদের জন্য শ্রম করিয়া এই ঋণের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহজগতে প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি শাসনব্যবস্থার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন।

রাজ-কর্তব্যের আদর্শ

পারলৌকিক উন্নতিবিধানের জন্য অশোক নিজ প্রজাবর্গ, এমন কি, বিদেশীয়দেরও ধর্মভাবাপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি রাজ্যের সীমান্তে তাঁহার ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্মসমাজ, ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মবিজয় প্রভৃতি তিনি উৎসাহিত করিতেন, অপর পক্ষে বিহার-যাত্রা, দিগ্বিজয় প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। অহিংসা ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র এবং জীবমাত্রই যে পবিত্র একথা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে অশোকের পরধর্মসহিষ্ণুতা,

পারলৌকিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা

অহিংসা ও মৈত্রীর বাণীর প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি মানবতার মূলনীতির উপর অশোক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে অশোকের মহান নীতি ও মানবতার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। দিগ্বিজয় ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের মাধ্যমে গ্রীক ও তামিল রাজ্যগুলি ও সিংহলের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী তিনি পররাষ্ট্রেও প্রচার করিয়াছিলেন।

ধর্মবিজয়

'সব মুনিসে পজা মমা'—সকল মানুষই আমার সন্তান - অশোকের এই উক্তি রাজ-কর্তব্যের এক নূতন এবং মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অপর কোন রাজা এইরূপ আদর্শ পালন করিয়া চলা দূরের কথা, এইরূপ আদর্শের কল্পনাও করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপীয় ইতিহাসে প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের (Benevolent Despotism) উদ্ভব দেখা যায়। কিন্তু আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারত-সম্রাট অশোক প্রজাহিতৈষণার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য সম্রাট-সুলভ জীবন যাপন ত্যাগ করিয়া তিনি পথের ধূলিতে নামিয়া আসিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রজাহিতৈষণার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বহু বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ধূলিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বহু স্বর্ণ-সিংহাসন কালের নির্মম আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; বহু স্পর্ধিত স্বৈরাচারীর রাজদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত-সম্রাট অশোক জ্ঞানের রত্নরাজিতে যে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরস্পর-অসহিষ্ণু, যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ, হিংসাপরায়ণ পৃথিবীকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারিবে। তিনি যে পথের ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন একমাত্র উহার অনুসরণেই বর্তমান জগতের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব।

প্রকৃত পথের ইঙ্গিত

অশোক, কন্স্টান্টাইন্, শার্লেম্যান ও আকবর (Asoka, Constantine, Charlemagne and Akbar): সম্রাট অশোককে রোমান সম্রাট কন্স্টান্টাইনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়া কন্স্টান্টাইন্ ও অশোক তুলনীয় হইলেও ধর্মপ্রচারক হিসাবে এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যে যখন খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার রোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল তখনই কন্স্টান্টাইন্ এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে অশোক নিজ চেষ্টায় সামান্য একটি স্থানীয় ধর্মকে জগদ্ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন। কন্স্টান্টাইনের খ্রীষ্টধর্ম-প্রীতির পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ঐ সময় খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতা করিয়া রোমান সাম্রাজ্যকে

কন্স্টান্টাইন্ ও অশোক: তুলনা

টিকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অশোক রাজনৈতিক বা অপর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। জনকল্যাণই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে গিয়া অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কন্‌স্টান্‌টাইন্ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশোকের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে সম্রাট অশোকের সহিত সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্‌কে তুলনা করা চলে না।

শার্লেম্যান ও অশোক : তুলনা

পবিত্র রোমান সম্রাট শার্লেম্যানের সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের বিশালতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শার্লেম্যানের অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা, অ-খ্রীষ্টানদের প্রতি নির্মম অত্যাচার, বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা প্রভৃতি অশোকের নিকট নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

ভারত-ইতিহাসের রাজগণের মধ্যে অশোক ও আকবরের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। একটি যুদ্ধের মর্মান্তিকতা অশোকের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল, কিন্তু আকবর অথবা শার্লেম্যান বহু যুদ্ধ জয় করিয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। আকবর

আকবর ও অশোক : তুলনা

পবিত্র রোমান সম্রাট শার্লেম্যানের ন্যায় যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট অশোক ধর্মবিজয়ের মাধ্যমে বিদেশীয় রাজগণের মনোরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। উভয়েই সুশাসক ও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বটে, কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর 'দীন-ইলাহী' নামে নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। উভয়েই ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন বটে, তথাপি জনকল্যাণের আদর্শ ও মোট কার্যাদির দিক হইতে বিচার করিলে অশোককেই ভারতের, এমন কি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মৌর্য শাসনের প্রকৃতি (Nature of the Maurya Administration) : ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে মৌর্য শাসনব্যবস্থা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। শাসনের নিপুণতা, আমলা শ্রেণীর কর্মকুশলতা, রাষ্ট্রকর্তব্যের সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা প্রভৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে মৌর্য শাসনপদ্ধতিকে যে-কোন আধুনিক শাসনব্যবস্থার সহিত তুলনায় এক শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিতে হইবে, বলা বাহুল্য। ডক্টর স্মিথ্-এর মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা আবুল ফজ্‌ল বর্ণিত মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থাকেও হার মানাইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে এত উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই বিস্ময়-উৎপাদনকারী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ কি ছিল—এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগিবে।

মৌর্য শাসনের নিপুণতা, আমলা শ্রেণীর কর্মকুশলতা, রাষ্ট্র-কর্তব্যের সুষ্ঠু বণ্টন

ডক্টর স্মিথ্ ও তাঁহার অনুগামী ঐতিহাসিকদের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল

'স্বৈরাচারী'।। এই স্বৈরাচার একমাত্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রভাবে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই মতবাদের সমর্থনে ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে, মৌর্য রাজগণ চারিপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যথাঃ প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত ও প্রধান আইনপ্রণেতা। শাসন-কার্যের প্রতি স্তরে মৌর্য সম্রাটের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হইত। গুপ্তচরের সাহায্যে মৌর্য সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের সর্ববিধ সংবাদ গ্রহণ করিতেন এবং নিজ ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। মৌর্য আমলে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধীকে অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অপরাধীকে নির্যাতন করা হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় মৌর্য দণ্ডবিধির কঠোরতার উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে মৌর্য সম্রাটগণ কঠোর দণ্ডবিধির সাহায্যে রাজস্ব আদায় ও রাজ-আদেশ কার্যকর করিতেন। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর স্মিথ্ মৌর্য শাসনকে 'সীমাহীন স্বৈরাচার' (unlimited autocracy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ শ্রেণী এই স্বৈরাচারের অধীন ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদ ও মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া মৌর্য সম্রাটগণ শাসন পরিচালনা করিতেন বটে, কিন্তু সম্রাটের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না।

ডক্টর স্মিথের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা স্বৈরাচারী

ডক্টর স্মিথের যুক্তি

মৌর্য শাসনব্যবস্থার সব দিক যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে মৌর্য-শাসন সম্পর্কে ডক্টর স্মিথের মতবাদ আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সম্রাটদের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা 'পুরাণ প্রকৃতি' অর্থাৎ প্রাচীন রীতি-নীতি, মন্ত্রিপরিষদ, মহামন্ত্রিগণ ও সম্রাটদের প্রজাহিতৈষণার দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইত।

ডক্টর স্মিথের মত গ্রহণযোগ্য নহে

মৌর্য সম্রাটগণ ছিলেন 'ধর্ম-প্রবর্তক', সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও যাহাতে অধর্ম না হইতে পারে সে-বিষয়ে মৌর্য সম্রাটগণ যে সতর্ক থাকিতেন তাহা অনুমান করা যায়। রাজার অনুশাসন বা আদেশ-ই ছিল আইন। ধর্ম-প্রবর্তক হিসাবে আইন-প্রণয়ন করিতে গিয়া মৌর্য সম্রাটগণ 'পুরাণ প্রকৃতি' অর্থাৎ প্রাচীন রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অবশ্যই যাইতে পারিতেন না। সুতরাং আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে তাঁহাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা প্রচলিত রীতি-নীতি এবং নৈতিকতা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না।

রীতি-নীতি-নিয়ন্ত্রিত আইন-প্রণয়ন

আইনত মৌর্য সম্রাটগণ যুদ্ধ, সন্ধি ও সৈন্য-পরিচালনার ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু মৌর্য শাসনব্যবস্থায় 'সেনাপতি' নামে সেনাবিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারীর সহিত আলোচনাক্রমে সকল বিষয়ে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র রাজারই ছিল।

সামরিক কার্যাদিতে সেনাপতির পরামর্শ গ্রহণ

পুরোহিত, বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মন্ত্রী প্রভৃতি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু দায়িত্বপালনে তাঁহারা জনস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইবেন এইরূপ নির্দেশ স্বয়ং সম্রাট তাঁহাদিগকে দিতেন। অশোকের কলিঙ্গ শিলালিপি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্রাট মন্ত্রিপরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং সম্রাট অশোক এই পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতামত জানিবার জন্য উদগ্রীব থাকিতেন। এইজন্য তিনি প্রতিবেদকদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনতিবিলম্বে তাঁহাকে জানাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আইনত কোন বাধ্য-বাধকতা না থাকিলেও সাধারণত মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সম্রাট মানিয়া চলিতেন। কৌটিল্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর মতামত অথবা তাঁহার উপস্থিতিতে গৃহীত মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত চন্দ্রগুপ্ত অবহেলা করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না।

জনকল্যাণ-সাধন রাজকর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব

মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

বিচার-বিভাগেও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মদক্ষতা ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করা হইত। গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা উপেক্ষা করিয়াও বিচারপ্রার্থীদের বিচার সম্পন্ন করিতেন। অশোকের আমলে বিচারকার্যে কোন-প্রকার অবহেলা যাহাতে না হইতে পারে সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার ভার ধর্মমহামাত্রদের উপর দেওয়া হইয়াছিল। রাজা ও প্রজার মধ্যে কোন মামলা-মোকদ্দমায় রাজার সপক্ষে অন্যায়ভাবে বিচার-নিষ্পত্তির কোন দৃষ্টান্ত মৌর্যযুগে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় মৌর্য সম্রাটগণও ছিলেন বিচার-ক্ষমতার উৎসস্বরূপ (Fountain-head of Justice)। কিন্তু ইংলণ্ডের টিউডর ও স্টুয়ার্ট রাজগণের ন্যায় রাজার নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিচারালয় স্থাপন ও ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মৌর্য আমলে পাওয়া যায় না।

বিচারকার্যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা

কৌটিল্য ও এ্যারিয়ানের মতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত উপজাতি বাস করিত। ইহা ভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানও ছিল। এই সকল তথ্য হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, মৌর্য সাম্রাজ্য একক অধিনায়কত্ব ও স্বায়ত্ত-শাসনের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল।

একক অধিনায়কত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ

মৌর্য শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ছিল জনকল্যাণসাধন। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতেও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। মৌর্য শাসনব্যবস্থা একক অধিনায়কত্ব হইলেও উহা অপ্রতিহত বা সীমাহীন স্বৈরাচার ছিল, তাহা বলা চলে না। মন্ত্রিপরিষদ, মহামন্ত্রিগণ, প্রাচীন রীতি-নীতি, সেনাপতি, জনকল্যাণের ইচ্ছা মৌর্য-শাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের আমলে এই প্রজাহিতৈষণা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রজাহিতৈষণা

মৌর্য সম্রাটগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে শাসনকার্যে অংশ দান করেন নাই বটে, কিন্তু গ্রামের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক উপজাতিদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থাধীনে থাকিবার অনুমতি প্রভৃতি মৌর্য শাসনকে জনমতগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মৌর্য শাসনের পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ জনসাধারণকে মৌর্য শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় 'প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার' (Benevolent Despotism) অপেক্ষা মৌর্য শাসন বহুগুণে বেশী প্রজাহিতৈষী ছিল, বলা বাহুল্য। সম্রাট অশোকের আমলে এই প্রজাহিতৈষণার আদর্শ চরমে পৌঁছিয়াছিল।

পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ

মৌর্য শিল্পকলা ও স্থাপত্য (Maurya Art and Architecture) : মৌর্য আমলে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস, স্ট্র্যাবো ও এ্যারিয়ানের বিবরণ হইতে রাজপ্রাসাদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং কয়েকশত বৎসর পরে ফা-হিয়েন মৌর্য সম্রাটদের প্রাসাদ দেখিয়া যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মৌর্য স্থাপত্য-শিল্প যে যথেষ্ট উন্নত ধরনের ছিল, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে মনে করিতে পারি। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে জানা যায়, নদী এবং সমুদ্রতীরের শহর-নগরের ঘর-বাড়ী কাঠ দিয়া নির্মাণ করা হইত। দেশের অভ্যন্তরে ইটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়াডেল ও স্পীনার-এর প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৌর্য রাজপ্রাসাদের কতকাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয় যে, চন্দ্রগুপ্তের আমলের মূল প্রাসাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বিন্দুসার ও অশোকের আমলে সাধিত হইয়াছিল। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে স্তম্ভযুক্ত কক্ষটি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, উহা অশোকের আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য-শিল্পের অপরাপর নিদর্শন অশোক এবং দশরথ কর্তৃক আজীবিক সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত গুহাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাথরের পাহাড় কাটিয়া এই সকল গুহা নির্মাণ করা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলির দেওয়ালগাত্র কাচের ন্যায় মসৃণ ছিল।

স্থাপত্য-শিল্প

ভাস্কর্য-শিল্পের মধ্যে স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষের সিংহ, ষাঁড় প্রভৃতি পশুমূর্তি ও অপরাপর আলঙ্কারিক কারুকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধৌলির খোদিত হাতীর বিশাল মূর্তিও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য-শিল্প

স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ নির্মাণে ভাস্কর্য-শিল্পের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্তম্ভশীর্ষের পশুমূর্তির নিখুঁত গড়ন এবং সেগুলির মসৃণতা ভাস্কর্য-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন সন্দেহ নাই। বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথের স্তম্ভ অশোকের আমলের ভাস্কর্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তিগুলি ঐ যুগের শিল্পীদের অনুপাতজ্ঞান ও শিল্প-

সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের নির্মাণ-কৌশল

কৌশলের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।* একখণ্ড পাথর হইতে ৪০-৫০ ফিট উচ্চ স্তম্ভ নীচ হইতে উপর দিকে ক্রমশ সরু করিয়া অবশেষে পদ্মমূর্তিতে সমাপ্ত করা শিল্প-কৌশলের অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই। স্তম্ভগাত্রের মসৃণতাও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। সম্ভবত চুনারের পাথর-খনি হইতে এই সকল স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপ বিশালাকৃতি স্তম্ভগুলিকে একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক (Engineering) কৌশলও নিশ্চয়ই সে-কালে জানা ছিল।

কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক মোট ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে সাঁচী-স্তূপ অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে আজও টিকিয়া আছে।

সাঁচী স্তূপ

পাটলিপুত্র নগর ও অপরাপর স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি বিভিন্ন আকারের পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি মৌর্য যুগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মার্শাল, চন্দ, ক্রামরিশ্ (Kramrisch) প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন।**

প্রস্তরমূর্তি

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে মৌর্য যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-কৌশল যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উন্নত ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-কৌশল

মৌর্য যুগ অপেক্ষা পূর্বেকার শিল্প নিদর্শন পারখাম-এ প্রাপ্ত পাথরের মূর্তির সহিত মৌর্য যুগের ভাস্কর্যের তুলনা করিলে এ-বিষয়ে মৌর্য যুগে কতদূর উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মৌর্য যুগে এই উন্নতির মূলে পারসিক ও গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।† সারনাথের স্তম্ভ নির্মাণে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভারতীয় হইলেও উহার মসৃণতা পারসিক শিল্পীদের শিল্প-কৌশলের পরিচায়ক। অশোকের শিল্পিগণ পারসিক শিল্পীদের নিকট হইতে এ-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।‡

পারসিক ও গ্রীক প্রভাব

অশোকের পরবর্তী মৌর্য রাজগণ (Successors of Asoka): অশোকের মৃত্যুর পর ভারতীয় ইতিহাসের এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা হইয়াছিল। ব্যক্তিত্ব

---

* "It would be difficult to find in any country an example of ancient animals sculpture superior or even equal to this beautiful work of art, which successfully combines realistic modelling with ideal dignity and is finished in every detail with perfect accuracy." Smith, Vide : *Advanced History of India*, p. 226.

** Vide . *The Age of Imperial Unity*, pp. 506-10.

† Vide : *Cambridge History of India*, Vol I. pp. 60-61. R. D. Banerjee, p. 101.

‡ "...The Maurya column seems to reveal the debt it owes to Achaemenian art, also to Hellenistic art so far as some of its crowning members and part of the general effect are concerned." *The age of Imperial Unity*, p. 508.

ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়া অশোকের উত্তরাধিকারিগণ মৌর্য সাম্রাজ্য রক্ষার অযোগ্য ছিলেন। অশোকের পুত্রদের সংখ্যা ও নাম সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপি হইতে একমাত্র তিবর-এর নাম পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত অশোকের উত্তরাধিকারীদের নাম একত্রে যোগ করিলে নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত হইবে: দশরথ, সম্প্রাতি, কুণাল, বৃহদ্রথ, শতধন্য, শালীশূক। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে পুষ্যমিত্র নামে অপর একজন উত্তরাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কল্হণ জলোক নামক অপর একজনের উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় অশোকের পরবর্তী রাজগণের রাজত্বকালের সময়ানুক্রম স্থির করা সম্ভব নহে। প্রাচীন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তীতে মহেন্দ্র, কুণাল ও জলোক—এই তিনজনকে অশোকের পুত্রদের মধ্যে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অশোকের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

অশোকের পৌত্র দশরথ

অশোকের পৌত্র দশরথ যে মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তাঁহার রাজত্বকালের তিনটি লিপি নাগার্জুন পর্বতগুহার দেওয়ালগাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ

পুরাণ ও বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত হইতে জানিতে পারা যায় যে, বৃহদ্রথ ছিলেন মৌর্যবংশের সর্বশেষ সম্রাট। ইনি নিজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। আনুমানিক ১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৃহদ্রথের মৃত্যু হইয়াছিল।

মৌর্য শাসনের অবসান আকস্মিকভাবে ঘটে নাই। কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে জানা যায় যে, অশোকের পুত্র জলোক কাশ্মীরে স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি কনৌজ পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকট্রীয় গ্রীক-আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কাশ্মীর ভিন্ন বীরসেন-এর অধীনে গান্ধার, সুভাগসেনের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল তখন বিদেশীয় আক্রমণ পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া উহাকে ধ্বংস করিয়াছিল।

বিভিন্ন অংশের স্বাধীনতা ঘোষণা: বিদেশীয় আক্রমণ

মৌর্য আমলে সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতি (Society, Economy, Art and Culture under the Mauryas): মেগাস্থিনিস তথা গ্রীক লেখক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি হইতে মৌর্য যুগ সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভব হইয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রা, তাহাদের আচার-আচরণ, শ্রেণীবিভাগ, অর্থনৈতিক জীবন, শিল্প সব কিছুরই বিবরণ আমরা পাইয়াছি।

মৌর্য যুগের সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যের উৎস

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণ ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহার করিত বলিয়া তাহাদের দেহের কাঠামো অপরাপর দেশের লোক অপেক্ষা সাধারণত দীর্ঘতর ছিল। দেশে জমি হইতে যাহা কিছু সাধারণত উৎপাদন করা যায় তাহা সবই মৌর্য যুগে উৎপন্ন হইত। খাদ্যশস্য ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তখন উৎপন্ন হইত। জমির উর্বরা শক্তি অত্যধিক থাকায় উৎপন্ন খাদ্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে ভারতবাসী দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিক তথ্য হইতে সে যুগে দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণ অজানা ছিল একথা ভুল প্রমাণিত হয়। মেগাস্থিনিসের ভারত ত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, সে-যুগে লোকের খাদ্যের অভাব ছিল না বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের কালেও কৃষিকার্য ব্যাহত হইত না। কৃষকগণকে পবিত্র এবং সেহেতু অবধ্য বলিয়া মনে করা হইত। কৃষির উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক লোকই কৃষিজীবী ছিল।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাবলীলতা ও খাদ্য ও অপরাপর সামগ্রীর প্রাচুর্য

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের ভ্রান্ত ধারণা

মৌর্য যুগে শহরেরও অভাব ছিল না। অনেকেই শহরের জীবনযাত্রার সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করিত। মৌর্য যুগে মোট কত সংখ্যক শহর ছিল সে-বিষয়ে অবশ্য ঠিক কিছু বলা যায় না। এ্যারিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৌর্য যুগে শহর-নগরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। মেগাস্থিনিস অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবে সাগর বা নদীতীরের শহরগুলি কাষ্ঠ দ্বারা তৈয়ার করা হইত, কিন্তু যেখানে প্লাবনের আশংকা থাকিত না সেখানের শহর-নগরে কাদা বা ইট ব্যবহার করা হইত। তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, পুন্ড্রনগর প্রভৃতি ছিল তখনকার প্রসিদ্ধ নগর। জীবনের নিরাপত্তা হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত। মৌর্য যুগে জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি থাকার ফলে চুরি, ডাকাতি একপ্রকার অজানাই ছিল। সেই সময়ে বহু জাতি ও অন্তর্বর্তী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণের লোকেদের চতুরাশ্রমের যাবতীয় কর্তব্য পালন করিতে হইত বলিয়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

শহর-নগরের প্রাচুর্য

সম্ভোগপূর্ণ জীবন

মেগাস্থিনিস উল্লিখিত সাতটি জাতির কথা সে যুগের ভারতীয়দের 'জাতি' সম্পর্কে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার ফল ছিল, বলা বাহুল্য। তাঁহার বর্ণিত সাতটি শ্রেণী ছিল সমাজের লোকেদের পেশাগত বিভাগ। সেই সময়কার বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির মধ্যে সরকারী কর্মচারী পদ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদ, নৌবাণিজ্য, পরিবহনের কাজ, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অলঙ্কার নির্মাণ, বয়নশিল্প এবং আরও নানাপ্রকার শিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য। কৃষিকার্য ছিল সর্বাধিক ব্যাপক বৃত্তি। পশুপালন,

মেগাস্থিনিসের সাতটি জাতির উল্লেখ ভ্রান্তিমূলক

বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা

পশু-পক্ষী শিকার প্রভৃতিও বৃত্তি হিসাবে চালু ছিল। শহর-নগরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এক-একটি পর্ষদ ছিল। সামরিক কার্য পরিচালনার জন্য একটি পর্ষদ ছিল। দেশের লোকের অবস্থা, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সর্বদা সংবাদ সংগ্রহের জন্য অশোক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের আমলে প্রজাবর্গের ঐহিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল।

জনসাধারণের মঙ্গল সাধন শাসনের মূল লক্ষ্য

খনিশিল্পের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সৈন্ধব লবণের খনি তখন দেশের লবণের চাহিদা বহুলাংশে মিটাইত। খনি মাত্রেই সরকারের মালিকানাধীন ছিল। নিয়ারকাসের (Nearchus) বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সে যুগে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যার্জন করিতেন এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। একাধিক বিবাহ প্রথা তখন চালু ছিল। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমৃতা হইতেন। মৃতদেহ দাহ করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে শকুনি দ্বারা খাওয়ানো হইত।*

বিভিন্ন শিল্প

মৌর্য যুগে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কাষ্ঠনির্মিত পাটলিপুত্র শহর দেখিয়া গ্রীক লেখক ইলিয়ান (Aelian) লিখিয়াছেন যে, পারসিক সাম্রাজ্যের রাজধানী সুসা (Susa) বা এক্‌বাটানা (Ecbatana) সেই তুলনায় কিছুই নহে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যাইতে পারে যে, মৌর্য যুগে স্থাপত্যশিল্প যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। অশোক স্থাপত্যশিল্পে পাথরের ব্যবহার চালু করেন। তাঁহার স্তম্ভ ও সিংহের প্রতিকৃতি-শীর্ষক স্তম্ভ আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে; মৌর্য শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

স্থাপত্য

ধর্মের দিক দিয়া সেই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভিন্ন জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল।

ধর্ম

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Maurya Empire): উত্থান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম। কৌটিল্য ও চন্দ্রগুপ্তের চেষ্টায় যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সম্রাট অশোকের মানবতা, নৈতিকতা ও প্রজাহিতৈষণায় যাহা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল, সেই মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। অশোকের মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

উত্থান ও পতন প্রাকৃতিক নিয়ম

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ খুঁজিতে গিয়া কোন কোন পণ্ডিত—যেমন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ব্রাহ্মণশ্রেণীর অসন্তুষ্টি-প্রসূত-প্রতিক্রিয়ার মতবাদ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

* A History of India, *Michael Edwards*, p. 57.

তাঁহাদের মতে ক্ষত্রিয় রাজা অশোকের পক্ষে পশুবলি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধকরণ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অসন্তুষ্টির কারণ হইয়াছিল। অশোকের ব্যবহার-সমতা ও দণ্ড-সমতা প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রতি যে বিশেষ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই কারণে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে মৌর্যবংশের পতন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ডক্টর রায়চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার মতবাদ অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ অশোক ব্রাহ্মণদের প্রতি নিজে যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি প্রজাবর্গকে ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নেতা হিসাবে তিনি বৃহদ্রথকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পুষ্যমিত্র মৌর্য সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন। সামরিক বাহিনীই ছিল তাঁহার শক্তির উৎস, ব্রাহ্মণশ্রেণীর সাহায্য নহে।

ব্রাহ্মণশ্রেণীর অসন্তুষ্টি-জনিত প্রতিক্রিয়া: মতবাদ অস্বীকৃত

অশোকের ধর্মবিজয়-নীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ক্ষীণ করিয়া উহার পতন ঘটাইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। অত্যধিক ধর্মপরায়ণতা, 'ভেরী-ঘোষের' স্থলে 'ধর্ম-ঘোষের' প্রবর্তন, পুত্র-প্রপৌত্রদের নূতন বিজয় না করিবার উপদেশ দান প্রভৃতির সমষ্টিগত ফল হিসাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের যে সামরিক দুর্বলতা ঘটিয়াছিল সেই কারণেই উহার পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই মত আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ বলা যায় না। কেবলমাত্র সামরিক শক্তি বজায় রাখিলেই যদি সাম্রাজ্যের পতন রোধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে শক্তিশালী বহু সাম্রাজ্যের পতন ঘটিত না। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অভ্যন্তরীণ কারণে যখন সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইয়া যায় তখন উহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

ধর্মবিজয়: সামরিক দুর্বলতা

অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার মধ্যে প্রাদেশিক শাসকবর্গের স্বার্থপরতা ও দূরবর্তী প্রদেশগুলির, যথা—তক্ষশিলার—স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছা সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে; অশোকের কলিঙ্গ অনুশাসন ইহার সাক্ষ্য বহন করে। বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অংশগুলির উপর ঐ যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় ছিল রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিত্ব। অশোকের পরবর্তী রাজগণের সেই ব্যক্তিত্ব ছিল না, বলা বাহুল্য। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিবার মত শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।*

প্রাদেশিক শাসকদের স্বার্থপরতা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা

অকর্মণ্য বংশধরগণ

* "His sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn by any weaker hand." Vide: *Pol. History of Ancient India*, p. 347.

রাজসভায় স্বার্থপরতা

রাজসভায় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতও সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ ছিল। সেনাপতি পুষ্যমিত্র ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্রিগণও যে নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন তাহা বিদিশা ও বিদর্ভ নামক স্থানে দুইজন মন্ত্রীর দুই পুত্রের রাজ্যপাল (গভর্ণর) নিযুক্ত হওয়ার মধ্যেই দেখা যায়। মৌর্যদের পতনের অপর একটি কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন প্রজাবর্গকে উচ্চ হারে জমির খাজনা দিতে হইত। গ্রীক লেখকগণের সূত্রে জানা যায় যে, মৌর্য আমলে উৎপন্নের এক-চতুর্থাংশ ভূমি রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন যে, এজন্য প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল এই উচ্চ রাজস্ব হার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচ্য। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থশাস্ত্রে বলা আছে যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার ভূমি রাজস্ব এক-ষষ্ঠাংশের স্থলে এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন মৌর্য আমলে ভূমি রাজস্ব জমির উর্বরতা, অবস্থিতি প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন হারে নির্ধারিত হইত। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরীর উপকণ্ঠের অত্যধিক উর্বর প্রান্তরের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই অঞ্চলের উৎপন্নের প্রাচুর্যের হেতু হয়ত রাজস্ব এক-চতুর্থাংশে নির্ধারিত হইয়াছিল। সুতরাং ভূমি রাজস্বের উচ্চ হার মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচ্য নহে।

অর্থনৈতিক কারণ

আসন্ন কারণ : ব্যাকট্রীয় আক্রমণ ও পুষ্যমিত্রের বিদ্রোহ

অভ্যন্তরীণ কারণ ভিন্ন বহিরাগত কারণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য যখন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হেতু বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে অক্ষম, তখন ব্যাকট্রীয় গ্রীকগণের আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের আসন্ন কারণ হিসাবে দেখা দিল। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ লইয়াই পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য সম্রাটকে হত্যা করিয়া শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক যদি দিগ্বিজয়ী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে সাময়িক কালের জন্য বিদেশীয় আক্রমণ হইতে মৌর্য সাম্রাজ্য হয়ত রক্ষা পাইত।* কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই শেষ পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। অশোক ধর্মবিজয়, শান্তি-মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের দ্বারা পৃথিবীর এক বিশাল অংশের উপর ভারতবর্ষের যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আজও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই।

ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য

* **"But even if Asoka's policy brought about the downfall of the Maurya Empire, India has no cause to regret the fact. That empire would have fallen to pieces sooner or later, even if Asoka had followed the policy of blood and iron of his grandfather. But the moral ascendancy of Indian culture over a large part of the civilised world, which Asoka was mainly instrumental in bringing about, remained for centuries as a monument to her glory and has not altogether vanished even now after the lapse of more than two thousand years".** *The Age of Imperial Unity*, **p. 92.**

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অশোকের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অশোকের ধর্মচক্র* স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার শোভা বর্ধন করিতেছে।

ধর্মচক্র : সারনাথের অশোক স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারিটি সিংহের উপরে অশোকের ধর্মচক্র নির্মিত হইয়াছিল। এই ধর্মচক্রটি স্তম্ভশীর্ষ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহার ভগ্নাবশেষ বারাণসীর সারনাথ মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। এই ধর্মচক্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু উহার নির্মাণ-ভঙ্গিমা হইতে উহার সংকেত সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমত, চারিটি সিংহের উপর ধর্মচক্রটির নির্মাণ হইতে অনুমান করা যায় যে, পশুশক্তি হইতে ধর্ম বা নৈতিকতার শক্তি অধিকতর। দ্বিতীয়ত, পশুশক্তিকে ধর্মের বা নৈতিকতার দ্বারা দমন করিয়া রাখিতে হইবে। পশুশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু উহাকে নৈতিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নতুবা পশুশক্তিরই প্রাধান্য ঘটিবে। সারনাথের নিকটে মৃগদাবে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার বাণী সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ইহার বিষয়বস্তু ছিল অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যপন্থা। বৌদ্ধগ্রন্থে 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন সূত্রে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সারনাথ স্তম্ভের ধর্মচক্রটি 'ধর্মচক্র'-প্রবর্তন-এর প্রতীক হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বৌদ্ধধর্মকে বাস্তববাদী করা। অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন বা অত্যধিক দেহ-তুষ্টির কোনটাই বুদ্ধদেব পছন্দ করিতেন না। সুতরাং দেহ ও ধর্ম দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা ছিল তাঁহার মধ্যপন্থার উদ্দেশ্য। অশোকও ইহার উপর জোর দিয়াছিলেন। 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন এর প্রতীক বাস্তব-জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন অর্থাৎ পশুশক্তি ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

তৃতীয়ত, পশুশক্তি স্থাণু। অগ্রগতির পথে পশুশক্তি অর্থাৎ কেবল দৈহিক বল কার্যকরী হয় না। অগ্রগতি প্রতীক 'চক্র' হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মের সহিত দৈহিক শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই অগ্রগতির সম্ভব হইবে। চতুর্থত, গীতার 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'-এর জন্য সুদর্শন চক্রের প্রয়োজন ছিল। ধর্মচক্রও দুর্নীতি, পশুশক্তি প্রভৃতি বিনাশ করিয়া ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিবারই ইঙ্গিত-স্বরূপ মনে করা ভুল হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

শুঙ্গ, কাণ্ব, যবন, শক, পহ্লব শাসন
(The Sunga-Kanva-Yavana-Saka-Pahlava Rule)

শুঙ্গবংশ, ১৮৭-৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (The Sungas) : সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহারই সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। সামরিক পরিদর্শনের অজুহাতে সমবেত সেনাবাহিনীর সম্মুখে সম্রাটকে লইয়া গিয়া পুষ্যমিত্র তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। সেনাবাহিনীর সম্মুখে এই হত্যাকাণ্ড হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুষ্যমিত্র পূর্ব হইতেই সেনাবাহিনীকে সপক্ষে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৃহদ্রথকে হত্যা

পুষ্যমিত্রের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। পুরাণে পুষ্যমিত্রকে শুঙ্গ বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শুঙ্গবংশ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া পাণিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে পুষ্যমিত্রকে বৈম্বকবংশসম্ভূত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতই পুষ্যমিত্রকে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

বংশ-পরিচয় : শুঙ্গ-বংশ—ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ

পুষ্যমিত্রের রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর ও শিয়ালকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরেই অবস্থিত ছিল। পুষ্যমিত্রের পুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র বিদিশার (বর্তমান বেসনগর) শাসক ছিলেন। অগ্নিমিত্র বিদর্ভ (বেরার) রাজ্যের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনকে শুঙ্গবংশের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় সীরিয়ার রাজা এণ্টিয়োকাস (দি গ্রেট) কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সুভাগসেন নামক ভারতীয় রাজার নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী আদায় করিয়াছিলেন। এণ্টিয়োকাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারই জামাতা ব্যাকট্রিয়ার রাজা ডেমেট্রিয়স (Demetrios) পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকার কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার পর মিনাণ্ডার নামক গ্রীকরাজা সাকেত (অযোধ্যা) এবং চিতোরের নিকটবর্তী মধ্যমিকা নামক শহরটি জয় করিয়াছিলেন। এমন কি, পাটলিপুত্র নগরও গ্রীক বা যবনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে চলিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসন লাভের পূর্বেই

পুষ্যমিত্রের রাজ্যসীমা

যবন আক্রমণ : এণ্টিয়োকাস, ডেমেট্রিয়স ও মিনাণ্ডার

এই যবন আক্রমণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরও যে যবন অর্থাৎ গ্রীকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে পাওয়া যায়।

পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ: বসুমিত্রের হস্তে যবন (গ্রীক)-দের পরাজয়

পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র (অগ্নিমিত্রের পুত্র) যবন আক্রমণ হইতে আর্যাবর্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে তিনি যবনদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ গ্রীকগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া যজ্ঞের ঘোড়া মুক্ত করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একটি যজ্ঞের দ্বারা শুঙ্গবংশের সিংহাসনাধিকার এবং অপরটির দ্বারা পৌত্র বসুমিত্র কর্তৃক যবন বিজয় আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালেই কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ ও উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় করিযাছিলেন।*

অগ্নিমিত্র সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র

দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পুষ্যমিত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই কালিদাস-রচিত মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রের পর হইতে শুঙ্গবংশের রাজত্বের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী রাজগণ যে ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুঙ্গবংশীয় মোট দশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্রের পর সুজ্যেষ্ঠ এবং তারপর বসুমিত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতামহ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে বসুমিত্রই যবনদের পরাজিত করিয়াছিলেন। এই বংশের দশম রাজা দেবভূতি বা দেবভূমিকে তাঁহারই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব একজন ক্রীতদাসী বালিকার সাহায্যে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।†

পুষ্যমিত্রের বংশধরগণ: মন্ত্রী বসুদেব কর্তৃক দেবভূতির হত্যা—শুঙ্গবংশের পতন

শুঙ্গবংশের শাসনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত হয় এবং গুপ্তযুগে ইহার চরম অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। ঐ যুগেই ভাগবত ধর্মের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। বহু গ্রীকও এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর হইতে যে সামরিক নিষ্ক্রিয়তা মগধরাজগণকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা পুষ্যমিত্রের আমলে কতক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। যবনদের বিরুদ্ধে বসুমিত্রের সামরিক সাফল্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে যবনদের পরাজিত করিয়া বসুমিত্র আর্যাবর্তের স্বাধীনতা রক্ষা

শুঙ্গ শাসনের গুরুত্ব

* Vide: R. D. Banerjee, *Pre-historic Ancient and Hindu India*, p. 104.

† পরিশিষ্টে শুঙ্গ-বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারুত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপের তোরণ ও রেলিং শুঙ্গ যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কলিঙ্গ-রাজ খারবেল (Kharvela of Kalinga) : কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) রাজা খারবেল ছিলেন মৌর্যোত্তর যুগের প্রতিপত্তিশালী রাজগণের অন্যতম। হাতিগুম্ফা প্রশস্তিতে তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম পঞ্চদশ বৎসর রাজপুত্রসুলভ কার্যকলাপ, যথা, শিকার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে খারবেল বিদ্যার্জন এবং প্রশাসনিক কার্যাদির অনেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে কলিঙ্গের সিংহাসনে 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত হন। তিনি কলিঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গ-চক্রবর্তী উপাধিও গ্রহণ করেন। জৈন্য ধর্মাবলম্বী মহারাজ খারবেল সম্রাট অশোকের ন্যায়ই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

খারবেলের বাল্য-জীবন ও শিক্ষা—সিংহাসন আরোহণ

সিংহাসন আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই খারবেল দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাতকর্ণী বা কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী ঋষিক নগরের রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দুই রাজ্যের সহিত তিনি মিত্রতাবন্ধ হইয়াছিলেন একথাই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। বেরার অঞ্চলের রাষ্ট্রিক ও ভোজক নামক জনসমষ্টিকে তিনি পরাজিত করেন এবং গোরথগিরি নামক এক গিরিদুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া বিহারের রাজগৃহ শহর আক্রমণ করেন। রাজগৃহের যবনরাজা ডেমেট্রিয়াস এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়ন করেন এবং মথুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাদ্রাজের পিথুর নামক স্থান দখল করিয়া তিনি মগধের দিকে অগ্রসর হন। হাতিগুম্ফা প্রশস্তিতে খারেবেল মগধরাজ বহসাতিমিত অর্থাৎ বৃহস্বাতীমিত্র অর্থাৎ পুষ্যমিত্র শুঙ্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন, উল্লেখ আছে। কিন্তু খারবেল পুষ্যমিত্র শুঙ্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন এই মতবাদ অনেক ঐতিহাসিকই গ্রহণ করেন না। বহসতিমিত বা বৃহস্বাতীমিত্রকে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। নন্দবংশের রাজত্বকালে একবার এবং অশোকের রাজত্বকালে দ্বিতীয়বার কলিঙ্গ মগধের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে খারবেল মগধ ও অঙ্গ রাজ্য হইতে বহু সম্পদ লইয়া গিয়াছিলেন এবং যে কয়েকটি জৈন মূর্তি নন্দরাজ কলিঙ্গ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করেন।

তাঁহার দিগ্বিজয়

বহসাতিমিত ও পুষ্যমিত্র সম্পর্কে মতদ্বৈধ

নন্দরাজ ও অশোক কর্তৃক কলিঙ্গ-জয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ

জনসাধারণের মঙ্গল সাধন, নৃত্য-গীতের পৃষ্ঠপোষকতা, স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য খারবেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মহাবিজয় প্রাসাদ, খণ্ডগিরি পর্বতে বহু সংখ্যক জৈন গুহা এবং পাভা নামক স্থানে জৈন মঠ তাঁহার নির্মাণকার্যের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বহন করে।

জনসাধারণের মঙ্গল সাধন : নৃত্য-গীত ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

কাণ্ববংশ, ৭৫—৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (The Kanvas) : শুঙ্গবংশের দশম রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া মন্ত্রী বসুদেব সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শুঙ্গ-বংশধরগণ অবশ্য আরও কিছুকাল ক্ষমতাহীনভাবে নিজ রাজ্যের একাংশে রাজা নাম ধারণ করিয়া টিকিয়াছিলেন। প্রকৃত রাজক্ষমতা কাণ্ববংশের হস্তেই চলিয়া গিয়াছিল। কাণ্ববংশের চারিজন রাজার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি; ইঁহারা হইলেন—বসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্মণ। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ হইতে ৩০ অব্দের মধ্যে শুঙ্গ-কাণ্ব উভয় বংশই দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিল। (দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনাকালে সাতবাহনদের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সাতবাহনদের হস্তে কাণ্ববংশের পতন

যবন শাসন (Yavana Rule) : প্রাচীনকালে 'যবন' বলিতে কেবলমাত্র গ্রীকদের বুঝাইত। 'যবন' শব্দটি পারসিক 'যোন' (Yauna) শব্দের অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপিতে 'অংতিয়োকে যোনরাজ' গ্রীকরাজ এণ্টিয়োকাস্‌কে বুঝাইত। পরবর্তী কালে অবশ্য 'যবন' এবং 'ম্লেচ্ছ' এই দুইটি শব্দের একটি অপরটির বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অ-হিন্দু বিদেশীয়দের বুঝাইত।

'যবন' শব্দের প্রকৃত অর্থ

পার্থিয়া (Parthia) অর্থাৎ খোরাসান ও ইহার সংলগ্ন অঞ্চল এবং ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশ (Bactria) অর্থাৎ আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল সেলিউকসের বংশধরগণের অধীনে ছিল। কিন্তু এণ্টিয়োকাস্ থিওসের রাজত্বকালে (২৬১-৪৬ খ্রীঃ পূঃ) এই উভয় অঞ্চলই স্বাধীন হইয়া পড়ে। তৃতীয় এণ্টিয়োকাস্ (দি গ্রেট, ২২৩-১৮৭ খ্রীঃ পূঃ) এই দুই দেশকে আনুগত্যাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দুই দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পার্থিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতালাভ

বাহ্লিক* গ্রীক রাজগণ (Bactrian Greek Kings) :

প্রথম ডায়োডোটাস্ (Diodotus I) : ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীন গ্রীক-রাজ্যের স্থাপয়িতা ছিলেন ডায়োডোটাস্ (Diodotus)। তাঁহার রাজ্য ব্যাকট্রিয়া ভিন্ন সোগ্‌ডিয়ানা (Sogdiana) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সেলিউকসের বংশধরদের অধীন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক গভর্ণর ছিলেন,

ডায়োডোটাস্

* Bacarians = বাহ্লিক গ্রীক। Parthians = পহ্লব।

কিন্তু পরে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ডায়োডোটাস্ পার্থিয়ার প্রথম স্বাধীন রাজা অর্সসেস্* (Arsaces)-এর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন না। অর্সসেস্ সেজন্য ডায়োডোটাসের সম্ভাব্য আক্রমণ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ডায়োডোটাস্ (Diodotus II) : পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ডায়োডোটাসের আমলে ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়ার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ডায়োডোটাস্ ইউথিডেমোস্ (Euthydemus) নামে তাঁহারই একজন আত্মীয় কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

ইউথিডেমাস্ কর্তৃক ডায়োডোটাস্ সিংহাসনচ্যুত

ইউথিডেমাস্ (Euthydemus) : ইউথিডেমোসের রাজত্বকালে তৃতীয় এণ্টিয়োকাস্ ব্যাকট্রিয়া পুনর্দখল করিতে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইউথিডেমোস্ নিজ পুত্র ডেমেট্রিয়াস্‌কে এণ্টিয়োকাসের শিবিরে দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডেমেট্রিয়াসের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও রাজসদৃশ চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া এণ্টিয়োকাস্ তাঁহার সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ডেমেট্রিয়াস্‌কে তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণের অধিকার দান করিলেন এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌম মর্যাদা স্বীকার করিয়া লইলেন।

তৃতীয় এণ্টিয়োকাসের আক্রমণ : ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত

ডেমিট্রিয়াস্ (Demetrius), ইউক্রেটাইডিস্ (Eucratides) : ইউথিডেমোসের পুত্র ডেমেট্রিয়াস্ আফগানিস্তানের এক বিশাল অংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হইতে ডেমেট্রিয়াসের ভারত অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ডেমেট্রিয়াস্ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যখন রাজ্যজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন স্বভাবতই ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রতি আনুগত্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সুযোগে ইউক্রেটাইডিস্ (Eucratides) ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছিলেন (১৭১ খ্রীঃ পূঃ)। জাস্টিনের রচনায় ইউক্রেটাইডিস্ 'ভারতবর্ষ' দখল করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। সম্ভবত ১৬৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ডেমেট্রিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ইউক্রেটাইডিস্ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই ব্যাকট্রিয়ার একাংশ পহ্লব বা পার্থিয়ানগণ কর্তৃক এবং অপরাংশ উত্তরাঞ্চল হইতে আগত কতকগুলি যাযাবর উপজাতি† কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ফলে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতকাংশ ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লীক গ্রীকদের অধিকারে রহিল।

ডেমেট্রিয়াসের রাজ্য-বিস্তৃতি

ইউক্রেটাইডিস্ কর্তৃক ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন অধিকার

ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক শাসনের অবসান

* Arsakes according to V. A. Smith, Vide : *Early History of India*, p. 239.

† The Asai, the Pasiani, the Tokhari and the Sacarauli,—Vide : *The Age of Imperial Unity*, p. 111.

মিনাণ্ডার (Menander) : ব্যাকট্রিয়ার উপর অধিকার হারাইয়া বাহ্লিক গ্রীকরাজগণ সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজগণে পরিণত হইয়াছিলেন। এই ভারতীয় গ্রীকরাজগণের মধ্যে মিনাণ্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিনাণ্ডার ডেমেট্রিয়াসের পরিবারসম্ভূত ছিলেন। পাঞ্জাবের সাকল (বর্তমান শিয়ালকোট) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাজাউর অঞ্চলে

মিনাণ্ডারের রাজ্যবিস্তার

মিনাণ্ডারের একটি লিপি (inscription) পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বাজাউর অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার আমলের মুদ্রা কাবুল, সিন্ধু-উপত্যকা এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের

মিলিন্দ-পঞ্‌হো

পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে। গ্রীকরাজগণের মধ্যে মিনাণ্ডার ভারতীয় কাহিনী-কিংবদন্তীতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নাগসেনের 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' (Milinda-Panho) বা 'মিলিন্দের প্রশ্ন' নামক গ্রন্থের মিলিন্দ, মিনাণ্ডার ভিন্ন অপর কেহ নহেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। মিলিন্দ অর্থাৎ

তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন

মিনাণ্ডার ধর্মসম্পর্কে নানাপ্রকার জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যতিব্যস্ত করিতেন। নাগসেন মিলিন্দের সকল প্রশ্নেরই যথাযোগ্য সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন। প্লুটার্কের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিনাণ্ডার একজন পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ সুশাসক ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহভস্ম স্মৃতিহিসাবে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন শহরের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল।

এ্যাণ্টালকিডাস্ (Antalcidas) : বেস্‌নগরের প্রাপ্ত লিপিতে (inscription) মিনাণ্ডার ভিন্ন এ্যাণ্টালকিডাস্ নামে অপর একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তক্ষশিলার হেলিওডোরাস্ নামে একজন গ্রীক ভাগবত ধর্ম (বৈষ্ণব) গ্রহণ করিয়া

বেস্‌নগর লিপি : গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ

বেস্‌নগরের গরুড়ধ্বজ অর্থাৎ গরুড়ের মূর্তিসংবলিত একটি স্তম্ভ বাসুদেবের (বিষ্ণু) সম্মানার্থে স্থাপন করিয়াছিলেন। হেলিওডোরাস্ মহারাজ অংতলিকিতের অর্থাৎ এ্যাণ্টালকিডাসের দূত হিসাবে বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। বেস্‌নগর লিপিতে এই কথা তিনি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

ভারতীয় ব্যাকট্রীয় রাজগণের মুদ্রা হইতে মোট ত্রিশজনেরও অধিক রাজার পরিচয়

ব্যাকট্রীয় গ্রীক শাসনের অবসান

পাওয়া যায়। ইঁহাদের অনেকেই একই সংগে ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া মনে হয়। শক, পহ্লব, ইউ-চি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আক্রমণে ব্যাকট্রীয় গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল।

শক শাসন (The Saka Rule) : শকগণ ছিল মূলত মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। ইউ-চি নামে অপর এক জাতি শকদিগকে মধ্য-এশিয়া হইতে বিতাড়িত করে।

মধ্য-এশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া শকগণ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া কিপিন, অর্থাৎ কাবুল নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। শক-অধিকৃত স্থান শকস্তান (বর্তমান সিস্তান) নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, শকগণ কাবুলের গ্রীক রাজ্যগুলির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দিকে হিরাট হইয়া তারপর দক্ষিণে সিস্তান (ইরান) অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ শকদিগকে সাইদিয়ান (Scythians) এবং শকদের বাসভূমিকে সাইদিয়া (Scythia) নামে অভিহিত করিত। ক্রমে সিস্তানের শকগণ সিন্ধু উপত্যকায় এবং পশ্চিম-ভারতে বসতি বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক-অধিকৃত অঞ্চলের একাংশ পার্থিয়ান বা পহ্লবগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

মধ্য-এশিয়া হইতে শকদের সিস্তানে আগমন

উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকগণ (The Sakas of Northern & North-Western India): ময়েস বা মোগ (Maues, Moa or Moga): শকরাজগণের মধ্যে প্রথমেই মোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তক্ষশিলার নিকটবর্তী চুক্ষ (Chuksha) নামক স্থানের শাসকগণ মোগ-এর আনুগত্য স্বীকার করিতেন বলিয়া জানা যায়। মোগ পশ্চিম-ভারতের এক বিশাল অংশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোগ গান্ধার অধিকার করিয়া কাবুল উপত্যকার গ্রীকরাজ্য এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের গ্রীক-অধিকৃত স্থানসমূহের সংযোগ-পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ, রাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

মোগ-এর রাজ্যের বিস্তৃতি

আজেস্ বা প্রথম অয় (Azes or Aya I): মোগ-এর পর রাজা হইয়াছিলেন অয়। তিনি সম্ভবত মোগের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে শক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম অয় সম্ভবত পূর্ব-পাঞ্জাব অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রীক-মুদ্রার অনুকরণে তিনি নিজ মুদ্রা তৈয়ার করাইয়াছিলেন। শক শাসন-পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একই সঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই দুইয়ের একজন উপরাজ হিসাবে কাজ করিতেন এবং প্রধান রাজার মৃত্যুর পর অপরজন সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। অজিলিস বা অয়িলিস্ (Azilises or Ayilisha) অয়-এর উপরাজ ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসন-পদ্ধতিতে পারসিক এবং গ্রীক শাসনব্যবস্থার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম অয়-এর রাজ্য বিস্তার ঃ মুদ্রা প্রস্তুতকরণ

অজিলিস্ ও দ্বিতীয় অয় (Azilises & Aya II): প্রথম অয়-এর পর অজিলিস্ এবং তাঁহার পর দ্বিতীয় অয় শক সিংহাসন লাভ করেন। দ্বিতীয় অয়-এর রাজত্বকালেই ভারত-সীমান্তবর্তী শক অধিকৃত স্থানসমূহের অধিকাংশ পহ্লবরাজ গণ্ডোফার্নিসের অধিকারে চলিয়া যায়।

পহ্লবরাজ গণ্ডোফার্নিস কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসনের অবসান

পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে শক শাসন (The Saka rule in Western & Southern India) : ক্ষহরত শাখা : শক-জাতির শক শাখা 'ক্ষহরত' (Kshaharat) নামে পরিচিত ছিল। ক্ষহরতগণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শক শাসকগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড়ের শকক্ষত্রপ ছিলেন ভূমক। কিন্তু ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ ছিলেন নহপান। তিনি সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র এবং কোঙ্কণের উত্তরাংশ, কাথিয়াবাড়, মালব, আজমীর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নহপান ১১৯—১২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

'ক্ষহরত' : ভূমক, নহপান

নহপানের রাজনৈতিক প্রাধান্য অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানকে পরাজিত করিয়া সাতবাহন শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তিনি নহপানের অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সাতবাহনদের সহিত সংঘর্ষ

উজ্জয়িনীর শকক্ষত্রপগণ : শক জাতির কার্দমক শাখার ক্ষত্রপগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। এই পরিবারের সর্বপ্রথম ক্ষত্রপের নাম ছিল চস্টন্। চস্টন্ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবত তিনি কুষাণ রাজগণের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজত্ব করিতেন। চস্টন্ এবং তাঁহার পৌত্র রুদ্রদামন যুগ্মভাবে রাজত্ব করিতেন একথা অন্ধো লিপি (inscription) হইতে জানিতে পারা যায়।* চস্টন্ ও রুদ্রদামন ছিলেন উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রুদ্রদামনেব জুনাগড় শিলালিপি হইতে তাঁহার শাসন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, রুদ্রদামন নিজ ক্ষমতাবলে 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে অনুমান করা হইয়া থাকে যে, সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর হস্তে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদের প্রাধান্য কতকটা বিনষ্ট হইলেও রুদ্রদামন তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া নিজেকে 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রুদ্রদামন মালব, কাথিয়াবাড়, উত্তর-গুজরাট, কচ্ছ, মাড়বার, সিন্ধু-উপত্যকার নিম্নাংশ এবং কোঙ্কণের উত্তরাংশ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল অঞ্চলের কোন কোন স্থানও সাতবাহনদের অধিকারভুক্ত ছিল। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী বা তাঁহারই পরবর্তী রাজার নিকট হইতে রুদ্রদামন সেগুলি জয় করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাংশ কুষাণরাজ কণিষ্কের দুর্বল বংশধরগণের নিকট হইতে তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং রাজস্থানের ভরতপুর অঞ্চলের যৌধেয়গণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন।

চস্টন্ ও রুদ্রদামন

রুদ্রদামনের রাজ্য-বিস্তার

---

* Vide : Raychaudhuri's *Political History of Ancient India*, pp. 486-88

রুদ্রদামন একাধারে সমরকুশলী সেনাপতি, প্রজাহিতৈষী সুশাসক এবং বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যাকরণ, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলার্থে সুবিশাখ নামে তাঁহারই একজন পহ্লব বংশীয় (Parthian) অমাত্য সম্পূর্ণ সরকারী খরচে সুদর্শন হ্রদের পার্শ্বে একটি নূতন বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সুবিশাখ আনর্ত ও সুরাষ্ট্র—এই দুইটি প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুদর্শন হ্রদের পার্শ্বে বাঁধ প্রস্তুতের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোনপ্রকার কর, শ্রম, সাহায্য বা স্বেচ্ছামূলক দান আদায় করা হয় নাই।

তাঁহার চরিত্র

সুদর্শন হ্রদের পার্শ্বে বাঁধ নির্মাণ

রুদ্রদামন ধর্মভীরু রাজা ছিলেন। অযথা প্রাণনাশ তিনি পছন্দ করিতেন না অর্থাৎ একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কোথাও কাহারও প্রাণনাশ হউক তিনি ইহা চাহিতেন না।

তাঁহার ধর্মভীরুতা

রুদ্রদামনের বংশধরগণ সম্পর্কে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। লিপি এবং মুদ্রায় বিভিন্ন নামের উল্লেখ হইতে রুদ্রদামনের পরবর্তী কালে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। এইরূপ অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ এবং বিদ্রোহের ফলে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ বংশের দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইলে সাতবাহন বংশ রুদ্রদামনের একদা-বিস্তীর্ণ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপগণ 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণের যোগ্যতা হারাইয়া কেবলমাত্র 'ক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। পারস্যের স্যাসানীয় সম্রাটদের আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। স্যাসানীয় আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক অধিকার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু স্যাসানীয় বংশের দুর্বলতার সুযোগে তৃতীয় রুদ্রসেন আনুমানিক চতুর্থ শতকের শেষভাগে পশ্চিম-ভারতের শক আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গুপ্তবংশের উত্থানের অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের হস্তে পশ্চিম-ভারতের শক শাসনের অবসান ঘটে। ইহার ফলে কাথিয়াবাড় ও মালব গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

শক শাসনের অবসান

মথুরা অঞ্চলেও শকক্ষত্রপগণ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রধান ক্ষত্রপদের নাম ছিল রাজুল বা রাজুবুল, ষোড়শ ও খরাত্তষ্ট।

মথুরার ক্ষত্রপবংশ

পহ্লব* রাজগণ (The Pahlava or the Parthian Kings): কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে পহ্লব জাতির বাসভূমি ছিল। পহ্লবগণ পারস্য-সম্রাট ড্যারিয়াস বা দরায়াসের আমলে পারসিক সাম্রাজ্যের ষোড়শ প্রদেশের (16th Satrapy),

* Pahlava or Parthian = পহ্লব (পল্হব নহে)।

অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের পর তাহারা পারসিক সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশের ন্যায় আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকসের ভাগে ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের যে অংশ পড়িয়াছিল পহ্লবগণ উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সেলিউকসের বংশধরদের আমলে অর্সসেস্ বা অর্সকেস্-এর নেতৃত্বে পহ্লবগণ স্বাধীন হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পহ্লবগণ অর্সেসস্ বংশের অধীন থাকে। এই বংশের সুযোগ্য রাজা প্রথম মিথ্রিডেটিস (Mithridates I)-এর আমলে (১৭১—১৩১ খ্রীঃ পূঃ) পহ্লব অধিকার সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্লিনির বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে পহ্লব রাজ্য হিরাট, হামুন ও হেলমন্দ্ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাবুল বা সিন্ধু-উপত্যকা পহ্লব রাজ্যভুক্ত ছিল এইরূপ কোন উল্লেখ অবশ্য প্লিনির রচনায় পাওয়া যায় না।

পহ্লবদের পরিচয়

পহ্লব রাজ্যের বিস্তৃতি

যাহা হউক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গান্ধারের একাংশ শক আধিপত্য হইতে পহ্লবদের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে পহ্লবরাজ ফ্রাওটিস্ (Phraotes) তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া জানা যায়।* ফ্রাওটিস্ ব্যাবিলন ও পার্থিয়া (কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীর)-এর মূল পহ্লব রাজা ভার্ডানেস (Vardanes) হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

ফ্রাওটিস, ভারতের পহ্লব রাজা

গণ্ডোফার্নিস্ (Gondophernes) : যে-সকল পহ্লব রাজা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন গণ্ডোফার্নিস্। ফ্রাওটিসের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। গণ্ডোফার্নিস্ প্রথমে আরাকোসিয়া (Arachosia) অঞ্চলের পহ্লব প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। ক্রমে তিনি নিজ অধিকার চতুর্দিকে বিস্তৃত করিয়া সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পহ্লব সাম্রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং উত্তরদিকে তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি ঐ অঞ্চলের ব্যাকট্রীয় গ্রীকরাজ হার্মেউস্ (Harmaeus)-কে পরাজিত করিয়া গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কুষাণ-রাজ কুজুল কদ্ফিসস্-এর নিকট কাবুল অঞ্চল তাঁহাকে হারাইতে হইয়াছিল। গণ্ডোফার্নিস্ পেশোয়ার জেলা, তক্ষশিলা এবং সিন্ধু-উপত্যকার নিম্নাংশে অবস্থিত শক রাজধানী মিন্নগর জয় করিয়াছিলেন।

গণ্ডোফার্নিসের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

---

* "In 43-44 A. D. when Appollonois of Tyana is reputed to have visited Taxila, the throne was occupied by Phraotes, evidently a Parthian." H. C. Raychoudhuri, *Political History of Ancient India*, p. 45.

গণ্ডোফার্নিসের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে) সেণ্ট্ টমাস নামে জনৈক খ্রীষ্টধর্মযাজক তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং গণ্ডোফার্নিস্ ও তাঁহার ভ্রাতা গাড্ বা গুডনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

গণ্ডোফার্নিসের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ : সেণ্ট্ টমাস

কুষাণ বংশের হস্তে পহ্লব শাসনের অবসান

গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। লিপি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, আফগানিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের পহ্লব প্রাধান্য কুষাণ বংশ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

চেদি বা চেত, সাতবাহন শাসন
(Chedi or Cheta, Satavahana Rule)

কলিঙ্গের চেদি বা চেতবংশ (The Chedis or Chetas of Kalinga) : মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কলিঙ্গ রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবত অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে চেতবংশের খারবেল নামক একজন শক্তিশালী কলিঙ্গরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। হাতীগুম্ফা লিপিতে উল্লেখ আছে যে, সাতবাহনরাজ সাতকর্ণীর রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে) কলিঙ্গরাজ খারবেল নিজ বাহুবলে উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন এবং রাজগৃহের (মগধ) রাজাকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাতীগুম্ফা লিপিতে খারবেলকে চেতবংশের তৃতীয় নরপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দুইজন নরপতির নামের কোন উল্লেখ তাহাতে নাই। খারবেল সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে গণিত, আইন, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

হাতীগুম্ফা লিপিতে খারবেল-এর উল্লেখ

খারবেল-এর নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

খারবেল সাতবাহনরাজ সাতকর্ণীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি রথিক, ভোজক নামে উপজাতিগুলিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া তিনি উত্তর-ভারতের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পার্বত্য অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং রাজগৃহের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে অভিযান শেষ করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হন এবং পিথুড় নামক নগরটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। ইহার পর তিনি পাণ্ড্য রাজ্যের রাজাকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কুমারী পাহাড় (উড়িষ্যার উদয়গিরি) অঞ্চলে কতকগুলি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত এগুলি ছিল তাঁহার সামরিক অভিযানের সাফল্যসূচক স্তম্ভ। খারবেল-এর পূর্ববর্তী রাজগণ সম্পর্কে যেমন কোন কিছু জানা যায় না, সেরূপ তাঁহার পরবর্তী কালের চেতবংশের ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা কিছুই অবগত নহি।

তাঁহার সামরিক অভিযান : উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত

সাতবাহন বংশ (The Satavahanas) : মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশ দীর্ঘ চারি শতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। সাতবাহন বংশ ঠিক কোন্ সময়ে শাসন শুরু

করিয়াছিল সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। সাতবাহনগণ অন্ধ্র বা অন্ধ্র-ভৃত্য নামেও অভিহিত হইতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাতবাহনগণকে অন্ধ্র-বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে পরবর্তী কালে সাতবাহনগণের প্রাধান্য যখন অন্ধ্র অঞ্চল অর্থাৎ কৃষ্ণা নদীর মোহনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তখন হইতে সম্ভবত সাতবাহনগণ 'অন্ধ্র' নামে পরিচিতি লাভ করেন।* সাতবাহনগণ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ।

সাতবাহন শাসনকাল সম্পর্কে মতানৈক্য

সিমুক ও সাতকর্ণী: সিমুক শুঙ্গ-কাণ্ব শাসনের অবসান ঘটাইয়া সাতবাহন বংশের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সিমুকের পরবর্তী রাজা ছিলেন কৃষ্ণ বা কণ্হ। এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণী রাজ্য বিস্তার করিয়া সাতবাহন বংশের প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাতকর্ণী মালবের পূর্বাংশও জয় করিয়াছিলেন। নিজ সামরিক সাফল্যের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অবশ্য কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর হস্তে সাতকর্ণী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক হাতীগুম্ফা প্রশস্তির দাবি ঠিক নহে বলিয়া মনে করেন এবং খারবেল সাতকর্ণীর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া থাকেন। তাঁহার রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান, বর্তমান পৈথান।

সাতবাহন বংশের স্থাপয়িতা সিমুক

সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর সাতবাহন বংশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে সাতবাহন শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে পশ্চিম-ভারতের ক্ষহরত নামক শকজাতির এক শাখা সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ জয় করিয়া লইয়াছিল। ফলে, সাতবাহনগণ স্বভাবতই মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ক্ষহরতদের হস্তে সাতবাহন বংশের পরাজয়

গোতমীপুত্র সাতকর্ণী: খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে গোতমীপুত্র সাতকর্ণী সাতবাহন শক্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শক-যবন-পহ্লবদের পরাজিত করিতেও তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ শকরাজ নহপানকে পরাজিত করিয়া তিনি ক্ষহরত বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। গোতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্য মহারাষ্ট্র, পৈথান বা প্রতিষ্ঠানের চতুষ্পার্শ্বের রাজ্যসমূহ, কোঙ্কণের উত্তরাংশ, সৌরাষ্ট্র, বেরার, মালব প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ লইয়া গঠিত ছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিন্ধ্য-অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করা

গোতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্যবিস্তার

* "The name *Andhra* probably came to be applied to the kings in later times when they lost their Northern and Western possessions and became a purely Andhra power, governing the territory at the mouth of the river Krishna." Raychaudhuri, pp. 412-13.

হইয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শাসক হিসাবে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন নির্ভীক, সুদর্শন, জনসাধারণের মঙ্গলকামী রাজা। তিনি তাঁহার মাতার প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। পরম শত্রুকেও তিনি মাতৃ আদেশে মুক্তি দিতে দ্বিধা করিতেন না। দেশের ন্যায়পরায়ণ সৎ লোক মাত্রেই তাঁহার সাহায্য-সহায়তা লাভ করিত। পার্শ্ববর্তী রাজগণের সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেন। প্রজার মঙ্গল সাধন, তাহাদের দুঃখ-দুর্দশায় সমবেদনা প্রদর্শন, ন্যায়বিচার করা এবং কর আদায়ে কোনপ্রকার অন্যায় যাহাতে না হয় সেদিকে নজর রাখা তিনি নিজ কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপন

সাতবাহনগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়দের সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়াছিলেন। সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ যাহাতে স্থাপিত না হয় সেই ব্যবস্থা করিয়া তিনি জাতিগত বৈষম্য বজায় রাখিয়াছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বশিষ্ঠীপুত্রের রাজ্য-বিস্তার ঃ রুদ্রদামনের হস্তে পরাজয়

বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী ঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পর বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাতবাহন প্রাধান্য অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশের কতকাংশ এবং করমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত বিস্তার করেন। ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের হস্তে তিনি পর পর দুইবার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, উত্তর-কোঙ্কণ পুলমায়ীর অধিকার হইতে রুদ্রদামনের প্রাধান্যাধীনে চলিয়া যায়।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী সাতবাহন বংশের সর্বশেষ ক্ষমতাশালী নরপতি

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ঃ বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর পর যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী রাজা হইয়াছিলেন। ইনি সাতবাহন বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি। তাঁহার রাজ্য মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র এবং উত্তর-কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাষ্ট্রের একাংশ এবং উত্তর-কোঙ্কণ তিনি রুদ্রদামনের পরবর্তী শকক্ষত্রপদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে সাতবাহনগণ যে নৌ-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিত একথা তাঁহার মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়।

সাতবাহন বংশের পতন

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর হইতে সাতবাহন বংশের পতন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আভির জাতি, ইক্ষ্বাকুবংশ এবং পল্লবদের আক্রমণে সাতবাহন রাজত্বের অবসান ঘটে।

দশম অধ্যায়

কুষাণ সাম্রাজ্য

(The Kushan Empire)

ইউ-চি জাতির দেশত্যাগ : কুষাণদের পরিচয় (Yue-Chi migration : Who were the Kushans ?) : যে-সকল বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কুষাণ বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কুষাণ বংশ এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

বিদেশীয় জাতির মধ্যে কুষাণগণ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ

চীনদেশীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় কুষাণ জাতির পরিচয় জানিতে পারা যায়। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইউ-চি (Yue-Chi) নামে এক যাযাবর জাতির বাস ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হিউং-নু (Hiung-nu) নামে এক তুর্কী যাযাবর জাতি ইউ-চিদিগকে উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে বিতাড়িত করিয়া ঐ অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিল। বিতাড়িত ইউ-চি জাতি নূতন চারণভূমির সন্ধানে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া টাক্‌লামাকান মরুভূমির উত্তরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা ইলি নদীর উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া তথাকার উ-সুন্ (Wu-Sun) নামক অপর এক যাযাবর জাতিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উ-সুন্ জাতির নেতা ইউ-চিদের সহিত সংঘর্ষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। উ-সুন্ জাতিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার কালে ইউ-চিদের ক্ষুদ্র একদল তিব্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। তিব্বতের সীমান্ত অঞ্চলে এই দল 'ক্ষুদ্র ইউ-চি শাখা' (The Little Yue-Chi) নামে পরিচিত। 'বৃহৎ ইউ-চি শাখা' (The Great Yue-Chi) উপযুক্ত চারণভূমির অন্বেষণে ক্রমে সির্‌দরিয়া নদীর অববাহিকা অঞ্চলের শকজাতির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। শকগণ পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল। ইউ-চিগণ কিছুকাল সির্‌দরিয়া (Jaxartes) অঞ্চলে শান্তিতে বাস করিল বটে, কিন্তু উ-সুন্ জাতির যে দলপতিকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল

হিউং-নু-জাতি কর্তৃক ইউ-চি জাতি বিতাড়িত

ইউ-চিদের হস্তে উ-সুন্‌দের পরাজয়

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইউ-চি শাখা

সির্‌দরিয়া অঞ্চলে বসতি

তাঁহারই এক পুত্র হিউং-নু জাতির সাহায্য লইয়া ইউ-চি জাতিকে আক্রমণ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ইউ-চি জাতি সির্‌দরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করিয়া আমুদরিয়া অঞ্চলে (Oxus Valley) আশ্রয় লইল। আমুদরিয়া অঞ্চলে বসবাসকালেই ইউ-চি জাতি তাহাদের যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পাঁচটি পৃথক অঞ্চলে বসবাস করিতে লাগিল। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখা-ই ক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল।

উ-সুন্ দলপতির পুত্র কর্তৃক ইউ-চি জাতি বিতাড়িত ঃ আমুদরিয়া অঞ্চলে বসতি, ইউ-চি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত

প্রথম কদ্‌ফিসস্ ঃ চীনা ঐতিহাসিক ফান্-ই (Fan-ye)-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুজুল বা কুসুলক কদ্‌ফিসস্ (Kadphises I)* অপর চারিটি ইউ-চি শাখার দলপতিগণকে পরাজিত করিয়া 'ওয়াং' অর্থাৎ রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পহ্লব রাজ্য আক্রমণ করিয়া কাবুল, কাবুলের অনতিদূরে অবস্থিত পো-টা (Po-ta) কিপিন্ (কাফ্রিস্তান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ) দখল করিয়াছিলেন। ডক্টর স্মিথ্ কিপিন্ নামক স্থানটিকে গান্ধার অঞ্চল বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে প্রথম কদ্‌ফিসস্-এর রাজ্য পারস্য দেশের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কিপিন্-এর প্রকৃত সীমা কি ছিল তাহা নিরূপিত হয় নাই বলিয়া প্রথম কদ্‌ফিসস্-এর রাজ্য সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রথম কদ্‌ফিসস্ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন।

কুষাণ শাখার কুজুল কদ্‌ফিসস্-এর প্রাধান্য

প্রথম কদ্‌ফিসস্-এর রাজ্যের বিস্তৃতি

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসস্ ঃ প্রথম কদ্‌ফিসস্-এর পুত্র বীম কদ্‌ফিসস্ (২য়) ক্রমবর্ধমান কুষাণ জাতির বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি সিন্ধুনদ-বিধৌত পাঞ্জাব অঞ্চলে পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। সম্ভবত তিনি তাঁহার রাজ্য গঙ্গা-উপত্যকায় বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিন্ধু-উপত্যকায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পহ্লব রাজ্য তখনও টিকিয়াছিল সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া পহ্লব শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসস্-এর রাজ্য বিস্তার

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে চীনা সেনাপতি প্যান-চাও (Pan-Chao) খোটান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা পর্যন্ত চীন-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চীনা সেনাপতির সামরিক বিজয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া দ্বিতীয়

* K'ieou tai on-K'to of the Chinese historians.

কদ্‌ফিসিস্‌ চীনের সম্রাটের সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। আনুমানিক ৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যান-চাও-এর নিকট চীন সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। চীনা সেনাপতি কদ্‌ফিসিস্‌-এর প্রস্তাবকে ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার দূতকে বন্দী করিয়া চীনদেশে প্রেরণ করিলেন। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেনাপতি সি (Si)-এর অধীনে এক বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী প্যান-চাও-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কাসগড় বা ইয়ারকন্দ-এর প্রান্তরে দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌-এর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল এবং তাঁহাকে চীন-সম্রাটের নিকট বাৎসরিক কর প্রেরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

চীনদেশের সহিত কদ্‌ফিসিস-এর দ্বন্দ্ব

কদ্‌ফিসিস্‌-এর পরাজয়

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ রোমান সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সহিত কুষাণ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ প্রথম কদ্‌ফিসিস্‌-এর আমল হইতেই শুরু হইয়াছিল। প্রথম কদ্‌ফিসিস্‌-এর মুদ্রায় রোমান মুদ্রার অনুকরণ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রোমান সম্রাট ট্রাজান-এর সভায় দূত প্রেরণ

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ স্বীয় মুদ্রায় নিজেকে মহীশ্বর বা মাহীশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহেশ অর্থাৎ শিবের উপাসক হিসাবে তিনি নিজেকে 'মাহীশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এইজন্য দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ শৈবধর্মাবলম্বী (?)

কুষাণশ্রেষ্ঠ কণিষ্ক (Kaniska, the Greatest Kushan): দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌-এর মৃত্যুর (১১০ খ্রীঃ ?) পর কণিষ্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌-এর সহিত কণিষ্কের কি সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোন কিছু জানা যায় না। কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পর্কেও সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-ইতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিষ্কের কার্যকলাপের দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল। চীনা, তীব্বতীয় এবং মোঙ্গলীয় কাহিনী-কিংবদন্তীতেও কণিষ্কের নাম শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল।

কুষাণশ্রেষ্ঠ কণিষ্ক

কণিষ্কের সাম্রাজ্য মধ্যদেশ, উত্তরাপথ এবং অপরান্ত দেশ লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান অঞ্চল হইতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত, উত্তরে খোটান হইতে দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। কণিষ্কের আমলের লিপি (inscriptions) হইতেও জানিতে পারা যায় যে,

কুষাণ রাজ্য
কুষাণ রাজ্যের প্রভাবাধীন অঞ্চল
০ ৩০০ ৬০০
মাইল
পাটলিপুত্র
মগধ
অন্ধ্র
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
চোল

তাঁহার সাম্রাজ্য বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং ভাওয়ালপুর রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। মথুরা ও ভাওয়ালপুরে প্রাপ্ত কণিষ্কের লিপি এবং মধ্য-ভারতে বিদিশার অনতিদূরে সাঁচীতে প্রাপ্ত কণিষ্কের অব্যবহিত পরবর্তী কুষাণরাজের লিপি হইতে রাজপুতানা, মালব, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানও কণিষ্কের আনুগত্যাধীন ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আল্‌বিরুণীর বর্ণনা এবং কণিষ্কের জনৈক উত্তরাধিকারীর লিপি হইতে কাবুল কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। চীনা ঐতিহাসিক গ্রন্থে কণিষ্ক সাকেত (অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্র (মগধ) পর্যন্ত সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী এবং বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, কাশ্মীর কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। হিউয়েন-সাঙ্‌-এর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গান্ধার কণিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশওয়ার। কণিষ্কের সামরিক সাফল্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তাঁহার কাসগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটান অঞ্চল জয়। কণিষ্কের আমলে এই সকল অঞ্চল চীনা সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ প্যান্‌-চাও-এর হস্তে পরাজিত হইয়া চীন-সম্রাটকে কর দিবার যে অপমানজনক শর্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কণিষ্ক সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনাসাম্রাজ্যভুক্ত কাসগড় অঞ্চলে অবস্থিত করদ রাজ্যের জনৈক চৈনিক রাজার এক পুত্রকে কণিষ্ক প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজসভায় লইয়া আসিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ্‌-এর বিবরণেও এই চৈনিক প্রতিভূর উল্লেখ রহিয়াছে।

কণিষ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

কণিষ্কের শাসনকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে কণিষ্ককে স্থাপন করিবার পক্ষপাতী। কণিষ্ক নিজে একটি অব্দের (era) প্রচলন করিয়াছিলেন। ৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে শকাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে কণিষ্কই উহার স্থাপয়িতা ছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নিজে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭৮ বৎসর হইতে শকাব্দ নামে একটি অব্দের গণনা করা হয়—এই তিনটি তথ্য একত্রে বিচার করিলে কণিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে না।

শকাব্দ : কণিষ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত

ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ কণিষ্ককে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে (১১৯ খ্রীঃ) স্থাপন করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু শকাব্দ হইতে হিসাব করিলে ঐ বৎসর কণিষ্ক নামক কুষাণরাজের পুত্র কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। যাহা হউক, কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

কোন কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক কণিষ্ককে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে স্থাপন

কণিষ্ক রাজ্য-বিজেতা হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার আমলের লিপি (inscription) হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। আল্‌বিরুণী এবং হিউয়েন-সাঙ্‌, উভয়ের বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে, কণিষ্ক পুরুষপুর বা পেশওয়ারে একটি অতি সুন্দর এবং বিশাল বৌদ্ধ মঠ বা চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মঠ সমসাময়িক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মমত 'মহাযান' এবং 'হীনযান'—এই দুই মতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে বুদ্ধের কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধের নিরাকার উপাসনাকে 'হীনযান' (Lesser Vehicle) অর্থাৎ 'সূক্ষ্ম ধর্মপথ' নামে অভিহিত করা হইত। আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া মোক্ষলাভের চেষ্টা করা চলিত। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বিদেশীয় আক্রমণের ফলে গ্রীক-পারসিক-খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের যে প্রভাব বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল উহার ফল 'মহাযান' (Great Vehicle) উপাসনা-পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়। এই উপাসনা-পদ্ধতিতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়া বুদ্ধকে দেবতার পর্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মমতের এই বিবর্তন বিদেশীয়দের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবার পক্ষে সহায়ক ছিল। সূক্ষ্ম হীনযান-পদ্ধতি বিদেশীয়দের পক্ষে অনুসরণ করা স্বভাবতই সহজসাধ্য ছিল না। কণিষ্ক সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিশেষত পার্শ্ব নামে জনৈক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর পরামর্শ অনুযায়ী কাশ্মীরে এক বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন কোন কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে এই বৌদ্ধসঙ্গীতি গান্ধার বা জলন্ধরে আহূত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতি প্রধানত বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তুত করিবার কাজেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। বসুমিত্র এই সঙ্গীতির সভাপতি এবং অশ্বঘোষ উহার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীতির যাবতীয় সিদ্ধান্ত একটি তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করিয়া কাশ্মীরের একটি স্তূপে রক্ষিত হইয়াছিল।

কণিষ্কের ধর্মমত

পেশোয়ারের বৌদ্ধ চৈত্য

'হীনযান' ও 'মহাযান' ধর্মমত

বৌদ্ধসঙ্গীতি

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে গ্রীক, পারসিক ভারতীয়-সুমারীয় দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার মুদ্রায় অঙ্কিত দেব-দেবীর মূর্তি হইতেই অনুমিত হয়। কণিষ্ক অবশ্য বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করা ভিন্ন তিনি বুদ্ধের বহু প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি নিজে 'মহাযান' বৌদ্ধ উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার আমলে এই ধর্মমতই ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

কণিষ্কের ধর্মমতের উদারতা

শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও কণিষ্ক ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। বসুমিত্র, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ রচয়িতাগণ কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। অশ্বঘোষ কেবলমাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদই ছিলেন না, তিনি একজন প্রথম পর্যায়ের কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্বান এবং তার্কিক ছিলেন। তিনি 'বুদ্ধচরিত' ও 'সূত্রালঙ্কার' নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নাগার্জুন মহাযান ধর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যামূলক দার্শনিক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বসুমিত্র 'মহাবিভাষা' নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিশারদ চরক কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন।

শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠ-পোষক কণিষ্ক

বসুমিত্র, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, চরক

মৌর্য আমল হইতে গ্রীক তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, উহার পরোক্ষ ফল হিসাবে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহাই 'গান্ধার-শিল্প' নামে অভিহিত। বৌদ্ধ ভাস্কর্য-শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ায় অতি সুদর্শন বৌদ্ধমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। গান্ধার-শিল্প কণিষ্কের যুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার চরম অভিব্যক্তি কণিষ্কের পরবর্তী কালেই পরিলক্ষিত হয়। গান্ধার শিল্পিগণ গ্রীক দেবতা এ্যাপলো (Apollo), জিউস্ (Zeus) প্রভৃতির প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

গান্ধার-শিল্প

গান্ধার-শিল্প ঐ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গান্ধার-শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব গান্ধার-শিল্পে পরিলক্ষিত হয়, ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই শিল্পের মূল নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"গান্ধারের শিল্পিগণ গ্রীক শিল্পীদের ন্যায়ই দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মন ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়।" গান্ধার-শিল্পের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল বুদ্ধমূর্তি গঠন-ভঙ্গিমার নূতনত্ব। পূর্বেকার বুদ্ধমূর্তিগুলিতে শিল্প-কৌশলের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু গান্ধার শিল্পীদের হস্তে বুদ্ধমূর্তিগুলি সুন্দর ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গান্ধার-শিল্পের উৎকর্ষ অতিরঞ্জিত

গান্ধার-শিল্পের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্যকে ম্লান করিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্প গান্ধার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতের অমরাবতী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে যে শিল্প ও ভাস্কর্যের সমসাময়িক নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই। অমরাবতীতে প্রাপ্ত প্রস্তরে খোদাই করা বৃহৎ পদক ঐ সময়কার সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। মথুরা অঞ্চলেও ভাস্কর্য

সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প-কলা : অমরাবতীতে প্রাপ্ত প্রস্তর-পদক

মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

শিল্পের চর্চা ছিল। এখানে কণিষ্কের একটি মস্তকহীন প্রস্তর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নির্মাতা হিসাবেও কণিষ্কের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি যমুনা নদীর তীরে বহু সংখ্যক স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মথুরা এক বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীক পূর্ত-শিল্পীদের সাহায্যে তিনি মথুরা নগরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। পুরুষপুরে বা পেশওয়ারে তিনি গৌতমবুদ্ধের দেহাংশের উপর যে বিশাল চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালেও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। সমগ্র এশিয়ায় এই চৈত্যের সৌন্দর্য ও বিশালতার প্রশংসা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই চৈত্যের ভিত্তি পর পর পাঁচটি স্তরে মোট ১৫০ ফিট উচ্চ ছিল। উহার উপর তেরতল-বিশিষ্ট ৪০০ ফিট উচ্চ কাষ্ঠনির্মিত চৈত্য নির্মিত ছিল। সর্বোপরি একটি লোহার স্তম্ভ ছিল এবং উহাতে অনেকগুলি সোনার পাতে মোড়া তামার ছাতা ছিল। চৈত্যের মোট উচ্চতা ছিল ৬৩৮ ফিট।* চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ যখন পুরুষপুরে যান তখন চৈত্যটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

স্থাপত্য-শিল্পের উৎসাহ দান

কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। কণিষ্ক একাধারে বিজয়ী বীর, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রাজসভা নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। চরক ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কণিষ্ক মৌর্য সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র কুষাণ বংশেরই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না, ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবেও তিনি সম্মানিত ছিলেন।

কণিষ্কের কৃতিত্ব

কণিষ্কের পরবর্তী রাজগণ (The Later Kushans) : কণিষ্কের উত্তরাধিকারিগণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, কণিষ্কের পর বাশিষ্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মথুরা নগরী। আরা শিলালিপিতে বাজিষ্ক নামে একজন কুষাণ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি দ্বিতীয় কণিষ্কের পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে জুষ্ক নামে অপর একজন সমসাময়িক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, বাশিষ্ক, বাজিষ্ক এবং জুষ্ক এই তিনজন একই ব্যক্তি।† বাশিষ্ক এবং তাঁহার ভ্রাতা হুবিষ্ক যুগ্মভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন

বাশিষ্ক

বাজিষ্ক, বাশিষ্ক, জুষ্ক একই ব্যক্তি (?)

বাশিষ্ক-হুবিষ্কের যুগ্ম-শাসন

---

* *The Age of Imperial Unity*, p. 490.

† "He may be identified with Vajishka of 'Ara inscription' and with Jushka founder of Jushkapura mentioned in the Kashmir Chronicle." Vide: *The Age of Imperial Unity*, p. 180.

বলিয়া অনুমিত হয়। বাশিষ্কের পর হুবিষ্ক সমগ্র কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

কাবুলের অনতিদূরে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে আফগানিস্তান হুবিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। হুবিষ্ক 'মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কণিষ্কের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মথুরায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি এক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হুবিষ্কের মুদ্রার উপরও পারসিক, ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় দেবমূর্তির ছাপ ছিল। এ-বিষয়ে তিনি কণিষ্কের অনুসরণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি নিজে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, কিন্তু অপরাপর দেবতার প্রতিও যে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এ কথা তাঁহার মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়।

হুবিষ্ক

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় কণিষ্ক ছিলেন বাশিষ্কের পুত্র। অল্পকালের জন্য তিনি হুবিষ্কের সহিত যুগ্মভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কণিষ্ক 'কাইজার' (Kaisara i.e., Caesar) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে রোমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

হুবিষ্ক ও দ্বিতীয় কণিষ্কের যুগ্ম-শাসন

পরবর্তী কুষাণ রাজা ছিলেন বাসুদেব। কদ্‌ফিসিস্‌ হইতে শুরু করিয়া বাসুদেব পর্যন্ত কুষাণরাজগণের নামকরণের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ক্রমেই তাঁহারা ভারতীয় হইয়া পড়িতেছিলেন। বাসুদেব নামটি সম্পূর্ণ ভারতীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু নাম 'বাসুদেব' হইলেও তিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিবের উপাসক।

বাসুদেব

বাসুদেবের পরবর্তী কালে কুষাণ প্রাধান্য লোপ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ কুষাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্থানীয় শাসকগণের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের শকক্ষত্রপগণও স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন। মথুরায় কুষাণ-প্রাধান্য নাগবংশ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণ রাজত্ব আরও কিছুকাল টিকিয়াছিল। সাময়িকভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অর্থাৎ উত্তরাপথের কুষাণ রাজগণ পারস্যের স্যাসানীয় বংশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গুপ্ত আমলে (৪র্থ শতক) উত্তরাপথে 'দৈবপুত্র শাহী শাহানুশাহী' উপাধিধারী একজন কুষাণ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় উত্তরাপথে তখনও কুষাণগণ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে উত্তরাপথের কুষাণদিগকে হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরব আক্রমণ পর্যন্ত কুষাণ বংশের কোন কোন শাখা উত্তরাপথের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিল।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন

কুষাণ আমলের গুরুত্ব ও বৈদেশিক সম্পর্ক (The importance of and foreign relations under the Kushans): কুষাণ যুগ ভারতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত-ইতিহাসে

যে অন্ধকারময় যুগের সূচনা হইয়াছিল এবং যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করিয়া কুষাণ রাজবংশ উত্তর-ভারতের অধিকাংশ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে আগত কুষাণগণ স্বভাবতই চীনদেশের এবং মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত পরিচিত ছিল। সির্‌দরিয়া ও আমুদরিয়া নদীর উপত্যকায় বসবাসকালে তাহারা গ্রীক, পহ্লব প্রভৃতি জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল। এই সকল যোগাযোগের ফল কুষাণ যুগে গান্ধার-শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল। অমরাবতী ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের বহু চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ঐক্য

শিল্পক্ষেত্রে বিদেশীয় প্রভাব : গান্ধার-শিল্প

কুষাণ যুগ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির উন্নতির জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, বসুমিত্র প্রভৃতির রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা' নামক গ্রন্থে কুষাণরাজ বাসুদেবকে কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাহিত্যের উৎকর্ষ

ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে 'হীনযান' বৌদ্ধমত 'মহাযান' মতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শিব, বাসুদেব, কৃষ্ণ প্রভৃতির উপাসনাও ঐ যুগে প্রসারলাভ করিয়াছিল। কুষাণ যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কুষাণগণ মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চীনদেশের সহিতও তাঁহাদের নিকট-সম্বন্ধ ছিল। কুষাণ আমলেই মহাযান বৌদ্ধধর্মমত মধ্য-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করে। এই অঞ্চলে সেই সময়ে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সার্ অরেল স্টাইন্ কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত এই পথেই বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চীনদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ সুদূর অতীত হইতেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার—মধ্য-এশিয়া ও চীন

বসুমিত্র, অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ-দর্শনের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ দর্শন

কুষাণ আমলে ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণদের মূল শাখা ইউ-চিগণ যখন অক্ষু নদী বা আমুদরিয়া অঞ্চলে বাস করিতেছিল তখন হইতেই চীনদেশের সহিত তাহাদের আদান-প্রদান চলিত। খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫-১১৫

অব্দ পর্যন্ত চাং-কিয়েন নামক জনৈক চৈনিক দূত ইউ-চিদের রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে এক শতাব্দী পর্যন্ত অবশ্য চীনদেশের সহিত 'কুষাণ' বা ইউ-চি জাতির কোন যোগাযোগ বা সৌহার্দ্য বজায় ছিল না। এমন কি, চীনা সেনাপতি প্যান্-চাও দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে তাঁহাকে করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। কণিষ্ক এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চীনা সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া খোটান, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের চীনা রাজার এক পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ লইয়া আসিয়াছিলেন।

চীনদেশের সহিত যোগাযোগ

৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুষাণ রাজসভা হইতে রোমান সম্রাট ট্রাজানের নিকট একজন দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল। রোমান সম্রাট ট্রাজান দিগ্বিজয় হইতে রোম নগরীতে ফিরিয়া আসিলে নানা দেশ হইতে দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কুষাণ রাজসভা (দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্?) হইতে আগত একজন দূতও ছিলেন।* ট্রাজান কর্তৃক মেসোপটামিয়া জয়ের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ফলে, রোম ও ভারতবর্ষের মধ্যে জল এবং স্থলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগে ভারতীয় রাজগণ রোমান সম্রাট হাড্রিয়ান এন্টোনিয়াস পায়াস, কন্‌স্টান্‌টাইন প্রভৃতির রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্বে দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্ তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের সহিত আদান-প্রদানের ফলে তিনি রোমান সম্রাটদের অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষ হইতে ঐ যুগে রেশম, মসলা, মণিমুক্তা, রং প্রভৃতি বিভিন্ন সামগ্রী রোমে রপ্তানি করা হইত এবং তাহার বিনিময়ে রোম হইতে প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতবর্ষে আসিত। শৌখীন সামগ্রী ক্রয় করিবার ফলে রোম হইতে ভারতবর্ষ, আরব ও চীনে প্রচুর সোনা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া রোমের লেখক প্লিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রোমের সহিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় বণিকদের অনেকে আলেকজান্দ্রিয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রোমান সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগ

গ্রীক, শক, পহ্লব প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশর এবং পশ্চিম-এশিয়াস্থ দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে মাইয়স্ হোরমস্ নামক মিশরীয় বন্দর হইতে কয়েক মাসের মধ্যে ১২০ খানি বাণিজ্যপোত ভারত অভিমুখে যাত্রা

* "And to Trajan after he had arrived in Rome there came a great many embassies from barbarian courts, and specially from the Indians". *Mc Crindle*, see footnote, 4, Smith's *Early History of India*, pp. 269-70.

গিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে প্রতি বৎসরই যে বহু বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের জন্য আসা-যাওয়া করিত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় বণিকগণও মিশরের বন্দরগুলিতে বাণিজ্যপোত প্রেরণ করিতেন। একবার একজন ভারতীয় নাবিক পথ হারাইয়া জার্মানিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপর একজন এইভাবে পথ হারাইয়া আরব উপসাগরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

মিশর ও পশ্চিম-এশিয়ার সহিত যোগাযোগ

কুষাণগণ ব্যাকট্রীয় গ্রীক, শক, পহ্লব প্রভৃতির বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। কুষাণ যুগের শাসনব্যবস্থা, শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে শক ও গ্রীক প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

একাদশ অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য
(The Gupta Empire)

গুপ্তবংশের প্রাধান্যলাভ (Rise of the Guptas to Power) : গুপ্তবংশের আদি পরিচয় জানা সম্ভব হয় নাই। শক-বিজয়ী সাতবাহন রাজগণের কর্মচারীদের মধ্যে গুপ্ত নামধারী বহু ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সহিত গুপ্ত রাজবংশের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোন কিছু জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং (I-Tsing) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে জনৈক রাজা মৃগশিখাবনের নিকট একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ই-সিং-এর বিবরণ অনুসারে মহারাজ শ্রীগুপ্ত ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু শ্রীগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে।

গুপ্তবংশের পরিচয়

মহারাজ শ্রীগুপ্ত

সমসাময়িক লিপি (inscription) হইতে জানিতে পারা যায় যে, মগধে মহারাজগুপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সম্ভবত তিনি মগধের কোন অংশের এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। মহারাজগুপ্তের পর ঘটোৎকচগুপ্ত রাজা হন। ঘটোৎকচগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্তরাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে, সম্ভবত তাঁহারা সামন্ত রাজা ছিলেন।

মহারাজগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta I) : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সম্ভবত ঘটোৎকচের পুত্র। তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের রাজগণের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ সম্বন্ধ-সূত্রে নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট ছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি উভয়ই অর্জন করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিগণ ঐ সময়ে সম্ভবত পাটলিপুত্রে কুষাণদের সামন্তরাজ হিসাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। যাহা হউক, লিচ্ছবি বিবাহের ফলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার মুদ্রায় লক্ষ্মীর ছাপযুক্ত মূর্তির নীচে 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুকালে তিরহুত, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দক্ষিণ-বিহার* পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ, রাজ্য-বিস্তার প্রভৃতি দ্বারা এবং সর্বশেষে মৃত্যুর পূর্বে নিজপুত্রগণের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাবান

লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

---

* "অনুগঙ্গা প্রয়াগং চ সাকেতং মগধংস্তথা,
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজা।"—পুরাণ।
Vide: Raychaudhuri's *Political History of Ancient India*, p. 581.

সমুদ্রগুপ্তকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta) : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত পিতার এই মনোনয়নের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐক্যবন্ধ করিয়া নিজেকে একরাট্-এ পরিণত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য, মধ্য-ভারতের আটবিক রাজ্য এবং নিজ রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রজাতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়

প্রথমে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্যাবর্তে তিনি 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' (Exterminator of all kings)-এর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাজিত রাজগণের রাজ্য তিনি নিজ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করিলেন। রুদ্রদেব, নাগদত্ত, নাগসেন, গণপতি, নাগ, নন্দী, মতিল, অচ্যুত, বলবর্মন, চন্দ্রবর্মন প্রভৃতি আর্যাবর্তের রাজগণকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া তিনি সমগ্র আর্যাবর্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

আর্যাবর্ত জয়

আর্যাবর্ত বিজয় শেষ করিয়া তিনি জব্বলপুর অঞ্চলের আটবিক রাজ্য জয় করিলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ-ভারত চিরদিনই বিজেতাকে প্রতিহত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। দক্ষিণ-ভারত সম্পূর্ণরূপে জয় করা সম্ভব হইলেও সেখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে ধর্ম-বিজয়ী নীতি অবলম্বন করিলেন। সুতরাং বিজিত রাজ্যগুলি তিনি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া স্থানীয় রাজগণকে ফিরাইয়া দিলেন এবং কেবলমাত্র তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। কোশলের মহেন্দ্র, কোরাল রাজ্যের মন্ত্ররাজ, কট্টুরের স্বামীদত্ত, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, এরণ্ডপল্লের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, বেঙ্গীর হস্তীবর্মন, পলক্কের উগ্রসেন, কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় এবং আরও বহু রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন।

আটবিক রাজ্য ও দাক্ষিণাত্য জয়

প্রত্যন্ত নৃপতিগণ অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাজ্যের রাজগণ সমুদ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যে ভীত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সমতট (পূর্ববঙ্গের একাংশ), দভাক (কাহারো কাহারো মতে ঢাকা) এবং কামরূপ (আসাম) এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানিক, কাক, খর্পরিক প্রভৃতি উপজাতিগুলিও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল।

প্রত্যন্ত নৃপতিদের আনুগত্য লাভ

উপজাতির আনুগত্য লাভ

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ও শক্তিবৃদ্ধিতে মালব, সুরাষ্ট্র, সিংহল প্রভৃতি দেশের রাজগণের পক্ষেও উদাসীন থাকা সম্ভব হইল না। মালব ও সুরাষ্ট্রের রাজগণ (শকমুরুন্দগণ) সময় ও সুযোগমত সমুদ্রগুপ্তের নিকট নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের কুষাণ বংশের দৈবপুত্র শাহী শাহানুশাহীও সমুদ্রগুপ্তের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণের সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বা মেঘবর্মন্ সমুদ্রগুপ্তের নিকট নানাদ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে বোধগয়ায় সিংহলের তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধিবৃক্ষের উত্তর দিকে এই মঠটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ৩০ হইতে ৪০ ফিট, ইহাতে একটি বিরাট হলঘর এবং তিনটি উচ্চ গম্বুজ ছিল। সোনা ও রূপার দ্বারা নির্মিত এবং বহু মণিমুক্তাখচিত একটি অতি অপূর্ব বুদ্ধমূর্তি এই মঠে স্থাপন করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ এই মঠটি যখন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন তখন সেখানে এক হাজার মহাযান বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন।

বৈদেশিক রাজগণের সহিত সম্ভাব

সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ

বোধগয়ায় মঠ নির্মাণ

দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা সমুদ্রগুপ্তই করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি 'অশ্বমেধ পরিক্রমা' মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের নিজ অধিকৃত রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সভাকবি হরিষেণকে একটি প্রশস্তি রচনা করিতে আদেশ দেন। হরিষেণ সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তিনি সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহা মৌর্য সম্রাট অশোকের একটি স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রশস্তিটি (এলাহাবাদ প্রশস্তি) এখনও প্রায় নিখুঁতভাবেই রহিয়াছে। হরিষেণের প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। সমুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র একজন দিগ্বিজয়ী বীর-ই ছিলেন না, তিনি তীক্ষ্নবুদ্ধি, সুদক্ষ রাষ্ট্রশাসক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া 'কবিরাজ' (King of the poets) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ অবশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মুদ্রা হইতে তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা সম্পর্কে হরিষেণের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। বিজেতা হিসাবে তাঁহাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্বজ্জন সমাজে

হরিষেণ-রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র

'ভারতীয় নেপোলিয়ন'

সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সাহিত্যসেবা দ্বারা যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টিও সে খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্মের দিক দিয়াও সমুদ্রগুপ্তের উদারতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল তাঁহার ধর্মনীতির মূল ভিত্তি। মেঘবর্ণকে বোধগয়া বা বুদ্ধগয়ায় মঠ নির্মাণ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দান করিয়া সমুদ্রগুপ্ত ধর্মক্ষেত্রে নিজ উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বসুবন্ধুকে তিনি নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং কেবলমাত্র বিজেতা বা সুশাসক হিসাবেই নহে, বিদ্যোৎসাহী এবং মানবহিতৈষী হিসাবেও সমুদ্রগুপ্ত ভারত-ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবত ৩৭৫-৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে।* যাহা হউক, মৃত্যুর পূর্বে পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : বিক্রমাদিত্য (Chandragupta II : Vikramaditya) : সমুদ্রগুপ্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রাণী দত্তদেবীর সন্তান চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। যুবরাজ হিসাবে তিনি শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ডক্টর স্মিথ্ মনে করেন। চন্দ্রগুপ্ত (২য়) 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বহু লিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে। এগুলি হইতে তাঁহার আমলের ঘটনা ও তারিখ প্রভৃতি নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত

আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ নবম ও দশম শতকের কতকগুলি লিপির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সমুদ্রগুপ্তের পর রামগুপ্ত নামে তাঁহার এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া জনৈক শক রাজা রাণী ধ্রুবাদেবীকে (রামগুপ্তের রাণী) বিবাহ করিতে চাহিলে রামগুপ্তের ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত শকরাজকে হত্যা করেন এবং অকর্মণ্য রামগুপ্তের স্থলে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

রামগুপ্ত ?

বিবাহ-সম্বন্ধ-সূত্রে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির নীতি গুপ্তবংশের

---

* "Smith's date (A. D. 330—375) for Samudra Gupta is conjectural. As the earliest known date of the next sovereign is A. D. 380—81, it is not improbable that his father and predecessor died sometime after A. D. 375." *Ibid.* pp. 551-52.

প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই অনুসৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও 'কুবের নাগা' নামে এক নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া নাগবংশের সৌহার্দ্য লাভ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে তিনি দাক্ষিণাত্যের কুন্তলদেশের কদম্ব বংশের সহিতও বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাণী কুবের নাগার কন্যা প্রভাবতীর সহিত বেরার এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজা বাকাটক বংশীয় দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়া গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক নীতি গ্রহণের পথ সুগম করিয়াছিলেন। শকক্ষত্রপদের আক্রমণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারেও বাকাটক বংশের সাহায্য ও সৌহার্দ্যের যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল।

নাগ, কদম্ব ও বাকাটক বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ : রাজনৈতিক গুরুত্ব

বীরসেন সাব-এর উদয়গিরি গুহালিপি হইতে চন্দ্রগুপ্তের মালব ও সুরাষ্ট্র জয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সমরমন্ত্রী বীরসেন সাব সহ মালব, গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে বিজয়-অভিযানে অগ্রসর হইলেন। এই অভিযানে চন্দ্রগুপ্ত সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। মালব, গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্তি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়। বাণভট্টের রচনা হইতেও জানা যায় যে, পশ্চিম-ভারত জয়ের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে বিদিশা এবং পরে উজ্জয়িনী নগরে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

পশ্চিম-ভারতের গুজরাট ও সুরাষ্ট্র বিজয়

পাটলিপুত্র নগর গুপ্ত আমলেও রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পর অযোধ্যা নগরী হইতেই যাবতীয় সরকারী কার্যাদি সম্পাদন করা হইত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে অযোধ্যা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু পাটলিপুত্র নগর রাজধানী বলিয়া অভিহিত হইত। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরের ও প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পাটলিপুত্র

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একজন বিজয়ী বীর, সুদক্ষ শাসক এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসাহদাতা ছিলেন। ফা-হিয়েন তাঁহার শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অপর কেহই নহেন, এই মত স্বীকার করিয়া লইলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা যে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উচ্চ সম্মান ও প্রতিপত্তি-সূচক উপাধি ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন।

কৃতিত্ব

কাহিনী-কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি, সাধারণত এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে। কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য শকারি ছিলেন অর্থাৎ শকদিগকে তিনি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সভায় কবি কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন থাকিতেন। দ্বিতীয়

গুপ্ত সাম্রাজ্য
০ ২৫০ ৫০০
মাইল
কাশ্মীর
পুরুষপুর
নেপাল
ইন্দ্রপ্রস্থ
মথুরা
কনৌজ
বৈশালী
কাশী
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
উজ্জয়িনী
সাঁচী
বুদ্ধগয়া
সমতট
তাম্রলিপ্ত
বলভী
কাঞ্চী
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

চন্দ্রগুপ্ত যে পশ্চিম-ভারতে শকক্ষত্রপদের শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সম্ভবত কবি কালিদাস তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবরত্নের সকলেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

শকারি বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কি একই ব্যক্তি?

বিক্রমাদিত্য পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী নগরীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম-ভারত জয়ের পর উজ্জয়িনী নগরে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও কিংবদন্তীর 'শকারি বিক্রমাদিত্য' এক এবং অভিন্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য 'বিক্রমসম্বৎ' নামে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন 'অব্দের' প্রবর্তক ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। 'বিক্রমসম্বৎ' কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যই যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে প্রচলিত সম্বৎ-এর সহিত বিক্রমাদিত্যের নাম হয়ত পরবর্তী কালে যোগ করা হইয়াছে। যাহা হউক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই যে 'শকারি বিক্রমাদিত্য' এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হইলেও এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, একথা বলা চলে না।

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-hien's Account): চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বৌদ্ধ-তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ এবং বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তক 'বিনয় পিটক'-এর মূল রচনা সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি গোবি মরুভূমির দক্ষিণ দিক দিয়া প্রথমে খোটানে উপস্থিত হন। সেখান হইতে পামীর পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছেন।

ফা-হিয়েনের ভারত আগমন

তিনি ৪০১ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর বাস করেন, এই ছয় বৎসরের তিন বৎসর তিনি পাটলিপুত্র নগরে এবং দুই বৎসর তাম্রলিপ্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি তাম্রলিপ্তি হইতে জলপথে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্র নগরে তিন বৎসর, তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর অবস্থান

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসন সম্পর্কে ফা-হিয়েন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শাসনবিধির উদারতা দেখিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দণ্ডবিধির কোন কঠোরতা ছিল না, সাধারণত অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। কোন অপরাধের জন্যই প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত না। বারংবার রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড ছিল দক্ষিণ হস্ত ছেদন। দেশের একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য কোন অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন

দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস

হইত না, এ-বিষয়ে প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাজার দেহরক্ষী ও অনুচরবর্গকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জমির উৎপন্নের একাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসন-সম্পর্কে যে-সকল মন্তব্য রহিয়াছে তাহা হইতে তৎকালীন শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রজাবর্গের সাধারণ জীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সুষ্ঠু ও সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা

শহর-নগরের বর্ণনা দিতে গিয়া ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-বিহারের শহর-নগর মাত্রই অত্যন্ত বিশাল ছিল। পাটলিপুত্র তখনও একটি অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল। ফা-হিয়েন সম্রাট অশোক নির্মিত মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। এই প্রাসাদটির কারুকার্য মানুষের শিল্পকৌশলের বহু ঊর্ধ্বে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। সিন্ধু-উপত্যকা হইতে মথুরা পর্যন্ত ভ্রমণকালে ফা-হিয়েন বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। একমাত্র মথুরা নগরীতে কুড়িটি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সে-সকল মঠে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু তখন বাস করিতেন।

পাটলিপুত্র নগব : অশোকের রাজপ্রাসাদ

বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মঠ : মথুরার কুড়িটি মঠে প্রায় তিন হাজাব ভিক্ষুর বাস

দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বিশেষত যমুনা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণ বৌদ্ধনীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করিত। দেশের কোন অংশেই প্রাণিহিংসা ছিল না এবং পেঁয়াজ বা রসুন কেহ খাইত না। শূকর, মোরগ প্রভৃতি কেহ পালন করিত না। শহরে মদ বা মাংসের কোন দোকান ছিল না। ইহা হইতে ঐ সময়কার সমাজ-জীবন বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা যে তখন কঠোর আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই প্রমাণ ফা-হিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায়। চণ্ডালদিগকে সমাজবহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা হইত। বাজারে, নগরে তাহাদের প্রবেশ করা সহজ ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সমাজ-জীবন

অস্পৃশ্যতা

গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু অপর ধর্মের প্রতি তাঁহাদের সহিষ্ণুতার কথাও ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ মঠগুলিতে গুপ্তরাজগণ পর্যাপ্ত সাহায্য দানে ত্রুটি করেন নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যাহাতে দেশের সর্বত্র অযাচিতভাবে ভিক্ষা পাইতে পারেন সেই ব্যবস্থা তখন ছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে জনসাধারণকে বিচারের জন্য কোন আদালতে যাইতে হইত না। তাহাদের জিনিসপত্র

বা সম্পত্তি রেজিস্ট্রী করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। রাত্রে দরজা খুলিয়া রাখিলেও কোন জিনিস চুরি যাইত না। রাস্তার কোন স্থানে সোনা ফেলিয়া রাখিলেও দীর্ঘকাল পরে সেই স্থানেই তাহা আবার পাওয়া যাইত। এই সকল বর্ণনা হইতে জনসাধারণের সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, গুপ্তরাজগণের শাসনদক্ষতা সম্পর্কেও তেমনি উচ্চ ধারণা লাভ করা যায়।

জনসাধারণের সন্তোষ-পূর্ণ জীবন যাপন

জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিত।

জনসাধারণের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা

দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য রাজপথ ছিল। পথিকদের সুবিধার্থে রাজপথের স্থানে স্থানে সরাইখানা স্থাপন করা হইয়াছিল। দেশে বহুসংখ্যক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। পাটলিপুত্র নগরে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। শিক্ষিত ও দয়াপ্রবণ নাগরিকদের দানেই এই প্রতিষ্ঠানটি চলিত। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা এখানে অতি যত্ন সহকারে করা হইত। ঔষধ ও পথ্যাদির কোন খরচ রোগীদিগকে দিতে হইত না।*

রাস্তাঘাট, সরাইখানা ও দাতব্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা

মালব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুযোগ-সুবিধার কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় এবং জনসাধারণের ব্যবহারে ফা-হিয়েন অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

মালব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুযোগ-সুবিধা

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ (The Later Guptas): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর প্রথম কুমারগুপ্ত-মহেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলের মুদ্রা এবং লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ৪১৫-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার আমলে তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ ছিল ইহাও জানিতে পারা যায়। অবশ্য তাঁহার রাজত্বকালের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐ সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) প্রদেশপাল ছিলেন চিরাতদত্ত। ইহা ভিন্ন যুবরাজ ঘটোৎকচগুপ্ত, বন্ধুবর্মন্ প্রভৃতিও তাঁহার অপর দুইজন প্রদেশপাল ছিলেন, এই কথাও জানা যায়। পৃথিবীসেন ছিলেন কুমারগুপ্তের 'মহাবলাধিকৃত' অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি।

প্রথম কুমারগুপ্ত

* "Hither come all poor or helpless suffering from all kinds of infirmities. They are well taken care of and a doctor attends them, food and medicine being supplied according to their wants. Thus they are made quite comfortable and, when they are well, they may go away."

Quoted by Smith, *Early History of India*, p. 312.

প্রথম কুমারগুপ্ত তাঁহার পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি নিজ পিতার ন্যায় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা পাশাপাশি বিনা বাধায় চলিত।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান : পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র নামে এক উপজাতির আক্রমণে সাময়িকভাবে গুপ্ত প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পুষ্যমিত্র উপজাতি সম্ভবত নর্মদা উপত্যকা হইতে আসিয়াছিল।

পুষ্যমিত্র উপজাতির আক্রমণ

পরবর্তী রাজা স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি সম্ভবত ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন এবং যে-সকল স্থান সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া গিয়াছিল সেগুলির পুনরুদ্ধার। স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্র উপজাতির আক্রমণ-ই যে কেবল প্রতিহত করিয়াছিলেন এমন নহে, হূণ ও বাকাটকদের আক্রমণ হইতেও তিনি সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কে. এম. পানিক্কারের মতে স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার ফল পৃথিবীর ইতিহাসের যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একথা ঐতিহাসিকগণ উপলব্ধি করেন নাই। স্কন্দগুপ্তের হাতে হূণদের পরাজয় তাহাদিগকে পূর্ব-ইওরোপের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার ফল হিসাবেই তাহারা পূর্ব-ইওরোপের দিকে চাপ সৃষ্টি করিয়া প্রায় এক শতাব্দী পর যখন ভারতের দিকে পুনরায় অগ্রসর হয় এবং পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় তখন হূণ শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্কন্দগুপ্তের আমলে হূণ শক্তি ছিল অতি দুর্ধর্ষ। এজন্য স্কন্দগুপ্তের এই কীর্তি ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।* কিন্তু তাঁহার সামরিক সাফল্যে তাঁহার আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও পরবর্তী কালের জন্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালের পর সুরাষ্ট্র, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্কন্দগুপ্ত : গুপ্তবংশের সর্বশেষ ক্ষমতাবান রাজা

হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার সুদূরপ্রসারী ফল

পুষ্যমিত্র জাতি হূণ ও বাকাটক আক্রমণ : স্কন্দগুপ্তের সাফল্য

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের শেষভাগে কোন যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার আমলেও গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা অক্ষুণ্ণ ছিল। শাসনব্যাপারে তিনি পর্ণদত্ত, ভীমবর্মা প্রভৃতি সুদক্ষ শাসকদের সহায়তা লাভ

সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

* "Skandagupta's victory over the Huns has enormous consequences for the world which historians have not realised. At the height of Hun Power, by this defeat, its movement was turned west and the continuous pressure on Eastern Europe arose, in fact, from the failure of the Huns to force an entry into India." Panikkar, *Survey of Indian History*, p. 49.

করিয়াছিলেন। পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিত সুদর্শন হ্রদের পার্শ্ববর্তী বাঁধ পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

স্কন্দগুপ্ত নিজে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার পূর্বপুরুষদের পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরু হয়।

পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ
(২য়) জীবিতগুপ্ত গুপ্তবংশের সর্বশেষ রাজা

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী রাজগণ ছিলেন পুরুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত বুধ বা বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বলাদিত্য, ভানুগুপ্ত প্রভৃতি। ইঁহাদের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গুপ্ত বংশধরগণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা (The Administrative System under the Guptas) :

ফা-হিয়েনের বিবরণ, অনুশাসন ও শিলালিপির সাক্ষ্য

গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ এবং সমসাময়িক অনুশাসন ও শিলালিপি হইতে গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

রাজতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রাধান্য

গুপ্তশাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল গণরাজ্য ছিল সেগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে ঐ সময়ে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব তখন ছিল না বলিলেই চলে। গুপ্তরাজগণ ঐশ্বরিক শক্তির মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সমতুল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাকে অচিন্ত্যপুরুষ, সৃষ্টি-লয়ের কর্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'মর্ত্যরাজ্যের ঈশ্বর' বলিয়াও তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

সম্রাটপদ বংশানুক্রমিক : সম্রাটের জীবদ্দশায় পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

গুপ্ত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সমগ্র দেশের এবং শাসনব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট। মৌর্যযুগের ন্যায় গুপ্ত আমলেও সম্রাট-পদ বংশানুক্রমিক ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাট জীবদ্দশায়-ই নিজ পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া যাঁহাকে বিবেচনা করিতেন, তাঁহাকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া যাইতেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে এবং সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজক্ষমতা

শাসনযন্ত্রের 'চাবি-কাঠি' ('Levers and handles') রাজার হাতে থাকিত। আইন-কানুন বলবৎ রাখিয়া এবং কার্যকরী করিয়া রাজা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করা রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। সরকারী নীতি নির্ধারণ,

বিচারব্যবস্থা ও যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি রাজগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের দায়িত্ব একাকী বহন করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এই কারণে রাজা বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। রাজমন্ত্রিপদ কোন কোন ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক হইয়া গিয়াছিল। রাজা স্বয়ং অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাজধানীতে বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন।

মন্ত্রিবর্গ

প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের সংরক্ষক মন্ত্রী—এই তিনজন ছিলেন মন্ত্রিবর্গের মধ্যে প্রধান। যুদ্ধের সময় রাজা-ই সৈন্য পরিচালনা এবং সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন মহাবলাধিকৃত, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারিগণও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন।

সামরিক ও বেসামরিক কার্যের বিভাজনহীনতা

গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় সামরিক ও বে-সামরিক কার্যের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বিভাজন ছিল না, ফলে একই কর্মচারীকে সামরিক ও বে-সামরিক উভয়প্রকার দায়িত্বই পালন করিতে হইত।

কেন্দ্রীয় পরিষদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা

মৌর্য শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের ন্যায় কোন কেন্দ্রীয় পরিষদ গুপ্ত আমলে ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। বস্‌রা সীলমোহরে স্থানীয় পরিষদের উল্লেখ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় কোন পরিষদ থাকিলেও উহার কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সভ্যদের সম্মুখে সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সকল সভ্য কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য ছিলেন কিনা তাহা বলা কঠিন। ইঁহারা যে রাজসভার সভ্য ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, হয়ত কেন্দ্রীয় পরিষদেরও সভ্য ইঁহারা ছিলেন।

প্রদেশ ও ভুক্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি দেশ ও ভুক্তি উভয় নামেই পরিচিত ছিল। এগুলি আবার জেলা বা 'বিষয়'-এ বিভক্ত ছিল। দেশগুলির মধ্যে সুকুলিদেশ, সুরাষ্ট্র; ধাবল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভুক্তিগুলির মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, নগরভুক্তি তীরভুক্তি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দেশ'-এর প্রধান শাসক ছিলেন 'গোপতি' এবং ভুক্তির প্রধান শাসক ছিলেন 'উপারিক-মহারাজ'।

গোপতি ও উপারিক-মহারাজ

এই সকল কর্মচারী প্রদেশের পুলিশবাহিনী, বিচারবিভাগ প্রভৃতি শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বহুসংখ্যক নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী প্রাদেশিক শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন্দ্রীয় এবং কেহ কেহ প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীন ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রদেশের বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন।

শহর এলাকার শাসনকার্যে সমবায় সঙ্ঘগুলির কর্মকর্তাগণ, লেখক, দলিল-রক্ষক প্রভৃতি নানা পর্যায়ের কর্মচারী সাহায্য করিতেন।

শহর এলাকার শাসনব্যবস্থা

ফা-হিয়েন গুপ্ত আমলের শাসন-দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জনসাধারণ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত, তাহারা বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইত না, রাত্রিতে দরজা বন্ধ না করিয়াই ঘুমাইত, প্রভৃতি বহু কিছু জানিতে পারা যায়। প্রজাহিতৈষী শাসনাধীনে জনগণ কতদূর সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিত তাহা দণ্ডবিধির উদারতা হইতেই বুঝা যায়।

জনসাধারণের সন্তুষ্টি

রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা গ্রহণ করিত না। অপরাধিগণকে প্রাণদণ্ড বা কোন দৈহিক শাস্তি না দিয়াই গুপ্ত সম্রাটগণ শাসনব্যবস্থা চালু রাখিতে সমর্থ ছিলেন। অপরাধিগণকে কেবলমাত্র অর্থদণ্ড দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। রাজার বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহে লিপ্ত থাকিবার একমাত্র শাস্তি ছিল দক্ষিণ-হস্ত ছেদন। বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণে এই সকল কথা পাঠ করিলে গুপ্ত রাজগণের শাসন-দক্ষতার কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল 'ভাগ' অর্থাৎ রাজার প্রাপ্য জমির উৎপন্নের একাংশ। সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ 'ভাগ' হিসাবে দিতে হইত। ইহা ভিন্ন, খেয়া, শুল্ক, সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উপর নিরাপত্তা কর প্রভৃতি হইতেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। সরকারী কাজের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের প্রথাও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

রাজস্ব

গুপ্ত শাসন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট ছিল না। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মে গভীর বিশ্বাসী হইয়াও অপরাপর ধর্মের প্রতি পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও গুপ্তরাজগণের দায়িত্বস্বরূপ ছিল; তাঁহাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ সময়ে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Culture and Civilization of the Gupta Age): সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া গুপ্ত শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক সুবর্ণ যুগ রচনা করিয়াছে। বিশালতায় শ্রেষ্ঠতর না হইলেও সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষের দিক দিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

সুবর্ণ যুগ

রাজনৈতিক উৎকর্ষ: গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে যুগের সূচনা হইয়াছিল, শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্বকালে উহা আংশিকভাবে অপসৃত হইয়া

গুপ্ত আমলে রাজনৈতিক জীবনের মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় হিন্দু সাম্রাজ্য গুপ্তযুগে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া গুপ্তরাজগণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ও সুদূর দক্ষিণে গুপ্তশাসন বিস্তার লাভ না করিলেও ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ তাঁহাদের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

সুবিশাল সাম্রাজ্য : রাজনৈতিক ঐক্য

কেবলমাত্র সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াই গুপ্ত সম্রাটগণ ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং প্রজাহিতৈষণার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা প্রজাবর্গের সন্তোষ ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল। কোনপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া গুপ্তরাজগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবার ফলে স্বভাবতই বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান সকল দিক দিয়া উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রতি ক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষার এক চরম অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

শাসনব্যবস্থার দক্ষতা

সাহিত্য : রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি স্বভাবতই সাহিত্যচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। গুপ্ত রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাহাদের সাহিত্য-সাধনার দ্বারা গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। শকুন্তলা, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি অমর গ্রন্থ-প্রণেতা মহাকবি কালিদাস, মৃচ্ছকটিকম্-প্রণেতা শূদ্রক, মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্ত, বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার বসুবন্ধু, এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ প্রভৃতি সাহিত্য-সেবিগণ গুপ্তযুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত-রচিত গ্রন্থাদি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত-রচিত গ্রন্থাদি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের অক্ষয় রত্নস্বরূপ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথের যুগ যেমন ইংরেজি সাহিত্যে এক চরম সমৃদ্ধির যুগ, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্তযুগও এক চরম উৎকর্ষের যুগ। এলিজাবেথের যুগে এডমাণ্ড স্পেন্সার, খ্রীস্টোফার মার্লো, ফিলিপ সিড্‌নি প্রভৃতি সাহিত্যসেবীরা যদি জন্মগ্রহণ নাও করিতেন তবুও একমাত্র শেক্সপীয়রের রচনাই এলিজাবেথের যুগকে সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব দান করিত সন্দেহ নাই। ঠিক সেইরূপ গুপ্তযুগে একমাত্র কালিদাস জন্মগ্রহণ করিলেও গুপ্তযুগ সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি এবং বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলেই এলিজাবেথের যুগের ন্যায় গুপ্তযুগেও এক ব্যাপক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল।

কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু, হরিষেণ

গুপ্তযুগ এলিজাবেথের যুগের সহিত তুলনীয়

সমাজ ঃ গুপ্তযুগে পূর্বেকার সমাজব্যবস্থার দ্রুত এবং ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ পূর্বেকার জাতি বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক জাতিকে নিজস্ব কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলেও গুপ্তযুগে পূর্বেকার জাতিগতভাবে পেশা গ্রহণের নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। যেমন, বহু ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়ের কাজ অর্থাৎ সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। অনুরূপ বৈশ্য ও শূদ্র জাতির লোককেও কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় রাজা হিসাবে শাসনকার্য করিতে দেখা যায়। বিদেশীদের ভারত-প্রবেশের ফলে প্রাচীন জাতি প্রথা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের ঘটনাও যথেষ্ট ছিল।

জাতিগত পেশা পরিত্যক্ত

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক

সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রশাসনিক কার্যে অংশ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাণী বা রাজমহিষী গুপ্তযুগে শাসনকার্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা এবং নৃত্যগীতাদি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের প্রমাণও পাওয়া যায়। স্বয়ম্বর প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল। পুরুষদের বহু বিবাহ করা দূষণীয় ছিল না, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর সহমৃতা হইবার অর্থাৎ 'সতী' হইবার রীতি ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করিতেছিল।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান

অর্থনীতি ঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়া গুপ্তযুগ কেবল অত্যধিক সমৃদ্ধই ছিল না, অর্থনৈতিক কাঠামোও গুপ্তযুগে পূর্বেকার যথা মৌর্যযুগ অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের ছিল। কৃষি অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল বলা বাহুল্য, কিন্তু পূর্বে যেমন কেবল শূদ্রদের উপরই কৃষিকার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল গুপ্তযুগে সেরূপ ছিল না। সমাজের সকল শ্রেণীই গুপ্তযুগে কৃষিকার্যে অল্পবিস্তর আকৃষ্ট ছিল। সরকারের আয়ের অধিকাংশই কৃষি-উৎপন্নের উপর কর হইতে আসিত। নূতন নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া, সেচের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি নীতি প্রবর্তন করিয়া এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গুপ্ত সম্রাটগণ এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। করভার অবশ্য মৌর্য আমলের তুলনায় অনেক কম ছিল। কৃষির উপর কর ভিন্ন করদ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত বাৎসরিক কর ছিল গুপ্ত রাজগণের রাজস্ব আয়ের উৎস। গুপ্তযুগের অপর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি। গ্রাম মাত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া পড়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কতকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল।*

কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কতকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জনসাধারণের বিশাল সংখ্যা ও তাহাদের সন্তোষপূর্ণ

* A History of India, Edwards, p. 772.

জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় ভূমি দাসত্ব প্রথা ভারতবর্ষে ছিল না। অহিংসা ছিল জীবনযাত্রার অন্যতম মূল নীতি। দয়া, দাক্ষিণ্য, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি ছিল তখনকার সমাজ জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দাতব্য চিকিৎসালয়, দানছত্র প্রভৃতির উল্লেখ ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। উত্তর-বিহার অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং তাহাদের দানশীলতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অহিংস জীবনযাত্রা—অতিথিপরায়ণতা ও দানশীলতা

শিল্পকলা ও ভাস্কর্য: শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি আমরা গুপ্তযুগে দেখিতে পাই। ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুপ্তযুগের শিল্পিগণ যেন প্রস্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও নীতিকে ভিত্তি করিয়া গুপ্তযুগের শিল্পিগণ তাঁহাদের শিল্প-কুশলতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ঐ যুগের সূক্ষ্ম শিল্পকার্য ভারতীয় শিল্পের গৌরবের বস্তু। সারনাথে গুপ্তযুগের শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এগুলি হইতে ঐ যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থাপত্য-শিল্পেও গুপ্তযুগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের কালে গুপ্তযুগের স্থাপত্য-নিদর্শনের প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু বর্তমান উত্তরপ্রদেশে গুপ্তযুগের প্রস্তর নির্মিত একটি এবং ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হইতে ঐ যুগের স্থাপত্য শিল্পোৎকর্ষের মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। অজন্তার গুহা-মন্দিরগুলিও গুপ্তযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। পাহাড় কাটিয়া এই গুহা-মন্দিরগুলির নির্মাণ সুনিপুণ শিল্প-কৌশলের পরিচায়ক। এই সকল গুহা-মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে অঙ্কিত চিত্রাদি ঐ যুগের চিত্রশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অজন্তাচিত্রগুলির মধ্যে মাতা ও পুত্র (যশোধরা ও রাহুল), রাজকুমারীর মৃত্যু, চীনা ভিক্ষু সমভিব্যাহারে বৌদ্ধ সভা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্প

চিত্রশিল্প; অজন্তা চিত্র

ধাতুশিল্পও গুপ্তযুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দিল্লীর নিকটে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ ও উহার কারুকার্য আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নালন্দায় প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের একটি তাম্রমূর্তি এবং বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের অসংখ্য মুদ্রা ঐ যুগের ধাতুশিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ধাতুশিল্পের উন্নতি: চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ, বুদ্ধের তাম্রমূর্তি ও অসংখ্য মুদ্রা

বিজ্ঞান: জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুপ্তযুগে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল। আর্যভট্ট ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রবিদ্, বরাহমিহির ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্।

গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নতি: আর্যভট্ট ও বরাহমিহির

চিকিৎসাশাস্ত্র ঐ সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। শল্য চিকিৎসাও তখন অবিদিত ছিল না।

বৈষ্ণব, শৈব ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য : ধর্মক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা

ধর্ম : গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অপরাপর ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই সময়ে বৈষ্ণব, শৈব ও বৌদ্ধধর্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির* কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গুপ্ত রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ধর্মানুরাগ ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয় নাই। ধর্মপালনের স্বাধীনতা সকলেই ভোগ করিত। প্রাচীনকাল হইতেই পরধর্মসহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মের মূলনীতি অন্যতম হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। গুপ্তবংশের রাজারা হিন্দুরাজগণের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থে গুপ্ত সম্রাটগণ সমভাবে ব্যয় করিতেন।†

গুপ্তযুগ পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনীয়

গুপ্তযুগকে সাধারণত গ্রীক ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। পেরিক্লিসের যুগে আথেন্স সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়া এক চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, এ্যারিস্টোফেনিস, ইউরিপিডিস্ প্রভৃতি ছিলেন ঐ সময়ের নাট্যকার এবং ফিডিয়াস ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। ইক্টিনাস্ ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্থপতি। দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ যুগে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। গুপ্তরাজত্বকালেও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতির চরম উন্নতি গুপ্তযুগকে ঠিক অনুরূপভাবেই পেরিক্লিসের যুগের ন্যায় অমরত্ব দান করিয়াছে।

গুপ্তযুগে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ (Contacts with the outside World) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। আলেকজান্ডার ও সেলিউকসের অভিযানের পর পাশ্চাত্য জগতের সহিত যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের

* "That Buddhism was flourishing is proved beyond doubt by the great mass of decorative sculpture and number of images discovered at Sarnath alone of all places." R. D. Banerjee, *The Age of the Imperial Guptas*, p. 137.

† "The principal religions of the time were Vaishnavism, Saivism and Buddhism. Permanent benefactions in support of each of these religions were encouraged by the state." P. K. Mookerji, *The Gupta Empire*, p. 51.

পতনের পর ব্যাক্ট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীকগণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এইসব সূত্রে এবং বিশেষভাবে মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় ভারতবর্ষ, চীন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এক মিলনক্ষেত্র-স্বরূপ ছিল। কুষাণ যুগেও এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে গান্ধার অঞ্চলে এক মিশ্রিত শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পরবর্তী কালেও এই পরস্পর আদান-প্রদান ও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এলিজাবেথের যুগে বহির্জগতের সহিত ইংলণ্ডের যোগাযোগের ফলে যেমন এক অতি উন্নত ধরনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীর মনের যে প্রসার ঘটিয়াছিল তাহারই প্রকাশ গুপ্তযুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ—পূর্বালোচনা

পাশ্চাত্যের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ রোমান জ্যোতির্বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্তাহের দিনগুলির ভারতীয় নাম ও পাশ্চাত্য নামের সহিত সামঞ্জস্য এ-বিষয়ে লক্ষণীয়। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছিল।

রোমান ও গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব

রোমান মুদ্রার অনুকরণে কুষাণ রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুপ্ত আমলেও এই রীতি চালু ছিল। এমন কি, গুপ্ত রাজগণ রোমান মুদ্রা 'দেনারিয়াস্' (Denarius)-এর অনুকরণে তাঁহাদের মুদ্রার নাম দিয়াছিলেন 'দীনার'। ওজনের দিক দিয়াও গুপ্ত আমলের মুদ্রা ও রোমান মুদ্রার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে অবশ্য এই ওজনের পরিবর্তন করা হইয়াছিল। গুপ্তযুগের রৌপ্যমুদ্রার ওজন শকদের মুদ্রার ওজনের সমান ছিল।

রোমান ও শক মুদ্রার অনুকরণ

কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যখন পরিপূর্ণতা ঘটে, তখনই উহা নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অপরাপর দেশকেও প্রভাবিত করিবার শক্তি সঞ্চয় করে। গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল. বলা বাহুল্য। তাই সেই যুগে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। এই সকল দেশ 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য গুপ্তযুগের পূর্ব হইতেই এই সকল অঞ্চলে বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। গুপ্তযুগে এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা, লিপি প্রভৃতি সবকিছু সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তৎকালে এতদ অঞ্চলে শৈবধর্মেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় উপনিবেশ: মালয় দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে ভারতীয় উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এগুলির কয়েকটি দীর্ঘ এক হাজার বৎসর পর্যন্ত টিকিয়াছিল। চম্পা (বর্তমান আনাম) ও কম্বোজ ছিল এই ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কালক্রমে কম্বোজ রাজ্যটি চম্পা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান কোচিন চীন, লাওস, শ্যাম, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের একাংশ কালক্রমে কম্বোজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কম্বোজের আংকোর-ভাট ও আংকোর-থোম মন্দির দুইটি ভারতীয় উপনিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। আংকোর-ভাট-এর মন্দিরটি একটি বিষ্ণুমন্দির।

চম্পা ও কম্বোজের প্রাধান্য

আংকোর-ভাট ও আংকোর-থোম

মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি লইয়া শৈলেন্দ্র বংশ নামে এক প্রতাপশালী রাজবংশের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন্দ্র বংশের রাজগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী। চীনদেশ ও ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের দূত আদান-প্রদান চলিত। বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের নিকট রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবপাল তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া পুতুলনাচও দেখান হইত।

শৈলেন্দ্র বংশ—ভারত ও চীনের সহিত যোগাযোগ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এইরূপ ব্যাপক বিস্তার সেই যুগের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ এবং বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস করিবার শক্তির পরিচায়ক। সমগ্র সুবর্ণভূমিতে এবং পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব-বিস্তৃতির কথা স্মরণ করিলে সেই যুগের ভারতবাসী যে এক শক্তিশালী সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাব

খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তযুগে মধ্য-এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্য-এশিয়া, কাশ্মীর, মধ্য-ভারত, বাণারস, গান্ধার প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ প্রচারকগণ সেই যুগে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কুমারজীব, সঙ্ঘভূতি, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মযশ, বুদ্ধযশ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক গুণবর্মন যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনদেশে ধর্মপ্রচার ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্যে গুণবর্মন ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে

চীনদেশ ও ভারতবর্ষ

নানকিং পৌঁছিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বাণারসের প্রজ্ঞারুচি, মধ্য-ভারতের গুণভদ্র, গান্ধারের জিনভদ্র, জিনযশ চীনদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক ধর্মদূত চীনদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতিও চীনদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জনের এক প্রবল আগ্রহ চীনাদের মধ্যে জন্মিয়াছিল। ইহার ফলেই ফা-হিয়েন পাঁচজন অনুচরসহ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আরও পাঁচজন চৈনিক পরিব্রাজক তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেই অবশ্য ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। চে-মং নামে অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজকের সহিত পাঁচজন চীনাবাসী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন (৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে পরবর্তী কালেও চীনদেশ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

চীনদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

এই যুগে বৌদ্ধধর্ম তুর্কীদের মধ্যেও যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। জনৈক চীনা পরিব্রাজক পশ্চিম-তুর্কীস্তানে উপস্থিত হইয়া তুর্কী দলপতি টো-ফো-কঘান-কে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

তুর্কীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন (The Downfall of the Gupta Empire): সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টা ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে যে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগ হইতে উহা পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। পঞ্চম শতকের শেষ দিকে সুরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্তবংশের আর কোন রাজা গঙ্গা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী সমতলখণ্ডে আধিপত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন নাই। ঐ সময়ে মালবদেশের পূর্বাংশ এবং উত্তরবঙ্গ নামেমাত্রই গুপ্ত রাজগণের আধিপত্যাধীন ছিল। আর্যাবর্ত তখন মৌখরি ও পুষ্যভূতি বংশের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় গুপ্তরাজগণ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন। চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত যুঝিয়া গুপ্তরাজগণ সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা দূরের কথা, নিজেরাই এমন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে (৫৫৫ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছিল।

ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত

সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি জানিতে পারা যায়। সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা করিলে অন্তত কতকগুলি কারণ সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য অথবা মুসলমান আমলের [illegible]

সাম্রাজ্য মাত্রেরই পতনের কারণগুলির সাদৃশ্য

ও মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পশ্চাতে এই একই ধরনের কতকগুলি কারণ পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতেও ঠিক ঐ ধরনের কতকগুলি কারণ বিদ্যমান ছিল, বলা বাহুল্য।

(১) পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ

(১) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্র জাতিকে দমন করিয়া সাময়িকভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দান করিতে পারেন নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই অপর দিক হইতেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইল।

(২) হূণজাতির আক্রমণ

(২) এই বিপদ আসিল বাহির হইতে; পুষ্যমিত্রদের বিদ্রোহ দমন করিতে না করিতেই হূণজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের মালব এবং পাঞ্জাব সাম্রাজ্যচ্যুত হইল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য পরবর্তী সম্রাটদের ছিল না। ফলে, হূণজাতি মধ্য-ভারতের এরান জেলা পর্যন্ত একপ্রকার বিনা বাধায় অগ্রসর হইল।

(৩) সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারিবৃন্দের স্বার্থপরতা

(৩) এইভাবে সম্রাটদের অকর্মণ্যতাহেতু বিদেশী আক্রমণকারিগণ যখন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল, তখন সুযোগ বুঝিয়া সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারিবৃন্দ নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

(৪) অধীন নৃপতিগণ কর্তৃক আনুগত্য অস্বীকার

(৪) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকগণও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলভী রাজ্য এবং মৈত্রক জাতি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাংলাদেশের শাসকগণ ও মধ্য-ভারতের মৌখরিগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। যশোধর্মন্ গুপ্ত সাম্রাজ্যের আনুগত্যাধীনে ছিলেন। হূণগণ যখন অপ্রতিহতভাবে মধ্য-ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন যশোধর্মন্ হূণদের পরাজিত করিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার প্রতিপত্তি ও সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে তিনিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন।

(৫) যুবরাজগণের স্বার্থপরতা ও পরস্পর দ্বন্দ্ব

(৫) পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের অংশ আত্মসাৎ করিবার জন্য গুপ্ত রাজপরিবারের যুবরাজগণের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন, এমন কি, স্থানীয় শাসকদের পরস্পর [illegible] কলহে [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] রাজ্যহানি ও শক্তিহীনতা বৃদ্ধি পাইতে চলিল।

(৬) গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও ক্ষমতা-বিস্তারে হিন্দুধর্মাবলম্বী সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি যে সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন পরবর্তী কালের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গুপ্ত সম্রাটগণের স্বভাবতই সেই ক্ষমতা বা পারদর্শিতা ছিল না। বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ-নামধারী সম্রাটগণের সামরিক দক্ষতা বজায় রাখিবার ক্ষমতা বা মনোবৃত্তি কিছুই ছিল না। সংকটকালে সাম্রাজ্য রক্ষা করা স্বভাবতই তাঁহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

(৬) বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্রাটগণের সামরিক অকর্মণ্যতা

হূণ আক্রমণ : ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য

(Hun Invasion : Political Disruption in India)

হূণ* আক্রমণ (Hun Invasion) : গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে হূণ আক্রমণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। বুধগুপ্ত বা বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যুর পর মালবের পূর্বাংশ এবং সাকল (বর্তমান শিয়ালকোট) হূণদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের আমলে হূণ আক্রমণ প্রতিহত

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হূণজাতি (হিউং-নু) উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়াছিল (১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিছুকাল পর হূণজাতিও পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। হূণজাতির এক শাখা ইওরোপে এবং অপর শাখা আমুদরিয়া বা অক্ষু নদীর (Oxus) উপত্যকা-ভূমিতে বাস করিতে থাকে। ইহারা শ্বেত হূণ (White Huns or Ephthalites) নামে অভিহিত হইত। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে এই হূণশাখা গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চম শতকের শেষ এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে হূণদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। তোরমাণ ও মিহিরকুল বা মিহিরগুল নামে দুইজন নেতার অধীনেই হূণজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

হূণদের পরিচয়

তোরমাণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের কতক স্থান অধিকার করিয়া মালব দেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। কিন্তু গুপ্তসম্রাট ভানুগুপ্তের হস্তে পরাজিত হওয়ার তাঁহার অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছিল।

তোরমাণ

তোরমাণ-এর পুত্র মিহিরগুল ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনি রক্তপিপাসু। তাঁহার আমলে হূণ অধিকার গোয়ালিওর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য গুপ্ত মিহিরগুলকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার আদেশে তিনি মিহিরগুলকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া বালাদিত্য মধ্য-ভারত হূণ অধিকার-মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু বালাদিত্যের হস্তে পরাজিত হওয়ার পরও মিহিরগুলের রাজ্যজয়ের স্পৃহা কমে নাই। তিনি পুনরায় রাজ্যজয়ে অগ্রসর হইলে মান্দাসোর-এর রাজা যশোধর্মন কর্তৃক শোচনীয়রূপে

মিহিরগুল

---

* হূণ বা হুন।

পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিহিরগুলের রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মিহিরগুল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও ক্ষুদ্র হূণ দলপতিগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবদেশের স্থানে স্থানে ভারতীয় নৃপতিদের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোনপ্রকারে টিকিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁহারা রাজপুত জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।* (রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

হূণ শাসনের অবসান

যশোধর্মন্ (Yasodharman) ঃ মধ্য-ভারতের রাজা যশোধর্মন্ ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁহার কৃতিত্বের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেন নাই। বস্তুতপক্ষে দুর্ধর্ষ হূণ নেতা মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া তিনি মধ্য-ভারত ও অপরাপর স্থানে হূণ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা প্রতিহত করিয়া ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন।

যশোধর্মনের হস্তে হূণশক্তির পরাজয়

যশোধর্মন্ প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন স্থানীয় শাসক ছিলেন। তাঁহার কর্মকেন্দ্র ছিল দশপুর (Dasapura or Mandasor)। দুর্বল গুপ্ত রাজগণের আমলে যশোধর্মন্ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়া নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। তিনি হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে তিনি নিজেকে 'সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পূর্বঘাট এবং হিমালয় হইতে 'পশ্চিম মহাসাগর' (Western Ocean) অর্থাৎ আরব সাগর পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের রাজগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন।

যশোধর্মনের সাম্রাজ্য

কোন কোন ঐতিহাসিক যশোধর্মন্‌কে 'শকারি বিক্রমাদিত্য' ভিন্ন অপর কেহ নহেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মতবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ উহার সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

'শকারি বিক্রমাদিত্য' ও যশোধর্মন্ কি একই ব্যক্তি (?)

কনৌজের মৌখরি বংশ (The Maukharis of Kanauj) ঃ প্রাচীনকাল হইতেই মগধের সামন্ত রাজবংশ মুখর বা মৌখরি বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে মৌখরি রাজগণ উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে গুপ্তরাজগণের সহিত সংগ্রামে

মগধের সামন্ত রাজবংশ হিসাবে প্রথম পরিচয়

* "Petty Huna Chieftains continued to rule over circumscribed area in North-West India and Malwa waging a perpetual warfare with indigenous princes till they were absorbed into the Rajput population". *Advanced History of India*, p. 154.

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৌখরি বংশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। বর্তমান উত্তর-প্রদেশের জৌনপুর ও বারাবাঁকী জেলা, বিহার প্রদেশের গয়া জেলা এবং রাজপুতানার কোটারাজ্যে মৌখরিদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন শাখা

হরিবর্মন্ ছিলেন মৌখরি বংশের স্থাপয়িতা। এই বংশের রাজা ঈশ্বরবর্মনের আমলে মৌখরি বংশ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। ঈশ্বরবর্মন্ অন্ধ্ররাজকে পরাজিত করিয়া ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মালবদেশের ধারা (Dhara) এবং রৈবত পর্বত (গিরনার) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মৌখরি বংশের রাজধানী ছিল কনৌজ।

মৌখরি বংশের স্থাপয়িতা হরিবর্মন্: ঈশ্বরবর্মনের রাজ্য-বিস্তৃতি

ঈশ্বরবর্মনের পুত্র ঈশানবর্মন্ মগধের গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব দিকে গৌড় জয় করিয়াছিলেন এবং নিজরাজ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর-উড়িষ্যার শূলিক রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের তেলেগু রাজ্য অন্ধ্র জয় করিয়াছিলেন। পূর্বে ঈশ্বরবর্মন্ ও মৌখরি রাজ্যের সীমান্তবর্তী অন্ধ্ররাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মন্ পাঞ্জাবের হূণ দলপতিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 'মহা-রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া তাঁহার মর্যাদা ও প্রতিপত্তির পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

ঈশানবর্মন্

ঈশানবর্মনের পর তাহার পুত্র সর্ববর্মন্ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মগধরাজ দামোদরগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। পশ্চিম হূণদেরও তিনি পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন।

সর্ববর্মন্

সর্ববর্মনের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে অবন্তীবর্মন্ ও গ্রহবর্মনের নামের উল্লেখ আছে। সর্ববর্মন্ ও অবন্তীবর্মনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না, তবে গ্রহবর্মন্ ছিলেন অবন্তীবর্মনের পুত্র। গ্রহবর্মন্ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা (রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগিনী) রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর মৌখরি বংশের অবসান ঘটিলে কনৌজও থানেশ্বর রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

অবন্তীবর্মন্ ও গ্রহবর্মন্

বাকাটক বংশ (The Vakatakas) : মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল লইয়া গঠিত বাকাটক রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাকাটক বংশ দীর্ঘকাল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি নামে জনৈক সাধারণ ব্যক্তি। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র (প্রথম) প্রবরসেন এই বংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার আমলে বাকাটক রাজ্য [illegible] করিয়াছিল। প্রবরসেনের পর তাঁহার পৌত্র (প্রথম) রুদ্রসেন রাজা

বিন্ধ্যশক্তি প্রথম প্রবরসেন

প্রথম রুদ্রসেন, প্রথম পৃথিবীসেন, দ্বিতীয় রুদ্রসেন

হন। রুদ্রসেনের পুত্র (প্রথম) পৃথিবীসেন কুন্তলদেশের (বর্তমান ধারওয়ার ও উত্তর-কানাড়া) রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার-ই পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল, কারণ বাকাটকগণকে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালবের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ

রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর রাণী প্রভাবতী নিজ নাবালক পুত্র যুবরাজ দিবাকর সেনের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রুদ্রসেন ও রাণী প্রভাবতীর বংশধরগণ আরও দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান নাসিক ও ঔরঙ্গাবাদ জেলার কলচুরি বা কলসুরি নামে এক দক্ষিণ-ভারতীয় গোষ্ঠীর হস্তে বাকাটক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠ শতকে বাকাটক শক্তির অবসান

বলভীর মৈত্রক বংশ (The Maitrakas of Valabhi) : পঞ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্ত সম্রাটদের জনৈক সেনাপতি ভট্টারক কাথিয়াবাড়ে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকের শেষ পর্যন্ত এই বংশের শাসন টিকিয়াছিল। ভট্টারক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেও নিজে এবং তাঁহার পুত্র ধরাসেন 'সেনাপতি' উপাধি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ধরাসেনের পরবর্তী রাজগণ 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৈত্রক বংশের স্থাপয়িতা : ভট্টারক

মৈত্রক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট্ট। তিনি গুর্জররাজ প্রশান্তরাগ-এর সাহায্য লইয়া থানেশ্বর রাজ্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধন ধ্রুবভট্টের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে বলভীর মৈত্রক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনও মৈত্রক রাজবংশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধু অঞ্চলে আরবদের আক্রমণে বলভী রাজ্যের অবসান ঘটে।

ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট্টের সহিত হর্ষবর্ধনের কন্যার বিবাহ

আরবদের হস্তে মৈত্রক শাসনের অবসান

গৌড় রাজ্য (Kingdom of Gauda) : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে-সকল স্থানীয় রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির মধ্যে গৌড় রাজ্য ছিল অন্যতম প্রধান। গৌড় ঐ সময়ে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ও বর্ধমান বিভাগের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত ছিল। বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি গৌড় রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে গৌড় রাজ্য পশ্চিমে কনৌজের সীমা এবং দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু গৌড় রাজ্যের পশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃতি মৌখরিরাজগণ কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল।

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীকে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মালবে গুপ্ত সম্রাটদের জনৈক বংশধর দেবগুপ্ত রাজত্ব করিতেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনৌজ আক্রমণের অভিপ্রায়ে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মিত্রতা প্রার্থনা করেন। শশাঙ্ক মৌখরিরাজ কর্তৃক পূর্বে প্রতিহত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সাগ্রহে দেবগুপ্তের মৈত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা

দেবগুপ্তের সহিত শশাঙ্কও গ্রহবর্মনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্মনকে নিহত করেন এবং গ্রহবর্মনের রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। ইহার পর শশাঙ্ক থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনকে কূটকৌশলে হত্যা করিলেন।

রাজ্যবর্ধনের হত্যা

এইভাবে শশাঙ্ক নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিলে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যুগ্মভাবে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করেন। পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া শশাঙ্ক বাংলাদেশ ও বিহার ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।* শোন নদ হইতে দক্ষিণ-উড়িষ্যা পর্যন্ত তখনও তাঁহার শাসন অটুট ছিল। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর পরেও (৬১৯) শশাঙ্ক বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং কঙ্গোদ রাজ্যের (গঞ্জাম) দ্বিতীয় মাধববর্মন্ ছিলেন তাঁহার আনুগত্যাধীন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে. শশাঙ্ক বাংলা ও বিহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।† হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে শশাঙ্ক থানেশ্বর রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু হিসাবে বিবেচিত হইতেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে পারেন নাই। হর্ষবর্ধনের বিজেতা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শশাঙ্ক নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কের বাংলা ও বিহার ত্যাগ

শশাঙ্ক দুর্দমনীয়

(বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

কামরূপ রাজ্য (Kingdom of Kamrupa): কামরূপ রাজ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে। কামরূপ রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সীমান্তবর্তী রাজ্য ছিল এবং গুপ্তসম্রাটকে বাৎসরিক কর দান করিত। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ও পুষ্যভূতি বংশের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন্

---

* 'Sasank was thus attacked from both flanks and compelled to retire from Magadha.........compelled to leave Bengal and Bihar for Orissa." Vide: R. D. Banerjee, *Pre-historic Ancient & Hindu India*, p. 200.

† Vide: *The Classical Age*, p. 107.

সম্পর্কে নিধনপুর অনুশাসনের উল্লেখ আছে। ভাস্করবর্মনের অনুশাসনে পুষ্যবর্মন্ হইতে আরম্ভ করিয়া মোট এগার জন রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল রাজার মধ্যে ভাস্করবর্মনের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উল্লেখ বাণভট্টের হর্ষচরিতে পাওয়া যায়। ভাস্করবর্মনের পিতার নাম ছিল সুস্থিতবর্মন্। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ভাস্করবর্মন্ হংসবেগ নামক এক দূতকে হর্ষবর্ধনের সভায় মৈত্রীর প্রস্তাব এবং বিবিধ উপঢৌকনসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শশাঙ্ককে দমন করিবার হর্ষবর্ধনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, সুতরাং ভাস্করবর্মনের সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে ভাস্করবর্মন্ হর্ষবর্ধনের কতকটা আনুগত্যাধীন হইয়া পড়িলেন বলা যায়। ইহার পর শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণে তিনিও হর্ষবর্ধনের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সাময়িক কালের জন্য হয়ত ভাস্করবর্মন্ কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ) অধিকার করিয়াছিলেন।

ভাস্করবর্মনের বংশ-পরিচয়

হর্ষবর্ধনের সহিত আনুগত্যমূলক মৈত্রী

ভাস্করবর্মন্ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ছিল। হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধর্মানুষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ কামরূপ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

থানেশ্বর : হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
(Thaneswar : Empire of Harshavardhan)

পুষ্যভূতি বংশ (The Pushyabhuti House) : খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কুরুক্ষেত্রের অনতিদূরে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ক্রমেই প্রতিপত্তি অর্জন করিতে থাকে। রাজা প্রভাকরবর্ধনের অধীনে থানেশ্বর রাজ্য সাম্রাজ্যের মর্যাদা লাভের পথে অগ্রসর হয়। প্রভাকরবর্ধন মালব দেশ, পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হূণ অধিকৃত স্থানগুলি এবং রাজপুতানার গুর্জর জাতিকে জয় করিয়া রাজ্যসীমা ও প্রতিপত্তি উভয়ই বৃদ্ধি করেন। মাতার দিক দিয়া প্রভাকরবর্ধন গুপ্তবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটদের রক্ত যাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত, সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার থাকিবেই, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য হূণদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি যুবরাজ রাজ্যবর্ধনকে হূণদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধন হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজ সমরকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধন নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীকে কনৌজের মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়।

প্রভাকরবর্ধন

রাজ্যবর্ধন ৬০৫—৬০৬ (Rajyavardhan) : প্রভাকরবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌখরি ও পুষ্যভূতি বংশের শত্রু মালবরাজ দেবগুপ্ত এই সময়ে কনৌজ আক্রমণ করিয়া রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মালবরাজ দেবগুপ্তকে অনায়াসে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করেন। শশাঙ্ক শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজ্যবর্ধনকে নিজ শিবিরে আহ্বান করিয়া আনিয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন এই বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়া থাকেন।* কিন্তু হর্ষবর্ধনের দুইটি অনুশাসনে এই ঘটনার প্রকৃত বিবরণ রহিয়াছে। এই বিবরণ দুইটি হইতে জানা যায় যে, প্রভাকরবর্ধন ও

রাজ্যবর্ধনের সিংহাসন লাভ

দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত

* "Rajyavardhan was allured into confidence by false civilities on the part of (Sasanka) the king of Gauda and then weaponless, confiding and alone, despatched in his own quarters." Vide : *Advanced History of India*, p. 166.

"In a duel between Sasanka and Rajyavardhan, the latter was killed."

শশাঙ্কের মধ্যে শশাঙ্কের শিবিরে এক মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল এবং উহাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ-বিষয়েও মতানৈক্য রহিয়াছে।*

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ (Harshavardhan) ঃ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটিলে হর্ষবর্ধনের সম্পর্কিত ভ্রাতা রাজসভার সভাসদ্ ভাণ্ডির প্রস্তাবক্রমে রাজসভা হর্ষবর্ধনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। হর্ষবর্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাজপদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ্-এর বর্ণনায় এই কথা সমর্থিত হইয়াছে। গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসনও শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কনৌজের রাজ্যও হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত হইল।

ভাণ্ডির প্রস্তাবে সভাসদ্‌গণ কর্তৃক হর্ষবর্ধনকে সিংহাসন দান

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আছে। ঐ যুগের শিলালিপি, অনুশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি ছাড়া বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ, এই দুইটি উপাদানে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন, হিউয়েন-সাঙ্-এর বন্ধু হুই-লি (Hwui-li) হিউয়েন-সাঙ্-এর একখানি জীবনী রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট আছে।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য

সিংহাসন লাভের পর হর্ষবর্ধন প্রথম ছয় বৎসর (৬০৬-৬১২) 'যুবরাজ শিলাদিত্য' নামেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম রাজোচিত উপাধি গ্রহণ করেন। রাজোচিত উপাধি ধারণে এই বিলম্ব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ্ অবশ্য তাঁহার বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন যে, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের আদেশ অনুসারে হর্ষবর্ধন 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করে নাই, তিনি 'রাজপুত্র' ও 'শিলাদিত্য' নামেই নিজেকে অভিহিত করিয়াছিলেন।†

রাজোচিত উপাধি ধারণে বিলম্ব

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর উদ্ধার ও ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে শাস্তিদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।‡ বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুসারে

* "Banabhatta the paid historigrapher of court of Thaneswara, denounces this duel in very strong terms, and modern historians have followed him in calling the slaying of Rajyavardhan a treacherous murder. But in two grants of Harshavardhana the event is correctly described as a duel." R. D. Banerjee, *Pre-historic Ancient & Hindu India*, p. 199.

† Vide : *The Classical Age*, p. 100.

‡ "I swear that unless in a limited number of days I clear this earth of Gaudas... then will I hurl my sinful self, like a moth into an oil-fed flame. *Harsha Charita*, Quoted in *The Classical Age*, p. 99.

হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাজ্যশ্রীর কনৌজ হইতে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ পাইয়া বিন্ধ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে যখন রাজ্যশ্রী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত ঠিক সেই সময়ে পার্বত্য জাতির কয়েকজন নেতার সাহায্যে হর্ষবর্ধন তাঁহার সন্ধান পান। বহু চেষ্টায় তিনি রাজ্যশ্রীকে থানেশ্বরে ফিরাইয়া লইয়া আসেন। 'ফাং-চি' (Fung-chi) নামক চৈনিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর সহযোগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। অন্তত ৬০৬ হইতে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন ভগিনীর সহযোগে যুগ্মভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ইহা মনে করা ভুল হইবে না।

রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার

হর্ষবর্ধনের সমর অভিযান (Military Campaigns of Harshavardhan): বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে যে, হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতীয় নৃপতিদিগকে তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে, অন্যথায় যুদ্ধ করিতে আহ্বান জানাইয়া অল্পকাল পরেই বিশাল সেনাবাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। পাঁচ হাজার হস্তী, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের চিরাচরিত যুদ্ধরথের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়

প্রথমেই হর্ষবর্ধন তাঁহার ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে সমুচিত শাস্তি দানের জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি ভাণ্ডির হস্তে গৌড়-এর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ার ভার ন্যস্ত করিয়া ভগিনীকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বিন্ধ্যপর্বত হইতে ভগিনীকে উদ্ধার করিবার পর সম্ভবত তিনি পুনরায় তাঁহার সেনাবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন্ শশাঙ্কের প্রতিপত্তিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সামরিক অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে কোন তথ্যাদি জানা যায় না। তবে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক যে বাংলা, দক্ষিণ-বিহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, হর্ষবর্ধন সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক নিজ প্রাধান্য ও রাজত্ব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত সকল স্থান নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্মনের নিধনপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের একাংশ তাঁহার অধীনে ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হর্ষবর্ধনকে

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান

শশাঙ্কের জীবদ্দশায় অকৃতকার্যতা

যুদ্ধে সহায়তাদানের পুরস্কারস্বরূপ অথবা হর্ষের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের কতকাংশের উপর ভাস্করবর্মনের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল।

হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন ছয় বৎসর ক্রমাগত 'পঞ্চভারত' (*Five Indies*)-এর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে কিছুকালের জন্যও তাঁহার হস্তিবাহিনী ও পদাতিকবাহিনী সমর-সজ্জা ত্যাগ করে নাই। ইহার পর হর্ষবর্ধন নিজ সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদির আলোচনা করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ হিউয়েন-সাঙ্-এর উক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। কিছুকাল পূর্বাবধি হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে যে অহেতুক উচ্চ ধারণা বিদ্যমান ছিল আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে উহা আংশিকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে অহেতুক ধারণা

যাহা হউক, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পর হর্ষবর্ধন সুরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সাময়িকভাবে বলভী রাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলভীরাজ ধ্রুবসেন, গুর্জররাজ দ্বিতীয় দদ্দ (Dadda II)-এর সহায়তায় নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদুপরি হর্ষবর্ধন ধ্রুবসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহও দিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে এই সকল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্ষবর্ধন তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই ধ্রুবসেনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধ্রুবসেনের লিপি (inscription) এবং হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধনের আমলে বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মালব ও উত্তর-গুজরাটের উপর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে অভিযান

দক্ষিণ-ভারতের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিত যুদ্ধে হর্ষবর্ধন পরাজিত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাকে দক্ষিণ-ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; ডক্টর স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ঐহোল (Aihole) লিপিতে উল্লেখ আছে যে, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আধিপত্য লাট, মালব ও গুর্জরগণের উপর বিস্তৃত ছিল। ইহা হইতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য যে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না তাহাই প্রমাণিত হয়।*

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ষবর্ধনের পরাজয়

* Vide: *The Classical Age*, p. 106-7.

সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি যখন সিন্ধুদেশ পর্যটনে গিয়াছিলেন, তখন উহা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। যাহা হউক, হর্ষবর্ধন সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধেও হয়ত সাময়িক সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সাময়িক সাফল্য

সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে যে, হর্ষবর্ধন 'তুষার শৈল' দেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া সেখান হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিয়া তিনি সেখান হইতে গোতম বুদ্ধের দেহাবশেষ (দাঁত) লইয়া আসিয়াছিলেন। এই দুইটি অভিযান কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

তুষার শৈল ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অভিযান

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (The Extent of Harshavardhan's Empire): হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী, প্রয়াগ প্রভৃতি অঞ্চল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন মগধ এবং উড়িষ্যাও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল একথা হিউয়েন-সাঙ্-এর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। জলন্ধরের রাজা উদিত এবং পূর্ব-মালবের রাজা মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের অধীন ছিলেন। "সম্রাটের (হর্ষবর্ধনের) সেনাবাহিনী প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়াছিল। উত্তরে তুষারাবৃত পর্বত হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে গঞ্জাম হইতে পশ্চিমে বলভী পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।"* কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন্ হর্ষবর্ধনের অনুগত ছিলেন। হর্ষবর্ধনের প্রধান শত্রু দ্বিতীয় পুলকেশীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সিন্ধু, বলভী, কাশ্মীর প্রভৃতি দূরবর্তী রাজ্যগুলিও হর্ষবর্ধনের শক্তি ও প্রতিপত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কে. এম. পানিক্কার-এর মতে হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরস্থ সকল দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন; এমন কি, কাশ্মীর এবং নেপালও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।†

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মতানৈক্য

তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

কিন্তু ডক্টর মজুমদার হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই

* "The Emperor's army had overrun almost the whole of Northern India, from the snowy mountains of the north to the Nerbudda in the south, and from Ganjam in the east to Valabhi in the west"—*An Advanced History of India*, p 158.

† "Nepal and Kashmir were also within this empire...While his authority north of the Vindhyas was complete, Harsha's aims met with a definite setback when he advanced towards the south." Panikkar, *A Survey of Indian History*, p. 77.

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
মুলতান
থানেশ্বর
ইন্দ্রপ্রস্থ
সিন্ধু নং
মথুরা
কনৌজ
কাশী
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
মগধ
গয়া
উজ্জয়িনী
গৌড়
তাম্রলিপ্ত
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
অজন্তা
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাঞ্চী
মাদুরা
সিংহল
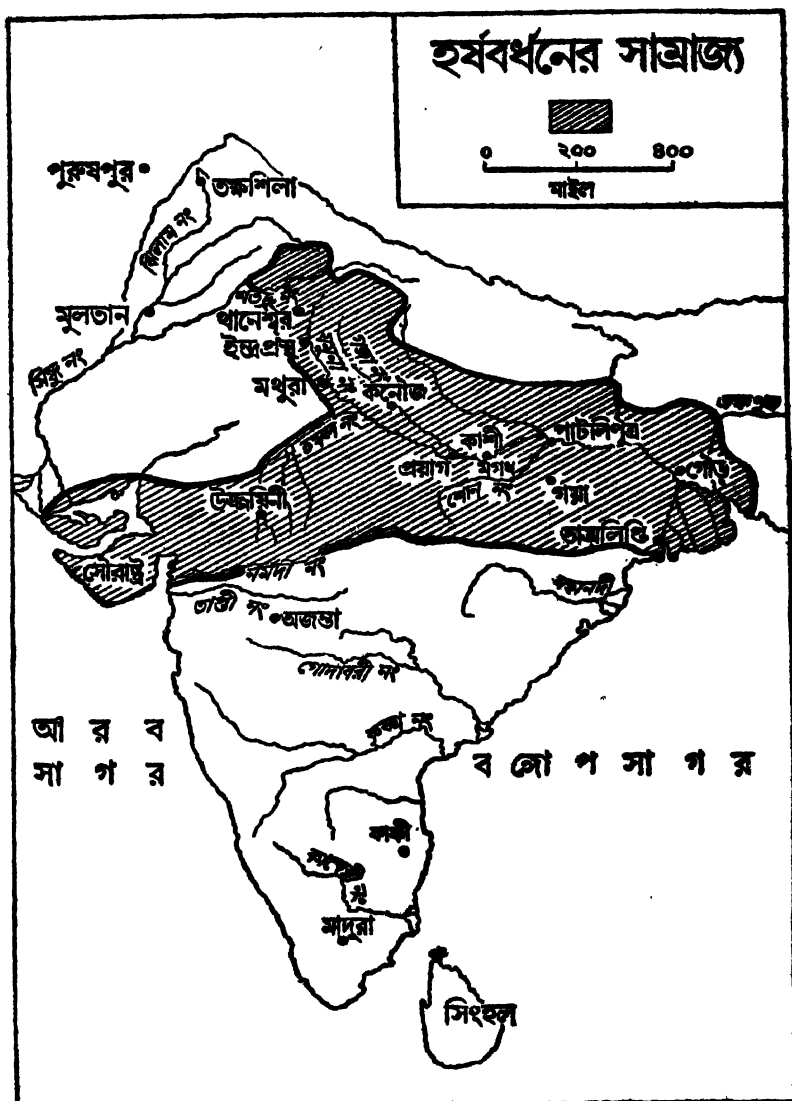
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ—এই কয়েকটি দেশ লইয়া গঠিত ছিল। বাংলাদেশে হর্ষবর্ধনের আধিপত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন।*

ডক্টর মজুমদারের মত

যাহা হউক, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছান এযাবৎ সম্ভব হয় নাই।†

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা (Harshavardhan's Administration): হর্ষবর্ধন তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসনব্যাপারে নিজের ক্ষমতার উপর সর্বাধিক নির্ভর করিতেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে সুশাসন বজায় থাকে সেজন্য হর্ষবর্ধন সর্বদা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে রত থাকিতেন। একমাত্র বর্ষাকালে যখন চলাচলের অসুবিধা ঘটিত ঐ সময়ে তিনি পরিদর্শন কার্য হইতে নিরস্ত থাকিতেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হর্ষবর্ধন অক্লান্তভাবে শাসনকার্যে রত থাকিতেন।

ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন

মৌর্য বা গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় যেরূপ শাসনকার্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল অনুরূপ বিভাগ হর্ষবর্ধনের আমলেও পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন স্বয়ং। তিনি মন্ত্রিপরিষদের ন্যায় একটি পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। প্রাদেশিক শাসনের সর্বোপরি থাকিতেন সামন্তরাজগণ অথবা সম্রাটের প্রতিনিধিগণ। প্রদেশ বা ভুক্তিগুলি জেলা বা বিষয়-এ বিভক্ত ছিল। এগুলি আবার গ্রামে বিভক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার দক্ষতা ও উদারতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারী কার্যাদির বিবরণ লিখিয়া রাখা হইত।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন

সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

হর্ষবর্ধনের আমলে দণ্ডবিধি অবশ্য গুপ্ত যুগের দণ্ডবিধি অপেক্ষা বহু গুণে কঠোর ছিল। কারাদণ্ড, হাত-পা, নাক-কান প্রভৃতি ছেদন ঐ সময়ে প্রচলিত দণ্ডনীতি ছিল। পিতামাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয় ছিল। অতি সাধারণ ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

* "The idea that his (Harsha's) empire included the whole of Northern India would not bear a moment's scrutiny. For Kashmir, Western Punjab, Sindh, Gujarat, Rajputana, Nepal and Kamrupa were certainly independent states in his day.—R. C. Majumder, *Ancient India*, p. 265.

† হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ম্যাপখানি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী অঙ্কিত।

জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকীয় কর্মচারিগণ মুসলমান আমলের ন্যায় জায়গীর অর্থাৎ জমি দান পাইতেন। শ্রমিকগণকে সরকারী কাজ করিতে বাধ্য করা হইত বটে, কিন্তু কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাহাদিগকে দেওয়া হইত; জমির রাজস্ব ভিন্ন অপরাপর কর স্থাপনের রীতিও ছিল, কিন্তু সেগুলির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সামান্য। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত।

রাজস্ব

রাস্তাঘাট বিপদসংকুল

হর্ষবর্ধনের সময় রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা ছিল না। হিউয়েন-সাঙ্ একাধিকবার দস্যুহস্তে সর্বস্ব হারাইয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের আমলে সমাজ (Society under Harshavardhana) ঃ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ, তাঁহারই সমসাময়িক অপর একজন পরিব্রাজক ওয়াং হুয়ান সি, বাণের হর্ষচরিত হর্ষবর্ধনের আমলের ইতিহাসের উৎস বলা বাহুল্য। অবশ্য হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল।

হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ

সেই সময়কার সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। শহরে কসাই, মৎসজীবী, ঘাতক, নৃত্যশিল্পী, চণ্ডাল প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা বসবাস করিতে পারিত না। শহরে প্রবেশ করা এবং বাহির হইবার কালে তাহাদিগকে রাস্তার একেবারে বামপাশ দিয়া চলিতে হইত। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন ব্রাহ্মণগণ। বৌদ্ধ মঠের ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুন্ন করিয়াছিল। গুপ্ত যুগে পদস্থ রাজকর্মচারী-দিগকে জমি ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে হর্ষবর্ধনের আমলেও কোনপ্রকার সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটে নাই বা প্রজাপীড়নের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

সমাজের রক্ষণশীলতা

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য

সাধারণ লোক সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙ্ বলিয়াছেন যে, তাহারা ছিল যেমন মর্যাদাপূর্ণ তেমনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। অর্থের ব্যাপারে তাহারা মোটেই ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইত না। পুনর্জন্মে তাহারা বিশ্বাসী ছিল বলিয়া তাহারা জীবনে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিত না বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত না। কারণ তাহা হইলে পরজন্মে সেজন্য তাহাদিগকে ফলভোগ করিতে হইবে এই ভয় তাঁহাদের ছিল। যাহারা সামাজিক রীতি-নীতি বিরোধী কাজ বা সরকারী আইন ভঙ্গ করিত অথবা অসৎ বলিয়া প্রমাণিত হইত তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। সে সময়কার লোকেদের পোশাক ছিল খুবই সুন্দর। সমাজজীবন সন্তোষপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু ফা-হিয়েনের বিবরণে

সাধারণ লোকের মর্যাদাপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ স্বভাব

সমাজজীবন সন্তোষপূর্ণ ; চুরি, ডাকাতি সম্পূর্ণ অজানা নহে

গুপ্ত যুগে যে পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা ছিল সে পরিমাণ নিরাপত্তা হর্ষবর্ধনের আমলে ছিল না। চুরি, ডাকাতি তখন হইত।

হর্ষবর্ধনের ধর্মমত (Harshavardhan's Religion) : হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে খুব সম্ভবত শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে তিনি বৌদ্ধধর্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পরধর্মের প্রতি হর্ষবর্ধন কেবল সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হর্ষবর্ধন সরাইখানা, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে অসংখ্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিত। গঙ্গাতীরে তিনি অসংখ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পরবর্তী কালে মুঘল সম্রাট আকবরের ন্যায় হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মজ্ঞানীদের সভা আহ্বান করিয়া ধর্মসম্পর্কে তাঁহাদের বিতর্ক শুনিতেন এবং শ্রেষ্ঠ বক্তাকে পুরস্কার দান করিতেন।

প্রথম জীবনে-শৈবধর্মাবলম্বী, পরে বৌদ্ধ

সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ

হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন যখন বাংলাদেশে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত হিউয়েন-সাঙ্-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ্-এর ধর্মজ্ঞান ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিশেষ ধর্মসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে কনৌজের ধর্মসভার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। হর্ষবর্ধন বাংলাদেশ হইতে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন্ ও বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে কনৌজে উপস্থিত হন (৬৪৩ খ্রীঃ)। ভাস্করবর্মন্ বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ভিন্ন অপরাপর আঠার জন করদ-রাজ কনৌজের ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। নালন্দার মঠ হইতে এক হাজার এবং অপরাপর স্থান হইতে আরও তিন হাজার বৌদ্ধভিক্ষু এবং মোট তিন হাজার জৈন ও ব্রাহ্মণ ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কনৌজের ধর্মসভা

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে এক বিশাল মন্দিরসহ মঠ নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই মন্দিরের একশত ফিট উচ্চ দেহের চূড়ার উপর হর্ষবর্ধনের সমান উচ্চতাবিশিষ্ট একটি স্বর্ণ-নির্মিত বৌদ্ধমূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তিন ফিট উচ্চ অপর একটি স্বর্ণ-নির্মিত বৌদ্ধমূর্তি অনুষ্ঠানের প্রতিদিন সম্রাট হর্ষবর্ধন শোভাযাত্রার অগ্রভাগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। সমবেত করদ-রাজগণও এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন। এই ধর্মসভায় চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ্ হীনযান বৌদ্ধধর্মমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিত্বের জন্য ব্রাহ্মণশ্রেণী হর্ষবর্ধনের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কতিপয় ব্রাহ্মণের কুমন্ত্রণায় এক ব্যক্তি তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে

কনৌজের ধর্মসভায় ধর্মানুষ্ঠানাদি

লোকটি ধরা পড়িয়াছিল। ধৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণদের নেতৃবর্গকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন হিউয়েন্-সাঙ্কে প্রয়াগের মেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে মেলা আহ্বান করিয়া পাঁচ বৎসরের সঞ্চয়ের যাবতীয় ধনরত্ন গরীব-দুঃখী ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। হিউয়েন-সাঙ্ প্রয়াগের যে মেলায় উপস্থিত ছিলেন, উহা ছিল হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের ষষ্ঠ মেলা। এই মেলায়ও হর্ষবর্ধনের সামন্ত করদ-রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন প্রায় পাঁচ লক্ষ গরীব-দুঃখী প্রভৃতি সাধারণ লোক এই মেলায় উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের ষষ্ঠ মেলা

প্রয়াগের মেলা মোট ৭৫ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম দিন বুদ্ধের উপাসনা করা হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন সূর্য এবং তৃতীয় দিন শিবের উপাসনা এবং চতুর্থ দিন প্রায় দশ হাজার বৌদ্ধভিক্ষুকে খাদ্যদ্রব্যাদি, বস্ত্র, মণিমুক্তা ও ধনরত্ন দান করা হইয়াছিল। ইহার পর দীর্ঘ কুড়িদিন ধরিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এবং আরও দশদিন ধরিয়া জৈন শ্রমণদিগকে নানাবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছিল। দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আগত সাধু-সন্ন্যাসীদিগকেও আরও দশদিন ধরিয়া নানাবিধ দানে সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। ইহার পর একমাস ধরিয়া গরীব-দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন ভিখারী প্রভৃতি হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল। হর্ষবর্ধন পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ, ধনরত্নাদি নিঃশেষে দান করিতেন। এমন কি, নিজের পরিধানের অলংকার, বস্ত্রাদিও বিলাইয়া দিয়া তিনি নিজে অতি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিতেন।

বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা

বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন, দূরদেশ হইতে আগত সাধু-সন্ন্যাসী ও গরীব-দুঃখীদিগকে বিবিধ দানে পরিতুষ্টকরণ

অর্থনীতি (Economy) : হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে হর্ষবর্ধনের আমলের অর্থনৈতিক অবস্থারও মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড। জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। রাজকর্মচারীদিগকে জমি ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হইত। জমির একাংশের আয় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কতক কতক জমি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বণ্টন করা হইত। দেবস্থান, মঠ, মন্দির, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য জমির একাংশ নির্দিষ্ট ছিল। কোন লোককেই বেগার খাটিতে হইত না। করের পরিমাণও ছিল অতি সামান্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে চালু ছিল, এজন্য

কৃষি

বিভিন্ন কাজের জন্য জমি দান

লঘু করভার

বণিক সম্প্রদায়কে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইত। বাণিজ্য সামগ্রী জল ও স্থলপথে পরিবহনকালে স্থানে স্থানে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। শ্রমের অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হইত। গ্রাম মাত্রেই অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বয়ম্ভর ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য; শুল্ক ব্যবস্থা

হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় সংকুলান, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ধর্মসভার জাঁকজমক ও ব্যাপকভাবে স্বর্ণখণ্ড, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও অপরাপর নানা দ্রব্য বিতরণ হইতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, আর্থিক দিক দিয়া দেশের লোকজন যথেষ্ট উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

আর্থিক সমৃদ্ধি

হর্ষবর্ধনের আমলে সাহিত্য (Literature under Harsha): হর্ষবর্ধন শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তির রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ সাহিত্য-সেবীদের জন্য ব্যয় করা হইত। ঐ সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সেখানে হিউয়েন-সাঙ্ স্বয়ং কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ মোট দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নালন্দায় শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ভিন্ন অপরাপর শাস্ত্র ও সাহিত্যের অধ্যাপনাও সেখানে করা হইত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙ্ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি।

শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধন কেবলমাত্র সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের উৎসাহ দান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নিজেও একজন প্রতিভাশালী নাট্যকার ও কবি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানি সংস্কৃত নাটক হর্ষবর্ধন স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের হস্তাক্ষরও ছিল অতি সুন্দর।

নাট্যকার হর্ষবর্ধন

প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া হর্ষবর্ধন ৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হর্ষবর্ধন কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। স্বভাবতই তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে গঠিত সাম্রাজ্যের পতনের ইঙ্গিতস্বরূপ হইল। উত্তর-ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিল।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যু: উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের ইঙ্গিত

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব (Estimate of Harshavardhan): হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে কিছুকাল পূর্বাবধি যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে আংশিকভাবে অহেতুক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি ভারত-ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের গৌরব ম্লান হয় নাই।

ভারত-ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসন

থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যের এক সংকট মূহূর্তে হর্ষবর্ধন উভয় রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি কনৌজ বা থানেশ্বরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ইহার ফলে হর্ষবর্ধনের সমস্যা জটিলতর হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হর্ষবর্ধন এইরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে নিজেকে কেবল রক্ষা করিতেই সক্ষম হন নাই, ক্ষুদ্র থানেশ্বর রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও শক্তি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য বিনাশ করিয়াছিল, হর্ষবর্ধনের চেষ্টায় সেই ধ্বংসাত্মক প্রভাব সাময়িকভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে তাঁহার রাজনৈতিক প্রাধান্য একপ্রকার সার্বভৌমত্বে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শত্রু এবং বিজেতা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে 'উত্তরাপথ-নাথ' নামে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজগণও তাঁহার অনুগত ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন্ এবং বলভীর রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ভাস্করবর্মন্ ও ধ্রুবসেন সহ মোট কুড়িজন অনুগত রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক আহূত কনৌজ-ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অনুরূপ সংখ্যক অধীন এবং করদ-রাজগণ প্রয়াগের মেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই।

সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার পরিবর্তন ঃ বিশাল সাম্রাজ্যের সংগঠক

উত্তর-ভারতে প্রাধান্য

বিভিন্ন রাজগণের আনুগত্য লাভ

হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে হর্ষবর্ধনের শাসনক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বিজেতা হিসাবে তিনি সমুদ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমপর্যায়ের না হইলেও তাঁহার সামরিক দক্ষতার কথা অস্বীকার করা চলে না। হর্ষবর্ধন শাসনকার্য পরিদর্শনের জন্য অক্লান্তভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহার শাসনে প্রজাহিতৈষণার কথা হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

শাসনকার্যে অক্লান্ত শ্রমপরায়ণতা

সামরিক সংগঠক হিসাবেও হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব নেহাত কম ছিল না। তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সামরিক সংগঠন

বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের সাহিত্যসেবার এবং সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন নিজে একজন উচ্চস্তরের কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁহার রচিত 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাণভট্ট, ময়ূর এবং আরও বহু সাহিত্যসেবী হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠ-

সাহিত্য ও সাহিত্য-সেবীদের পৃষ্ঠপোষকতা

পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত।

ধর্ম বিষয়ে হর্ষবর্ধন সকল ধর্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশত হর্ষবর্ধন কনৌজের ধর্মসভা আহ্বান করিলেও তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এইরূপ মনে করা ভুল হইবে। তিনি সূর্য, শিব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীরও উপাসনা করিতেন। প্রয়াগের মেলায় সূর্য ও শিবের যুগপৎ উপাসনার নাম উল্লেখ আছে।

ধর্ম-সম্পর্কে উদারতা

চীনদেশের সহিতও হর্ষবর্ধন এক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন-সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট লিয়াং-হোয়াই-কিং নামে একজন চৈনিক দূতকে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি লি-পিয়াও এবং ওয়াং-হিউয়েন-সি নামক দুইজন চীনাবাসীকে দ্বিতীয়বার দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত তৃতীয়বারের দূত ভারতে পৌঁছিবার পূর্বেই হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

চীনদেশের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক

উপসংহার

বিজেতা, সুশাসক, সাহিত্যিক, প্রজাহিতৈষী, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে হর্ষবর্ধন ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম একথা অনস্বীকার্য।

হিউয়েন-সাঙ্ (Hiuen-Tsang): চীনদেশের বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ বা ইয়েন্ চোয়াঙ্ বৌদ্ধতীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন (৬৩০ খ্রীঃ)। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণে অতিবাহিত করিযা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণী হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল ভারতে অবস্থান

হিউয়েন-সাঙ্ উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারাণসী নগরী তখন জনবহুল এবং বহুসংখ্যক হিন্দুমন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বারাণসীতে ঐ সময়ে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও বৌদ্ধভিক্ষু বা বৌদ্ধমঠ যে সেখানে একেবারে ছিল না এমন নহে। হিউয়েন-সাঙ্ প্রাচীন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগর ভিন্ন বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি স্থানেও তিনি গিয়াছিলেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ সেখানে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর খ্যাতনামা অধ্যক্ষ শীলভদ্রের

বারাণসী নগরীতে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান

পাটলিপুত্র নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত

নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও অপরাপর নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। চীনদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসিতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

তাম্রলিপ্তি তখন ছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দর হইতে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে বণিকগণ যাতায়াত করিত। হিউয়েন-সাঙ্-এর মতে শশাঙ্কের অত্যাচারে বংলাদেশে ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সেই সময়কার বৌদ্ধমঠ ও ধর্মশালায় ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বৌদ্ধধর্মের নৈতিক মান বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম রাজার উপর পূর্বেকার নৈতিক প্রভাব আর বিস্তার করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণগণ সমাজে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত বংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর

দাক্ষিণাত্যে হিউয়েন-সাঙ্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় জাতিরও তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে পর্যটন

হিউয়েন-সাঙ্ সেই সময়কার ১৩৮টি ভারতীয় রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে উত্তর-ভারতের হর্ষবর্ধন ও দক্ষিণ-ভারতের দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সহিত হিউয়েন-সাঙ্-এর সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল।

হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশংসা

হিউয়েন-সাঙ্-এর সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলায়ও তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই উভয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণীতে পাওয়া যায়।

কনৌজের ধর্মসভা প্রয়াগের মেলা

হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে প্রায় আট বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁহার বর্ণনা স্বভাবতই নির্ভরযোগ্য। দণ্ডবিধির কঠোরতা, উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য হিউয়েন-সাঙ্-এর বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থা উদারনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজকর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করিতেন। প্রতিভাবান ব্যক্তি, ধর্মস্থান, মঠ, মন্দির প্রভৃতিকেও জমি দান করা হইত। এভাবে জমি বণ্টন করা হইলেও সামন্ত প্রথা অথবা কৃষক-পীড়নের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষকদিগকে প্রয়োজনবোধে

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে অবস্থিতি : হর্ষবর্ধনের শাসন সম্পর্কে বিবরণ

বীজ ও কৃষির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করা হইত। বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও কাজ করান হইত না। শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। কৃষি-

উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি এবং ফলের মধ্যে আম, আপেল, কলা, আঙ্গুর, বেদানা, কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ, কমলালেবু প্রভৃতির
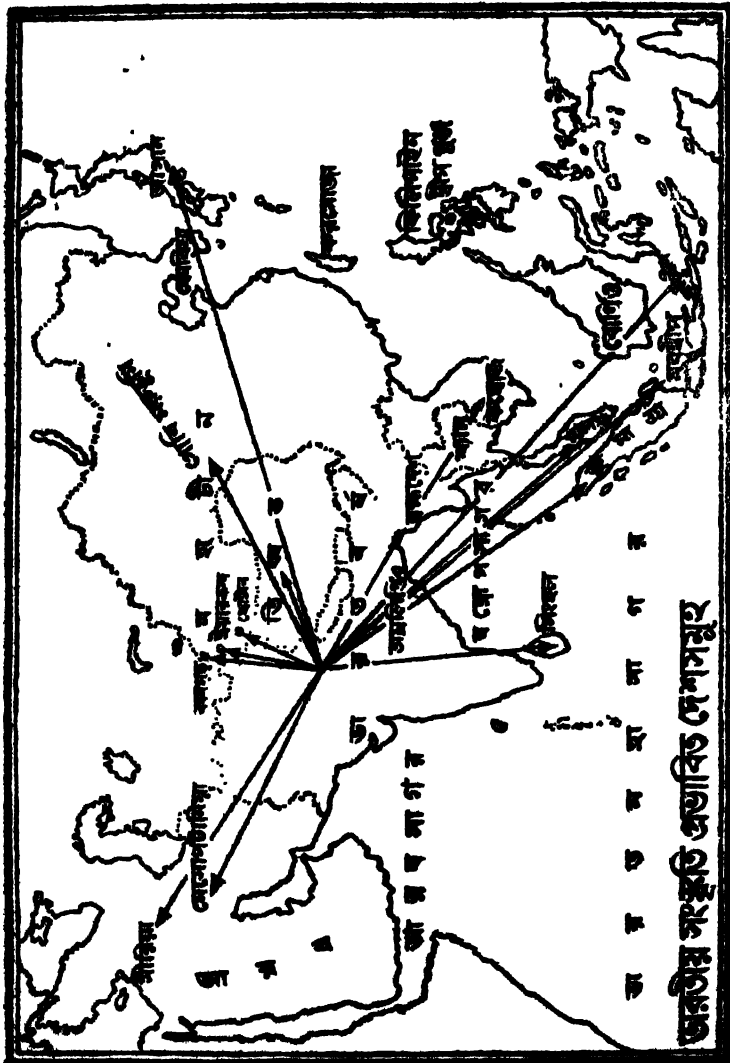
উল্লেখ তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়। জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য চলাচল এবং বিভিন্ন স্থানে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।

ভারতীয় জনসাধারণের সাধুতা ও সরলতা

ভারতীয় জনসাধারণের সাধু ও সরল ব্যবহারের কথা হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের জীবনযাত্রা ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা, অসাধু ব্যবহার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি ভারতবাসী করিত না। যাহারা এইরূপ করিত তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। রাস্তাঘাট তখন তেমন নিরাপদ ছিল না। হিউয়েন-সাঙ্ একাধিকবার দস্যুর কবলে পড়িয়াছিলেন।

গুপ্ত যুগ ও গুপ্ত-যুগোত্তর কালে বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ (India's Relation with outside world du ing the Gupta & Post-Gupta Period) : গুপ্ত যুগে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিল। এই যুগে সমগ্র চীনদেশ ও মধ্য-এশিয়া চীন সম্রাটের অধীন হওয়ার ফলে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি এই উভয় অঞ্চলেই অধিকতর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার ধর্মপ্রচারক, বণিক ও অপরাপর বৃত্তির লোক চীনদেশের নগরগুলিতে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। চীনদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও রাজদূত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সেই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এশিয়ার সকল অংশ হইতেই বৌদ্ধভিক্ষু ও শিক্ষার্থিগণ নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আসিতেন। এই সূত্রে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

চীন ও মধ্য-এশিয়ার সহিত যোগাযোগ

এই যুগে চীনা ভিক্ষুদের মধ্যে হিউয়েন-সাঙ্-ই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধমূর্তি চীনদেশে লইয়া গিয়া চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিবার কালে হিউয়েন-সাঙ্ সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সার অরেল স্টাইন-এর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে খোটান, কাসগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিউয়েন-সাঙ্

হিউয়েন-সাঙ্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চীন, কোরিয়া, সমরকন্দ, তুর্কীস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে এইরূপ বিভিন্ন দেশের ষাটজন পরিব্রাজকের জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন-সাঙ্-এর পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে ইৎ-সিং বা ই-সিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চীনদেশ হইতে সমুদ্রপথে সুমাত্রায় উপস্থিত হন। সেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে

চীন, কোরিয়া, সমরকন্দ, তুর্কীস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বৌদ্ধ পর্যটকদের ভারতে আগমন

পৌঁছেন। তিনি এক বিরাট সংখ্যক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদেশিক শিক্ষার্থিগণ

নালন্দা তখন দেশীয় ও বৈদেশিক শিক্ষার্থীদের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, একথা ই-সিং-এর বিবরণ হইতেও পাওয়া যায়।* নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রভাকর মিত্র চীনদেশে এক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাকর মিত্র ভিন্ন বোধিরুচি নামে অপর একজন পণ্ডিতও নালন্দা হইতে চীনদেশে সেই সময়ে গিয়াছিলেন।

চীনদেশের সহিত দূত বিনিময়

৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধন চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করিলে সেই সূত্রে চীন-সম্রাট পর পর তিনজন দূত হর্ষবর্ধনের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালেও গান্ধার, মগধ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত চীনদেশের দূত-বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনদেশীয় চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্প, সঙ্গীত, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতীয় প্রভাব

সেই যুগের চীনদেশীয় চিত্র ও ভাস্কর্যে সারনাথ, অজন্তা, গান্ধার ও মথুরা প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় শিল্পরীতির অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাথরের পাহাড় কাটিয়া গুহানির্মাণের রীতিও ভারতবর্ষ হইতেই চীনদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীত, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির প্রভাবও চীনদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে রচিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ—নবগ্রহ-সিদ্ধান্ত চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এইভাবে চিকিৎসাবিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য-সম্পর্ক

গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলাচল বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দু বণিকগণ চীনদেশের বন্দর-গুলিতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেন। সেখানে অবস্থানকালে উপাসনার জন্য তাঁহারা বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

মধ্য-এশিয়ার খোটান, ভারুকা, কাসগড়, কুচি, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পূর্ণমাত্রায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ্ খোটানে বহু হিন্দু ধর্মপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ফা-হিয়েনও খোটানে চারিটি বিশাল বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে গোমতী মঠ-ই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে সেই সময়ে মোট তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। মধ্য-এশিয়ার কুচি অঞ্চলে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

আরবদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

আরবদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল, একথা আরবীয় কাহিনী-কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, আরবের খলিফা অল্-মনসুর-এর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী খালিদ জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের পুত্র ছিলেন। বখ্ অঞ্চল আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলে খালিদসহ তাঁহার মাতা

* *Vide, An Advanced History of India*, p. 198.

আরবগণ কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। খালিদ, তাঁহার পুত্র ও দুই পৌত্র আরবের আব্বাসীয় সম্রাটদের (৭৮৬—৮০৩ খ্রীঃ) দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায়-ই আরবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহাদের চেষ্টায় আরবদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

তুর্কীস্থান, আফগানিস্থান, কাফ্রিস্তান ও তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান, কাফ্রিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সেই যুগে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। তিব্বতের রাজা স্রং-সান্-গাম্পোর আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি তিব্বতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার আমলেই তিব্বতে সংস্কৃত লিপির প্রবর্তন হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম এবং উহার সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি চীন, তিব্বত ও মধ্য-এশিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কোরিয়া ও জাপানের সহিত ভারতের সরাসরি যোগাযোগও ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কোরিয়া হইতে পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বোধিসেন নামে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু ৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও জাপানী উভয় ভাষাতে-ই জাপানী বৌদ্ধভিক্ষুদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব জাপানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে রোমের সহিত সমগ্র গুপ্ত যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে উহা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে পারস্য, আরব ও পশ্চিম-এশিয়ার অপরাপর দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। আরবের 'দব' নামক বাণিজ্য বন্দরে গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য উপস্থিত হইত। এই যুগে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতির উপর ভারতীয় সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থখানি আরবী, সীরীয়, পারসিক, হিব্রু, ল্যাটিন, স্পেনীয় এবং ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের ন্যায় হিন্দু গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানও পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐ যুগের গ্রীক চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্যের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিতও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পূর্বের ন্যায়ই অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশসমূহে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

চতুর্দশ অধ্যায়

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে উত্তর-ভারত

(Northern India after Harshavardhan)

কনৌজের যশোবর্মন (Yasovarman of Kanauj) : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী অর্জুন কনৌজের সিংহাসন দখল করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত চীনা দূতগণকে আক্রমণ করিবার অপরাধে চীন-সম্রাটের জামাতা তিব্বতের রাজা স্ট্রং-সান্-গাম্পো (Strong-tsan-Gampo) অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন।

মন্ত্রী অর্জুনের কনৌজ দখল

অর্জুনের পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী কনৌজের ইতিহাসের ঘোর অন্ধকারময় যুগ। এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কনৌজের ইতিহাসের এই অন্ধকারময় যুগ অতিবাহিত হইলে যশোবর্মন নামে এক পরাক্রমশালী রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।

কনৌজের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ

যশোবর্মনের পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়া যায় না, তবে তাঁহার সভাকবি বাক্পতি 'গৌড়বহো' নামক কাব্যগ্রন্থে যশোবর্মনের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও রাজত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যশোবর্মন মগধ, বাংলাদেশ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। চালুক্যরাজ নিলয়াদিত্যের রাজত্বকালে যশোবর্মন দাক্ষিণাত্য-জয়ে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। যশোবর্মন কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন-সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন যে, যশোবর্মন ও ললিতাদিত্য চীন-সম্রাটের সাহায্য লইয়া আরব ও তিব্বতীয়দের আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম দিকে যশোবর্মন আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। বাক্পতি উল্লিখিত 'পারসিকগণের' বিরুদ্ধে যশোবর্মনের সামরিক সাফল্য সম্ভবত আরবদের সহিত যুদ্ধজয়ের কথা-ই বুঝাইয়াছে।

যশোবর্মনের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি

আরবদের পরাজয়

যশোবর্মন ও ললিতাদিত্যের সৌহার্দ্য কিছুকাল পরে গভীর শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে শেষ পর্যন্ত যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণিত আছে।

ললিতাদিত্যের হস্তে শোচনীয় পরাজয়

রাজতরঙ্গিণী হইতে যশোবর্মনের সভায় বাক্পতি, ভবভূতি প্রমুখ বহু বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন বলিয়া জানা যায়। যশোবর্মনের রাজত্বকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ৭০০ হইতে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজত্ব করিতেন মনে করা ভুল

বাক্পতি ও ভবভূতি – সভাকবি

হইবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই কনোজের ইতিহাসে পুনরায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

কাশ্মীর রাজ্য (Kashmir): কাশ্মীর রাজ্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ্ যখন কাশ্মীর রাজ্য পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন সেখানে কার্কট বা নাগ (Karkata or Naga) বংশের দুর্লভবর্ধন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরও দুর্লভবর্ধনের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।

কার্কট বা নাগবংশ

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম ছিলেন চন্দ্রাপীড়। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরব আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চীন-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আরব নেতা মহম্মদ-ইবন্ কাসিম কাশ্মীরের সীমান্তদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। চীনদেশ হইতে কোন সাহায্য না পাইয়াও চন্দ্রাপীড় এককভাবে যুদ্ধ করিয়া আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই বীরত্বব্যঞ্জক কাজের জন্য চীন-সম্রাট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন (৭২০), অর্থাৎ তাঁহার রাজপদমর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়।

চন্দ্রাপীড়

চন্দ্রাপীড় অতিশয় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিতেন এবং বিচারকার্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করিতেন না।

তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা

চন্দ্রাপীড়ের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কনোজের যশোবর্মনের সহিত যুগ্মভাবে আরব ও তিব্বতীয় আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণে চীন-সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য ও যশোবর্মনের মিত্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; এই দুইজনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই যুদ্ধে যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া কনোজ রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা

ললিতাদিত্য কেবলমাত্র কনোজই দখল করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহার বিজয়-অভিযান বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, ললিতাদিত্য কম্বোজ, তুর্কী, দারদ ও তিব্বতীয়দের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।* ইহা ভিন্ন তিনি মগধ, কামরূপ, কলিঙ্গ, গুজরাট প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের

তাঁহার বিজয়-অভিযান

তাঁহার সাম্রাজ্য

* "There may be a great deal of truth in the reputed victories of Lalitaditya against the Kambojas, Turks, Dards and Tibetans who surrounded the kingdom of Kashmir."—*The Classical Age*, p. 134.

পর ভারতবর্ষে যে-সকল হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ললিতাদিত্যের সাম্রাজ্যই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।*

ললিতাদিত্য নিজ রাজ্যকে বহুসংখ্যক মন্দির, মঠ ও নগর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলের কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির সেই যুগের স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ আজিও বিদ্যমান। ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ললিতাদিত্যের রাজত্বের অবসান ঘটে।

স্থাপত্য-শিল্প : মার্তণ্ড মন্দির

গুর্জর-প্রতিহারগণ (**The Gurjara-Pratiharas**) : গুর্জরগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ দিকে বা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তোলে। পাঞ্জাব হইতে যোধপুর পর্যন্ত অনেক শহর, জেলা প্রভৃতির গুর্জর নাম তাহাদের পাঞ্জাব হইতে ক্রমে রাজপুতানার অন্তঃস্থল পর্যন্ত বিস্তৃতির সাক্ষ্য বহন করে। আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিমে 'গুর্জরত্রা' নামে তাহাদের প্রধান রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই 'গুর্জরত্রা' পরে গুজরাট নাম হইয়াছে। পরে এই অঞ্চলের নামই হইয়াছে রাজপুতানা। তাহাদের রাজ্যের মধ্যে রাজপুতানার দক্ষিণাংশের গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গুর্জরগণ ভারতের বাহির হইতে আগত

হরিচন্দ্র ছিলেন গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধন গুর্জর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। হিউয়েন-সাঙ্ যখন গুর্জর রাজ্য পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন নাগভট্টের পুত্র তাত গুর্জর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ 'পি-লো-মো-লো' (Pi-lo-mo-lo) বর্তমান ভিনমাল গুর্জর রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সময়ে গুর্জর-প্রতিহার রাজগণ সমসাময়িকদের নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। এইভাবে বিদেশ হইতে আগত গুর্জর-প্রতিহার জাতি ক্রমে ভারতীয় সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

গুর্জর রাজ্যের স্থাপয়িতা হরিচন্দ্র

গুর্জরগণের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিতি

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমভাগে নাগভট্ট এক নূতন গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে সিন্ধু অঞ্চল হইতে আরবগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিয়া ক্রমে উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। নাগভট্ট আরবগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকের শেষাংশে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহাদের

প্রথম নাগভট্ট

---

* "His extensive conquests made the kingdom of Kashmir, for the time being, the most powerful empire that India had seen since the days of the Guptas."—*The Classical Age*, p. 135.

মধ্যে ভারতবর্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। এই তিনটি শক্তি হইল, রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহারগণ, বাংলার পাল বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। এই সময় কনৌজ ছিল উত্তর-ভারতের কেন্দ্রস্থল। কনৌজ অধিকার করিতে পারিলে উত্তর-ভারত অধিকৃত হইল এই ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক ধারণা। এই কারণে গুর্জর, পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজগণের মধ্যে কনৌজ তথা সমস্ত উত্তর-ভারত অধিকারের জন্য এক ত্রি-কোণ যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে কনৌজ এই তিন রাজবংশের অধীন হইয়াছিল।

কনৌজ অধিকারের জন্য ত্রি-কোণ যুদ্ধ

প্রথম নাগভট্টের পরবর্তী শক্তিশালী গুর্জর-প্রতিহার রাজা ছিলেন বৎসরাজ। তিনি গুর্জর-প্রতিহার জাতির বিভিন্ন শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার অগ্রগতি প্রতিহত হয়।

বৎসরাজ

প্রথম নাগভট্টের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট উত্তর-ভারতের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশের রাজ্য ধর্মপালের মনোনীত তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কনৌজ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তার প্রতিহত করেন। উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রকূটরাজগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে সাময়িকভাবে গুর্জর-প্রতিহার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছিল।

দ্বিতীয় নাগভট্ট

কিন্তু গুর্জররাজ প্রথম ভোজ (মিহির ভোজ)-এর সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে গুর্জর রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে। রাজা ভোজ ভিনমাল হইতে তাঁহার রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। প্রথম ভোজ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিমি ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাবের কার্ণাল হইতে উত্তর-বঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গের নামক স্থানে বাংলার পালবংশের রাজাকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। পূর্বপুরুষদের আমলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য প্রথম ভোজ-এর চেষ্টায় এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। রাজা প্রথম ভোজই উত্তর-ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জনৈক আরব পর্যটকের বিবরণে প্রথমে ভোজের প্রতিপত্তি, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্যের উল্লেখ রহিয়াছে। গুর্জর-প্রতিহারগণের বংশধর রাজপুতগণ পরবর্তী কালে বাংলা ও বিহার ভিন্ন সমগ্র উত্তর-ভারত অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রথম ভোজ

প্রথম ভোজ-এর পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র পাল সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কাথিয়াবাড় পর্যন্ত গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পূর্ব-ভারতের উত্তর-বঙ্গ ও দক্ষিণ-বিহার রাজা মহেন্দ্রের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। মহেন্দ্রপালের পর

তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভোজ রাজা হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ ভ্রাতা মহীপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র (৩য়) কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি কনৌজ ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রপাল, দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল

মহীপালের পরবর্তী দুর্বল গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহাদের আমলে গুর্জর-শক্তি ক্রমেই পতনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং দশম শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিশাল গুর্জর সাম্রাজ্য এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। ক্রমে একাদশ শতকে গুর্জর-প্রতিহারগণ বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

মহীপালের পর গুর্জর-প্রতিহার শক্তির পতনোন্মুখতা

ভারত-ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের প্রধান গুরুত্ব হইল, ইহা আরবদের অগ্রগতি প্রতিহত করিয়া মুসলমান আধিপত্য হইতে অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্য ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল। আরবগণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া গুর্জর-প্রতিহারগণ আরব শক্তিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের গুরুত্ব

সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পতনের অন্যতম কারণ

গুর্জর-প্রতিহারদের শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিতেই গুর্জর সাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। [পাল ও রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায় দুইটিতে দ্রষ্টব্য।]*

---

* গুর্জর-প্রতিহার বংশ	পাল বংশ	রাষ্ট্রকূট বংশ
বৎসরাজ (৭৮৩ খ্রীঃ)	ধর্মপাল (৭৮০ খ্রীঃ)	ধ্রুব (৭৭৯ খ্রীঃ)
নাগভট্ট (৮১৫ খ্রীঃ)	দেবপাল (৮১৫ খ্রীঃ)	তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪ খ্রীঃ)
রামভদ্র (?)	বিগ্রহপাল (৮৫৫ খ্রীঃ)	অমোঘবর্ষ (৮১৪ খ্রীঃ)
ভোজ (৮৩৬ খ্রীঃ)	নারায়ণপাল (৮৬০ খ্রীঃ)	দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮ খ্রীঃ)
মহেন্দ্রপাল (৮৮৫ খ্রীঃ)		

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলার ইতিহাস
(History of Bengal)

[পূর্ব-কথা (A Retrospect)]

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস (Ancient History of Bengal) : প্রাচীন হিন্দুযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বস্তুত, সেই সময়ে বাংলাদেশ নামে কোন একটি সমগ্র দেশের অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশ বলিতে পরবর্তী কালে, যেমন মুসলমান আমলে, যে ভূখণ্ডকে বুঝাইত তাহা প্রাচীনকালে কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তখন রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, আর পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল, উত্তর-বঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী এই কয়টি পৃথক রাজ্য ছিল। বর্তমান উত্তর-বঙ্গের একাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের কতক স্থান লইয়া গঠিত ছিল গৌড় রাজ্য। যাহা হউক, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বাংলাদেশ বলিতে যাহা বুঝাইত সেই সমগ্র অঞ্চলটি প্রাচীনকালে উপরি-উক্ত খণ্ডরাজ্যের মোট আয়তনের সমান ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোন কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার রাজ্যসীমা ছিল ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

প্রাচীন হিন্দুযুগে বাংলাদেশের খণ্ড রাজ্যসমূহ

'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামটি সর্বপ্রথম মুসলমান আমলেই পরিচিতি লাভ করে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজলের মতে বাংলাদেশের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। এই দেশের রাজারা খুব উঁচু 'আল' নির্মাণ করিতেন। সেহেতু 'বঙ্গ' ও 'আল' এই দুইটি কথার (বঙ্গ + আল) সংমিশ্রণে ক্রমে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা বা বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে এরূপ যুক্তি ঐতিহাসিকগণ মানিয়া লইতে রাজি নহেন। কারণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী (সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল)* হইতেই 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' নামে দুইটি পৃথক দেশের অস্তিত্বের কথা বহু সংখ্যক শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে 'বঙ্গাল' দেশের নাম হইতেই বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সীমা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের

বাংলা বা 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি

বঙ্গ ও বঙ্গাল

---

* Vide : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২।

তটভূমি যে 'বঙ্গাল' দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা অনেকেই নিঃসন্দেহে মানিয়া লইয়াছেন।* অবশ্য 'বাংলা' নামটি মুঘল যুগেই সর্বপ্রথম সমগ্র দেশবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গুপ্তোত্তর যুগে 'গৌড়' বলিতে ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলাদেশকে এবং সংকীর্ণ অর্থে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গকে বুঝাইত। পালযুগে গৌড়ের রাজ্যসীমা খুবই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহার ফলেই কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কলহন তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চগৌড় বলিতে গৌড় বা বাংলাদেশ, সারস্বত অর্থাৎ পাঞ্জাবের পূর্বভাগ, কান্যকুব্জ বা কনৌজ, মিথিলা বা উত্তর-বিহার, উৎকল বা উড়িষ্যা এই কয়টি অঞ্চলকে বুঝাইত। পাল ও সেন যুগের পরবর্তী কালে অর্থাৎ সুলতানী আমলে বাংলাদেশ গৌড় নামেই পরিচিত ছিল। মুঘল যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'বাংলা' নাম (যেমন আকবরের আমলে 'সুবা বাংলা') স্থায়িত্ব লাভ করে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বাংলা'কে পাশ্চাত্য দেশীয় বণিকগণ কাগজপত্রে 'বেঙ্গলা' (Bengala or Bengalla) নামে অভিহিত করিয়াছে। ইংরাজ বণিকগণ-ই সর্বপ্রথম 'বাংলা'কে বেঙ্গল (Bengal) নামে অভিহিত করিতে শুরু করে।

গৌড়, পঞ্চগৌড়, 'বাংলা', Bengala, Bengalla প্রভৃতি নামের ব্যবহার

বাংলাদেশের সীমা প্রাচীন রাজতন্ত্রের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারবার পরিবর্তিত হইয়াছে। সেহেতু প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটিভাবে উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা—ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।"† এই প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বাংলাদেশের মোটামুটি সীমা

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসিগণকে অনেকে 'নিষাদ জাতি' আখ্যা দিয়াছেন। অপর অনেকে তাহাদিগকে অস্ট্রীক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক নামকরণ করিয়াছেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ 'নিষাদ জাতিকে' বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। এই নিষাদ জাতির জীবন ছিল কৃষি-আশ্রয়ী ও গ্রাম-কেন্দ্রিক। নিষাদ জাতির পর দ্রাবিড় ভাষাভাষী আলপাইন জাতির লোক বাংলাদেশে

* Ibid, ডক্টর মজুমদারের মতে: বর্তমানকালে পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণকে যে 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হয়, তাহা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করিয়া আসিতেছে।

† ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়: বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।

Also vide ‡, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস পৃঃ ২-৩।

বসবাস শুরু করে। ইহারাই ছিল বাঙালী জাতির আদি পুরুষ।* এই সকল লোকের সহিত পরবর্তী কালে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

বাঙালী জাতির আদি পরিচয়

বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ সম্পর্কে যে মতবাদই থাকুক না কেন, প্রাচীন বাঙালী জাতির মধ্যে কোন মঙ্গোলীয় রক্ত যে ছিল না সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে—রীজলি সাহেবের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা হয় না।

বৈদিক যুগের শেষভাগে বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা ও আর্যজাতির বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে আর্যগণ বাংলাদেশের সহিত স্বভাবতই পরিচিত ছিলেন না। সেহেতু ঋক্-সংহিতায় বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে এবং তাহার পরবর্তী কালে অথর্ববেদ প্রভৃতিতে বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকিলেও পূর্বাঞ্চলে অধিবাসিগণের—অর্থাৎ অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে আর্যগণ অত্যন্ত নিন্দাসূচক মন্তব্য করিতেন। তাহাদিগকে অসুর অর্থাৎ দানবগোষ্ঠীসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইত। যে-সকল আর্য এই অঞ্চলে আসিতেন তাঁহাদিগকে পতিত-আর্য অর্থাৎ ভ্রষ্ট-আর্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি ঘৃণা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'দস্যু' বলিয়া বর্ণনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর প্রভৃতি জাতিকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ তখন পুণ্ড্র নামে অভিহিত হইত। সুতরাং বাঙালীর পূর্বপুরুষগণও আর্যদের নিকট 'দস্যু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 'বোধায়ন ধর্মসূত্র', 'মানব ধর্মশাস্ত্র' প্রভৃতিতেও পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য রহিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে আসিবার ফলে যে-সকল আর্য পতিত-আর্যে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্রের অধিবাসী অর্থাৎ পৌণ্ড্রগণেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, ধর্মশাস্ত্রের যুগের পূর্বেই আর্যগণ বাংলাদেশে বসতি বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতেও বাংলাদেশের একাধিকবার উল্লেখ আছে।† এই দুই মহাকাব্যে পুণ্ড্র (উত্তর-বঙ্গ), বঙ্গ (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ), সুহ্ম (পশ্চিমবঙ্গ), তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই যুগে বাংলাদেশের উন্নত, সভ্য অধিবাসীদের পাশাপাশি অসভ্য জাতিও যে বাস করিত সেকথা পুরাণ ও মহাভারত হইতে জানিতে পারা যায়। মহাভারতে

ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলাদেশের উল্লেখ

ধর্মশাস্ত্রে বাংলাদেশের উল্লেখ

* ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস পৃঃ ১১।

† পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত দীর্ঘতম্বার কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা নাই বটে, কিন্তু ইহা হইতে সেযুগে বাংলাদেশে আর্য-প্রভাব সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। *Ibid*, p. 13.

বাংলার সমুদ্রতীরবাসীদের ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ভাগবত পুরাণে সুহ্মগণকে পাপাচারী বলা হইয়াছে। জৈনসূত্র 'আচারঙ্গ'-এ পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিষ্ঠুরতার একটি কাহিনী পাওয়া যায়।* লাঢ় বা রাঢ় দেশ তখন সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মহাবীর জিন এই দেশে ভ্রমণ করিবার কালে এদেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং 'চু, ছু' বলিয়া কুকুর লেলাইয়া দেয়। মহাবীরকে কুকুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ সর্বদা-ই একটি লাঠি সঙ্গে রাখিতে হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও বঙ্গ ও সুহ্ম— এই দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তরনিকায় এবং বৌদ্ধজাতক ও দিব্যাবদানে বঙ্গ, রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। মিলিন্দ পঞ্হো নামক গ্রন্থও (খ্রীঃ প্রথম শতকে) 'বঙ্গ'কে একটি সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে বাংলাদেশের উল্লেখ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বাংলাদেশের এবং বাঙালী জাতির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অবশ্য আর্যদের উপনিবেশ বিস্তারের ফলেই বাংলাদেশে আর্যভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করিযাছিল এবং বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশে পরিণত হইয়াছিল।

আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে যে অনার্য জাতি বাস করিত তাহাদের সভ্যতা, আচার-আচরণের অনেক কিছু বাংলাদেশে আগত আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হইলে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণে বাংলার সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নূতনভাবে গড়িয়া উঠিল। শাড়ী, সিন্দুর, পান, হলুদ প্রভৃতির ব্যবহার, কালীপূজা, মনসা-পূজা, শিবের গাজন, বালাম চাউল,† 'খোকা-খুকী' নামকরণ প্রভৃতি অনার্য যুগের স্মৃতি আজিও বহন করিয়া চলিয়াছে।‡ বাংলাদেশে আর্যপ্রভাব বিস্তারের কাল নির্ণয় করা অবশ্য সম্ভব নহে, তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই আর্যগণ বাংলাদেশে বসতি বিস্তার সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন।

বাংলাদেশে আর্য বসতি ও আর্য সভ্যতায় বিস্তৃতি

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা চলে না। তবে এই আলোচনা হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিলেন অনার্য, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বেই আর্যগণ বাংলাদেশে বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে এদেশে

* *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 36.

† একপ্রকার বেত দ্বারা বাঁধা নৌকাকে 'বালাম' বলা হইত। এই সকল নৌকায় যে চাউল আমদানী-রপ্তানী করা হইত তাহা ক্রমে 'বালাম চাউল' নামে পরিচিত হয়।

‡ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১২-১৩।

আর্য-অনার্য রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। দ্বিতীয়ত, আদিম বাংলার অধিবাসীদের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গঠনের ক্ষমতা ছিল। বস্তুত, তাঁহারা সেকালে কোন কোন রাজার অধীনে যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, সেই যুগে বাংলাদেশ বলিতে রাজনৈতিকক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ একটি সমগ্র দেশকে বুঝাইত না। উহা তখন বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সকল রাজার মধ্যে কেহ কেহ খুবই প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চতুর্থত, সেই কালের বাঙালীরা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী ছিলেন না। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ বিশেষভাবে বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তের দেশ ও লোকের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বকালীন বাংলার ইতিহাসের গুরুত্ব

বাংলার ইতিহাস আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের (৩২৭-২৬ খ্রীঃ পূঃ) সময় হইতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশের প্রামাণিক ইতিহাস সর্বপ্রথম গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়।

গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনায় বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য বিবরণ

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে বাংলাদেশ (Bengal at the time of Alexander's Invansion of India): খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলাদেশ প্রাচীন বঙ্গ ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত ছিল, সেই প্রমাণ গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়।

এই সকল গ্রীক ল্যাটিন লেখক 'গঙ্গরিডই' (Gangaridai) নামে এক শক্তিশালী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণ 'গঙ্গরিডই' জাতিকে গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমাজ বলিয়া মনে করিতেন। কুইণ্টাস কার্টিয়াস্ (Quintus Curtius), প্লুটার্ক (Plutarch), সোলিনাস (Solinus), ডায়োডোরাস (Diodorus) প্রভৃতি 'গঙ্গরিডই' জাতিকে গঙ্গানদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। টলেমি (Ptolemy) ও প্লিনির (Pliny) বর্ণনায় গঙ্গানদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকেই 'গঙ্গরিডই' জাতি বলা হইয়াছে।* গ্রীক লেখকদের রচনায় 'প্রাসিঅয়' (Prasioi) নামে অপর এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতির বাস ছিল 'গঙ্গরিডই' জাতির আবাসভূমির পশ্চিমে। প্রাসিঅয় রাজ্যের রাজধানী ছিল প্যালিম্‌বোথ্রা। আবার কোন কোন গ্রীক লেখক এই দুই জাতির লোক-ই গঙ্গরিডই দেশের রাজার অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই দুই জাতিকে পৃথক পৃথক

গঙ্গরিডই' জাতি

প্রাসিঅয় জাতি

*"...all the coun'ry about the mouths of the Ganges is occupied by the Gangaridai" —Ptolemy. "Pliny tells us that the final part of the course of the Ganges is through country of the Gangarides." Vide: *History of Bengal*, Vol. I (D. U.), p. 42.

রাজার অধীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্কের বিবরণের একস্থলে এই দুই জাতি—গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয়—একই রাজার অধীন এবং অন্যত্র পৃথক রাজার অধীন এইরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তি রহিয়াছে।* যাহা হউক, গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকগণের রচনা হইতে গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল, তাহারা একই রাজার অধীন কিংবা পৃথক রাজার অধীন ছিল সে-সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। তথাপি অধিকাংশ গ্রীক লেখকদের উপর নির্ভর করিয়া একথা মনে করা অনুচিত হইবে না যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গঙ্গরিডই অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজার রাজ্য বিপাশা নদী পর্যন্ত অর্থাৎ পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনায় এই বিশাল রাজ্যের রাজার নাম এগ্রামিস বা জেণ্ড্রামিস্ (Agrammes or Xandrames) প্রভৃতি বিভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল লেখকদের রচনায় এই রাজা নীচকুলসম্ভূত এবং নাপিত সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈন পরিশিষ্ট পার্বণে নন্দবংশীয় রাজাকে 'নাপিত কুমার' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের এগ্রামিস্ বা জেণ্ড্রামিস্ নন্দবংশীয় কোন রাজা হইবেন। ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের এগ্রামিস্ বা জেণ্ড্রামিস্ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র—গ্রীক লেখকদের পালিবোথ্রা বা প্যালিমবোথ্রা। এই সকল প্রমাণ হইতে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গঙ্গরিডই রাজা ধননন্দের অধীনে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ অতিবাহিত হইতেছিল।

গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গরিডই এবং প্রাসিঅয়দের রাজা এগ্রামিস্ বা জেণ্ড্রামিস্ ও ধননন্দ এক ও অভিন্ন এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক বাংলার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল যুগ

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে গঙ্গরিডই জাতি যে এক অতি পরাক্রমশালী জাতি ছিল এবং প্রাসিঅয় জাতির সহিত এক যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, অন্তত প্রাসিঅয় ও গঙ্গরিডই এই দুই জাতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তাহারা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে যে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল সেকথা অনস্বীকার্য। বিপাশা নদীর তীরে পৌঁছিয়াই আলেকজাণ্ডার গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির এক বিশাল সেনাবাহিনী তাঁহাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে এই সংবাদ পাইলেন। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধক্লান্ত সেনাবাহিনীর পক্ষে গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির বিশাল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হইবে না উপলব্ধি করিয়া

আলেকজাণ্ডারের প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির সমরসজ্জা

---

* Vide : History of Bengal Vol. I (D. U.), p. 48.

আলেকজাণ্ডারের অভিজ্ঞ সহচরগণ তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিলেন। আলেকজাণ্ডার গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় জাতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইয়াই ভারত ত্যাগ করিলেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের মনে ভীতি-সঞ্চারকারী গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় জাতির মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই যে অধিকতর শক্তিশালী ছিল তাহা গ্রীক লেখক ডায়োডোরাসের রচনা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।* এই গঙ্গারিডই জাতির বিশাল হস্তীবাহিনীর কথা জানিতে পারিয়াই আলেকজাণ্ডার তাহাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই।

আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগ

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরবর্তী কালে বাংলাদেশ (Bengal after Alexander's Invasion)ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পরবর্তী কালে যে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল, বাংলাদেশের উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ ও উপকূল অঞ্চল উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্তত এই সকল অঞ্চল মৌর্য সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিত একথা বৌদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে পুণ্ড্রনগর একটি সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই লিপিটি মৌর্য-যুগের বলিয়া অনুমান করেন। এই লিপি হইতে পুণ্ড্রনগরের শাসন-ব্যবস্থা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল এবং দৈবদুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সাহায্যার্থে যে বিশাল পরিমাণ মুদ্রা (গণ্ডক ও কাকিণক) সঞ্চিত থাকিত তাহা জানা যায়। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থের যে সকল অংশ এযাবৎ উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে 'গঙ্গারিডই রাজ্য অন্ধ্ররাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ছিল' এবং কলিঙ্গরাজ্য গঙ্গারিডই রাজ্যের সহিত সংযুক্ত ছিল।† যাহা হউক, পরবর্তী কালে মৌর্য সাম্রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিলে 'রাঢ় ও বঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত' হইয়া পড়ে। অন্তত ইহা আমরা জানি যে, সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার অনুশাসনের কোন স্থানে বঙ্গ, গৌড় বা বারেন্দ্র-এর কোন উল্লেখ না থাকিলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমায় কোন স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বেরও কোন উল্লেখ নাই। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণী (তম্বপল্লী) এবং অংতিয়োকো অর্থাৎ এণ্টিয়োকাস্-এর রাজ্য এই কয়টি সীমান্ত রাজ্য তখন স্বাধীন ছিল। এই সকল

গ্রীক ও বৌদ্ধ লেখকদের রচনায় বাংলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত

মেগাস্থিনিসের উক্তি

অশোকের শিলালিপি

---

* "India...is inhabited by very many nations among which the greatest of all is that of the Gangaridai against whom Alexander did not undertake an expedition, being deterred by the multitude of the elephants." Diodorus, *Ibid*, p. 41

Also Vide : Monahan : *Early History of Bengal*, p. 15.

† Vide, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৬৯।

রাজ্যের রাজগণ ভিন্ন আর কোনও প্রত্যন্ত নৃপতি যে সেই সময়ে স্বাধীন ছিলেন না এই কথা অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায়।* সুতরাং বঙ্গদেশ সেই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল একথা মনে করা অনুচিত হইবে না। এ-বিষয়ে অবশ্য অপর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

'পুরাণ' নামক মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান

মৌর্য সম্রাটদের আমলে 'পুরাণ' নামে একপ্রকার রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে অসংখ্য 'পুরাণ' আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরি-উক্ত আলোচনার সহিত বাংলার নানাস্থানে পুরাণ নামক মুদ্রা আবিষ্কারের খুবই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশ মৌর্য শাসনাধীন, অন্তত প্রাধান্যাধীন ছিল একথা বলা যাইতে পারে।

শুঙ্গ শাসনকালেও পুণ্ড্রনগর সমৃদ্ধশালী ছিল সেই প্রমাণ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিল্প-নিদর্শন হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। কুষাণ আমলে বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল কিংবা কুষাণ রাজগণের প্রাধান্য মানিয়া চলিত সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কুষাণ আমলের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাস্থানগড়ে কণিষ্কের মূর্তি অংকিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তমলুক, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কুষাণরাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে এই সকল অঞ্চল কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা বলা ঠিক হইবে না। বিশেষত, টলেমির (Ptolemy) রচনা ও পেরিপ্লাস (Periplus) নামক গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল লইয়া এক শক্তিশালী রাজ্য গঠিত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল 'গঙ্গে' (Gange) এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর ছিল। 'মসলিন' নামক সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। সুতরাং কুষাণ আমলে বাংলাদেশের কিয়দংশ হয়ত বা কুষাণ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

শুঙ্গ ও কুষাণ আমলে বাংলাদেশ

গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ (Bengal during the Gupta Age): গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ অথবা চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ কয়েকটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চন্দ্ররাজ্যের স্তম্ভলিপি এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের লিপিসমূহ এবং সুসুনিয়ার পর্বতগাত্রে খোদিত লিপি হইতে পূর্ববঙ্গে সমতট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে পুষ্করণ রাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুষ্করণ রাজ্যে সিংহবর্মন ও চন্দ্রবর্মন রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল 'পোখর্ণা'। সিংহবর্মনের পুত্র চন্দ্রবর্মন দিল্লী স্তম্ভের চন্দ্রবর্মন ভিন্ন অপর কেহ নহেন, এইরূপ মত অনেকে

পুষ্করণ রাজ্য : গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্তি

* Rock Edict II, *Epigraphia. Indica* Vol. II, p. 449.
Also Vide : *History of Bengal* (D. U), Vol. I, II, p. 44.
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, pp. 18-19.

পোষণ করিয়া থাকেন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর-ভারত বিজয়কালে চন্দ্রবর্মন নামে জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে। এই চন্দ্রবর্মন-ই বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গঠিত পুষ্করণ রাজ্যের রাজা ছিলেন একথা অনেকে মনে করেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পূর্ববঙ্গের সমতট রাজ্যের রাজা সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিতেন ও তাঁহাকে 'কর' দান করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ই-সিং বা ইং-সিং (I-Tsing)-এর বিবরণে পাওয়া যায় যে, গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীন দেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে মৃগস্থাপন স্তূপটি বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল একথার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বেই বাংলাদেশের একাংশ (বরেন্দ্র) গুপ্ত রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সকল দিক বিচা করিয়া কেহ কেহ গুপ্ত রাজবংশ বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

সমতট রাজ্য : গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্তি

শ্রীগুপ্তের আদি রাজা

উপরের আলোচনা হইতে গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্নাংশ এবং সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত, অন্তত পক্ষে গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্যাধীন ছিল একথা প্রমাণিত হয়। উত্তরবঙ্গে গুপ্তযুগের কতকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলিতে বাংলাদেশের উত্তরাংশ লইয়া সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি 'ভুক্তি' বা প্রদেশ গঠিত ছিল। ইহা 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি' নামে পরিচিত ছিল এবং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত প্রদেশপালের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তী কালে (৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) জনৈক গুপ্তসম্রাট নিজ পুত্রকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির প্রদেশপাল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি'

সমতট রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্তসাম্রাজ্যের আনুগত্যাধীন একটি করদ রাজ্য ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহা সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। কারণ, ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে (৫০৭-৮ খ্রীঃ) এই অঞ্চল বৈন্যগুপ্ত নামে জনৈক গুপ্তবংশীয় রাজার অধীন ছিল। তিনি ত্রিপুরা জেলার কতক স্থান এক দানপত্র সম্পাদন করিয়া তাঁহারই একজন অনুগত ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। বৈন্যগুপ্ত 'দ্বাদশাদিত্য', 'মহারাজ', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাট বংশের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ লইয়া গুপ্ত সম্রাটের অধীনে বাংলার প্রদেশপাল

সমতটে স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি

বৈন্যগুপ্ত হয়ত স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শ্রীপুরে। পরে তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক হইবে না।

গুপ্তোত্তরযুগে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যসমূহ (Independent Kingdoms of Bengal in Post-Gupta Period): গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় এযাবৎ জানা যায় নাই, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যে সূত্রপাত হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইহা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তার নূতন উপাধি গ্রহণ এবং পূর্ববঙ্গে বৈন্যগুপ্তের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা পূর্বে 'উপারিক' পদবী গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিক হইতে তিনি 'উপারিকমহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। দামোদরপুর তাম্রশাসন (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ) হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অল্পকালের মধ্যেই অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে যশোধর্মন নামে জনৈক পরাক্রমশালী বীর হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আর্যাবর্তে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহার লিপি হইতে (Mandasor Inscription) জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে গঞ্জাম জেলাস্থ মহেন্দ্রগিরি এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাংলাদেশ যশোধর্মনের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ হইতেই যশোধর্মনের রাজ্যের পতন ঘটে। কিন্তু হূণ আক্রমণ এবং যশোধর্মনের বিজয় প্রভৃতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্তর-ভারতে যেমন পুষ্যভূতি বংশ, মৌখরি বংশ প্রভৃতির উত্থান ঘটে, অনুরূপ দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং পূর্ববঙ্গ লইয়া এক স্বাধীন ও পরাক্রমশালী রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই নূতন এবং স্বাধীন বাংলা রাজ্যের প্রধান দুইটি প্রদেশ ছিল 'বর্ধমানভুক্তি' ও 'নব্যাবকাশিকা' বা 'সুবর্ণভিটি'। ঐ সময়ের পাঁচখানি তাম্রলিপি ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় এবং একখানি বর্ধমানের 'মল্লসারুলে' আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল তাম্রলিপিতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব—এই তিনজন রাজার নাম উল্লিখিত আছে। ইঁহারা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহারা যে স্বাধীন এবং পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন সে-কথা অনুমান করা যাইতে পারে। তদুপরি সমাচারদেব কর্তৃক নিজ নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তনও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এই সকল রাজার মধ্যে পরস্পর কি সম্পর্ক ছিল সে-কথা জানা সম্ভব হয় নাই। অপরাপর কয়েকটি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা

যশোধর্মনের অধীনে বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি

গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

পৃথ্বীবীর ও সুধন্যাদিত্য

তাম্রশাসনে পৃথ্বীবীর ও সুধন্যাদিত্য—এই দুইজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদিগকে গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব প্রভৃতি রাজগণের বংশসম্ভূত পরবর্তী রাজা বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র বাংলাদেশে এক পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বংশের রাজগণের ছয়খানি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দানপত্র হইতে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে বাংলাদেশে স্বাধীন, শক্তিশালী এবং সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এইরূপ সুদক্ষ শাসনাধীনে থাকিবার ফলে বাংলাদেশ ও জাতি যেমন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি তাহারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কেও সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল।*

সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

এই শক্তিশালী রাজ্যের পতন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের 'মহাকূট' লিপি হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতকের একেবারে শেষে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অন্তত একথা বলা যাইতে পারে যে, কীর্তিবর্মনের আক্রমণ হয়ত ষষ্ঠ শতকের স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে গৌড় রাজ্যের অভ্যুদয়ই সম্ভবত ইহার পতনের প্রধান কারণ ছিল।†

স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতন

গৌড় রাজ্যের অভ্যুত্থান (Rise of the Kingdom of Gauda): মূল গুপ্তবংশের অধীনে যে গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল উহার পতন ঘটিলে গুপ্তবংশ-সম্ভূত‡ এক রাজবংশের উত্থান হয়। এই বংশ 'পরবর্তী গুপ্তবংশ' (Later Guptas) নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গ (অর্থাৎ পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী) এবং পশ্চিমবঙ্গ (অর্থাৎ সুহ্ম বা রাঢ়) লইয়া তখন 'গৌড়' নামে এক রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। গৌড় তখন (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে) পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণের অধীন ছিল। দক্ষিণ এবং পূর্ববঙ্গ লইয়া তখন বঙ্গরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে শুরু করিয়া বাংলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি নামেই পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গৌড় একটি পরাক্রমশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার 'হরহ লিপি' (৫৫৪ খ্রীঃ) হইতে জানা যায়। পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ ও মৌখরি রাজগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল উহার

গৌড় ও বঙ্গরাজ্যের উত্থান

মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা কর্তৃক গৌড় আক্রমণ

* "All the records taken together undoubtedly imply that there was a free, strong and stable government in Bengal which brought peace and prosperity to the people and made them conscious of their power and potentialities." *History of Bengal* (D.U.), Vol. I. p. 54.

† Vide: বাংলাদেশের ইতিহাস : ডক্টর মজুমদার, পৃঃ ২৩।

‡ "The Later Guptas might or might not have been connected by blood with the imperial Guptas." *History of Bengal* (D. U.), Vol. I. p. 55.

সূত্র ধরিয়াই ঈশানবর্মা গোড়দেশ আক্রমণ করেন এবং গোড়-এর লোকদিগকে আত্মরক্ষার্থ সমুদ্রতীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ইহা হইতে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌গণ মনে করেন যে, সেই সময়ে গোড়-এর আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হয়ত ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী। যাহা হউক, এই ঘটনার পরও গোড় পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। এই বংশের রাজা মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মনকে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

মহাসেনগুপ্ত—কামরূপরাজ সুস্থিত-বর্মার পরাজয়

মহাসেনগুপ্ত মৌখরিরাজগণের পরাক্রম খর্ব করিয়া মগধ ও গোড়রাজ্যের উপর নিজের নিরংকুশ শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তরাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে স্বভাবতই উভয় বংশই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসেনগুপ্তের আমলে মৌখরিবংশের দুর্বলতার সুযোগে গুপ্তশাসন মগধ ও গোড়ে পুনরায় স্থাপিত হইলেও এই পুনরুজ্জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তদুপরি দক্ষিণ হইতে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মার আক্রমণ এবং উত্তর হইতে তিব্বতীয় রাজা স্রণ-বৎসান (Sron-btsan)-এর আক্রমণের ফলে গুপ্তরাজবংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগে বাঙালী রাজা শশাংক গোড়দেশে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।*

স্বাধীন গোড় রাজ্যের উত্থান

গোড়াধিপতি শশাংক (Sasanka, the King of Gauda) : রাজা শশাংককেই সর্বপ্রথম সার্বভৌম বাঙালী রাজা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। তিনি কিভাবে এবং ঠিক কোন্ বৎসর গোড়দেশে সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাংক'— এই কথাগুলি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এ-কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, শশাংক মূলত একজন মহাসামন্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি মৌখরি রাজ্যের অধীন মহাসামন্ত অথবা গুপ্তরাজগণের মহাসামন্ত ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। তথাপি ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত গোড় ও মগধের অধিপতি ছিলেন, একথা হইতে শশাংক মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন এইরূপ মনে করা অনুচিত হইবে না। ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাসেনগুপ্ত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মাতার নাম ছিল মহাসেনগুপ্তা। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, কলচুরিদের আক্রমণের ফলে মহাসেনগুপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া থানেশ্বরের রাজসভায় অর্থাৎ নিজ ভগিনী মহাসেনগুপ্তার আশ্রয়প্রার্থী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।† যাহা হউক, পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের

আদি পরিচয়

* Vide : *The Classical Age*, p. 78 : *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, pp 57-58, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৩-২৪।

† Vide : *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 58.

ধ্বংসাবশেষ হইতেই যে শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌখরিবংশ এবং কামরূপের রাজবংশের সহিত শশাঙ্কের সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ইহা হইতে এই অনুমান করা ভুল হইবে না যে, পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবেই শশাঙ্ক এই দুই বংশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবিদ্-এর মতে শশাঙ্ক পরবর্তী গুপ্তবংশের সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নাই।

তাঁহার উত্থান

বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ্-এর রচনায় শশাঙ্ককে গৌড়ের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার রাজধানী ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। এই রাজধানীটি ঠিক কোথায় ছিল, সে-বিষয়ে কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত রাঙামাটি নামক স্থানটিই কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল, একথা অনেকে মনে করেন।*

গৌড়-এর রাজধানী : কর্ণসুবর্ণ

শশাঙ্কের উত্থানের পূর্বে মেদিনীপুর এবং গয়া জেলার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে 'মানবংশ' এক স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ক্রমে এই বংশের পরাক্রম এত বৃদ্ধি পায় যে, উড়িষ্যা পর্যন্ত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। শশাঙ্ক মানবংশের রাজা (মতান্তরে সামন্তরাজ), শম্ভুযশ বা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল (উত্তর-উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ-উড়িষ্যা) নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শৈলোদ্ভব বংশের রাজগণ শশাঙ্কের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সামন্তরাজরূপে কঙ্গোদ বা দক্ষিণ-উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য শৈলোদ্ভব বংশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ছিল সম্ভবত সেই রাজ্যও শশাঙ্কের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। অবশ্য এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। যাহা হউক, শশাঙ্ক কেবলমাত্র গৌড়কে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজ্যের মর্যাদায় আসীন করেন নাই, তিনি বাহুবলে নিজ রাজ্যের সীমা দক্ষিণে গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি নামক পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল মনে করা অনুচিত হইবে না। শশাঙ্ক পশ্চিমে তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলে প্রথমে মগধ এবং বারাণসী রাজ্য তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। উভয়

তাঁহার দিগ্বিজয়

দণ্ডভুক্তি, উৎকল, কঙ্গোদ, বঙ্গ (?), মগধ ও বারাণসী অধিকার

* "His (Sasanka's) capital city, Karnasuvarna, cannot be indentified with absolute certainty, but it is most probably represented today by the ruins at Rangamati, six miles south of Berhampore in the Murshidabad district."—*The Classical Age*, p. 78.

Also Vide : *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 60 & fn. No. 1

শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়। শশাঙ্ক মৌখরিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে অগ্রসর হইলে থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে, কারণ কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা ছিলেন পুষ্যভূতিবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের জামাতা। শশাঙ্ক ছিলেন সামরিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন রাজা। তিনি পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজা মালবের দেবগুপ্তের সহিত যুগ্মভাবে মৌখরিদের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৌখরিবংশ ছিল গুপ্তবংশের চিরশত্রু। স্বভাবতই শশাঙ্ক যখন বারাণসী জয় করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন মালবরাজ দেবগুপ্তও কনৌজের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনতিকালের মধ্যে কনৌজ হইতে সংবাদ আসিল যে. মালবরাজ দেবগুপ্ত (রাজ্যশ্রীর স্বামী) গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং থানেশ্বর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাজ্যবর্ধন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর রাজ্যভার দিয়া ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ রওয়ানা হইলেন। এদিকে দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। শশাঙ্কও অল্পকালের মধ্যেই থানেশ্বরের দিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন স্থির ছিল। রাজ্যবর্ধনের সহিত প্রথমে দেবগুপ্তের সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধে মালবরাজ দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইহার পর কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া রাজ্যবর্ধনকে শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হইলেন।

মৌখরি বংশের গ্রহবর্মার বিরুদ্ধে অভিযান—মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা

দেবগুপ্তের হস্তে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত

থানেশ্বরের অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা

রাজ্যবর্ধনের হস্তে দেবগুপ্তের পরাজয় ও প্রাণনাশ

শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও প্রাণনাশ (৬০৬ খ্রীঃ) সম্পর্কে নানাপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ ও হর্ষবর্ধনের শিলালিপি প্রণিধানযোগ্য। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের বিবরণে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকেএকাকী পাইয়া হত্যা করেন, একথা রহিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ্-এর মতে শশাঙ্ক নিজ মন্ত্রিগণের অনুরোধে রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হত্যা করেন, কারণ মন্ত্রিগণ তাঁহাকে এই মন্ত্রণা দিয়াছিলেন যে, প্রতিবেশী রাজ্যে রাজ্যবর্ধনের ন্যায় ধার্মিক রাজার বিদ্যমানে গৌড় রাজ্যের কোন কল্যাণ হইবে না। আর হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যবর্ধন সত্যরক্ষার জন্য শত্রুর শিবিরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন.

শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত

এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বিবরণ হইতে রাজ্যবর্ধনের হত্যা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন সম্ভব নহে। তদুপরি, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের পরম শত্রু বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী শশাঙ্ক সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ্ যে পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক, হর্ষবর্ধনের দুইটি শিলালিপি হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাজ্যবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে শশাঙ্কের শিবিরে মল্লযুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত এই দুইটি শিলালিপিতে নাই।* এই সকল কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যার পরস্পর-বিরোধী কাহিনী

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি যদি পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করিতে না পারেন তাহা হইলে প্রদীপে যেমন কীট পুড়িয়া মরে, সেইরূপ তিনিও অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিবেন।† ইহার পর হর্ষবর্ধন সেনাবাহিনীসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন সেনাপতি ভাণ্ডির উপর শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবার ভার অর্পণ করিয়া রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের শক্তি ও প্রতিপত্তিতে ভীত হইয়া হর্ষবর্ধনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে কোন সম্মুখ সমর কখনও হইয়াছিল কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। একমাত্র 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই বৌদ্ধগ্রন্থখানি পুরাণের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ছলে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছে। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে উল্লিখিত শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার; শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ছেদন, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ-মূর্তিটিকে নিকটবর্তী হিন্দুমন্দিরে স্থাপন, ফলে নানাপ্রকার রোগভোগ ও মৃত্যুর কাহিনী 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে'ও পাওয়া যায়। এগুলির সত্যতা

হর্ষবর্ধন কর্তৃক গৌড় ধ্বংসের শপথ গ্রহণ

মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে হর্ষ-শশাঙ্কের সংঘর্ষের উল্লেখ

* Vide: *Advanced History of India*, p. 156: R. D. Banerjee, *Pre-historic Ancient & Hindu India*, p. 199; *The Classical Age*, pp. 80-88; *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, pp. 62-63; 72-78; Smith: *The Early History of India*, p. 350: ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৬-২৭।

† "I swear that unless in a limited number of days I can clear this earth of Gaudas ...then I will hurl my sinful self, like a moth into an oil-fed flame." *Harsha Charita*, quoted in the *Classical Age*, p. 99.

সম্পর্কে কিছুই সঠিক বলা যায় না। এগুলি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এই বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলেও হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের অধীন 'বর্বর দেশে' যথাযোগ্য সম্মান না পাইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—এই উক্তি হর্ষের সাফল্যের পরিচয় বহন করে না। নতুবা বাণের হর্ষচরিতে হর্ষের হস্তে শশাঙ্কের পরাজয়ের কোন উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি ?

যাহা হউক, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন নাই তাহা শশাঙ্কের তিনখানি শিলালিপি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এই শিলালিপিগুলির একটির তারিখ হইল ৬১৯ অব্দ। অন্তত ৬১৯ অব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক তাঁহার সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ অধিপতি ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ উহাতে কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশের জনৈক রাজা শশাঙ্কের সামন্তরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ডক্টর মজুমদারের মতে সম্ভবত শশাঙ্ক তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৬৩৭ অব্দ) গোড়, দণ্ডভুক্তি, মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ থাকিলেও তিনি গোড়াধিপতি শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই।

শশাঙ্কের শাসনকাল

শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ সহিষ্ণু ছিলেন না একথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলেও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তাঁহার অত্যাচারের কাহিনী যে অলীক তাহা হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা স্পষ্টই জানা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও তাঁহার রাজ্যের বিভিন্নাংশে বৌদ্ধধর্ম তখন বিস্তারলাভ করিয়াছিল। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের শত্রু হইলে এইরূপ কখনও ঘটিতে পারিত না।

শশাঙ্কের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

শশাঙ্কের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Sasanka) : বাঙালীর ও বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছেন। আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের কল্পনা সর্বপ্রথম তাঁহার মনেই উদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই কল্পনা আংশিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল। তিনি পরবর্তী গুপ্তরাজগণের প্রাধান্য হইতে গোড় রাজ্যকে স্বাধীন করিয়া এক সার্বভৌম বাঙালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল ও কঙ্গোদ (উত্তর ও দক্ষিণ উড়িষ্যা), মগধ, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শুধু তাহাই নহে, মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া তিনি কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র অভিযান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সম্রাট হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের জীবদ্দশায় বাংলা রাজ্যের কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। কূটকৌশলে শশাঙ্ক

সার্বভৌম বাঙালা-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

শশাঙ্কের সামরিক দক্ষতা ও কূট-কৌশলের ক্ষমতা

ছিলেন অদ্বিতীয়। মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত তাঁহার মিত্রতা, রাজ্যবর্ধনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্কের সামরিক দক্ষতা ও কূটকৌশলের সাফল্যের পরিচায়ক। বৌদ্ধগ্রন্থাদি, হর্ষচরিত, হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে শশাঙ্কের যে চরিত্র বর্ণনা রহিয়াছে তাহা গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রকৃত রূপ নহে। কাফি খাঁর বিবরণে শিবাজীর চরিত্র যেমন মসিলিপ্ত হইয়াছে, অনুরূপ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট চরিত্র-বর্ণনায় শশাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কোন সুযোগ নাই। আধুনিক গবেষণার ফলে যে-সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় কতকাংশে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

শশাঙ্কের প্রতি বাণভট্ট, হিউয়েন-সাঙ্-প্রভৃতির অবিচার

বাংলার পাল ও সেনবংশ (The Palas & Senas of Bengal) ঃ

বাংলাদেশে মাৎস্য-ন্যায় ঃ গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হইতে পালবংশের উত্থান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ যুগ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।

শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিউয়েন-সাঙ্ বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পাঁচটি পৃথক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি হইল কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। পূর্বে বাংলাদেশের অংশ হইলেও উৎকল এবং কঙ্গোদ তখন স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, একথার উল্লেখ আছে। শশাঙ্কের পুত্র মানব মাত্র আট মাস পাঁচ দিন এবং বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন রাজা অতি সামান্যকাল রাজত্ব করেন। সেই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড় এবং সম্রাট হর্ষবর্ধন উৎকল ও কঙ্গোদ জয় করেন। হর্ষবর্ধন যখন কজঙ্গল রাজ্যে (রাজমহলের নিকটে) অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে ভাস্করবর্মা বিশ হাজার রণহস্তী ও ত্রিশ হাজার রণপোত লইয়া কজঙ্গলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এইভাবে শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে বাংলা রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী রাজগণ কর্তৃক ঘন ঘন আক্রান্ত হইতে লাগিল। তিব্বতরাজ, পরবর্তী গুপ্তবংশের রাজগণ, শৈলবংশের রাজা, কনৌজের যশোবর্মন, আসামের অর্থাৎ কামরূপের হর্ষদেব এবং কাশ্মীরের ললিতাদিত্য কর্তৃক পর পর বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়। গুর্জরের বৎসরাজও বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে অরাজকতা ঃ অভ্যন্তরীণ অনৈক্য বাহিরাগত আক্রমণ

কনৌজরাজ যশোবর্মার গৌড়জয়ের উপর ভিত্তি করিয়া কনৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ 'গৌড়বহো' বা গৌড়বধ নামে একটি কাব্য রচনা করেন। কনৌজরাজ

যশোবর্মা বঙ্গরাজ্যটিও (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) জয় করেন। এই অঞ্চলে যশোবর্মার অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে বাংলাদেশ তখন অরাজকতার চরমে পেঁীছিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসকগণ ছিলেন পরস্পর বিবদমান। বাংলাদেশে তখন 'মাৎস্য-ন্যায়' চলিতেছে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি বা শাসকগণ দুর্বলকে গ্রাস করিতেছিলেন। অবিচার, অরাজকতা ও আত্মকলহের ফলে সাধারণের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্কটময় অবস্থায় (৭৫০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের জনসাধারণ গোপাল নামে একজন স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন।

গোপাল রাজা নির্বাচিত

পালবংশ (The Palas)

গোপাল, আঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ (Gopala) ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে (৭৫০ খ্রীঃ) পালবংশের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী, অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই সময় হইতে বাংলাদেশের ইতিহাস ও বাঙালী রাজগণের কার্যকলাপের বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করিবার যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়।

যুগান্তকারী ঘটনা

গোপালকে বাংলার সিংহাসনে নির্বাচন করিয়া তদানীন্তন বাংলার নেতৃবর্গ জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য। দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া গোপালের ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহারা নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের গণতন্ত্রে বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে।

বাঙালী নেতৃবর্গের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম

গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক আনুগত্য লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গোপালের পিতা বপ্যট ও পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সম্পর্কে তাঁহার লিপিতে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তিই ছিলেন। গোপাল প্রথমেই দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া জনসাধারণের প্রতি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশের অশান্তি ও অরাজকতা দূর হইল। তিনি বাংলার বিখ্যাত পালবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু তিনি প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের উপরই রাজত্ব

শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন

পালবংশের প্রতিষ্ঠা

বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন, একথা মনে করা ভুল হইবে না। গোপাল মোট কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।*

ধর্মপাল আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ (Dharmapala): পালবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা। তিনি আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

পালবংশের প্রাধান্যের স্থাপয়িতা

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ধর্মপাল আর্যাবর্তে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু প্রতিহার তথা গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজ সেই সময়ে অত্যধিক পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ধর্মপালের পক্ষে আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হইল না। ধর্মপাল আর্যাবর্তের দিকে অগ্রসর হইলে বৎসরাজও সেই অঞ্চল জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। ফলে, উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ধর্মপাল পরাজিত হইলেন। এমন সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুব আর্যাবর্ত জয় করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বৎসরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। বৎসরাজ পলাইয়া মরুভূমি অঞ্চলে আত্মগোপন করিলেন। এদিকে বৎসরাজ ও ধ্রুবের সংঘর্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মপাল মগধ, প্রয়াগ ও বারণসী জয় করিয়া লইলেন। ধ্রুব এইবার ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধর্মপাল ও ধ্রুবের মধ্যে যুদ্ধ হইল। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ে ধর্মপালের কোন অনিষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যে ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ধর্মপালকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।†

আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

বৎসরাজের হস্তে পরাজয়

মগধ, প্রয়াগ ও বারাণসী জয়

ধ্রুবের হস্তে পরাজয়

আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ধর্মপালের রাজ্যসীমা উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে দিল্লী ও জলন্ধর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন হইতে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে

ধর্মপালের রাজ্যজয়

---

* "The reign-period of Gopala is not definitely known. According to Taranath he ruled for 45 years but this statement cannot be taken without corroboration. According to *Manjusrimulakalpa* his reign-period was twenty-seven years. His accession to the throne may be placed with a tolerable degree of certainty within a decade of 750 A. D. and he probably ceased to rule about 770 A. D." *History of Bengal* (D. U.), Vol. I., p. 103.

† Vide: *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, pp. 104-116.

সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি কনৌজে এক দরবার আহ্বান করিয়াছিলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কির প্রভৃতি দেশের রাজগণ এই দরবারে উপস্থিত হইয়া ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে অবশ্য ইন্দ্রায়ুধ গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের সাহায্যে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে পরাজয়

ধর্মপাল 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়া নিজ সার্বভৌমত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়া পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ধর্মপাল কেবলমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহেই কালাতিপাত করেন নাই, তিনি বিহারের বিক্রমশীলা মহাবিহারটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মহাবিহারে ১০৭টি মন্দির এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। এগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনার কাজ করিতেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অপরাপর ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি হিন্দু দেবতার মন্দির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি দান করিয়াছিলেন। গর্গ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। ধর্মের প্রভাবে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্মপাল মোট ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে ধর্মপাল মোট ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। একথা অবশ্য ইতিহাসসম্মত নহে।

বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ

দেবপাল, আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ (Devapala) : পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল এই বংশের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। তাঁহার সেনাপতি লবসেন বা লৌসেন আসাম ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার আমলে গুর্জর-প্রতিহার এবং দ্রাবিড়দের সহিত পুনরায় যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। গুর্জররাজ প্রথম ভোজকে দেবপাল পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি হূণদের সহিতও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে দেবপাল পরাজিত করেন। দেবপালের সভাকবি তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি, কারণ তাঁহারই রাজত্বকালের একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য উত্তরে কম্বোজ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেবপাল পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা

তাঁহার রাজ্যসীমা

উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় রাজগণের সহিত যে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ

নাই। ঐ অঞ্চলের বীরদের নামে একজন ব্রাহ্মণকে দেবপাল নিজ রাজ্যের এক অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের সুখ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। সুমাত্রায় বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের থাকিবার জন্য এই মঠ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বহির্দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। ইন্দ্রদেব নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে দেবপাল নালন্দার আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহিত যোগাযোগ

দেবপাল অন্যান্য পালরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর-ভারতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

দেবপাল শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধ মঠগুলির তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বোধগয়া বা বুদ্ধগয়ায় একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁহার নূতন রাজধানী নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্থাপত্য-শিল্প, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

দেবপালের পরবর্তী পাল রাজগণ: পাল সাম্রাজ্যের পতন (The Pala Kings after Devapala : Fall of the Pala Empire): দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও পরাক্রম আর অব্যাহত রহিল না। পরবর্তী পালরাজগণ—বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ছিলেন যেমন দুর্বল-চেতা তেমনি অকর্মণ্য। ফলে, তাঁহাদের শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য ক্রমেই পতনের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল রাজা হইলেন। বিগ্রহপাল ছিলেন দেবপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র। তিনি ছিলেন যেমন দুর্বল-চেতা ও শান্তিপ্রিয় তেমনি সংসার-বিরোধী ও অকর্মণ্য। রাজ্যশাসন অপেক্ষা ধর্মকর্মে তাঁহার অত্যধিক মনোযোগ থাকিবার ফলে স্বভাবতই শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বিগ্রহপাল শেষ পর্যন্ত নিজ পুত্র নারায়ণপালের সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন। বিগ্রহপালের রাজত্বকালে এবং নারায়ণপালের রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকটি স্থান পাল সাম্রাজ্যচ্যুত

বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল

হইয়া গিয়াছিল। নারায়ণপালের চেষ্টায় সেই সকল স্থান পুনরায় অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নারায়ণপালও তাঁহার পিতার ন্যায়-ই শান্তিপ্রিয় ও দুর্বল-চেতা ছিলেন। বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অর্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিরাগত আক্রমণের ফলে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। পাল সাম্রাজ্যের কতকাংশ বহিঃশত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইল। দেবপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার বংশীয় রাজগণ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নারায়ণপালের আমলে এই দুই শক্তিশালী রাজবংশের আক্রমণ হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করিবার শক্তি আর ছিল না। অমোঘবর্ষের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ইহা হইতে পালরাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রতিহাররাজ ভোজ কলচুরি ও গুহিলোৎ রাজগণের সাহায্যে নারায়ণপালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের পরবর্তী রাজগণ রাজ্যপাল (আঃ ৯০৮—৯৪০), দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৪০—৯৬০); দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০—৯৮৮) প্রভৃতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দশম শতকের শেষভাগে কম্বোজ বা কাম্বোজ নামে এক পার্বত্য জাতি পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। দিনাজপুর স্তম্ভলিপি হইতে কম্বোজ আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। কম্বোজ জাতি কোথা হইতে আসিয়াছিল, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। যাহা হউক, দশম শতকের শেষভাগে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরমে পৌঁছিয়াছিল। পালবংশের নবম রাজা মহীপাল কম্বোজদিগকে বিতাড়িত করিয়া পালবংশের সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি কতকাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কম্বোজ আক্রমণ

পুনরুজ্জীবিত বা দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য (Revived or the 2nd Pala Empire) :

প্রথম মহীপাল (Mahipala I) : প্রথম মহীপালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কীর্তি কম্বোজ জাতির বিতাড়ন ও পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; তাঁহার সিংহাসন আরোহণকালে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশ ও পশ্চিমবঙ্গে সুরবংশ রাজত্ব করিতেছিল। কুমিল্লার বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণু ও গণেশ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, মহীপাল তাঁহার রাজত্বকালের দুই-তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সুরবংশের রাজগণের মধ্যে বাংলাদেশের কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লিখিত আদিশূর-এর নাম বিশেষ বিখ্যাত। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মহীপাল সমগ্র মগধ জয় করেন। ইহা ভিন্ন তীরভুক্তিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ববঙ্গ হইতে বারাণসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

মহীপাল কর্তৃক কম্বোজ জাতির বিতাড়ন

মহীপাল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের একাদশ বৎসরে নালন্দায় একটি বিশাল বৌদ্ধমন্দির পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। বারাণসীর কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির মহীপালের আত্মীয় স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্তৃক পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের এক নূতন গঠনকৌশল পরিলক্ষিত হয়।

নির্মাতা মহীপাল

মহীপালের রাজত্বকালের শেষভাগে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তীরভুক্তি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সুদূর দক্ষিণের তামিলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যার মধ্য দিয়া সসৈন্যে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন (১০২৩)।

গাঙ্গেয়দেব ও রাজেন্দ্র চোলদেব-এর হস্তে পরাজয়

মহীপালের পরবর্তী পাল রাজগণ (The Pala Kings after Mahipala) : প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর পালবংশ পতনের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল (আঃ ১০৩৮—১০৫৪), তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ১০৫৪—১০৭২) ও তৎপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পুনরুজ্জীবিত পাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার মত ক্ষমতাশালী ছিলেন না। এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তর-বঙ্গের এক চাষী-কৈবর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাহারা দিব্যোক নামে এক নেতার অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে। ইহার পর দিব্যোক বা দিব্য উত্তর-বঙ্গে প্রাধান্য লাভ করেন। কাহিনী-কিংবদন্তীতে দিব্যোক বা দিব্যকে দেশাত্মবোধসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। তিনি অত্যাচারী পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করিয়া দেশ ও দশকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু রামচরিতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, কোনপ্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকায় দিব্যোককে দেশের ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত হইবে না, একথা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। দিব্যোকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রোক ও তাঁহার পরে রুদ্রোকের পুত্র ভীম উত্তর-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভীমের শাসনাধীনে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী (উত্তর-বঙ্গ) এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হইয়া ছিল রামচরিতে ভীমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দিনাজপুরের কৈবর্ত স্তম্ভ দিব্যোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের স্মৃতি আজিও বহন করিতেছে।

চাষী-কৈবর্ত বিদ্রোহ : দিব্যোক

রুদ্রোক

ভীম

এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়—শূরপাল ও রামপাল কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া মগধে উপস্থিত হন। মগধ তখন পাল

রাজ্যেরই অংশ ছিল। শূরপাল ও রামপালকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহারা মগধে কিছুকাল রাজত্ব করেন। প্রথমে শূরপাল এবং পরে রামপাল মগধে পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রামপাল ভীমকে পরাজিত করিয়া উত্তর-বঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাবর্গের করভার লাঘব করিলেন ও কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রামাবতী নামে (সম্ভবত মালদহের নিকট) এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজ পিতৃপুরুষের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ধর্মরাজ ও কামরূপের রাজা রামপালের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পাল সাম্রাজ্যের পনরুজ্জীবন—তৃতীয় পাল সাম্রাজ্য : রামপাল (আঃ ১০৭৭-১১২০)

পালবংশের বিলোপ

উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে তিনি পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। এ-বিষয় লইয়া অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সহিত রামপালের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। রামচরিত হইতে জানা যায় যে, রামপাল অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। কর্ণাটের চালুক্য রাজগণের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে তিনি দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গাহড়বাল বংশের রাজা চন্দ্রদেবের রাজ্যবিস্তারেও রামপাল বাধাদান করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়া রামপাল মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বাংলাদেশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সুশাসন ও সুদৃঢ় রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাঙালীর গৌরব পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।* কিন্তু পরবর্তী রাজগণের চরম দুর্বলতার সুযোগে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

রামপালের কৃতিত্ব

সেনবংশ (The Senas)

সামন্ত সেন : হেমন্ত সেন (Samanta Sen : Hemanta Sen) : একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সামন্ত সেন ও তাঁহার পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) হেমন্ত সেন কাসিপুরী নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কাসিপুরী বর্তমান ময়ূরভঞ্জ জেলার কাসিয়ারী নামক স্থানের প্রাচীন নাম ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। সেনবংশ সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন।† সেনরাজগণ প্রথমে পালরাজগণের সামন্তরাজ ছিলেন। কিন্তু রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগে সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন পালবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেনবংশের শক্তি ও রাজ্য বৃদ্ধি করেন। ঐ সময় হইতে সেনরাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজার মর্যাদা অর্জন করেন।

সেনবংশের প্রতিষ্ঠা—সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন

* Vide : *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, pp. 1?6-72.

† *Ibid* p. 205.

বিজয় সেন, আঃ ১০৯৫-১১৫৮ (Vijoy Sen) : বিজয় সেন ছিলেন সেনবংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা। কিভাবে এবং কি পরিস্থিতিতে তিনি রাঢ়-এর স্থানীয় রাজগণ, পূর্ববঙ্গের বর্মাবংশ এবং উত্তরবঙ্গের পালরাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কেবল পালবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া উত্তর-বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দ প্রণীত 'বল্লাল-চরিত' হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। দক্ষিণরাঢ়ের শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গের যাদব বংশকে পরাজিত করিয়া বিক্রমপুর দখল করিয়াছিলেন এবং পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয় সেনের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়-ই যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়াছিল। দেওপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি নায়, বীর, রাঘব, বর্ধন প্রভৃতি স্থানীয় রাজগণ, এবং গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বিজয় সেনের রাজ্যবিস্তার

বিজয় সেনের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। উমাপতিধরের প্রশস্তি হইতে বিজয় সেনের কৃতিত্বের কথা জানা যায়।* পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে বিজয় সেন দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিজয় সেন ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধা। তাঁহার সাহস ছিল অপরিসীম, সামরিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তিনিও 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ', 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর' প্রভৃতি সম্রাটসুলভ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।†

বিজয় সেনের কৃতিত্ব

দীর্ঘ যাট (মতান্তরে চল্লিশ) বৎসর রাজত্বের পর বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বল্লাল সেন, আঃ ১১৫৮-১১৭৯ (Vallal Sen) : বল্লাল সেন রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তিনি কোন সামরিক অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না, কিন্তু তাঁহার আমলে সেন রাজ্য যে সুরক্ষিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি নিজ পিতার ন্যায় 'অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর' প্রভৃতি সম্রাটসুলভ উপাধি গ্রহণ

---

* "The long and memorable reign of Vijay Sen which restored peace and prosperity in Bengal made a deep impression upon its people. This feeling is echoed in the remarkable poetic composition of Umapatidhar preserved on a slab of stone found at Deopara." *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 215.

† *Idem.*

করিয়াছিলেন। ইনি কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক বাংলাদেশের কাহিনী-কিংবদন্তীর বিখ্যাত বল্লাল সেন। বল্লাল সেন হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকদিগকে কতকগুলি বিশেষ রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত। ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগত পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বৃদ্ধি করাই ছিল এই সকল রীতি-নীতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে কৌলীন্য-প্রথার যাবতীয় গুণ লুপ্ত হইয়া কতকগুলি অবাঞ্ছিত দোষত্রুটি উহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বল্লাল সেনের আমলে বাংলাদেশ বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্দী ও মিথিলা—এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল।*

কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন

বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার চেষ্টায় অন্ত ছিল না এবং এজন্য তিনি মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানির শেষাংশ তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন রচনা করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

লক্ষ্মণ সেন, আঃ ১১৭৯-১২০৫ (Lakshman Sen): বল্লাল সেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিনের মতে সেই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় যাট বৎসর ছিল।† তাঁহার রাজধানী ছিল নদীয়া। তিনি 'অরিরাজ-মদন-শঙ্কর' প্রভৃতি সম্রাটসুলভ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকে 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহা ভিন্ন, অনুশাসন প্রভৃতিতে লক্ষ্মণ সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন অনুসৃত পরমমহেশ্বর উপাধির স্থলে পরমবৈষ্ণব, পরম-নরসিংহ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি যে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন সেকথা অনুমান করা যায়। লক্ষ্মণ সেন পরমবৈষ্ণব জয়দেবকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন—ইহা হইতেও তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রমাণিত হয়। তিনি মিথিলা ও গয়া জয় করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং গাহ্‌ড়বাল রাজ্যের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সূত্রে তিনি বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়ী বীর এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে লক্ষ্মণ সেন পিতার ন্যায় সমপরিমাণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সভাকবি শরণ এবং উমাপতিধরের রচনায় উল্লিখিত নামহীন অনন্যসাধারণ বীর স্বয়ং

লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যজয় ও সাহিত্যসেবা

* *Ibid*, p. 217.

† Minhaj-ud-din ; *Tabaqat-i-Nasiri*, Vide : *History of Bengal* (D. U.), Vol. I pp. 218, 242 fn.

লক্ষ্মণ সেন ভিন্ন অপর কেহ নহেন একথা অনেকে মনে করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেব, পবনদূত-প্রণেতা ধোয়ী, কবি শরণ এবং দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানী হলায়ুধ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ তাঁহার রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনের রাজপুরোহিত ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বল্লাল সেন কর্তৃক আংশিকভাবে রচিত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পিতা-পিতামহের রচিত শ্লোকও আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯৭ খ্রীঃ) কুতব-উদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন্-বিন্-বখতিয়ার খল্‌জি যখন বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন তখন এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরিয়া সেনবংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মুসলমান আক্রমণ

মিন্‌হাজ-উদ্দিন লক্ষ্মণ সেনকে অতিশয় পরাক্রমশালী 'রায়' (Rae) অর্থাৎ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিন তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খল্‌জি কর্তৃক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয়ের এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার-জয়ের কথা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গ জানিবার পর মন্ত্রী, জ্যোতিষী প্রভৃতি অনেকেই লক্ষ্মণ সেনকে নদীয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন অবশ্য এই সকল কাপুরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রীদের অনেকে, ধনী বণিক সম্প্রদায়, ধর্মভীরু ব্রাহ্মণগণ—অনেকেই পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্বাহ্নেই পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন এ-বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া নদীয়ায়-ই বাস করিতেছিলেন। এমন সময় একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি যখন আহারে বসিয়াছেন সেই সময় বখ্‌তিয়ার খল্‌জি ১৮ জন অশ্বারোহীসহ রাজধানীর তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার বিশাল বাহিনীর অন্য সকলে তখনও সামান্য পশ্চাতে ছিল। কারণ, তাহারা বখ্‌তিয়ার-এর সহিত অশ্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই।*

মিন্‌হাজ উদ্দিন কর্তৃক মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খল্‌জির নদীয়া আক্রমণের বিবরণ

এমতাবস্থায় রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব ভাবিয়া লক্ষ্মণ সেন প্রাসাদের পশ্চাৎ দরজা দিয়া নগ্নপদে নদীয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন।†

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিন্‌হাজ-এর এই বিবরণ সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত বলিয়া মনে করেন না। কারণ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার-জয়ের সংবাদ পাইবার পরও লক্ষ্মণ সেন

* Minhaj: *Tabaqat-i-Nasiri quoted in History of Bengal* (D. U.), Vol. I. p. 243.
† *Idem.*

রাজধানী রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। মিন্‌হাজ-উদ্দিনের বর্ণনা সত্য হইলেও বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন, মন্ত্রিগণ এবং অপরাপর অনেকে নদীয়া ত্যাগ করিয়া যাইবার পরও নিজে রাজধানীতে রহিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার দেশপ্রীতি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আকস্মিক আক্রমণের ফলেই হয়ত তাঁহার পক্ষে শত্রুর সহিত যুঝিবার সুযোগ ঘটে নাই। যাহা হউক, মিন্‌হাজ-উদ্দিনও লক্ষ্মণ সেনকে উদারচেতা, দয়াবান এবং পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনকে দুর্বলচেতা কাপুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়া এই বীরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।*

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত

প্রাচীন যুগে বাংলার শাসন-পদ্ধতি (Administration of Bengal during the Ancient Period): গুপ্তযুগের পূর্বে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীনকালে বাংলাদেশকে সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি উপজাতির আবাসভূমি বলিয়া বর্ণনা ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে করা ভুল হইবে না যে, সেই যুগে অর্থাৎ মৌর্যযুগেরও পূর্বে বাংলাদেশে উপদলীয় রাজতন্ত্র (Tribal monarchy) প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীনকালের শাসনব্যবস্থা—দলীয় রাজতন্ত্র

গ্রীক লেখকদের কথায় 'গঙ্গারিডই' জাতি সম্পর্কে সম্ভ্রমসূচক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশ তখন এক পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল। তখনও বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা যে রাজতান্ত্রিক ছিল একথাও গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বিবরণ হইতে জানা যায়। শাসনব্যবস্থার কার্যক্রম প্রভৃতি সম্পর্কে কোন কিছু এযাবৎ জানা যায় নাই। বাংলাদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব হেতু আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌গণ ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সন্দিহান। যাহা হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়ের তারিখ (৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ) সত্য বলিয়া না ধরিলেও বাংলায় সে-যুগে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বাঙালী তখন নৌ-বলে বলীয়ান ও বহির্মুখী ছিল, একথা অনুমান করা যাইতে পারে।†

প্রাক্-মৌর্যযুগ: রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

মৌর্যযুগে বাংলাদেশের শাসন সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। একমাত্র মহাস্থান লিপিতে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশ মৌর্য শাসনব্যবস্থার যাবতীয় জনকল্যাণকামী ও প্রজাহিতৈষী নীতি পালন করিত এবং নানা প্রকার জনমঙ্গলকর সংস্কার সাধন

মৌর্যযুগে বাংলার শাসনব্যবস্থার প্রজাহিতৈষণা

* *Ibid*, pp. 246-247.
† *Ibid*, pp. 49, 263.

করিয়াছিল।* মহাস্থান লিপি হইতে তদানীন্তন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা যে সম্রাট অশোকের আদর্শ এবং অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত নীতি অনুসরণ করিয়া প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কালে জনসাধারণকে নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা দান করিত, সে-কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশের একাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অপরাপর অংশের রাজগণ প্রথমে হয়ত স্বাধীন ছিলেন পরে গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহাসামন্ত, মহারাজমহাসামন্ত প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ এলাকার রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি প্রথম জীবনে গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত ছিলেন। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনাধীন ছিল সেগুলিকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য 'ভুক্তি' বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল। ভুক্তি আবার পর্যায়ক্রমে 'বিষয়', 'মণ্ডল', 'বীথি' ও 'গ্রাম'-এ বিভক্ত ছিল। গুপ্তযুগে বাংলাদেশে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ-গুলির শাসনব্যবস্থা গুপ্তযুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ছিল, বলা বাহুল্য। ভুক্তিগুলি ছিল উপারিক, উপারিকমহারাজ প্রভৃতি নামে অভিহিত প্রদেশপালের অধীনে। কুমারামাত্য, আযুক্তক প্রভৃতি রাজকর্মচারী 'বিষয়'-এর (জেলার) শাসনভার প্রাপ্ত ছিল। প্রদেশপালগণ বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতির কর্মচারিবর্গকে নিযুক্ত করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতিতে 'অধিকরণ' নামে এক কমিটি শাসনকার্যে সহায়ক-সংস্থা হিসাবে থাকিত। এ-গুলির কর্তব্যকার্য সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। দামোদর তাম্রশাসন হইতে কোটিশ্বর বিষয়ের অধিকরণ নগরের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্ঘের সভাপতি, নগরের প্রধান বণিক, প্রধান কারিগর, প্রধান লেখক এবং কুমারামাত্য লইয়া গঠিত হইত, একথা জানা যায়। এই সকল তথ্য হইতে সে-যুগে শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতা বিদ্যমান ছিল সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই সকল অধিকরণের ও এগুলির সদস্যদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোপালচন্দ্রের মল্লসারল তাম্রলিপি হইতে 'বীথি-অধিকরণে'র গঠন সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, সেই যুগের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গের কয়েকজনকে স্থান দিয়া শাসনব্যবস্থাকে সর্বজনসম্মত করিয়া তোলা হইয়াছিল।

গুপ্তযুগে বাংলার শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক অধিকরণ

পাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা (The Pala Administration): বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া পালবংশ রাজত্ব করিয়াছিল। এইরূপ সুদীর্ঘকাল

* "In any case it is most likely that the social conditions and the administration of Bengal approximated to those obtaining in the neighbouring country of Magadha." Monahan: *The Early History of Bengal*, p. 207.

ধরিয়া একই রাজবংশের শাসনের ইতিহাস খুবই বিরল। পাল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা হইতে সে-যুগের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না বটে, তথাপি দীর্ঘকাল রাজত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে পালযুগে এক উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, একথা মনে করা-ই যুক্তিযুক্ত হইবে। সমসাময়িক লিপি, দানপত্র, গ্রন্থাদি হইতে যে-সকল উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা হইতে একথা স্পষ্টভাবে জানা গিয়াছে যে, পালযুগের শাসনব্যবস্থা (১) কেন্দ্রীয় ও (২) প্রাদেশিক—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। বস্তুত, পালযুগের শাসনব্যবস্থা ও গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল।

স্থায়ী ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

(১) কেন্দ্রীয় সরকার (Central Govt.): কেন্দ্রীয় সরকারের, তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। পাল রাজগণ গুপ্ত সম্রাটদের অনুকরণে 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। পাল রাজগণের 'প্রধানমন্ত্রী' নিয়োগ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার এক অভিনব অভিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে ভারতীয় সম্রাটদের কেহ 'প্রধানমন্ত্রী' নিয়োগ করেন নাই। ক্রমে প্রধানমন্ত্রি-পদ বংশানুক্রমিক হইয়া গিয়াছিল। বাদাল স্তম্ভলিপি হইতে পাল রাজগণের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও অধিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। পাল শাসনব্যবস্থায় বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারীদের মধ্যে অমাত্য, অঙ্গরক্ষ, বলাধ্যক্ষ, চৌরধরণিক, দণ্ডশক্তি, দণ্ডিক, দাসগ্রামিক, দূত, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, কোট্টপাল, মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, সেনাপতি বা মহাসেনাপতি, নৌকাধ্যক্ষ, প্রান্তপাল, রাজস্থানীয়, উপারিক, বিষয়পতি প্রভৃতি বহু সংখ্যক নামের উল্লেখ পাল রাজগণের লিপি এবং দানপত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাটসুলভ উপাধি ধারণ

বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী

শাসনকার্যের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজা এবং তাহার সরাসরি অধীন কর্মচারিবর্গের উপর। রাজপুত্র, প্রধানমন্ত্রী, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত প্রভৃতি কর্মচারী এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 'রাজস্থানীয়' (Viceroy or Regent) রাজার অনুপস্থিতিতে শাসন পরিচালনা করিতেন। অঙ্গরক্ষ নামক কর্মচারী ছিলেন রাজার দেহরক্ষীদের অধিনায়ক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'অধ্যক্ষ' নামক কর্মচারীও পালযুগে নিযুক্ত হইতেন। রাজকীয় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা ছিল ইঁহাদের দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা: রাজা, রাজপুত্র, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি

রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব ছিল বিষয়পতি, উপারিক, দাসগ্রামিক, গ্রামপতি প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের উপর। ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরি-কর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের

রাজস্ব ও করের উল্লেখ সমসাময়িক দানপত্র ভূমিদান প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হইত। ভোগবতি সম্ভবত 'ভোগ' নামক কর আদায় করিতেন। 'ষষ্ঠ অধিকৃত' নামক কর্মচারী উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিতেন বলিয়া মনে হয়। চোর-ডাকাত হইতে গ্রামাঞ্চল রক্ষার জন্য কর, শুল্ক, খেয়া, জরিমানা প্রভৃতি হইতেও সরকারের আয় হইত। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। মহাঅক্ষপটলিক ও জ্যেষ্ঠকায়স্থ হিসাব পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব

বিচার-বিভাগ

মহাদণ্ডনায়ক বা ধর্মাধিকরণ বিচার-ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ও বিচারালয় ছিল, বলা বাহুল্য।

সেনাপতি বা মহাসেনাপতি ছিলেন সমর-বিভাগের সর্বোচ্চে। সমরবাহিনীতে পদাতিক ভিন্ন, অশ্বারোহী, গজারোহী উষ্ট্রারোহী সৈনিক ছিল। নৌবাহিনী ছিল পাল রাজগণের সমরবাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশ বা বিভাগ। সেনাপতি বা মহাসেনাপতির অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রান্তপাল-এর (Warden of the Marches) উপর। কোট্টপাল ছিলেন দুর্গসমূহের ভারপ্রাপ্ত। মহাপ্রতিহার, দণ্ডিক, দণ্ডপাশিক ছিলেন পুলিস বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'খোল' (Khola) নামে কর্মচারীর উল্লেখ হইতে অনেকে মনে করেন যে, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচরবাহিনীও পালযুগে ছিল।

সামরিক ও পুলিস বিভাগ

(২) **প্রাদেশিক শাসন (Provincial Administration) :** পালযুগে বাংলা, বিহার ও আসাম পাল রাজগণের সরাসরি শাসনাধীন ছিল।* শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই সকল অঞ্চলকে ক্রমপর্যায়ে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল ও পাটক-এ ভাগ করা হইয়াছিল। পালযুগের দানপত্র, লিপি ও গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি ও তীরভুক্তি—এই তিনটি 'ভুক্তি' বা প্রদেশে বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায় ; বিহার অংশে ছিল নগরভুক্তি ও তীরভুক্তি আর আসামে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরভুক্তি। এগুলি আবার 'বিষয়' (অর্থাৎ জেলা) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। 'বিষয়' ছিল 'মণ্ডল'-এ এবং 'মণ্ডল' 'পাটক'-এ বিভক্ত। এই সকল অংশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভুক্তি বিষয়, মণ্ডল ও পাটক

পালযুগে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ধরনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও চালু করিতে হইয়াছিল। বিজিত অঞ্চলসমূহের স্থানীয় রাজগণকে নিজ নিজ এলাকায়

* "The Palas exercised direct administrative control over Bengal, Bihar and Assam." *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 278.

পাল রাজগণের অধীন সামন্ত হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল সামন্ত 'রাজন্', 'রাজন্যক', 'রাণক', 'সামন্ত', 'মহাসামন্ত' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন।* এই সকল সামন্তরাজ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা যতদিন দৃঢ় ছিল, ততদিন পাল রাজগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের অনেকেই স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কোন কোন সামন্তরাজা, যথা, ঈশ্বর ঘোষ, এমন পরাক্রমশালী ছিলেন যে, তাঁহারা নামে মাত্রই পাল রাজগণের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কার্যত তাঁহারা স্বাধীনই ছিলেন।†

সামন্ত রাজগণ

পালযুগের শাসনব্যবস্থার আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, পাল রাজগণ এক অতি সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছুই গুপ্ত শাসনব্যবস্থা এবং চিরাচরিত হিন্দু শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গঠন করা হইয়াছিল। কৌটিল্য বিরচিত অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসন-পদ্ধতির সুস্পষ্ট প্রভাব পালযুগের শাসন-পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়। পালযুগের শাসনব্যবস্থায় দক্ষতার পরিচয় সেই যুগের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়। শান্তি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া উঠা সম্ভব সেইরূপ শান্তি ও সমৃদ্ধি পাল শাসনকালে বজায় ছিল। পাল রাজগণ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনেই মনোযোগী ছিলেন না; ধর্ম, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্যও তাঁহারা সচেষ্ট ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, বহুসংখ্যক কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য মঠ প্রভৃতি স্থাপন তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। পরধর্ম-সহিষ্ণুতার গুণও পাল রাজগণের ছিল। পাল রাজগণের অনেকেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাল শাসনকালে বাংলাদেশের অধিবাসীদের শান্তি, সন্তুষ্টি ও সমৃদ্ধি পাল রাজগণের জনকল্যাণকামী শাসনেরই পরিচায়ক।

পাল-শাসনের প্রকৃতি

সেনযুগের শাসন-পদ্ধতি (Administrative System under the Senas): সেনযুগে মোটামুটিভাবে পালযুগের শাসনব্যবস্থা-ই প্রচলিত ছিল। ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতি তখনও শাসনতান্ত্রিক বিভাগ হিসাবে চালু ছিল। অবশ্য পাটক, চতুরক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের নাম সেন আমলের লিপি ও গ্রন্থাদিতে পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। স্বভাবতই একথা মনে করা যাইতে পারে যে, সেনযুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল।

পূর্ববর্তী যুগের কাঠামো অপরিবর্তিত

* *Ibid*, p. 274.
† *Ibid*, p. 275.

রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভুক্তিপতি, মণ্ডলপতি, বিষয়পতি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পালযুগের প্রধানমন্ত্রী এখন 'মহামন্ত্রী' নামে অভিহিত হইতেন। সেনরাজগণ অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজপ্রয়াধিপতি প্রভৃতি উপাধিও গ্রহণ করিতেন। সেনযুগে রাণী বা রাজমহিষীকে দানপত্র লিখিয়া জমি দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরোহিত, মহাপুরোহিত প্রভৃতিকে দানপত্র প্রস্তুত করিয়া জমি দান হইতে একথা অনুমিত হয় যে, পুরোহিতগণ অর্থাৎ রাজপণ্ডিতগণ তখন যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পালযুগের সন্ধিবিগ্রহিক সেনযুগে মহাসন্ধি বিগ্রহিক নাম ধারণ করেন। তদুপরি মহামুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকৃত প্রভৃতি নূতন নূতন রাজকর্মচারীর পরিচয়ও সেনযুগে পাওয়া যায়। অনুরূপ, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী তখন মহাধর্মাধ্যক্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। সমর-বিভাগের কর্মচারীদের নামেরও নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, মহাবূ্যহপতি প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রলিপিতে মোট ঊনত্রিশটি নূতন কর্মচারিপদের উল্লেখ আছে। বাংলার অপর কোন যুগে এই সকল রাজকর্মচারিপদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যাহা হউক, সেনযুগে পূর্বেকার অর্থাৎ পালযুগের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত থাকিলেও উহার নানাবিধ এবং নানাস্তরে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'প্রদেষ্টা' নামক রাজকর্মচারী সেনযুগেও নিযুক্ত হইতেন। ইহা হইতে মনে হয় চিরাচরিত হিন্দু শাসন-পদ্ধতি অর্থাৎ কৌটিল্য-বর্ণিত শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

'প্রধানমন্ত্রী' মহামন্ত্রীতে রূপান্তরিত

পুরোহিতের গুরুত্ব

নূতন নূতন রাজকর্মচারী নিয়োগ

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রভাব

সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাসে সেন শাসনকালও ছিল এক অতিশয় সমৃদ্ধির যুগ। যে শান্তি ও সন্তুষ্টির ফলে পালযুগে বাঙালী জাতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত হইয়াছিল সেরূপ শান্তি ও সন্তুষ্টি সেনযুগেও অব্যাহত ছিল। সেনযুগও বাঙালীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই সেনযুগের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

সমৃদ্ধির যুগ

পালযুগের পূর্বকালীন বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি (Society & Culture of Bengal before the Palas): অতি প্রাচীন কালে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণালাভের উপযুক্ত তথ্যাদিও পাওয়া যায় না। বৈদিক ব্রাহ্মণগুলিতে সে-যুগের বাংলার অধিবাসীদিগকে 'অসুর', 'দস্যু'* প্রভৃতি নিন্দাসূচক

* শতপথ ব্রাহ্মণ ঃ ১৩।৮।৫, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঃ ৭।১৮

নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বাংলাদেশে আর্যদের যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বাংলাদেশে গেলে আর্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। যাহা হউক, বৈদিক যুগের শেষভাগে বাংলাদেশের অধিবাসীদের সহিত আর্য-সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের মধ্যেও আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, মহাভারতে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ প্রভৃতি জাতি সে-যুগের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে এবং ঠিক কোন্ সময়ে বাংলাদেশে আর্যগণ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। যাহা হউক, যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, আর্যদের সহিত সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাষা গৃহীত হয়। মনুস্মৃতি ও মহাভারতের যুগে বাংলাদেশে আর্য সামাজিক রীতি বিস্তারলাভ করে। জাতিভেদ ছিল আর্য সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেই অনুসারে বাংলার সুহ্ম, বঙ্গ, পুলিন্দ, পুণ্ড্র ও কিরাত প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইত একথা প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, পুণ্ড্র ও কিরাত এই দুই ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণদের সহিত সংশ্রব রক্ষা না করায় এবং আর্যদের ক্রিয়া-কর্মাদি না করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কৈবর্ত জাতিকে মনুসংহিতায় সংকর জাতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন আরও নানাপ্রকার সংকর জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে পদ্মা নদী ও যমুনা নদীর উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থে উল্লিখিত নানাপ্রকার সংকর জাতি সেই সময়ে বাংলাদেশেও ছিল। এই সকল মিশ্র বা সংকর জাতির মধ্যে করণ, অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, গোপ, কুম্ভকার, শাঙ্খিক, দাস (কৃষক), বারুজীবী, মোদক, তাম্বুলী প্রভৃতি উত্তম সংকর; রজক, তক্ষণ, স্বর্ণবণিক, তৈলকারক, ধীবর, জালিক প্রভৃতি মধ্যম সংকর; চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী প্রভৃতি অধম সংকর বলিয়া বর্ণিত আছে। এই সকল সংকর জাতির অনেকগুলিই সেই সময়ে বাংলাদেশে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। সংকর জাতিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির সংস্পর্শ এবং কোন্ কোন্ জাতির হস্তে আহার, পানীয় বর্জনীয় তাহা বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত আছে। আচার-আচরণে এই সকল বাধা-নিষেধ বর্তমানকালেও বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আর্য-সংমিশ্রণ: আর্য ভাষা ও সাহিত্য এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন

(১) সমাজ: জাতিভেদ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

সংকর জাতির উদ্ভব

বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত সংকর জাতি অদ্যাপি বিদ্যমান

(২) সাহিত্য

সে-যুগের কোন সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বস্তুত, দশম শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে নাই। আর্যগণের বাংলায় আগমনের সময় হইতে প্রথমে সংস্কৃত এবং উহা হইতে পালি ও প্রাকৃত এবং

তাহারও পর অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এই অপভ্রংশ ভাষা হইতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা

বাংলার সর্বপ্রাচীন প্রস্তরলিপি প্রাকৃত ভাষায় মহাস্থানগড়ে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই লিপি মৌর্যযুগে বাংলাদেশের একমাত্র সাহিত্য-নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে রাজা চন্দ্রবর্মার সুসুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত লিপি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল। গুপ্তযুগেও বাংলায় তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত। সুতরাং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল ইহা অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ্ ও ই-সিং বা ইৎ-সিং বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার সম্পর্কে প্রশংসা করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার ফলে বাংলাদেশে সাহিত্যসৃষ্টির একটি বিশেষ রীতির উদ্ভব ঘটে। ইহা 'গৌড়ীয়' বা 'গৌড়ী রীতি' নামে অভিহিত। বাণভট্ট সাহিত্যের

গৌড়ী রীতি

গুণাবলী, যথা: 'শ্লেষ', অর্থ", 'উৎপ্রেক্ষা' এবং 'অক্ষর-ডম্বর' (বাগাড়ম্বর) প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল গুণের কোন্‌টি বিদ্যমান তাহা বলিয়াছেন।* তাহাতে গৌড়দেশে 'অক্ষর-ডম্বর' রীতি প্রচলিত ছিল এই উক্তি তিনি করিয়াছেন। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষের সভাকবি। পুষ্যভূতি রাজবংশের শত্রু গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ও গৌড়জনদের প্রতি তিনি স্বভাবতই প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহার বর্ণনার 'অক্ষর-ডম্বর' গৌড়ী সাহিত্য রীতির কথাটি একটু শ্লেষার্থকভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য সৃষ্টিতে শব্দযোজনা (Diction) এক অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলাদেশে

ত্রিপুরা ও নিধনপুরে তাম্রশাসনে গৌড়ীর রীতির নিদর্শন

'গৌড়ী রীতি' এই বিষয়ে সে-যুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ভামহ ও দণ্ডিন-এর (৭ম ও ৮ম শতক) রচনায় গৌড়ী রীতির উল্লেখ আছে। ভামহের মতে সংস্কৃত কাব্যে গৌড়ী রীতিই ছিল শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই বাংলাদেশের সংস্কৃত সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা-রীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসন, ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে গৌড়ী রীতির কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যালোচনার যুগে কতকগুলি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। নতুবা গৌড়ী রীতির উদ্ভব ঘটিল কিভাবে? যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই

---

* 'শ্লেষ প্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ ॥
—হর্ষচরিতম্, শ্লোক: ৭

অনুবাদ: উত্তরদেশীয় সাহিত্যে 'শ্লেষ', পশ্চিমদেশীয় সাহিত্যে 'অর্থ", দাক্ষিণাত্যে 'উৎপ্রেক্ষা অলংকার' এবং গৌড়দেশে 'অক্ষর-ডম্বর' বা শব্দাড়ম্বর গুণগুলি পরিলক্ষিত হয়।

বিলুপ্ত হইয়াছে। পালকাপ্য রচিত হস্তী-আয়ুর্বেদ অর্থাৎ হস্তীর চিকিৎসাশাস্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রগোমিন প্রণীত চান্দ্র ব্যাকরণ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে রচিত হইয়াছিল। ইনি সম্ভবত একজন বাঙালী ছিলেন।* গৌড়াচার্য গৌড়পাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক। প্রবাদ আছে, তিনি শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু ছিলেন। তাঁহার রচিত 'গৌড়পাদকারিকা' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। চন্দ্রগোমিন্ ও গৌড়পাদ রচিত গ্রন্থাদি ব্যতীত এ-যুগের অপর কোন বাঙালী গ্রন্থকার রচিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডিন্, চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, হিউয়েন্-সাঙ্, ইৎ-সিং প্রভৃতির রচনায় বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগোমিন্ ও গৌড়পাদ

আর্যদের আগমনের পূর্বাবধি বাংলাদেশের জনসাধারণের ধর্মমত ও ধর্মকর্মাদি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণালাভের উপায় নাই। তথাপি বাংলাদেশের ধর্ম-জীবনে এবং ধর্মকর্মাদি, আচার-অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই যে বাংলার আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে গৃহীত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এখনও বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীজাতির মধ্যে গাছ পূজার প্রচলন, পূজাপার্বণে আম্রপল্লব, ধানছড়া, দূর্বা, কলা, পান, সুপারি, নারিকেল, ঘট, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার আদিবাসীদেরই দান। অনুরূপ মনসা পূজা, শ্মশানকালীর পূজা, ষষ্ঠী পূজা প্রভৃতিও আদিবাসীদেরই ধর্মানুষ্ঠানের পরিচায়ক।

(৩) ধর্ম

আদিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান

আর্যদের বাংলাদেশে আসিবার পর এদেশেও বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসারলাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে আর্যগণ বাংলাদেশে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ঐ সময়ে স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, একথা অনুমান করা যাইতে পারে। জৈন কল্পসূত্র হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রচলিত ছিল। গুপ্তযুগের পূর্বাবধি বাংলার ধর্মজীবন সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু আমাদের জানা নাই।

গুপ্তপূর্ব যুগ: বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

গুপ্তযুগের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেই কালে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এদেশে অনুষ্ঠিত হইত, ব্রাহ্মণগণ বেদ আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করিয়া পুণ্যার্জনের চেষ্টার কথাও সে-যুগের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে শ্রীহট্টে ২০৫ জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান-এর

গুপ্তযুগে বৈদিক ধর্ম

* Vide: *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, pp. 296-97.

বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে তাম্রলিপিতে ২২টি বৌদ্ধ বিহারে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে কুমিল্লা অঞ্চলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলে কয়েকটি বিহারে তিন শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের দশটি মন্দির তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনে অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গে ২০টি বিহারে তিন শতাধিক 'হীনযান' ও 'মহাযান'-বৌদ্ধ ভিক্ষু তখন বাস করিতেন একথাও তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়। অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রায় একশত মন্দির এই অঞ্চলে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নির্গ্রন্থ জৈন ভিক্ষুদের সংখ্যাও খুব বেশি, একথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাম্রলিপ্তিতে সেই সময়ে ৩০টি বৌদ্ধ বিহারে দুই সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দিরের সংখ্যা ছিল ৫০। কর্ণসুবর্ণে দশটি বিহারে মোট দুই হাজার হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। কর্ণসুবর্ণে তাহাদের মোট পঞ্চাশটি মন্দির ছিল। এই বর্ণনা হইতে সেই সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধ, জৈন এবং অপরাপর ধর্মসম্প্রদায় যথা—বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতির লোক পাশাপাশি বাস করিত। ইৎ-সিং ও শেং-চি নামক অপর দুইজন চীনদেশীয় পরিব্রাজকের বর্ণনায়ও অনুরূপ তথ্যাদি রহিয়াছে। এই সকল বিবরণ হইতে সেই সময়ের বাঙালী-সমাজ পরমধর্ম-সহিষ্ণুতার চরম নিদর্শনস্বরূপ ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। সমতটের রাজবংশসম্ভূত বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ অলংকৃত করিয়া সে-যুগের বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রচলন

পরস্পর সহিষ্ণুতা

শীলভদ্র

আদিকাল হইতেই বাংলাদেশ কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জনসাধারণের ঐশ্বর্যের উৎস ছিল কৃষি। নদীমাতৃক বাংলাদেশ স্বভাবতই কৃষিপ্রধান হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে বাংলাদেশের কৃষিজাত ফসল, ফলমূল প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। ইক্ষু ছিল বাংলার কৃষিজাত ফসলের অন্যতম প্রধান। বাংলায় প্রস্তুত গুড় ও চিনি বিদেশেও রপ্তানি করা হইত সেকথা গ্রীক লেখক ইলিয়ান (Aelian) ও লুকান-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থে বাংলার বন্দরসমূহের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল বন্দরের মাধ্যমে পশ্চিম-এশিয়া, মিশর, ইওরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাদেশে উৎপন্ন মসলা, বিশেষভাবে এলাচ ও লবঙ্গ রপ্তানি করা হইত। বাংলাদেশে হীরা, রূপা প্রভৃতিও পাওয়া যাইত একথা জৈন আচারঙ্গসূত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। কার্পাসিক,

অর্থনীতি

কৃষি

শিল্প

পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও দুকুল—এই চারি প্রকার বস্ত্র বাংলাদেশে প্রস্তুত হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থ প্রভৃতিতে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। পেরিপ্লাস, ঈশানবর্মার হরহ লিপি, বৈন্যগুপ্তের ঘুনাইঘর লিপি, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতিতে বাংলাদেশের নৌ-বল ও নৌ-বাণিজ্যের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

নৌ-বাণিজ্য

পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Society & Culture of Bengal under the Palas & the Senas) : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার পালবংশের শাসনকাল বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের রচনা করিয়াছিল, একথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নহে, পাল-শাসনাধীনে বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যই পালযুগের ইতিহাস বাঙালীর নিকট গৌরবের বস্তু। সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রাধান্য কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবময় যুগ

সামাজিক অবস্থা (Social Condition) : পালবংশের উত্থানের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বাঙালী জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সেই যুগের বাঙালী জাতির চরিত্রবল, সাহস, সাধুতা ও সংস্কৃতি চৈনিক পরিব্রাজকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাহাদের বিদ্যানুরাগ ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন। পালযুগের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে হিউয়েন-সাঙ্ কর্তৃক উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তখনও বাঙালী জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল জানা যায়। পাল ও সেন যুগের সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতে সে-যুগের বাঙালী জাতি অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল জীবন যাপন করিত, একথাও জানিতে পারা যায়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত'-এ সে-যুগের সমাজের ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক উভয় প্রকার লোক-ই ছিল একথার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের রচনায়ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশের সমাজে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা ছিল ও এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে হয়ত কোন বাধা ছিল। তখনকার সমাজ প্রধানত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

হিউয়েন সাঙ্-এর বর্ণনা (সপ্তম শতক) : বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য

অনাড়ম্বর সামাজিক জীবন যাপন

কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন

সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল খুব উচ্চে। নারীজাতিকে সম্মান প্রদর্শন করা ভারতীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাল ও সেন যুগের বাঙালী নারীজাতির প্রশংসা সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

সমাজে নারীজাতির স্থান

তখনকার দিনে বাঙালীদের খাদ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতই ছিল। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ঘৃত, দধি-দুগ্ধ এবং চাউল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলাদেশে সেই সময়ে পেটা চিনি ও গুড় উভয়-ই প্রস্তুত হইত।

খাদ্য

পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না। সে-যুগের পুরুষদের পোশাক বলিতে ধুতি ও চাদর বুঝাইত। সাধারণত শরীরের উপরাংশ অনাবৃতই থাকিত। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে চাদর ব্যবহার করা হইত। পুরুষগণ কাঠের পাদুকা বা চামড়ার চটি ব্যবহার করিতেন। নারীজাতি শাড়ী পরিধান করিতেন এবং শাড়ীর একাংশ দ্বারা তাঁহারা শরীরের উপরাংশ আবৃত রাখিতেন। ইহা ভিন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে খাটো জামা বা ওড়নার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীও তখন ব্যবহৃত হইত। পরদা-প্রথার প্রচলন তখন ছিল না।

পোশাক-পরিচ্ছদ

স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে অলঙ্কার-ব্যবহারের রীতি ছিল। সোনা ও রূপার কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, হার, মেখলা, আংটি, নাকফুল, মল প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। ধনী পরিবারে মণি-মুক্তা ও অপরাপর মূল্যবান পাথর-বসান অলঙ্কার ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কপালে সিন্দুরের টিপ দিতেন।

অলঙ্কার

সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। বাঙালীর পূজা-পার্বণের প্রাচুর্য অর্থাৎ বারোমাসে তের পার্বণ তখনও ছিল। অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধূলারও ব্যবস্থা ছিল। পাশা, দাবা ও অপরাপর নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক তখন প্রচলিত ছিল।

নৃত্য-গীতাদি আনন্দোৎসব

গরুর গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতি ছিল তখনকার পরিবহন-ব্যবস্থা। ধনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা নৌকা বা পাল্কী করিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া-আসা করিতেন।

পরিবহন-ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) : পাল ও সেন যুগে বাঙালীরা গ্রামাঞ্চলে বাস করিত। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি। শিল্প ও বাণিজ্যও সে-যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। সমৃদ্ধ শহর ও বন্দরের অভাব সে-যুগে ছিল না। কিন্তু বাণিজ্য বা অন্য কোন কার্যব্যপদেশে লোকেরা শহর বা বন্দরে বাস করিলেও পরিবার-পরিজন সকলেই গ্রামে থাকিত। লোকেরা প্রধানত জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যেই শহরে বাস করিত। সামাজিক জীবনের

কৃষি ও শিল্প

মূলভিত্তি ছিল গ্রাম। বাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশ গ্রামে বাস করিলেও ধনসম্পদপূর্ণ শহরের অভাবও সেযুগে ছিল না। সম্ভ্রান্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের অনেকে শহর এলাকাতেই স্থায়িভাবে বাস করিতেন। শহরগুলির প্রশস্ত রাস্তার দুইপাশ ধরিয়া উঁচু দালান-প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মিত ছিল এবং প্রাসাদের চূড়ায় সোনার কলস শোভা পাইত। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' নামক গ্রন্থে পালরাজধানী 'রামাবতী'র বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজধানী রামাবতীর নানাস্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াবাপী শোভা পাইত। নানাপ্রকার লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদি নগরীর শোভা বর্ধন করিত। কেবল রাজধানীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা এমন নহে, প্রত্যেক নগর ও শহর এলাকার বিভিন্ন স্থান সরোবর, দেব-দেবীর মন্দির ও উদ্যান দ্বারা পরিশোভিত ছিল।

গ্রামাঞ্চলে বাঙালীর বাস

শহর ও বন্দর

পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ শিল্পজাত জিনিসপত্রের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত এবং হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বণিকগণ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিত। স্থলপথেও সেই যুগে তিব্বত, নেপাল, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বহির্দেশের বাণিজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের সহিতও বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে প্রস্তুত সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি করা হইত। ইবন-খোরদাদবাহ নামে জনৈক আরব বণিকের বর্ণনায় বাংলাদেশের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের একখানি ধুতি সামান্য একটি আংটির ফাঁক দিয়া টানিয়া বাহির করা যাইত, একথা পাওয়া যায়। আরব বণিক সুলেমান-এর বর্ণনায় বাংলাদেশ হইতে গণ্ডারের শিঙ্ চীনদেশে রপ্তানি করা হইত জানা যায়। 'অভিধান রত্নমালা' গ্রন্থে বঙ্গদেশে টিন পাওয়া যাইত বলিয়া উল্লেখ আছে।

বৈদেশিক ও দেশীয় বাণিজ্য

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সেই যুগের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। অন্তত গুপ্তোত্তর যুগে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির যে কোন অবনতি ঘটে নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Literature & Culture): পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি-স্থাপন ভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্যও পাল ও সেনবংশের রাজত্বকাল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

(১) সাহিত্য (Literature) : পাল ও সেন যুগে বাঙালী মনীষার এক অভূতপূর্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে। এই যুগে শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ পাল ও সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গণিত, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সেই যুগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানার্জন করিতেন। পালযুগেই 'চর্যাপদ' নামে বহু বৌদ্ধ দোঁহা ও গান রচিত হইয়াছিল। লুই ও কাহ্নপা বা কাহ্নপাদ এই সকল দোঁহা ও গান-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চর্যাপদগুলিই হইল বাংলা ভাষার আদি রূপ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', গৌড় অভিনন্দ-এর 'কাদম্বরী কথাসার' ও হলায়ুধের 'অভিধান রত্নমালা' প্রভৃতি এই যুগে রচিত হইয়াছিল। চিকিৎসা-সংগ্রহ রচয়িতা চক্রপাণি দত্ত ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ। শ্রীকর ছিলেন সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্র-সম্পর্কিত গ্রন্থের রচয়িতা। জীমূতবাহন, শ্রীধরভট্ট প্রভৃতিও তাঁহাদের রচনার দ্বারা এই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেনরাজ বল্লালসেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব ও 'পবন-দূত'-রচয়িতা ধোয়ী, কবি উমাপতি ধর প্রভৃতি সেন রাজগণের আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চর্যাপদ—আদি বাংলা রচনা

সন্ধ্যাকর নন্দী, গৌড় অভিনন্দ, হলায়ুধ, চক্রপাণি দত্ত, জীমূতবাহন, শ্রীধরভট্ট, ধোয়ী, উমাপতি ধর, জয়দেব, বল্লাল সেন প্রভৃতি

(২) ধর্ম (Religion) : পাল রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সেই সময়ে ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইতেছিল। একমাত্র পাল রাজ্যেই উহা তখনও প্রাণবন্ত ছিল। ভারতের অপরাপর অংশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব যে একেবারে না ছিল এমন নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা ছিল পূর্বাপেক্ষা বহু কম। বুদ্ধদেব ও মহাবীর জিন সেই যুগে ক্রমেই সম্পূর্ণ হিন্দুদেবতায় রূপান্তরিত হইতেছিলেন। শিব ও বিষ্ণু উপাসনার প্রভাব ক্রমেই বুদ্ধ ও জিন-এর উপর প্রতিফলিত হইয়া তাঁহারাও বিষ্ণুরই অবতার বলিয়া বিবেচিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্মের পূর্বেকার সহজ ও সরল ভাব পরিত্যক্ত হইয়া তখন হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনায় যে-সকল অনুষ্ঠান ও মন্ত্র-তন্ত্রাদি পাঠ করা হইত, বুদ্ধদেবের পূজায়ও সেইরূপ করা হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা দেখা দিলে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মেও ক্রমশ স্থানলাভ করিবার ফলে ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের

পাল রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য

বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা—হিন্দুধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত

বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্তির কারণ

পূজাপার্বণ-রীতি পাঠ করিলে হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই যে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তান্ত্রিকতা দেখা দিবার ফলেই হিন্দুধর্মের পক্ষে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করা কঠিন হইল না। এইভাবে ভারতের অন্যত্র বৌদ্ধধর্ম যখন ক্রমেই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইতেছিল, তখন একমাত্র পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহার অঞ্চলে উহা প্রকৃত বৌদ্ধধর্মরূপেই প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন, নেপাল ও কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের কতক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাল রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু সকল ধর্মের লোকের প্রতি তাঁহারা সমব্যবহার করিতেন। গোপালের মন্ত্রী ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ। পালবংশের পর সেনবংশের আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।

(৩) **শিক্ষা-দীক্ষা (Education) :** পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল উদন্তপুরী বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধদার্শনিক শান্তিরক্ষিত গোপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক। গোপালের পুত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে পঞ্চাশটি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদার্শনিক হরিভদ্র এই সকল মঠে বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ। ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট অঞ্চলে গঙ্গা-নদীর তীরে এই মহাবিহারটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে মোট ১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য বা ব্রহ্মাচার্য ছিলেন বুদ্ধজ্ঞানপাদ। বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়গুলিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন প্রশস্ত মিত্র, বুদ্ধশক্তি, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, রাহুলভদ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ। কমলশীল ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্ণবর্ধন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ। ইহা ভিন্ন, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অনুষ্ঠানবিধি শিক্ষা দিবার জন্যও অধ্যাপকগণ নিযুক্ত ছিলেন। মোট ১০৮ জন পণ্ডিত বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষার জন্য কোন ব্যয় বহন করিতে হইত না। তাহাদের খাওয়া এবং হাতখরচ বাবদ অর্থ মহাবিহার হইতে দেওয়া হইত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন তাঁহাদিগকে উপাধি-পত্র (diploma) দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন তিব্বত ও অপরাপর দেশ হইতেও শিক্ষার্থিগণ বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হইতেন। এই মহাবিহারে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই মহাবিহারে অধ্যাপনা করিতেন। পালরাজ দেবপালের আমলে সোমপুরী বিহার নামে একটি বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হইয়াছিল। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে এই বিহারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উদন্তপুরী, বৌদ্ধ-বিহার—শান্তিরক্ষিত

বিক্রমশীলা মহাবিহার

কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্ণবর্ধন প্রভৃতি ১০৮ জন অধ্যাপক

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সোমপুরী ও ত্রৈকুটক বিহার

ত্রৈকূটক মঠ নামে অপর একটি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কেন্দ্র দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পালযুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থিগণ নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আসিতেন সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবপাল স্বয়ং নালন্দায় কয়েকটি মঠ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্বান ও বিদ্যার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—বালপুত্রদেবের দূত প্রেরণ

(৪) **শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (Art, Architecture & Sculpture) :** চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পালযুগে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। সেনযুগেও স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। পাল অথবা সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির নিদর্শনের অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যে সামান্য কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেই ঐ যুগের শিল্প-রীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। গোপাল-নির্মিত উদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার স্থাপত্য-শিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন। এই বিহারটির অনুকরণে তিব্বতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার নির্মিত হইয়াছিল। সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সোমপুরী বিহারের নির্মাণ-কৌশলের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিস্তীর্ণ আঙ্গিনার চতুর্দিকে সোমপুরী বিহারের ছোট-বড় বহু দালান, কক্ষ, মন্দির, ভোজনালয় প্রভৃতি নির্মিত ছিল। পাল ও সেনযুগে নির্মিত স্থাপত্য-শিল্পের ভগ্নাবশেষও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে পালযুগের অনন্যসাধারণ শিল্পী ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ধাতু দ্বারা মূর্তি-নির্মাণ-কৌশলও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। পালযুগের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির নিখুঁত শিল্পকার্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সেনযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।* পালরাজগণের আমলে বহু জলাশয় ও পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল। দিনাজপুর জিলায় সেই যুগের দুই-একটি জলাশয়ের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান আছে।

উদন্তপুরীর শিল্পকৌশল

চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য—ধীমান, বীতপাল, শূলপাণি প্রভৃতি শিল্পিগণ

পালযুগে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ (Contact with the outside World under the Palas) : পাল ও সেনযুগে, বিশেষভাবে পালরাজগণের আমলে বাংলাদেশ ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং বাণিজ্যিক পণ্যাদির উৎসস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ,

সুবর্ণভূমির সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ

* "Sulapani, a Ranaka, chief of the guild (gostai) of silpis of Varendra..." Vide: *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 534.

সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষয়িত্রী (Mistress) ছিল বাংলাদেশ। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম হইতে অসংখ্য বাণিজ্যপোত সিংহল, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে চলাচল করিত। ভাগ্য-

পাল যুগে বহির্জগতের সহিত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
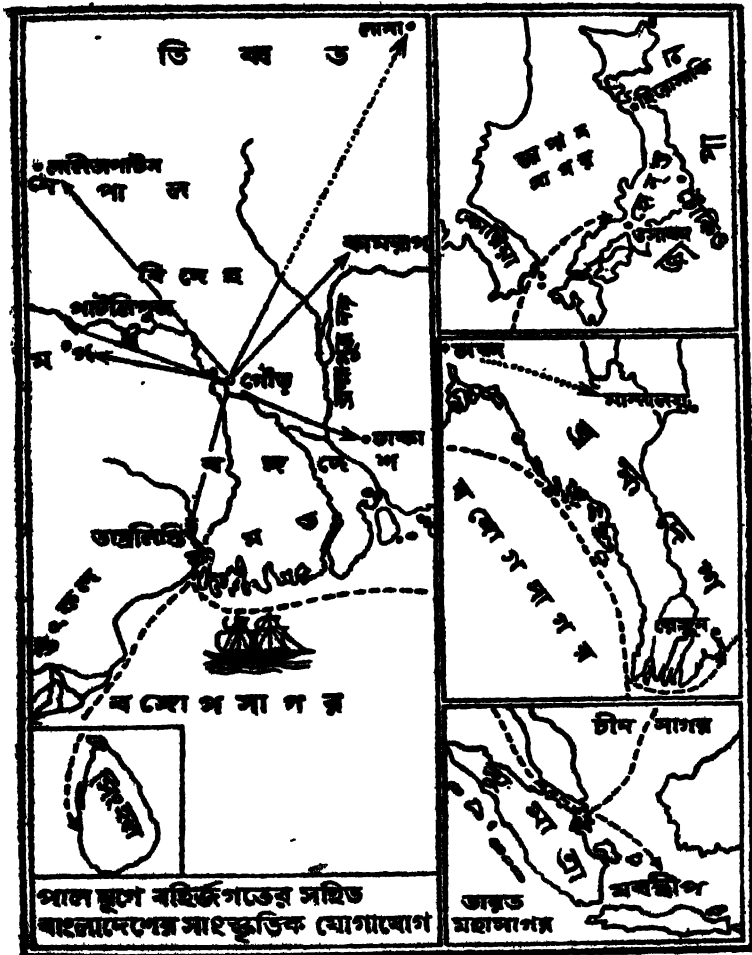
বিড়ম্বিত বহু ক্ষত্রিয় সন্তান সুবর্ণদ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইতেন এবং তথা হইতে প্রচুর ধনরত্ন লইয়া ফিরিতেন। স্থলপথেও তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপাল ও চীনদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত।

পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে শৈলেন্দ্র রাজবংশের তিনজন রাজার নাম বাংলার পালবংশীয় রাজা দেবপালের (৮১০-'৫০) নালন্দা অনুশাসনে উল্লিখিত আছে। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী। সুবর্ণভূমির রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের উদ্দেশ্যে দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুবর্ণভূমি অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সোমপুরী বিহারের অনুকরণে নির্মিত দালান প্রভৃতির চিহ্নাদিও সেই সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয়।

সুবর্ণভূমির সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

তিব্বতের সহিত বহু পূর্ব হইতেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজা স্রং-গান গাম্পোর চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। পালবংশের রাজত্বকালে তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহু তিব্বতীয় ভিক্ষু নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিতেন। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বাঙালী বৌদ্ধ দার্শনিক রত্নবজ্র ও অতীশ দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান) তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু অতীশের চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম পুনঃসঞ্জীবিত হইয়াছিল। গোপালনির্মিত উদন্তপুরী বৌদ্ধমঠের অনুকরণে সেই যুগে তিব্বতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিব্বতের সহিত সেই যুগে স্থলপথে বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

তিব্বতের সহিত সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

পালযুগে চীনদেশের সহিতও বাংলাদেশের ধর্ম ও বাণিজ্য-সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দার জনৈক অধ্যাপক চীন-সম্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ হইতেও অবশ্য সেই যুগে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে গিয়াছিলেন। চীনদেশ হইতেও বহু পরিব্রাজক সেই যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচজন বোধগয়ায় কয়েকটি লিপি (inscription) রাখিয়া গিয়াছেন।

চীনদেশের সহিত সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ

ব্রহ্মদেশ এবং তিব্বত ও চীনের মাধ্যমে জাপান ও উহার সংলগ্ন অঞ্চলে পালযুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ, জাপান প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ

সেন রাজগণও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তাঁহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেন ধর্মপ্রচারের জন্য মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেন রাজগণের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি যে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—সবক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেনবংশই ছিল বাংলাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ। এই বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে (১১৯৭ খ্রীঃ) কুতুব্-উদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন-বিন্-বখ্‌তিয়ার বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। পূর্ববঙ্গে অবশ্য সেনবংশধরগণ আরও কিছুকাল স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উপসংহার

ষোড়শ অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

(Kingdoms of the South)

রাষ্ট্রকূটগণ (The Rashtrakutas): রাষ্ট্রকূটগণ সাত্যকি নামে জনৈক যাদববংশীয় নেতার বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত। কিন্তু তাহাদের মূল ইতিহাস সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, রাষ্ট্রকূটগণ মূলত দ্রাবিড় জাতির এক কৃষক সম্প্রদায় ছিল। চালুক্যরাজগণের কয়েকটি লিপি হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্যদের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল কর্ণাটক এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। রাষ্ট্রকূট শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিবর্মা বা দন্তিদুর্গ। রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিবর্মা বা দন্তিদুর্গ সম্ভবত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক ছিলেন।

রাষ্ট্রকূটদের পরিচয়

দন্তিবর্মা বা দন্তিদুর্গ গোদাবরী ও ভীমা নদীর মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট তারিখ যাহা জানা গিয়াছে উহা হইল ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময় হইতে রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। দন্তিবর্মা কলিঙ্গ, কোশল, কাঞ্চি, শ্রীশ্রীস, মালব, লাট জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

দন্তিবর্মা বা দন্তিদুর্গ

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি মহারাষ্ট্র নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

দন্তিবর্মার পর তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণ বা কৃষ্ণরাজ (৭৬৮-৭৭২) সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে-সকল অঞ্চল তখন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার অধীন ছিল সেই সকল অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনি চালুক্য রাজ্য জয় সমাপ্ত করেন। তিনি কোঙ্কণ অধিকার করেন এবং রহপ নামে জনৈক রাজাকে পরাজিত করেন। রহপ কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহা জানা যায় না। বেঙ্গীর চালুক্যরাজ চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধন ও মহীশূরের গঙ্গবংশ তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। কৃষ্ণ ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাষ্ট্রকূট শিল্পকৌশল ও স্থাপত্যের তথা নিজ শিল্প-স্থাপত্যানুরাগের চমৎকার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।* কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তাঁহার পুত্র গোবিন্দরাজ রাজা হন। তিনি দ্বিতীয় গোবিন্দ নামে কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার অকর্মণ্যতা ও শাসনকার্যে অবহেলা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই ভ্রাতা ধ্রুব তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন এবং স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। ধ্রুব ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি গুর্জর-প্রতিহারদের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া বৎসরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত

কৃষ্ণরাজ, গোবিন্দরাজ

ধ্রুব

---

* V. A. Smith: *Early History of India*, pp. 444-45.

করিয়াছিলেন। কাঞ্চির পল্লবগণ এবং বাংলার পালবংশীয় রাজা ধর্মপালকে তিনি পরাজিত করেন।

ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ পিতার ন্যায়ই ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনিও গুর্জর-শক্তিকে দমন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপশালী গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বাংলার পালরাজ ধর্মপাল ও তাঁহার তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূট বংশকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত ও মালব হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র অমোঘবর্ষ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৃতীয় গোবিন্দ: তাঁহার কৃতিত্ব

অমোঘবর্ষ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। যোদ্ধা হিসাবে অবশ্য তিনি তাঁহার পিতা তৃতীয় গোবিন্দের ন্যায় ততটা পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তিনি পূর্ব-চালুক্যরাজগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুর্জররাজ প্রথম ভোজের দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রগতি তিনিই প্রতিহত করিয়াছিলেন। তিনি মালক্ষেত্র বা মালখেদ নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ভৃগুকচ্ছ বা ভারুচ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল।

অমোঘবর্ষ পূর্ব-চালুক্য গুর্জরদের সহিত অমোঘবর্ষের দ্বন্দ্ব

অমোঘবর্ষ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পূর্বপুরুষগণের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নিজ রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, অমোঘবর্ষ জীনসেন নামে এক জৈন ভিক্ষু কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় জীনসেন 'পার্শ্ব অভ্যুদয়' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'জয়ধাবল', 'রত্নমালিকা' প্রভৃতি দার্শনিক ও সাহিত্য গ্রন্থাদি এবং 'সার-সংগ্রহ' নামে একখানি গণিতশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

সুলেমান (Suleiman) নামে একজন আরব বণিক তাঁহার বিবরণে অমোঘবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারিজন রাজার অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর আর তিনজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বাগদাদের খলিফা, কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং চীনদেশের সম্রাট।

আরব বণিক সুলেমানের বর্ণনা

দীর্ঘ ৬৩ বৎসর রাজত্বের পর অমোঘবর্ষের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ রাজা হন। পরবর্তী রাজা তৃতীয় ইন্দ্র প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি গুর্জররাজ মহীপালকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাজগণ দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও অকর্মণ্য রাজা। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। গুর্জর-প্রতিহার রাজা মহীপালের সহিত

অমোঘবর্ষের পরবর্তী রাজগণ

তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তিনি কাঞ্চি ও তাঞ্জোর অধিকার করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সাময়িক কালের জন্য দশম শতকের মধ্যভাগে তামিল রাজবংশীয় চোলদের প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু দশম শতকের শেষভাগে শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ কাক* কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে রাষ্ট্রকূট শক্তির অবসান ঘটে।

সিন্ধুর আরবদের সহিত রাষ্ট্রকূটদের বাণিজ্য-সম্পর্ক

রাষ্ট্রকূটরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশের আরবদের সহিত মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। গুর্জর-প্রতিহারগণ যখন আরব-শক্তির সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত, তখন রাষ্ট্রকূটগণ আরবদের সহিত বাণিজ্যসূত্রে লাভবান হইতেছিল। এই বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহু আরব বণিক রাষ্ট্রকূট রাজ্যে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সুলেমানের নাম উল্লেখযোগ্য। সুলেমান রাষ্ট্রকূটগণকে 'বলহর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজগণ 'বল্লভ' উপাধি ধারণ করিতেন। 'বল্লভ' শব্দকেই তিনি 'বলহর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, মনে করা হয়। সুলেমান কর্তৃক বর্ণিত 'বলহর'গণই হইলেন সেই সময়কার রাষ্ট্রকূটরাজগণ।

'বলহর' শব্দের উৎপত্তি

চালুক্যবংশ (The Chalukyas)

বাতাপির চালুক্যগণ (Chalukyas of Vatapi): দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্যবংশের উত্থানের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। চালুক্যগণ উত্তর-ভারত হইতে আগত রাজপুত জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত। পরবর্তী কালে চালুক্য লিপিতে চালুক্যবংশ অযোধ্যা হইতে আগত বলিয়া বর্ণিত আছে। ডক্টর স্মিথের মতে চালুক্যগণ ছিল গুর্জর জাতির এক শাখা। তাহারা সম্ভবত রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিল।† কেহ কেহ অবশ্য তাহাদিগকে কানাড়ী জাতির লোক বলিয়া মনে করেন।‡

চালুক্যদের পরিচয়

বাতাপির চালুক্যবংশের স্থাপয়িতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। বাতাপি বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটি রাজ্য ছিল। চালুক্যগণ উত্তর-ভারতের গুর্জররাজগণের ন্যায় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। প্রথম পুলকেশী তাঁহার রাজ্য-স্থাপনের স্মৃতিরক্ষার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

প্রথম পুলকেশী

---

* Vide, Smith : *Early History of India*, p. 446.

†"There is some reason for believing that the Chalukyas or Solankis were connected with the Chapas and so with the foreign Gurjara tribe of which the Chapas we e a branch and it seems to be probable that they emigrated from Rajputana to the Deccan." Smith : *Early History of India*, p. 446.

‡ Vide : R. C. Majumdar, *Ancient India*, p. 286.

প্রথম পুলকেশীর পর তাঁহার পুত্র কীর্তিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চালুক্য প্রাধান্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা। ভারতবর্ষের পূর্ব-উপকূলের যাবতীয় স্থান তিনি জয় করিয়াছিলেন এবং উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকে তিনি চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিলেন এবং মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা, দ্রাবিড় অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ভারতের পশ্চিম-উপকূলে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কতকাংশ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। নল, কদম্ব এবং কোঙ্কণের মৌর্য বংশের তিনি উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কীর্তিবর্মা

কীর্তিবর্মার পর তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলেশ সাময়িকভাবে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য মালভূমির একাংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাতাপি বা বাদামির নিকটে পাহাড় কাটিয়া একটি বিরাট মণ্ডপযুক্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। শেষ জীবনে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র (কীর্তিবর্মার পুত্র) দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

মঙ্গলেশ

দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন বাতাপি বা বাদামির চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রগতি প্রতিহত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ-কোশল, কলিঙ্গ, ভৃগুকচ্ছের গুর্জরবংশ, গঙ্গ ও লাট প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমি চালুক্য রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর শক্তি ও প্রতিপত্তির কথা হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুলকেশী পারসিক সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পারস্য-সম্রাট কর্তৃক পুলকেশীর রাজসভায় একজন পারসিক দূতও প্রেরিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পুলকেশী

দ্বিতীয় পুলকেশী সুদূর দক্ষিণের চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে নিজ আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের পল্লবদের পরাজিত করিয়া বেঙ্গী দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই রাজত্বকালের শেষভাগে পল্লবগণ পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পল্লবদের সহিত দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্য শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে চালুক্যবংশের এক শাখা প্রথমে পিষ্ঠপুরম্ এবং বেঙ্গী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা পূর্ব-চালুক্য নামে পরিচিত।

পূর্ব-চালুক্যদের উত্থান

দ্বিতীয় পুলকেশীর পরবর্তী রাজগণের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের পরাজিত করিয়া তাঁহাদের হস্তে নিজ পিতা দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাজয়ের প্রতিশোধ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কীর্তি দাক্ষিণাত্যে আরবদের প্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করা। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হওয়ায় চালুক্য রাজত্বের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক আরব আক্রমণ প্রতিহত

বাতাপি বা বাদামির চালুক্যরাজগণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাঁহারা বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদি করিতেন। তাঁহাদের আমলে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতির অপরিসীম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হাতী গুহা ও অজন্তা গুহায় চালুক্যদের আমলের শিল্পোৎকর্ষের চমৎকার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। অজন্তা গুহাগুলির দেওয়ালচিত্র আজিও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চালুক্যগণ পারদর্শী ছিল। আরব সাগরের তীরস্থ বন্দরের সহিত তাহারা একচেটিয়া বাণিজ্য প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া চালাইয়াছিল।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ

কল্যাণীর চালুক্যগণ (The Chalukyas of Kalyani) : দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল লইয়া পশ্চিম-চালুক্য বা কল্যাণীর চালুক্য রাজ্য গঠিত ছিল। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কাক-কে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তৈল ছিলেন বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশধর। দ্বিতীয় তৈল মালব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৈলের পরবর্তী কালে সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ও জয়সিংহ পর পর কল্যাণীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়সিংহের রাজত্বকালে বসব নামে জনৈক ধর্মপ্রবর্তক "লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়" নামে শৈবধর্মাবলম্বীদের এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। জয়সিংহ রাজা ভোজ ও রাজেন্দ্র চোলদেব-এর সমসাময়িক ছিলেন। স্বভাবতই তিনি এই দুইজন শক্তিশালী রাজার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। রাজেন্দ্র চোলদেব তাঁহাকে এক যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তৈল বা তৈলপ

লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় গঠন

পরবর্তী রাজা সোমেশ্বর কল্যাণী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার চোলরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন্। সোমেশ্বরের পর দ্বিতীয় সোমেশ্বর ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রাজা হন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালুক্য বিক্রমাদিত্য অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ছিলেন কল্যাণীর চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি কল্যাণীর চালুক্য রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে মহীশূরের একাংশ দখল করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিচারব্যবস্থা, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

কল্যাণীর চালুক্য রাজ্যের পতন

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পর তৃতীয় তৈল, চতুর্থ সোমেশ্বর প্রভৃতি রাজত্ব করেন। ঐ সময়ে কলচুরি বংশের নেতা বিজ্জল কল্যাণীর সিংহাসন দখল করেন। অল্পকালের মধ্যেই যাদব ও হোয়সলরাজগণ কল্যাণীর রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

পল্লবদের মূল পরিচয় সম্পর্কে মতানৈক্য

কাঞ্চির পল্লবগণ (The Pallavas of Kanchi) : পল্লবদের মূল পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। মগধের গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সমুদ্রগুপ্ত বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করিয়া কেবলমাত্র আনুগত্য স্বীকার করাইয়াই তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুগোপের পরবর্তী কিছুকালের ইতিহাস জানা যায় না।

সিংহবাহু

ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে সিংহবাহু বা সিংহবিষ্ণু সিংহাসন অধিকার করিলে পল্লবদের ইতিহাস ধারাবাহিকতা লাভ করে। সিংহবাহু চোল রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর আরও অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি সিংহল পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাঞ্চি ছিল পল্লব রাজ্যের রাজধানী।

মহেন্দ্রবর্মা

২য় পুলকেশীর সহিত দ্বন্দ্ব

সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (১ম) মহেন্দ্রবর্মা পল্লব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বাতাপির চালুক্যদের বিরুদ্ধে এক জীবন-মরণ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। ঐ সময়ে বাতাপির চালুক্যরাজ ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। পুলকেশী ৬০৯ বা ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহেন্দ্রবর্মাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া পল্লবরাজ্যের উত্তরাংশ বেঙ্গী দখল করিয়াছিলেন। পুলকেশী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই নববিজিত স্থানের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সূত্রেই পূর্ব-চালুক্য রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

প্রথম মহেন্দ্রবর্মা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলে ত্রিচিনপল্লী, চিঙ্গলপুট, উত্তর-ও দক্ষিণ-আর্কট জেলায় পাথরের পাহাড় কাটিয়া বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি এখনও পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মহেন্দ্রবর্মা নিজ নামানুকরণে 'মহেন্দ্রবাধি' নামে একটি শহর এবং 'মহেন্দ্রবাপী' নামে একটি জলাশয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শৈবধর্ম গ্রহণ করেন।

চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য

পরবর্তী রাজা ছিলেন মহেন্দ্রবর্মার পুত্র নরসিংহ বর্মা। তিনিও চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি অবশ্য চালুক্যরাজকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি দখল করিয়াছিলেন।

নরসিংহ বর্মার অধীনে দক্ষিণ-ভারতে পল্লবদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।

সিংহলের সহিত যোগাযোগ

নরসিংহ বর্মা চালুক্যদের সহিত যুদ্ধে সিংহলের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে নরসিংহ বর্মাও সিংহল রাজ্যের রাজাকে চালুক্যদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ

নরসিংহ বর্মার রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ্ পল্লব রাজ্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ হইতে পল্লব রাজ্যের জমির উর্বরতা, ফসল, ফুল ও ফলমূলের প্রাচুর্যের কথা জানিতে পারা যায়। কাঞ্চি নগরের পরিধি ছিল পাঁচ বা ছয় মাইল। হিউয়েন-সাঙ্ পল্লব রাজ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ, হিন্দু এবং জৈন মন্দির দেখিতে পান।

মহাবলিপুরম্-এর 'সপ্তরথ' মন্দিরসমূহ

বৌদ্ধমঠগুলিতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। নরসিংহ বর্মাও ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই মহাবলিপুরম্ বা মামল্লপুরম্-এর পাথর হইতে খোদাই করা 'সপ্তরথ' মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

পরবর্তী রাজগণ — পল্লব শক্তির পতন

নরসিংহ বর্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্র এবং তারপর দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মা রাজা হন। প্রথম পরমেশ্বর বর্মা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মা স্থাপত্য-শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির, মহাবলিপুরম্-এর সমুদ্র উপকূলস্থ মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজধানী কাঞ্চি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে চোলরাজগণের হস্তে পরাজয়ের ফলে পল্লবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট হয় এবং পল্লবগণ ক্ষুদ্র সামন্ত রাজবংশে পরিণত হয়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত বর্মা।

পল্লব ইতিহাসের গুরুত্ব

রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লবরাজগণ ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। পেন্নার ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণভাগে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার সাময়িক কালের জন্য সিংহল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। শিল্পক্ষেত্রে পল্লবগণ এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

কাঞ্চি ও মহাবলিপুরম্-এ পল্লব-শিল্পের নিদর্শন

পল্লব-শিল্প (The Pallava Art) : দক্ষিণ-ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ পল্লবদের নির্মিত মন্দিরগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দ্রাবিড়-শিল্প বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পরিচয় পল্লবদের নির্মিত মন্দিরে পাওয়া যায়। মথুরা ও অমরাবতীতে যে শিল্প কুষাণ আমলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, পল্লব-শিল্প উহার সহিত যোগ রাখিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। পল্লব-শিল্পের কতিপয় নিদর্শন এখনও কাঞ্চি ও মহাবলিপুরম্-এ দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে প্রাচীন পল্লব-শিল্পের নিদর্শন বিশেষ

কিছু পাওয়া যায় না। কাঞ্চি ও মহাবালিপুরম্-এর শিল্প-নিদর্শনগুলি পরবর্তী পল্লব (Later Pallava) শিল্পের নিদর্শন। বড় বড় পাহাড় কাটিয়া পল্লব মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেগুলির নির্মাণকৌশল, অনুপাত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম কারুকার্য আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। পল্লবশিল্পীদের শিল্পকৌশলের মান যে কত উচ্চ ছিল এইগুলির নির্মাণকৌশল হইতেই তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

কাঞ্চি ও মহাবালি-পুরম্-এর মন্দির

কাঞ্চির ত্রিপুরান্তকেশ্বর ও ঐরাবতেশ্বর-এর মন্দির এবং মহাবালিপুরম্-এর মুক্তেশ্বর ও কৈলাসনাথ-এর মন্দির পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহাবালিপুরম্-এর সমুদ্র উপকূলে নির্মিত আরও দুইটি মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠব ও ভাস্কর্যকৌশল উল্লেখযোগ্য। মন্দির গাত্রের খোদাই করা মূর্তিগুলি আজও দর্শকের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে মন্দিরের নামকরণ

দ্রৌপদী-রথ, অর্জুন-রথ, ভীম-রথ, ধর্মরাজ-পথ প্রভৃতি মন্দিরগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি বিরাট পাথর হইতে খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে যে এই সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহা এগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। মহাবালিপুরম্-এর মন্দিরগুলির অনুকরণে যবদ্বীপের মন্দিরগুলিও নির্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এক মর্যাদা-পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পল্লব সাহিত্য

পল্লব সাহিত্য (The Pallava Literature): পল্লবরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাঞ্চি ঐ সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। কিরাতার্জুনীয়ম্ প্রণেতা কবি ভারবী সিংহবাহু (বা সিংহবিষ্ণু) সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন্ ঐ যুগের সাহিত্যসেবীদের অন্যতম। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মা স্বয়ং একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

পল্লবদের ধর্মানুরাগ (Religion of the Pallavas): পল্লবরাজগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সিংহবাহু বা সিংহবিষ্ণু সম্ভবত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এই বংশের রাজা মহেন্দ্রবর্মা (১ম) প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু পরে অপ্পর নামক শৈব সাধুর প্রভাবে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জন্যও মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অবশ্য জৈনধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন এবং জৈনমঠের ধ্বংস সাধন করেন। যাহা হউক, পল্লবরাজগণ পরধর্ম অসহিষ্ণু ছিলেন একথা বলা যায় না। মহেন্দ্রবর্মার আচরণ একটি আকস্মিক এবং সাময়িক ঘটনা বলিয়া বিবেচ্য।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

হিউয়েন-সাঙ্ পল্লবরাজ্যে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও বিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্য জৈনধর্মাবলম্বীরও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতিই পল্লবরাজগণ অনুসরণ করিতেন।

সুদূর দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলি (The Tamil Kingdoms of the Far South) :

চোল রাজ্য (The Cho'a Kingdom) : মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সুদূর দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্য স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও তামিল লেখকগণের রচনায়ও চোল রাজ্যের নৌ-বাণিজ্য প্রাধান্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চোল রাজ্যের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

অশোকের শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও তামিল লেখকদের রচনায় চোল রাজ্যের উল্লেখ

চোল রাজ্যের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন কারিকাল। তিনি একবার সিংহল জয় করিয়া সেখান হইতে কয়েক সহস্র শ্রমিক নিজদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই সকল বিদেশী শ্রমিকের সাহায্যে তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বাঁধ এবং কাবেরী-পাল্দিনম্ নামে একটি নূতন রাজধানী নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কারিকাল

সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টের জন্মের তৃতীয় শতকে চোল রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হইয়া শেষ পর্যন্ত পল্লবদের অধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু অষ্টম শতকে চালুক্যরাজগণের হস্তে পল্লবদের পরাজয় ঘটিলে চোলবংশ তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। বিজয়ালয় নামক জনৈক চোলরাজ নবম শতকের মাঝামাঝি চোল রাজ্যকে স্বাধীন করিয়া তোলেন। তাঁহার পুত্র আদিত্য চোলরাজগণের উপর পল্লবদের শেষ প্রাধান্যটুকু বিনাশ করিয়া চোল রাজ্যকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যের পর্যায়ে ও মর্যাদায় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র পরান্তক (১ম)-এর সিংহাসন আরোহণের সময় (৯০৭ খ্রীঃ) হইতে চোল রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

পল্লবদের অধিকারে চোল রাজ্য

চোল রাজ্যের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার

প্রথম পরান্তক (Parantaka I) : পরান্তক একজন বীর ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী মাদুরা দখল করিয়াছিলেন এবং সিংহল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরান্তকই চোল রাজ্যের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন দুর্বল রাজার অধীনে চোল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজরাজ নামে একজন প্রতাপশালী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলে চোল রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।

চোল রাজ্যের প্রাধান্যের সূত্রপাত

রাজরাজ ৯৮৫—১০১২ খ্রীঃ (Raja Raja) : রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজরাজের সিংহাসন আরোহণের কাল হইতে চোল রাজ্যের

সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির সূচনা হয়। তিনি তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে পর পর বহু রাজ্য জয় করেন। এইভাবে ক্রমে তিনি দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠেন। তিনি চের ও পাণ্ড্যরাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পূর্ব-চালুক্যগণকে পরাজিত করিয়া তিনি বেঙ্গী দখল করিয়াছিলেন। নিজ নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি লংকা দ্বীপ ও মালয় দ্বীপ জয় করেন। রাজরাজের রাজ্য বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ, কুইলন, পাণ্ড্য, সিংহল, মালাবার উপকূল লইয়া গঠিত ছিল।

রাজ্য জয়

কেবল বিজেতা হিসাবেই রাজরাজ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতিতে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের দেওয়াল-গাত্রে রাজরাজ-এর যুদ্ধজয়ের কাহিনী খোদাই করা আছে। এই মন্দিরটি আজিও রাজরাজের রাজত্বকালের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। রাজরাজ প্রকৃতপক্ষে একজন মহান রাজা ছিলেন। এইজন্য ইতিহাসে তিনি রাজরাজ 'দি গ্রেট' (The Great) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

রাজরাজ শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু পরধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। নেগাপটম্ নামক বাণিজ্য-বন্দরে স্থাপিত ব্রহ্মদেশীয় একটি বৌদ্ধমন্দিরে তিনি প্রভূত পরিমাণে অর্থ দান করিয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

রাজেন্দ্রচোলদেব গঙ্গইকোণ্ড (Rajendra Choladeva Gangaikonda) : পিতার মৃত্যুর পর ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোলদেব চোল রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যুবরাজ হিসাবেও তিনি পিতাকে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করিতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি পিতার অনুসৃত রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করিলেন। বঙ্গোপসাগরে দুর্ধর্ষ নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়া তিনি পেগু, আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপ সাময়িকভাবে দখল করেন। তিনি বাংলার পালবংশের রাজা প্রথম মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজা মহীপালের বিরুদ্ধে জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি 'গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্' নামে একটি নূতন রাজধানীও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরটি বহুসংখ্যক সুন্দর অট্টালিকায় সুসজ্জিত ছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটি বিরাট কৃত্রিম হ্রদ খনন করা হইয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধিধারণ

রাজেন্দ্রচোলদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজাধিরাজ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশই চোল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহদমন এবং পাণ্ড্য, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়াছিল। চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি চালুক্যরাজ

রাজাধিরাজ

সোমেশ্বরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। রাজাধিরাজের পর অধিরাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনে জনসাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে এবং অল্পকালের মধ্যে এক আততায়ীর হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয়। অধিরাজেন্দ্রের রাজত্বকালে বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রামানুজ চোল রাজ্যের শ্রীরঙ্গম্ নামক স্থানে বাস করিতেন। কিন্তু শৈবধর্মে বিশ্বাসী অধিরাজেন্দ্র বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রামানুজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। এই বিদ্বেষ প্রকাশ্য অত্যাচারে পরিণত হইলে রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ করিয়া মহীশূর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিরাজেন্দ্রের পরবর্তী চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৩১০) মালিক কাফুর চোল রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

অধিরাজেন্দ্র

রামানুজ

চোল রাজ্যের অবসান

চোল শাসনব্যবস্থা (Chola Administration): চোল শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল সুবিন্যস্ত তেমনি সুদক্ষ। প্রথম পরান্তকের লিপি হইতে চোল শাসনব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রাম বা কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টিকে 'কুর্রম্' বলা হইত। প্রত্যেকটি গ্রামেই স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যসভা' গ্রামের শাসন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিল। গ্রাম্যসভার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য আবার রাজকর্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামের যাবতীয় জমির উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল গ্রাম-পঞ্চায়েতের। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যদের লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করা হইত এবং এগুলির উপর পুষ্করিণী, উদ্যান, বিচারকার্য প্রভৃতি এক-একটি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হইত। প্রত্যেক গ্রাম-পঞ্চায়েতের-ই একটি করিয়া কোষাগার ছিল।

গ্রাম ও কুর্রম্

গ্রাম্যসভা

কতকগুলি গ্রাম বা 'কুর্রম্'-এর সমষ্টিকে জেলা বা 'নাডু' বলা হইত। কয়েকটি নাডু লইয়া এক-একটি বিভাগ বা 'কোট্টম' গঠিত ছিল। কয়েকটি বিভাগ বা কোট্টম লইয়া এক-একটি 'প্রদেশ' গঠিত হইত। সমগ্র চোল রাজ্য 'চোলমণ্ডলম্' নামে অভিহিত হইত এবং উহা ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

নাডু, কোট্টম, প্রদেশ: চোলমণ্ডলম্

জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য করও অল্প মাত্রায় দিতে হইত। রাজস্ব, কর প্রভৃতি সব কিছু মিলাইয়া মোট আয়ের পনের ভাগের চারি ভাগের ($\frac{4}{15}$) বেশী সরকারকে দিতে হইত না। রাজস্ব উৎপন্ন ফসল অথবা অর্থ দ্বারা দেওয়া চলিত। তখনকার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'কাসু'।

রাজস্ব

চোলরাজগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য এবং সামরিক প্রয়োজনে এক বিশাল নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। দেশের কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য একাধিক বিশাল সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছিল।

নৌবহর

সরকারী রাস্তাঘাট, সেচ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে লোকের শ্রমগ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। রাজপথ ব্যবহারের যোগ্য রাখিবার জন্য উপযুক্ত কর দাওয়া হইত।

চোল-শিল্প (Chola Art): চোল-শিল্প বলিতে চোলদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্প বুঝায়, কারণ চিত্র-শিল্পে তাহাদের কোন দান নাই। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পে চোলগণ অবশ্য চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিল। সম্পূর্ণ বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত চোল-শিল্পকে পল্লবদের শিল্পের অনুকরণ বলা যাইতে পারে।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

চোলরাজগণের অনেকেই ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল তাঞ্জোরের শিব (রাজরাজেশ্বর) মন্দির। রাজ-রাজেশ্বর-এর আদেশে এই বিশাল ও সুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি তলা বা ধাপ আছে। ঐগুলির উপরে একটি বিশাল পাথরকে বৃত্তাকারে খোদাই করিয়া বসান হইয়াছে। গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্-এর মন্দিরগুলির দেওয়াল-গাত্রে অতি মনোহর মূর্তি খোদাই করা রহিয়াছে। চোল-শিল্পের বৈশিষ্ট্য-ই হইল উহার বিশালতা। পাথরের বড় বড় পাহাড় কাটিয়া তাহা হইতে মন্দির নির্মাণ ও নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য করা চোল-শিল্পীদের শিল্পকৌশলের উৎকর্ষের চরম নিদর্শন। ফারগুসন্ (Fergusson) নামে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'চোল-শিল্পিগণ দানব-সুলভ পরিকল্পনাকে মণিকারের সূক্ষ্মতা সহকারে রূপদান করিয়াছেন।

তাঞ্জোরের শিবমন্দির

পাথরের পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণ

পাণ্ড্য রাজ্য (The Pandya Kingdom): পাণ্ড্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। হিউয়েন-সাঙ্ যখন দাক্ষিণাত্য পর্যটনে গিয়াছিলেন তখন খুব সম্ভবত পাণ্ড্যদেশ পল্লবরাজগণের অধীন ছিল। হিউয়েন সাঙ্ পাণ্ড্যদেশে যান নাই। পাণ্ড্য রাজা সুন্দর পাণ্ড্য প্রথমে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি জৈনধর্মা-বলম্বীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

প্রাচীন ইতিহাসের অভাব

পরবর্তী কালে পাণ্ড্যরাজগণ পল্লব, চোল এবং সিংহল রাজ্যের সহিত অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পাণ্ড্য রাজ্য চোল শক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়া দাক্ষিণাত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো দুইবার পাণ্ড্য রাজ্যে আসিয়াছিলেন (১২৮৮ ও ১২৯২ খ্রীঃ)। তাঁহারা বর্ণনায় পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী কায়ল (Kayal) একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সুন্দর নগর বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের হস্তে তামিল শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ড্য রাজ্যেরও অবসান ঘটে।

চের রাজ্য (The Chera Kingdom) : চের রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অশোকের রাজত্বকালে চের বা কেরলপুত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই রাজ্যটি চোলরাজগণেরই অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

তামিল রাজ্যগুলির সামুদ্রিক কার্যকলাপ (Maritime Activities of the Tamil Kingdoms) : সুদূর অতীত হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, সেকথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। গুপ্তোত্তর যুগেও এই বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির মাধ্যমে এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য বন্দরের নাম উল্লিখিত আছে। মুজিরিস (বর্তমান ক্র্যাংগানোর) কায়ল, কোরকাই প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতীয় এবং বহু উত্তর-ভারতীয় বন্দর হইতে পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত প্রাচীনকালে বাণিজ্য-চলাচল ছিল, একথা এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে। গ্রীক ও রোমান গ্রন্থেও চোল, চের ও পাণ্ড্য দেশগুলির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে একাধিক চোলবংশীয় রাজা সিংহল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে। চোলবংশের সর্বপ্রথম রাজা কারিকাল সিংহল জয় করিয়া সেই দেশ হইতে কয়েক হাজার শ্রমিক নিজ দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বাঁধ ও কাবেরীপট্টিনম্ নামে একটি রাজধানী নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। চোলরাজ রাজরাজ সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ জয় করিয়া এক সামুদ্রিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বিশাল নৌবহর ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক সাম্রাজ্য উভয় প্রয়োজনেই তিনি এই নৌবহর গঠন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র-চোলদেব বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশের পেগু অঞ্চলও জয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বাণিজ্যপোত সর্বদা যাতায়াত করিত। কাবেরীপট্টিনম্ ছিল চোল রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। পাণ্ড্য রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল কারিকল। দক্ষিণ-ভারতীয় বণিকগণ এই সকল বন্দর হইতে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া সমুদ্রপথে আরব সাগর অতিক্রম করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া, সীরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত। সেখান হইতে এই সকল সামগ্রী জল ও স্থলপথে পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি করা হইত। পরবর্তী কালে আরব বণিক সম্প্রদায় মালাবার উপকূলে বাণিজ্যব্যপদেশে যাতায়াত করিত। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—অর্থাৎ মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। সেই সকল অঞ্চল হইয়া দক্ষিণ-ভারতীয় বাণিজ্যপোত চীন এমন কি জাপান পর্যন্ত পৌঁছিত, সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুজিরিস, কায়ল, কোরকাই প্রভৃতি বন্দর

সিংহল লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, আন্দামান-নিকোবর ও পেগু অধিকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত যোগাযোগ

রোমের সহিত দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের বহুসংখ্যক রোমান মুদ্রার আবিষ্কার হইতে বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম
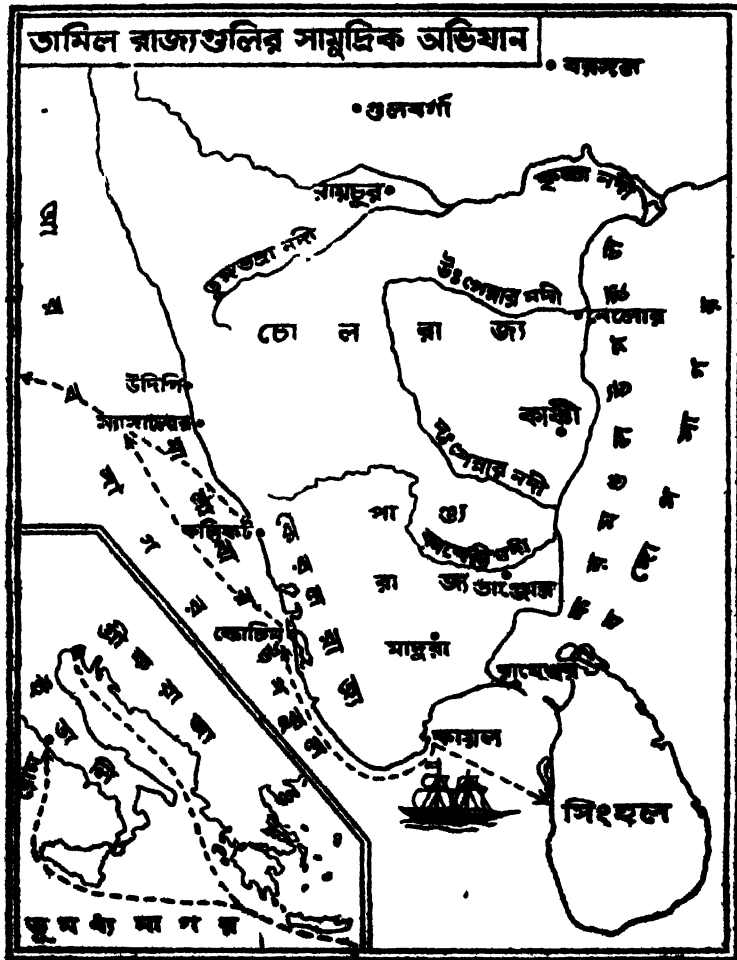
শতকে পাণ্ড্যদেশ হইতে একজন দূতকে রোমান সম্রাট অগস্টাসের সভায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এইরূপ আরও সাতটি দৌত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বলা বাহুল্য। বহির্ভারতে উপনিবেশ স্থাপন-ব্যাপারেও দক্ষিণ-ভারতীয়গণই অগ্রণী ছিল।

দ্বিতীয় এবং পঞ্চম শতকে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি ও বোর্ণিও এমন কি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের শৈবধর্মই অধিক মাত্রায় প্রচারলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মও এই সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল। হিন্দুর আচার-আচরণ ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অদ্যাপি এই সকল অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। চোলরাজ রাজরাজ নেগাপটম্ নামক বাণিজ্য-বন্দরে একটি ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে ঐ সময়ে বহুসংখ্যক ব্রহ্মদেশীয় লোক বসবাস করিত। পল্লব ও চোল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য-রীতিও সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি বহির্ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। সেই সকল স্থানের মন্দিরগুলিতে দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপনিবেশ—সাংস্কৃতিক প্রভাব

দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে পোর্তুগীজ বণিক সম্প্রদায় ভারতীয়দের হাত হইতে এই সকল অঞ্চলের প্রাধান্য কাড়িয়া লইলে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক সমৃদ্ধি লোপ পায়।

পরিশিষ্ট (ক)

(Appendix)

(১)

ভারতের বাহিরে ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতির বিস্তার (Indian Colonial and Cultural Expansion outside India) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক এবং সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র হিন্দুশাসন যুগে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই জল ও স্থলপথে ইন্দোচীন, দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, ব্যাবিলন, সীরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতীয়দের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

মৌর্যবংশের শাসনকাল হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগের বিশদ বিবরণ জানা যায়। অশোকের ধর্মদূত দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মিশর, কাইরিণী, ইপাইরাস প্রভৃতিতে এবং আফ্রিকা ও ইওরোপে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে জনৈক গ্রীক তাঁহার 'পেরিপ্লাস' (The Periplus of the Erythraean Sea) গ্রন্থে পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আরবগণ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি আরবদের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিদেশীয় যথা, গ্রীক ও রোমান প্রভাবও যে ভারতে বিস্তারলাভ করে নাই এমন নহে। গ্রীক ও রোমান জ্যোতির্বিদ্যা, মুদ্রা-নীতি, শিল্প প্রভৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

মধ্য-এশিয়া (Central Asia) : বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া এবং কুষাণরাজগণের অধীনে রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সার্ অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein)-এর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত

হইয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান্ প্রভৃতি স্থান ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্যর্ অরেল স্টাইন এই অঞ্চলে খননকার্যের দ্বারা বহু বৌদ্ধবিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবী, এমন কি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়াছেন।

হিউয়েন-সাঙ্ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ষে আসিবার এবং চীনদেশে ফিরিয়া যাইবার পথে সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চীনদেশ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের অনেকে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। নালন্দায় হিউয়েন-সাঙ্ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধগণও বিক্রমশীলা ও নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারসাধনের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে অষ্টম শতকে শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব নামে দুইজন পণ্ডিত ঐ একই উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, মালয়, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই সূত্রে পরবর্তী কালে ঐ সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এতদঞ্চল ঐ সময়ে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। ভাগ্যবিড়ম্বিত বহু ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপুত্র ঐ অঞ্চলে গিয়া ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া আসিতেন বলিয়া কথিত আছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ইন্দোচীনের কম্বোজ বা কম্বোডিয়ায় ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কৌণ্ডিন্য নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকুমার সেখানে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। চীনাদের নিকট কম্বোজ রাজ্য 'ফু-নান' নামে পরিচিত ছিল। ফু-নান ক্রমে এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিল।

ফু-নানের পতনের পর সেইখানেই জয়বর্মন্, সূর্যবর্মন্, যশোবর্মন্ প্রভৃতি রাজগণের অধীনে কম্বোজ রাজ্য অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথমে এই কম্বোজ রাজ্য ফু-নানের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু ফু-নানের পতনের পর কম্বোজ রাজ্য সমগ্র কম্বোডিয়া, কোচীন, শ্যাম, লাওস এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ যুগের বহুসংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে কম্বোজরাজগণ ও তাঁহাদের আমলে নির্মিত আঙ্কোর-ভাট্ ও আঙ্কোর-থোম্ মন্দিরগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কম্বোজ সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল।

আঙ্কোর-ভাট্ ও আঙ্কোর-থোমের মন্দিরগুলির শিল্পকৌশল ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্য আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইন্দোচীনে চম্পা নামে অপর একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই চম্পা রাজ্যেও বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এবং সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বর্তমান ভিয়েৎনাম বা আনাম চম্পা রাজ্যের রাজধানী ছিল।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, মালয়, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল স্থানেও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

শৈলেন্দ্রবংশের অধীনে সুমাত্রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগে যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু স্থান সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বাঙালী কুমারঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুরু। শৈলেন্দ্রবংশের রাজত্বকালে যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বরোবুদুর বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় শিল্পকৌশলের অপূর্ব নিদর্শন বরোবুদুরের মন্দিরটি আজিও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছে। শৈলেন্দ্রবংশ নৌবলেও বলীয়ান্ ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশ প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(২)

রাজপুতদের মূল পরিচয় (The Origin of the Rajputs) : রাজপুত জাতির আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছান সম্ভব হয় নাই। কাহিনী-কিংবদন্তীতে রাজপুতগণকে সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়জাতিসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কাহারো কাহারো মতে রাজপুত জাতি যেহেতু হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল সেই কারণেই তাহাদিগকে মূলত ভারতীয় জাতি বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নহে। রাজপুতদের দেহের গঠন হইতে অনেকে তাহাদিগকে আর্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একথা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, রাজপুত জাতি বহিরাগত জাতিগুলির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত রাজপুত জাতি ভারতের হিন্দু সমাজের সহিত শক, কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতিদের ন্যায়ই সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অর্থাৎ মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজপুতগণই ভারতের

বিভিন্নাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে উত্তর-ভারতের চৌহান, পরমার, তোমর, চন্দেল্ল, গাড়ওয়াল, কলচুরি এবং রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত জাতি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের ও শাসনের যুগে রাজপুত জাতি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

(৩)

আরব জাতির সিন্ধুদেশ জয় (The Arab Conquest of Sind) : ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হইয়া আরবগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬৩৬-৬৩৭ খ্রীঃ) ভারতের উপকূলে হানা দেয়। সুদূর বোম্বাই-এর উপকূলস্থ 'থান' (Thana) নামক স্থানে আসিবার কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার পর হইতে কিছুকাল আরবগণ ভারত-উপকূলে হানা দেওয়া ত্যাগ করে। কিন্তু অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে আরবশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাদের প্রাধান্য স্পেন, সমরখন্দ, বোখারা, ফারঘনা, কাশগড় প্রভৃতি স্থানে বিস্তারলাভ করে। ঐ সময়ে সিংহলের রাজা আরব খলিফার (Caliph) নিকট আটটি জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া নানা সামগ্রী উপঢৌকন প্রেরণ করিলে সিন্ধুদেশে দেবল নামক বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা সেগুলি লুণ্ঠিত হয়। ইরাকের আরবীয় শাসক হজ্জাজ দেবলের জলদস্যুদের শাস্তিদানের জন্য এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযানে সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে মহম্মদ-বিন্-কাশিম-এর নেতৃত্বে এক বৃহত্তর অভিযান প্রেরণ করা হয়। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বিন্-কাশিম দেবল বন্দরটি দখল করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিলেন। বহু লোককে বলপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইল। যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইল তাহাদিগকে প্রাণে বধ করা হইল। সিন্ধুর রাজা দাহির ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তিনি স্বভাবতই মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে শাস্তিদানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। দাহিরের রাণী ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। একে একে সিন্ধু রাজ্যের বাওয়ার, আলোয়ার, মুলতান প্রভৃতি সবকয়টি দুর্গই আরবদের হস্তে চলিয়া গেল। সমগ্র সিন্ধু রাজ্য আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে ভারতের একাংশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

আরবগণের ভারত-আক্রমণ ও সিন্ধুপ্রদেশ বিজয়ের ফল খুব সুদূরপ্রসারী ছিল না। কারণ, গুজরাট, কাথিয়াবাড়, কচ্ছ প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবগণ অভিযান প্রেরণ করিয়াও তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ইহা ভিন্ন ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি কোনকিছুর-ই কোন পরিবর্তন করিতে বা কোনকিছুরই উপর প্রভাব বিস্তার করিতে

তাহারা সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু তাহারা নিজেরাই ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রথম দিকে হিন্দুদের উপর বলপূর্বক ইসলামধর্ম চাপাইবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই মহম্মদ-বিন্-কাশিম ধর্ম-বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ দ্বারা হিন্দুধর্মকে দমন করা সম্ভব হইবে না।

আরবদেশে খলিফার শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে সিন্ধুদেশের আরবগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ফলে, সিন্ধুদেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন, শিয়া-সুন্নী ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বন্দ্ব সিন্ধুর আরবদিগকে ক্রমেই দুর্বল করিয়া তুলিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুদেশ জয় করিয়া আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

পরিশিষ্ট (খ)

বংশ-পরিচয়

মগধের রাজবংশ

বিম্বিসারীয় বংশ :

বিম্বিসার	৫৪৪—৪৯৩ খ্রীঃ পূঃ (আনুমানিক)		
অজাতশত্রু	৪৯৩—৪৬১	,,	,,
উদয়ভদ্র	৪৬১—৪৪৫	,,	,,
অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড	৪৪৫—৪৩৭	,,	,,
নাগদাসকে	৪৩৭—৪১৩	,,	,,

শৈশুনাগ বংশ :

শিশুনাগ	৪৩১—৩৯৫	,,	,,
কালাশোক কাকবর্ণ	৩৯৫—৩৪৫	,,	,,

নন্দবংশ :

মহাপদ্ম	৩৪৫—(?)
উগ্রসেন	
ধননন্দ	৩২৪ খ্রীঃ পূঃ

মৌর্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২৪—২৯৮ খ্রীঃ পূঃ
বিন্দুসার ২৯৮—২৭৩ ,,
সুসীম
অশোক
২৭৩—২৩২
বিগতাশোক
মহেন্দ্র (?)
কুণাল
জলোক
তিবর
বন্ধুপালিত
সম্প্রাতি
বিগতাশোক
শালিশূক
সোমশর্মন্ (দেববর্মন্ ?)
শতধন্য (শশধর্মন্)
বৃহদ্রথ

শুঙ্গ বংশ :

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ
অগ্নিমিত্র
জ্যেষ্ঠমিত্র ও সুমিত্র
ভাগভদ্র
দেবভূতি

কাণ্ব বংশ :

বাসুদেব
ভূমিমিত্র
নারায়ণ
সুশর্মন্

সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ :

সিমুক

শ্রীসাতকর্ণী
* * *
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী
* * *
যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

কুষাণ বংশ :

কুজল কদ্‌ফিসিস্ বা প্রথম কদ্‌ফিসিস্
বিম বা দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্
* * *
কণিষ্ক
বাশিষ্ক
হুবিষ্ক
দ্বিতীয় কণিষ্ক
বাসুদেব

গুপ্ত বংশ
শ্রীগুপ্ত
ঘটোৎকচগুপ্ত
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮১—৪১৩ খ্রীঃ)
গোবিন্দগুপ্ত
কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ)
স্কন্দগুপ্ত
(আঃ ৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ)
পুরুগুপ্ত
নরসিংহগুপ্ত
বুধ বা বুধগুপ্ত (৪৭৭—৪৯৫ খ্রীঃ)
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
(৪৭৩—৪৭৪ খ্রীঃ)
তথাগতগুপ্ত
বিষ্ণুগুপ্ত
বালাদিত্যগুপ্ত
প্রকটাদিত্য
বজ্র
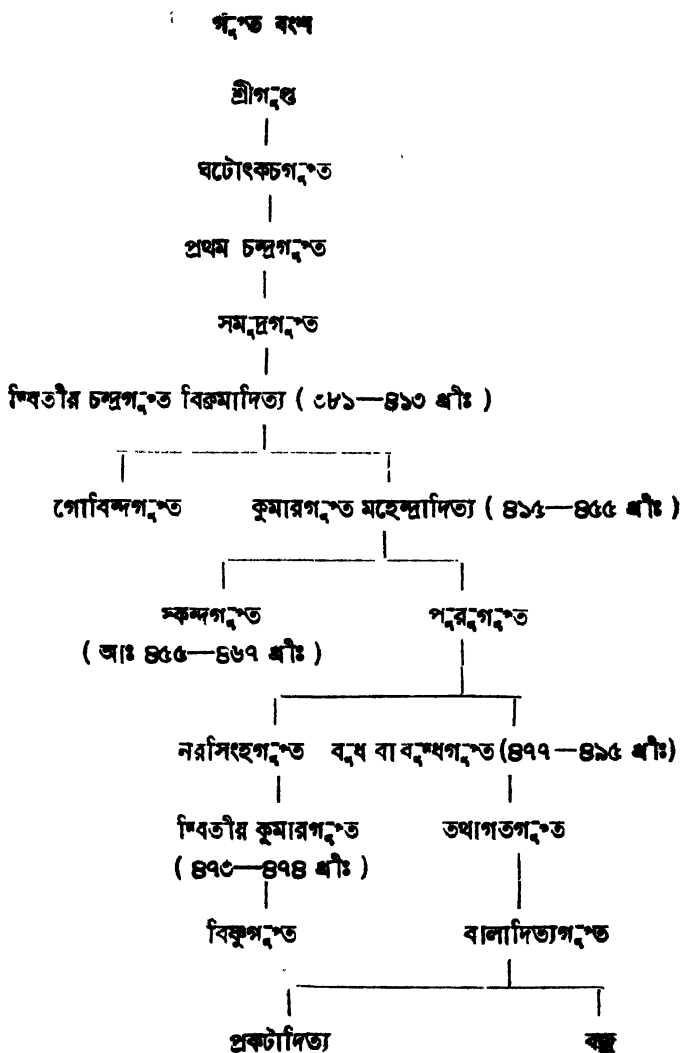
পাল বংশ
(১) গোপাল
(২) ধর্মপাল
বাক্যপাল
(৩) দেবপাল
জয়পাল
রাজ্যপাল
( ) বিগ্রহপাল
(৫) নারায়ণপাল
(৬) রাজ্যপাল
(৭) গোপাল (২য়)
(৮) বিগ্রহপাল (২য়)
(৯) মহীপাল
(১০) ন্যায়পাল
(১১) বিগ্রহপাল (৩য়)
মহীপাল (২য়)
শূরপাল
রামপাল
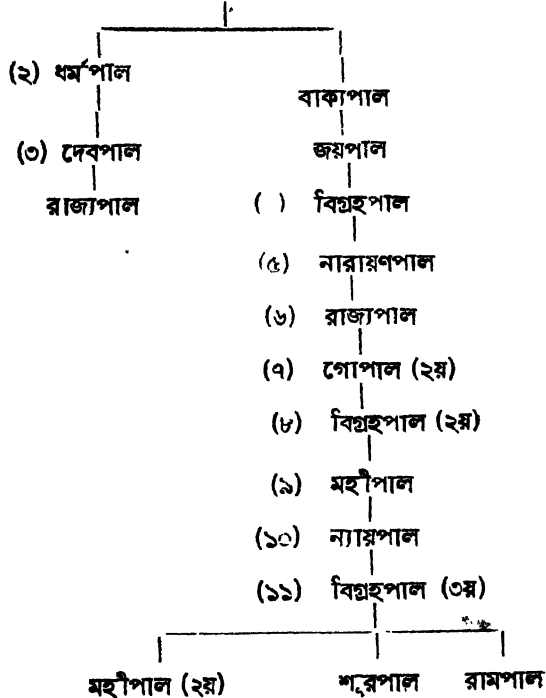
সেন বংশ
বীর সেন
সামন্ত সেন
হেমন্ত সেন
বিজয় সেন
বল্লাল সেন
লক্ষ্মণ সেন
বিশ্বরূপ সেন
কেশব সেন
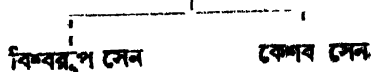
রাষ্ট্রকূট বংশ

১ম দন্তিবর্মা
১ম ইন্দ্র
১ম গোবিন্দ
১ম কর্ক
২য় ইন্দ্র
১ম কৃষ্ণ
দন্তিদুর্গ
২য় গোবিন্দ
ধ্রুব
৩য় গোবিন্দ
১ম অমোঘবর্ষ
২য় কৃষ্ণ
জগত্তুঙ্গ
৩য় ইন্দ্র
৩য় অমোঘবর্ষ
২য় অমোঘবর্ষ
৪র্থ গোবিন্দ
৩য় কৃষ্ণ
খোট্টিগ
নিরুপম
পুত্র
৪র্থ ইন্দ্র
৪র্থ অমোঘবর্ষ

চোল বংশ

বিজয়ালয়
১ম আদিত্য
১ম পরান্তক
১ম রাজাদিত্য
গণ্ডরাদিত্য
অরিঞ্জয়
মদ্‌্রান্তক উত্তম
২য় পরান্তক
১ম আদিত্য
১ম রাজরাজ
১ম রাজেন্দ্র
১ম রাজাধিরাজ
২য় রাজেন্দ্র দেব
বীররাজেন্দ্র
রাজমহেন্দ্র
অধিরাজেন্দ্র

——

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ
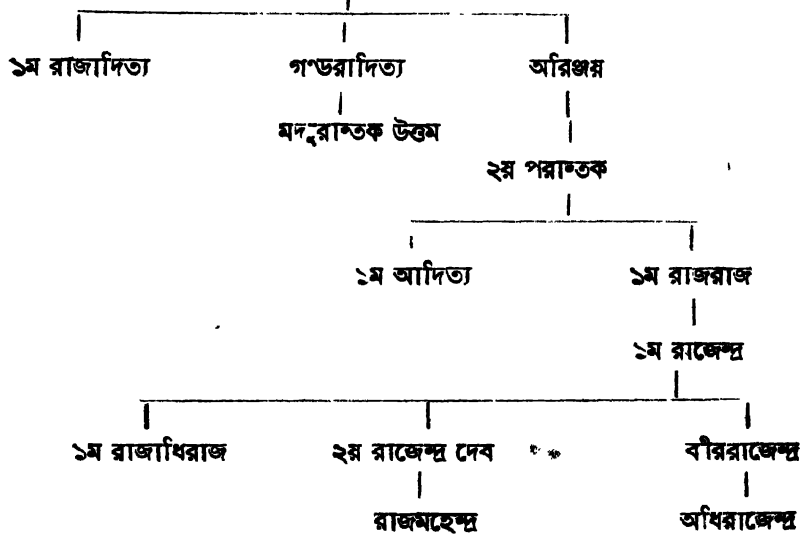
সূচনা

(Introduction)

মুসলমানদের ভারতে আগমন (The Advent of the Muslims in India) : ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে আরবের মুসলমান রাজ্য এক সর্বগ্রাসী শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করিতেছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরব সাম্রাজ্য আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ভারতের সিন্ধু প্রদেশের সীমা এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে মিশরে নীলনদ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল। স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসীদেশের দক্ষিণের কতকাংশ, আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উত্তর-উপকূল, নীলনদের অববাহিকা অঞ্চল, আরব, মেসোপটামিয়া, সীরিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, অক্ষুনদীর (The Oxus) উপত্যকা অঞ্চল প্রভৃতি ছিল তখন আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কোনিয়া (ফরাসী-জার্মান) রাজ্যের চার্লস্ মার্টেল্ (Charles Martel)-এর হস্তে টুয়র্স্ (Tours)-এর যুদ্ধে মুসলমান শক্তি পরাজিত না হইলে সমগ্র ইওরোপে মুসলমান শাসন ও ইসলামধর্ম বিস্তৃত হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

ঐ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। আরব সাম্রাজ্যের সীমা তখন দাহিরের রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তখন এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের সহিত আরবদের যুদ্ধ শুরু হয়। সিংহলের রাজা তাঁহার রাজ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে অবস্থানকালীন যে-সকল আরব বণিকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহাদের অবলম্বনহীনা কয়েকটি কন্যাকে জাহাজে করিয়া আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের শাসনকর্তা হজ্জাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিন্ধু রাজ্যের দেবল বন্দরে সেই কয়টি জাহাজ দলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কাহারো কাহারো মতে সিংহলের রাজা স্বয়ং ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া আরবের খলিফার (Caliph) নিকট আটটি জাহাজপূর্ণ নানা দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।*

সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের সহিত আরবদের সংঘর্ষ

---

* "The king of Ceylon was sending to Hajjas, the viceroy of the Eastern prov nces of the Caliphate, the orphan daughters of Muslim merchants who had died in his dominions, and his vessels were attacked and plundered by p'rates off the coast of Sind. According to a less probable account, the king of Ceylon had himself accepted Islam, and was sending tribute to the commander of the Faithful." *The Cambridge History of India*, Vol. III, pp. 2-19.

যাহা হউক, সিংহল হইতে প্রেরিত জাহাজগুলি লুণ্ঠিত হইলে হজ্জাজের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি প্রথমে ওবেদুল্লা এবং পরে বুদাইল নামে সেনাপতিকে পর পর দুইটি অভিযানে দেবলের জলদস্যুদিগের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় অভিযানই বিফল হইলে এবং ওবেদুল্লা ও বুদাইল দুইজনই নিহত হইলে হজ্জাজ ইমাদ্-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে তৃতীয় অভিযানের সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিলেন। জলপথে নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ অপর এক সেনাবাহিনী মহম্মদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হইল (৭১১)। এই যুদ্ধে আরবগণ 'বলিস্ত' (*Balista*) নামে একপ্রকার প্রস্তরনিক্ষেপক কামান ব্যবহার করিয়া সুরক্ষিত দেবল বন্দরটির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহম্মদের আদেশে সতের বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই হত্যা করা হইল। তিন দিন ধরিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পর যাবতীয় হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইল। তারপর দেবলে এক কঠোর সামরিক শাসনের ব্যবস্থা করিয়া মহম্মদ সমগ্র সিন্ধুদেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহম্মদ-বিন্-কাশিমের দেবল বন্দর অধিকার

নিরুণ, সেওয়ান প্রভৃতি দুর্গ জয় করিয়া মহম্মদ রাওর নামক স্থানে সিন্ধুর রাজা দাহিরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হইলে (জুন ২০, ৭১২) দাহিরের অন্যতমা পত্নী রাণীবাঈ নিজ পরিচারিকাগণসহ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হওয়ার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ইহার পর বাহমনাবাদ নামক দুর্গ জয় করিতে গিয়া সেই স্থানের হিন্দুদের সহিত মহম্মদ-বিন্-কাশিমের এক ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এই দুর্গটি রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণদান করিয়াও মহম্মদকে প্রতিহত করিতে পারিল না। বাহমনাবাদ আরবদের অধীনে চলিয়া গেল। বাহমনাবাদের পর আলোর জয় করিয়া মহম্মদ মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানেও এক দারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুসংখ্যক হিন্দুর প্রাণনাশ করিয়া এবং ততোধিক সংখ্যক নরনারীকে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়া মহম্মদ মুলতান শহরটি দখল করিলেন (৭১৩)। এইভাবে ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সিন্ধু উপত্যকাস্থ অঞ্চলটি অধিকার করিলেন। সিন্ধুরাজ্য জয় করিয়াই মহম্মদ ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি পার্শ্ববর্তী অপরাপর ভারতীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

রাও-এর যুদ্ধে দাহিরের পরাজয় (জুন ২০, ৭১২)

সমগ্র সিন্ধুদেশ মহম্মদের করতলগত

পরবর্তী শাসক জুনিয়াদ মহম্মদ অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। আরবদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জুনিয়াদ মরমদ (Marwar ?), অল্-মন্দল (Mandor ?), দহনজ, বরওয়াজ বা ভারুচ (Broach), উজ্জয়ীন, মালিভ (Malava), মহরিমদ, অল্‌জুজ (Gurjara) প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ

মহম্মদের পরবর্তী শাসক জুনিয়াদের রাজ্যবিস্তার

করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সংস্কৃত লিপি হইতেও জানা যায় যে, আরবগণ সিন্ধু, কুচ্, সুরাষ্ট্র, চকটক (রাজপুতানার চাপ নামক অঞ্চল), মালব ও ভিন্‌মালের পার্শ্ববর্তী গুর্জর অঞ্চল দখল করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে চালুক্য বংশ, পূর্বে প্রতিহারগণ ও উত্তরে কার্কটগণের হস্তে আরব আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল।

আরব আক্রমণ প্রতিহত

মহম্মদ-বিন্-কাশিম সিন্ধু জয় করিয়া প্রথমে সেখানে এক অত্যাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি তাঁহার এই ধর্মান্ধ, অত্যাচারী নীতি পরিবর্তন করিয়া ধর্মপালনের স্বাধীনতা, হিন্দুদের মন্দির ও খ্রীষ্টানদের গির্জা প্রভৃতি যাহাতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

আরব শাসনের প্রকৃতি

বিজিত রাজ্যকে তিনি কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন সামরিক কর্মচারীর উপর শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সরকারী কর্মচারীদিগকে তাহাদের কাজের পরিবর্তে জমি জায়গীর হিসাবে দেওয়া হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারাও বেতন দেওয়া হইত। মসজিদ ও ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদেরও সরকারী জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইত।

শাসনব্যবস্থা

রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল অ-মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জিজিয়া কর ও জমির খাজনা। উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জিজিয়া কর আদায় করা হইত। বিচারের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। স্থানীয় জমিদার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। হিন্দু প্রজাবর্গের বিচার করিতেন কাজি। মুসলমান আইন-কানুন অনুসারেই হিন্দুদেরও বিচার করা হইত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে অমানুষিক কঠোর দণ্ডবিধির ব্যবস্থা ছিল। সামান্য চুরির অপরাধে দোষী ব্যক্তির পরিবারের সকলকে আগুনে পুড়াইয়া মারা হইত। হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের বিচার হিন্দু পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজস্ব

বিচারব্যবস্থা

চালুক্য, প্রতিহার ও কার্কটদের অবিরাম যুদ্ধ এবং আরব-অধিকৃত দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ স্বার্থ-দ্বন্দ্ব অল্পকালের মধ্যেই আরব আধিপত্য-বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিল। তদুপরি আরব খলিফার রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে সিন্ধুপ্রদেশের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হইল। শিয়া-সুন্নী ধর্মদ্বন্দ্ব রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদের পরিপূরক হইয়া উঠিল। এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরী সমগ্র সিন্ধুদেশ জয় করিয়া আরব আধিপত্যের বিলোপ সাধন করিলেন।

সিন্ধুদেশে আরব শাসনের অবসান

ভারতে আরব অধিকার অতি ক্ষুদ্র অংশেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে আরব অধিকার ভারত-ইতিহাসের এক অতি অকিঞ্চিৎকর

ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক টড্ (Tod) তাঁহার 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থে আরব অধিকারের যে গুরুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। স্টেনলি লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) আরব অধিকারকে ফলাফলবিহীন এক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,* কিন্তু বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব-অধিকার সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। আরব-অধিকৃত সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বসবাসের ফলে আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল। আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের জ্ঞান ইওরোপীয় দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। জনৈক আরব পণ্ডিত আবু মা'শর বানারসে আসিয়া দীর্ঘ দশ বৎসর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতীয় হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া আরবগণ চমৎকৃত হইয়াছিল। আরব ঐতিহাসিক তব্রি (Tabri)-র বর্ণনা হইতে জানা যায় খলিফা হারুন্ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে একজন ভারতীয় হিন্দু চিকিৎসক তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদিও আরবগণ ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে শিখিয়াছিল। মনসুর যখন বাগদাদের খলিফা তখন ভারতীয় পণ্ডিতদের রচিত বহু গ্রন্থ ভারতীয়দের সাহায্যে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ড-খাদ্যক' নামক দুইখানি জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানও আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। এই কারণে আরবগণ 'সংখ্যা'কে 'হিন্দসাস্' (Hindasas) বলিত। আরবদেশের বহু শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিতেন এবং বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে তাঁহারা বাগদাদে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বহু ভারতীয় চিকিৎসক বাগদাদের হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আরব্য সাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প ও সুকুমারশিল্প ভারতীয় প্রভাবের ফলে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।†

আরব শাসনের ফলাফল

আরবদের উপর ভারতীয়দের সংস্কৃতির প্রভাব

সিন্ধুদেশের হিন্দু জনসংখ্যার একাংশকে বলপূর্বক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা

* "......an episode in the history of India and Islam a triumph without result." Stanley Lane-Poole.

† "It was India, not Greece, that taught the Islam in the impressionable years of its youth, formed philosophy and esoteric religious ideals and inspired its most characteristic expression in literature, art and architecture." Havell. *Aryan Rule in India*, p. 256.

হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ বা তাহাদের ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আরবগণ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভারত-ইতিহাসের উপাদান (মধ্যযুগ) (Sources of Medieval Indian History): ভারতের মধ্যযুগ তথা মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার উপকরণের প্রাচুর্য ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত করা বিচিত্র নহে। ঐ যুগের ইতিবৃত্ত-লেখক সুলতানদের সভাকবি, বিদেশী বণিক, পর্যটকদের পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করাই হইল মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস রচয়িতার গুরু দায়িত্ব। অবশ্য প্রাচীন যুগের ন্যায় এই যুগের ইতিহাস-রচনায় পরোক্ষ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিতে হয় না। মধ্যযুগের ইতিহাস-রচনার তথ্যাদিকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে, যথা: (১) সরকারী দলিলপত্র, (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা, (৩) বিদেশী পর্যটক ও বণিকদের বিবরণ, (৪) মুদ্রা ও শিল্প-নিদর্শন, (৫) হিন্দু লেখকদের রচনা।

ঐতিহাসিক উপকরণের প্রাচুর্য

(১) **সরকারী দলিলপত্র (State Papers):** সুলতানী ও মুঘল আমলের সরকারী দলিলপত্রাদি ঐ সময়ের ইতিহাস-রচনার অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপকরণ, সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে মুঘল আমলে সরকারী কাগজপত্র সংরক্ষণের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এই সকল দলিলপত্রের অধিকাংশই পরবর্তী কালের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুঘল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে চব্বিশ হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল, কিন্তু এগুলির একটিও রক্ষা পায় নাই। যাহা হউক, যাহা কিছু সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ঐ যুগের ইতিহাস-রচনার মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

সরকারী দলিলপত্রের অধিকাংশ বিনাশপ্রাপ্ত

(২) **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা (Writings of the Contemporary Historians):** (ক) অলবেরুণী (Alberuni) নামে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত প্রথমে গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভায় ছিলেন। কিন্তু সুলতান মামুদ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হইলে তিনি গজনী হইতে পাঞ্জাবে চলিয়া আসেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি 'তহ-কক্-ই-হিন্দ্'* (*An Enquiry into India*) নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক-

অলবেরুণী

* "The title of the book is *Kitabun fi Tahqiq-i-ma-li-l-Hind*" Sachau, Text, Pref. p. iv, and p. 1: *vide* Elliot & Dowson. *History of India as told by Her Own Historians*, Vol. II (Reprint), p. 777.

অতি মনোজ্ঞ বর্ণনা রহিয়াছে। সমসাময়িক হিন্দুসমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অল্‌বেরুণী ভগবদ্‌গীতার দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

(খ) মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ (Minhaj-us-Siraj) এবং হাসান নিজামীর (Hasan Nizami) রচনা হইতে দাস রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ নাসির-উদ্দিন মহম্মদের অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার 'তবকৎ-ই-নাসিরী' নাসির-উদ্দিনের রাজত্বকালের এক অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনা।

মিন্‌হাজ উস্‌-সিরাজ ও হাসান নিজামী

(গ) আমীর খুসরু বা খুস্‌রভ (Amir Khusrav) ছিলেন গিয়াস-উদ্দিন বলবনের আমলের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক। পরবর্তী কালে তিনি আলা-উদ্দিন খল্‌জীর সভাকবির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে কেবল তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এমন নহে, ঐ যুগের ইতিহাস-রচনায়ও তাঁহার গ্রন্থাদির যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

আমীর খুসরু

(ঘ) মোবারক শাহ্‌ ও মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের আমলের একজন অতি সুদক্ষ শাসনকর্তা আইন-উল্‌-মুল্‌ক (Ain-ul-Mulk) ইসলামধর্ম ও মুসলমান আইন-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। 'মুনসাৎ-ই-মহ্‌রা' (Munshat-i-Mahra) নামে একখানি গ্রন্থে তিনি ফিরুজ তুঘ্‌লকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

আইন-উল্‌-মুল্‌ক

(ঙ) জিয়া-উদ্দিন বর্‌ণী (Zia-ud-din-Barni) সুলতানী আমলের আরম্ভ হইতে ফিরুজ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফিরুজ তুঘ্‌লকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁহার রচিত 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' (Tarikh-i-Firuz-Shahi) একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। ইসামি রচিত 'ফতোয়া-উস্‌-সালাতিন' (Futuha-us-Salatin) একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের একটি সুন্দর ইতিহাস-কাব্য।

জিয়া-উদ্দিন-বর্‌ণী

(চ) ফিরুজশাহের স্ব-রচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজশাহী' (Futuhat-i-Firuz-Shahi) গ্রন্থে ফিরুজশাহের শাসনব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, ফিরুজশাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে শাম্‌স-ই-সিরাজ, আইন-উল্‌-মুল্‌ক্‌, আমীর খুসরু, এহিয়া-বিন্‌-আহম্মদ, আজ-উদ্দিন খলিদ খানি প্রভৃতি লেখকদের রচনা হইত মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়।

ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজশাহী, শাম্‌স-ই-সিরাজ, আইন-উল্‌-মুল্‌ক, এহিয়া-বিন্‌-আহম্মদ, আজ-উদ্দিন

(ছ) বাবর-এর জীবনস্মৃতি (Memoirs), জাহাঙ্গীর-এর জীবনস্মৃতি, হুমায়ুনের অনুচর জোহর রচিত 'তজকিরাৎ-উল্-ওয়াকিয়াৎ' (Tajkirat-ul-wakiat), গুল্বদন বেগম-রচিত 'হুমায়ুননামা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বাবর ও জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, জোহর ও গুল্বদন-রচিত গ্রন্থাদি

(জ) সমগ্র মুসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন ফেরিস্তা (Ferishtah)। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সভার সভাসদ্ ছিলেন। তিনি মুঘল যুগ ও মুঘল যুগের পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফেরিস্তা

(ঝ) আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশদ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী' (Ain-i-Akbari) ও 'আকবরনামা' (Akbarnama) নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনায় এই দুইখানি গ্রন্থ অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। বদাউনীর (Badauni) 'মুন্তাখাব্-উৎ-তোয়ারিখ' (Muntakhab-ut-Tawarikh) ও নিজাম-উদ্দিন আহ্মেদ-রচিত 'তবকত-ই-আকবরী' (Tabaquat-i-Akbari) সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আবুল ফজল ও বদাউনী

(ঞ) 'আলমগীরনামা', 'পাদশাহীনামা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে শাহ্জাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট আছে। 'মাসির-ই-আলমগীর' ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ। কাফি খাঁ-রচিত 'মুন্তাখাব-উল্-লুবাব্' (Muntakhab-ul-Lubab) গ্রন্থ হইতে ঔরঙ্গজেবের আমলের বহু মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়।

আলমগীরনামা, পাদশাহীনামা, কাফি খাঁ

(৩) **বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (Account of Foreign Travellers):** সুলতানী ও মুঘল আমলে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় স্বভাবতই মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। (ক) ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ-ভারতের তামিল রাজ্যে আসেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তদানীন্তন দক্ষিণ-ভারতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে কতক মূল্যবান তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। (খ) সুলতানী আমলের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বিদেশী পর্যটক ছিলেন আফ্রিকাবাসী ইবন্ বতুতা (Iban Batuta)। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের অধীনে রাজকর্মচারী হিসাবে কিছুকাল কাজও করিয়াছিলেন। ইবন্ বতুতা মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের আমলের একখানি নিখুঁত ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া

মার্কো পোলো

ইবন্ বতুতা

মুসলমান আক্রমণকালে
ভারতবর্ষ
(একাদশ শতক)
০ ৩৫০ ৭০০
মাইল
পেশোয়ার
গজনী
কাশ্মীর
তোমর
চৌহান
দিল্লী
মথুরা
কনৌজ
প্রয়াগ
চন্দেল্ল
কাশী
পাল
গঙ্গা নং
অনহিলবার
পরমার
উজ্জয়িনী
কলচুরি
চালুক্য
সোমনাথ
নর্মদা নং
মহানদী
যাদব
চালুক্য
কাকতীয়
কৃষ্ণা নং
চোল
পাণ্ড্য
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর

গিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনার সহিত ইবন্ বতুতার বর্ণনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আলা-উদ্দিন-এর কথা বলিতে গিয়া ইবন্ বতুতা তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও জমির উর্বরতা সম্পর্কেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (গ) মাহুয়ান (Mahuan) নামে জনৈক চীনদেশীয় পর্যটক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে সেই সময়কার বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (ঘ) মধ্যযুগে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি (Nicolo Conti), পারসিক পর্যটক আব্দুর্-রজাক, রুশ পর্যটক আথেনুসিয়াস্ নিকিতিন (Athanusius Nikitin), পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) ও নুনিজ (Nunitz) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়কার দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইঁহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। (ঙ) মুঘল যুগে জেসুইট্ ধর্মযাজকগণের (Jesuit missionaries) রচনা, র‍্যাল্ফ্ ফিচ্, টমাস রো, টেভারনিয়ে, বার্ণিয়ে, ক্যারেরি, টেরি, পার্কাস, মানুচি প্রভৃতি ইওরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনা হইতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস, জনসাধারণের অবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

চীন পর্যটক মাহুয়ান

নিকোলো কন্টি, আব্দুর্-রজাক, নিকিতিন, পায়েজ ও নুনিজ

জেসুইট্ যাজকগণ, ফিচ্, রো, টেভারনিয়ে, বার্নিয়ে, টেরি, পার্কাস ও মানুচি প্রভৃতি

(৪) **মুদ্রা ও শিল্প-নিদর্শন (Coins and Monuments):** সুলতানী ও মুঘল যুগের স্থাপত্যশিল্প ও ললিতকলার বহু নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। এগুলি হইতে ঐ যুগের ভারতীয় স্থাপত্য ও অপরাপর শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী আমলের স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু ও মুসলমান শিল্প-কৌশলের সংমিশ্রণের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী ও মুঘল আমলের মুদ্রাগুলি ঐ যুগের মুদ্রানীতি ও ধাতুশিল্পের পরিচয় দিয়া থাকে।

মুদ্রা, স্থাপত্য ও শিল্পকলা

(৫) **হিন্দু লেখকদের রচনা (Writings of the Hindus):** মুঘল আমলে রচিত মারাঠা ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে 'সভাসদ্ বখর' নামক গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর সমসাময়িক জনৈক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। সুজন রায় ভাণ্ডারী-রচিত 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ্' (Khulasat-ut-Twarikh) নামক গ্রন্থে গজনীবংশের শাসনকাল হইতে দিল্লী সুলতানির প্রথম দিকের ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজপুত চারণদের চারণগীতি রাজপুত ইতিহাস-রচনার সহায়ক। টড্-এর 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) প্রধানত রাজপুত চারণদের রচনার উপর নির্ভর

মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের রচনা

করিয়াই রচিত হইয়াছে। এই কারণে টডের গ্রন্থখানি নির্ভুল ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই চারণদের রচনা এবং টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস'-এর মধ্যে কতক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও রহিয়াছে। শিখদের 'গ্রন্থসাহেব' ও অপরাপর ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে শিখধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political Condition of Northern India on the eve of the Muslim Invasion) : গজনীর সুলতান মামুদ যখন ভারত-অভিযান শুরু করেন তখন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরস্থ সমগ্র ভূভাগ কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। স্বভাবতই সুলতান মামুদ তথা অপর কোন মুসলমান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত প্রথম পর্যায়ের কোন হিন্দু রাজশক্তি তখন ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের ন্যায় কোন শক্তিশালী রাজাও তখন উত্তর-ভারতে ছিলেন না।

সুলতান মামুদের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহিবংশের হিন্দু রাজা জয়পাল রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যসীমা চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাহিরাজ্যের রাজধানী ছিল উদ্‌ভাণ্ডপুর (বর্তমান উন্দ্)। আজমীর ও দিল্লীতে তখন চৌহান বংশ রাজত্ব করিতেছিল। কনৌজ তখন ছিল গাহড়বাল বংশের অধীনে; আর বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশ, মালবদেশে পরমার বংশ, গুজরাটে চালুক্য বংশ, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে ডাহল রাজ্যে চেদীবংশ, বাংলাদেশে পালবংশ ও কাশ্মীর রাজ্যে কার্কট বংশ রাজত্ব করিতেছিল।

প্রথম অধ্যায়

ভারতে মুসলমান শক্তির উত্থান
(Rise of the Muslim Power in India)

গজনী বংশ (The Ghaznavids) : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সিন্ধু দেশে আরব আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উহার কোন গুরুত্ব ছিল না, ইসলামধর্মও সিন্ধুদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ধর্মজীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইসলামধর্মের বিস্তৃতি সিন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দশম শতকের শেষ ভাগে গজনীর তুর্কী মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের সময় হইতেই ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের এবং ইসলামধর্ম-বিস্তারের যুগের সূচনা হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

দশম শতকের শেষ-ভাগে গজনীর তুর্কী মুসলমানদের ভারত-আক্রমণ

দশম শতকের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের সুলেমান পার্বত্য অঞ্চলে আল্‌প্তিগীন নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুর্কী মুসলমান কর্তৃক গজনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্‌প্তিগীন প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি পারস্যের সামানিদ বংশের (The Samanids) অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। সামানিদ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোখারা। সামানিদ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আল্‌প্তিগীন গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আল্‌প্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইশাক্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে আল্‌প্তিগীনের একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস বক্তিগীন গজনীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বক্তিগীনের পরবর্তী আমীরের নাম ছিল পীরাই। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পীরাই সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহিবংশের রাজা জয়পাল সীমান্তবর্তী গজনী রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া উহা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণ বিফলতায় পর্যবসিত হইল।*

গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : আল্‌প্তিগীন

ইশাক্, বক্তিগীন ও পীরাই

জয়পাল কর্তৃক গজনী আক্রমণ

---

* "Pirai succeeded in 972, whose reign of five years is remarkable for the first conflict in this reign between Hindus and Muslims, the former being the aggressors. The Raja of the Punjab, whose dominions extended to the Hindukush and included Kabul, was alarmed by the establishment of a Muslim kingdom to the south of the great mountain barrier and invaded the dominion of Ghazni but was defeated." *The Cambridge History of India,* Vol. III, p. 11.

৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গীরাই জনসাধারণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে আল্‌প্তিগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অবশ্য মুখে সামানিদ বংশের সম্রাটদের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শাহিবংশের রাজা জয়পাল বণিক ও পর্যটকদের মুখে সবুক্তিগীন কর্তৃক তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত দেশের কতক অঞ্চল অধিকারের কথা শুনিয়া সবুক্তিগীনকে শাস্তিদানের জন্য অগ্রসর হইলেন (৯৭৯)। ঘুজাক্ (Ghuzak) নামক স্থানে জয়পাল সবুক্তিগীনের সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু এক দারুণ তুষারপাতের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।* এই ঘটনার সাত বৎসর পর (৯৮৬) সবুক্তিগীন নিজ সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী হিসাবে ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ লইয়া গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। ইহার দুই বৎসর পর (৯৮৮) সবুক্তিগীন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কাবুল ও উহার নিকটবর্তী কতক অঞ্চল সমর্পণে বাধ্য করিলেন। ইহার অল্পকাল মধ্যেই সবুক্তিগীনের মৃত্যু হইল (৯৯৭)। সবুক্তিগীন ভারতবর্ষের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি ভারত-অভিযানের ইঙ্গিত রাখিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র মামুদ সবুক্তিগীনের এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া বারবার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

জয়পাল কর্তৃক দ্বিতীয়বার গজনী আক্রমণ (৯৭৯)

সবুক্তিগীন কর্তৃক জয়পালের রাজ্য আক্রমণ (৯৮৬), দ্বিতীয় আক্রমণ (৯৮৮)

সবুক্তিগীনের মৃত্যু মামুদের সিংহাসন-লাভ

সুলতান মামুদ (Sultan Mahmud): সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মামুদ পিতা সবুক্তিগীনের নীতি অনুসরণ করিয়া সামানিদ বংশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সামানিদ সম্রাটপদ লইয়া স্বার্থান্বেষী কর্মচারীদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে মামুদ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি খলিফা অল-কাদের বিল্লাহ্-এর নিকট হইতে 'ইয়ামিন্-উদ্-দোলা' ও 'আমিল-উল্-মিলাত' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মামুদ গজনীবংশের চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করিয়া নিজেকে 'আমীর'-এর পরিবর্তে 'সুলতান' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর তিনি পৌত্তলিক হিন্দুগণ-অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন।

'ইয়ামিন্-উদ্-দোলা' ও 'আমিল-উল্-মিলাত' উপাধিলাভ

* "Two years after his (Sabuktigin's) accession Jaipal, Raja of the Panjab, again invaded the kingdom of Gazni from the east, but terms of peace were arranged." *The Cambridge History of India*, Vol. III. p. 11.

১০০০ হইতে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসরই সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি মোট কত বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। সার্ হেন্‌রী ইলিয়ট্ (Sir Henry Elliot)-এর মতে সুলতান মামুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।* আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সার্ হেন্‌রী ইলিয়টের মত-ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ

সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে খাইবার গিরিপথের সীমান্তবর্তী কয়েকটি শহর আক্রমণ করেন। এই অভিযানের ফলে তিনি কয়েকটি জেলা ও কয়েকটি দুর্গ দখল করিতে সক্ষম হন। নব-বিজিত স্থানে তিনি একজন শাসক নিযুক্ত করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

প্রথম অভিযান (১০০০)—সীমান্তবর্তী শহরের বিরুদ্ধে

প্রথম অভিযানের অল্পকালের মধ্যেই (১০০০ খ্রীঃ) সুলতান মামুদ দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ 'ধর্মের ধ্বজা উড্ডীন করিবার এবং ন্যায়, সত্য ও সুবিচার প্রভৃতির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য' জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইলেন।† জয়পালও সামরিক প্রস্তুতিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। পেশওয়ার-এ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। পনর হাজার হিন্দু সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। মামুদ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়পাল তাঁহার পনর জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও অসংখ্য অনুচরসহ সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হইলেন। জয়পালের গলা হইতে বহু মণি-মুক্তা-খচিত হার মামুদের আদেশে কাড়িয়া লওয়া হইল। জয়পাল আড়াই লক্ষ দিনার (dinars) ও দেড় শত হাতী মুক্তিপণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া স্থির হইল। কিন্তু মুক্তিপণের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ যোগাড়

দ্বিতীয় অভিযান (১০০০)—জয়পালের বিরুদ্ধে

---

* "The following is Sir H. M. Elliot's arrangement:

1. Frontier towns, A. D. 1000; 2. Peshwar and Waihind, 1001; 3. Bhira (Bhatia), 1004; 4. Multan, 1006; 5. Against Nawasa Shah, 1007; 6. Nagarkot, 1008; 7. Narain, 1009; 8. Multan, 1010; 9. Ninduna, 1013; 10. Thaneswar, 1014; 11. Lohkot, 1015; 12. Mathura, Kanauj, 1018; 13. The Rahib, 1021; 14. Kirat, Lohkot, Lahore, 1022; 15. Gwalior, Kalinjar, 1023; 16. Somnath, 1025-26; 17. The Jats, 1026-27; Lane-Poole, *Mediaeval India under Mohammadan Rule*, pp. 18-19, (Foot note).

† "For the purpose of exalting the standard of religion, of widening the plain of right, of illuminating the words of truth and of strengthening the power of justice." Vide, Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 80.

করা সম্ভব না হওয়ায় কয়েকজন প্রতিভূর বিনিময়ে জয়পাল ও তাঁহার অনুচরবর্গকে মুক্ত দেওয়া হইল। মামুদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই জয়পালের পুত্র আনন্দপাল প্রতিশ্রুত মুক্তিপণের অবশিষ্টাংশ শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।* সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হওয়ার অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জয়পাল রাজ্যভার নিজপুত্র আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

জয়পালের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ : আনন্দপালের সিংহাসন লাভ

১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ তাঁহার তৃতীয় অভিযানে ঝিলাম নদীর তীরবর্তী 'ভীর' (Bhira) নামক শহরটি জয় করিলেন। তারপর তিনি মুলতান জয় করিবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাঞ্জাব অঞ্চলের রাজা আনন্দপালের রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। মুলতান রাজ্যের অধিপতির সহিত আনন্দপালের মিত্রতা ছিল, ইহা ভিন্ন মামুদ ছিলেন তাঁহার পিতৃশত্রু। স্বভাবতই তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদকে সসৈন্যে যাইবার অনুমতি দিলেন না। ফলে, মামুদ আনন্দপালের উপর প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু মুলতান নিজ প্রাধান্যাধীনে আনিতে মামুদকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। মুলতানের রাজা আবুল ফতা দাউদ্ বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হওয়ায় সুলতান মামুদ মুলতানের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন।

তৃতীয় অভিযান (১০০৪)—ভীর নামক শহরের বিরুদ্ধে

চতুর্থ অভিযান (১০০৬)—মুলতান-এর বিরুদ্ধে

ইতিমধ্যে কাশগড়ের রাজা গজনীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মামুদ ভারতবর্ষে তাঁহার বিজিত স্থানগুলি নওয়াজ শাহ্-এর শাসনাধীনে স্থাপন করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নওয়াজ শাহ্ ছিলেন জাতিতে হিন্দু, তাঁহার নাম ছিল সেবকপাল। মামুদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নওয়াজ শাহ্ ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুলতান মামুদের আনুগত্য অস্বীকার করিলেন। কিন্তু মামুদ অল্পকালের মধ্যেই নওয়াজ শাহ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। নওয়াজ শাহ্‌কে জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে কাটাইতে হইল।

নওয়াজ শাহ্-এর বিরুদ্ধে অভিযান—(১০০৭)

১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইলেন।

---

* **"A treaty was made, by which he agreed to pay 250,00 *dinars* as ransom and to give fifty elephants, and his son and grandson as hostages for fulfilling the conditions of peace." *Vide*, Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 80.** কিন্তু ***Cambridge History of India***তে বলা হইয়াছে :

"...Jaipal was permitted to ransom himself for a large sum of money and a hundred and fifty elephants, but as the ransom was not at once forthcoming was obliged to leave hostages for its payment His son Anandapal made good the deficiency and the hostages were released before Mahmud returned to Ghazni."—*The Cambridge History of India*, Vol. III. p. 14.

আনন্দপাল মামুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব হইতেই সন্দিহান ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার অনুমতিদানে অস্বীকৃত হওয়ার কথা সুলতান মামুদ ভুলিবার পাত্র নহেন। আনন্দপালও সেজন্য উজ্জয়িনী, গোয়ালিওর, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীর-এর রাজগণের সহিত সম্মিলিতভাবে সুলতান মামুদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কাশ্মীরের পাদদেশে বসবাসকারী দুর্ধর্ষ খোকর জাতির (Khokars) সাহায্যও আনন্দপাল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অভিযান (১০০৮)—আনন্দপালের বিরুদ্ধে

পেশওয়ার ও উন্দ-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ বাধিলে প্রথমেই ত্রিশ হাজার খোকর সৈন্যের আক্রমণে সুলতান মামুদের সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মামুদের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। এমতাবস্থায় মামুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই যখন স্থির করিয়াছেন, তখন এক আকস্মিক ঘটনার ফলে তিনি যুদ্ধে একপ্রকার পরাজিত হইয়াও জয়লাভ করিলেন। আনন্দপালের জয়লাভ যখন নিশ্চিত তখন যে হাতীর উপর চড়িয়া তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই হাতী ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল। আনন্দপাল যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। সুলতান মামুদ সুযোগ পাইয়া পলায়মান হিন্দুবাহিনীর আট হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ করিলেন। এইভাবে যুদ্ধে তাঁহারই জয় হইল। তিনি নগরকোট বা কাংড়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দুর্গ সর্বাপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত ছিল বলিয়া বহু হিন্দুরাজা ও অর্থশালী ব্যক্তি সেখানে তাঁহাদের মণি-মুক্তা ও ধনরত্ন জমা রাখিতেন। সুলতান মামুদ অতি সহজেই দুর্গটি জয় করিয়া সেখান হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ধনদৌলত লইয়া গেলেন। এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মন্দির ছিল উহা হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণ সোনা ও রূপা লুণ্ঠন করিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও পনর গজ প্রশস্ত একটি রৌপ্যনির্মিত গৃহ ছিল। এই গৃহের অভ্যন্তরে দুইটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্যনির্মিত স্তম্ভের সাহায্যে একটি চাঁদোয়া খাটান ছিল। মামুদ এই চারিটি স্তম্ভ লইয়া গিয়াছিলেন। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কাংড়া দুর্গ হইতে মামুদ মোট সাত লক্ষ দিনার, সাত শত মণ সোনা ও রূপার পাত, দুই শত মণ খাঁটি সোনা, দুই হাজার মণ রূপা ও কুড়ি মণ মণি-মুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। কাংড়া হইতে লুণ্ঠিত সোনা, রূপা ও মণি-মুক্তা গজনী রাজ্যে লইয়া গেলে সেখানে সমবেত বৈদেশিক দূতগণ বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন।

কাংড়া দুর্গ লুণ্ঠন

হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে যে বিশাল পরিমাণ ধনদৌলত সুলতান মামুদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অর্থগৃধ্নুতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি হিন্দুমন্দির আক্রমণ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙিবার জন্য আরও উৎসুক হইয়া পড়িলেন। তিনি 'গাজী' (Victor) ও 'বাত্-শিকান্' (Idol-breaker) উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করিলেন।

সুলতান মামুদের 'গাজী' ও 'বাত-শিকান্' উপাধি গ্রহণ

সুলতান মামুদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিযান হইল থানেশ্বর আক্রমণ। ইহা ছিল তাঁহার দশম অভিযান (১০১৪)। মামুদ এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া থানেশ্বর-রাজ গজনীতে এক দূত প্রেরণ করিয়া বাৎসরিক পঞ্চাশটি হাতী করদানের প্রস্তাব জানাইলেন। মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। থানেশ্বর-এ উপস্থিত হইয়া তিনি সেখানকার সুবিখ্যাত হিন্দু মন্দিরটি অরক্ষিত অবস্থায় পাইলেন। সুতরাং একপ্রকার বিনা বাধায়ই তিনি মন্দিরস্থ বিগ্রহাদি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সেখানকার যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলেন। তারপর তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে তাঁহার অনুচরগণ প্রথমে পাঞ্জাব জয় করিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

দশম অভিযান (১০১৪)—থানেশ্বরের বিরুদ্ধে

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের দ্বাদশ অভিযানে কনৌজ ও মথুরা লুণ্ঠিত হইল। কনৌজের রাজা রাজ্যপাল বিনা যুদ্ধে মামুদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।* সুলতান মামুদ কনৌজের সাতটি দুর্গ একে একে জয় করিয়া সেগুলির অভ্যন্তরস্থিত যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলেন। ইহা ভিন্ন, বহুসংখ্যক লোককে তিনি বন্দী হিসাবে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র লীলাক্ষেত্র মথুরা নগরীর দশ হাজার ছোট-বড় মন্দির লুণ্ঠন করিয়াও মামুদের অর্থগৃধ্নুতা তৃপ্ত হইল না। মথুরা নগরীর মধ্যস্থলে নির্মিত মন্দিরটি স্থাপত্য ও শিল্পের এক অতি অপূর্ব নিদর্শন ছিল। সুলতান মামুদ এই মন্দিরটির সৌন্দর্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা নির্মাণে অন্তত দুই শত বৎসর সময় লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু তাঁহারই আদেশে হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। তাঁহার বর্বরতায় হিন্দু-স্থাপত্যের এক অমূল্য সম্পদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মন্দিরের যাবতীয় ধনরত্নাদি ও স্বর্ণনির্মিত বিগ্রহাদি মামুদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচটি ছিল পাঁচ গজ উচ্চ। এই পাঁচটি বিগ্রহের চক্ষু ছিল অতি মূল্যবান্ মণি দ্বারা তৈয়ারী।

দ্বাদশ অভিযান (১০১৮)—কনৌজ ও মথুরার বিরুদ্ধে

এদিকে কনৌজ-রাজ রাজ্যপাল সুলতান মামুদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া অপমানজনক-ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিবেশী রাজগণ কালিঞ্জরের চন্দেল্ল বংশের রাজা গোণ্ড-এর নেতৃত্বে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন।† রাজ্যপাল তাঁহাদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। প্রতিবেশী রাজগণ তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পালকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। সুলতান মামুদ রাজ্যপালকে নিজ আশ্রিত রাজা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্বভাবতই তিনি চন্দেল্লরাজ গোণ্ডকে উচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে

* Vide: Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, pp. 90-91.

† *Idem.*

তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গোণ্ড এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ মামুদকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ত্রিলোচন পালও তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোণ্ড সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া রাত্রির অন্ধকারে নিজ সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতে পলায়ন করিলেন। মামুদ সহজেই চন্দেল্ল রাজ্যের সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ৫৮০টি হাতী ও প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পর বৎসর (১০২১-২২) তিনি গোয়ালিওর জয় করিয়া পুনরায় চন্দেল্ল রাজ্যের প্রধান দুর্গ কালিঞ্জর-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। চন্দেল্লরাজ গোণ্ড এইবার পূর্বাহ্নেই মামুদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন দান করিয়া মামুদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এই সূত্রে গোণ্ড কর্তৃক সুলতান মামুদের নিকট লিখিত পত্রখানির চাটুবাক্যাদিতে মামুদ খুব প্রীত হইয়াছিলেন বলিয়া নিজাম-উদ্দিন ও ফেরিস্তার গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

পঞ্চদশ অভিযান (১০২০-২৩) —গোয়ালিওর ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে

সুলতান মামুদের অভিযানগুলির মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের ঐশ্বর্যের সংবাদ পাইয়া সুলতান মামুদ ইহা লুণ্ঠনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সোমনাথের মন্দিরটি কাথিয়াবাড়ের পশ্চিম উপকূলে নির্মিত। বর্তমানে ইহা জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্ত। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও অসংখ্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক* সঙ্গে লইয়া মুলতানের পথে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর শহরটি লুণ্ঠন করিয়া মামুদ গুজরাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ তাঁহার বিশাল বাহিনীসহ সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক হইতে বহুসংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা ও রাজগণ সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। গুজরাটের রাজা ভীমও তাঁহার সেনাবাহিনীসহ আসিয়া যোগ দিলেন। এক ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদই জয়ী হইলেন। প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু সোমনাথের মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াও উহা রক্ষা করিতে পারিল না। মন্দিরের পূজারী ও বহু ব্রাহ্মণকে মামুদ হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মামুদের আদেশে মন্দিরটি অপবিত্র করিয়া মন্দিরস্থ বিগ্রহটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। এই মন্দির হইতে দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলঙ্কারাদি হইতে প্রভূত পরিমাণ মণি-মুক্তা তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। অনহিলবার-এর রাজা সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মামুদ অনহিলবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর জাঠগণের আক্রমণে সুলতান মামুদ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জাঠগণকে এজন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মার্চ মাস) তাঁহার

ষোড়শ অভিযান (১০২৫-২৬ —সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন

সপ্তদশ ও সর্বশেষ অভিযান (১০২৭)—জাঠদের বিরুদ্ধে

*হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনে মামুদ বহুসংখ্যক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

সপ্তদশ এবং সর্বশেষ অভিযানে অগ্রসর হন। জাঠগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া মামুদের হস্তে পরাজিত হইলে মামুদ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিন বৎসর পরে (১০৩০) মামুদের মৃত্যু হইল।

সুলতান মামুদের অভিযানের প্রকৃতি (The Character of Sultan Mahmud's Invasions): সুলতান মামুদের অভিযানগুলিতে ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না। স্থায়ী রাজ্য স্থাপন তাঁহার পরিকল্পনার বহির্ভূত ছিল।

স্থায়ী রাজ্য স্থাপন মামুদের পরিকল্পনা বহির্ভূত

ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য যেমন তাঁহার অভিযানগুলির সাফল্যের সহায়ক হইয়াছিল, তেমনি এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাই তাঁহার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ একটি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থ ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করা। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্যাপক কোন অংশ জয় করা সুলতান মামুদের যেমন উদ্দেশ্যও ছিল না, তেমনি জয় করাও সম্ভব ছিল না। দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ জয় করা গজনীর সামরিক শক্তির বহির্ভূত ছিল।*

ধনরত্ন লুণ্ঠন, পৌত্তলিকদের হত্যা ও দেবমন্দির ধ্বংস—প্রধান উদ্দেশ্য

ডক্টর স্মিথের মতে সুলতান মামুদ ঐ সময়কার ধর্মান্ধ ও দুর্ধর্ষ তুর্কী মুসলমানদের নেতাস্বরূপ ছিলেন। পৌত্তলিকদের হত্যা করা তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের যেমন কর্তব্য ছিল তেমনি হত্যাকাণ্ডে তাহাদের আনন্দও ছিল প্রচুর। ধনরত্ন লুণ্ঠন, পৌত্তলিকদের হত্যা ও তাহাদের দেবমন্দির ও বিগ্রহাদির ধ্বংসসাধন—এই সব উদ্দেশ্য লইয়াই সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সংকীর্ণ স্বার্থপর ও ধর্মান্ধনীতি

বিজয়গৌরব বা ধর্মপ্রচার মামুদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না, এই কারণেই বিজয়ীর উদারতা তাঁহার আচরণে পরিলক্ষিত হয় না। আনন্দপালের মণি-মুক্তা-খচিত হার বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, হিন্দু-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন মথুরার বিখ্যাত মন্দিরটির বিনাশসাধন প্রভৃতি তাঁহার সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মান্ধনীতিপ্রসূত, বলা বাহুল্য।

সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ (Causes of Sultan Mahmud's Success): সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল।

সুলতান মামুদের সামরিক প্রতিভা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মান্ধতা

প্রথমত, সুলতান মামুদ নিজে একজন অসাধারণ সমরকুশলী অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার এই সামরিক প্রতিভার সহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মান্ধতার সংমিশ্রণের ফলে তিনি এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার তুর্কী অনুচরগণও ছিল ধর্মান্ধ ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু। স্বাভাবতই পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা এবং হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনে তাহারা

* "...An occupation of India was beyond the means of the forces of Ghazni." Lane-pole, *Medieval India under Mohammedan Rule* pp 28-29.

অত্যধিক উৎসাহী ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও রাজগণের মধ্যে সহযোগিতার অভাব সুলতান মামুদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্মের নামে লুণ্ঠনের লিপ্সায় ঐক্যবদ্ধ মামুদের দুর্ধর্ষ অনুচরবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, প্রাকৃতিক কারণে স্বভাবত দুর্বল ভারতবাসী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।* ভারতবাসী মধ্য-এশিয়াস্থ পার্বত্য অঞ্চলের তুর্কী আক্রমণকারীদের তুলনায় দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হইলেও কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই তাহাদের জয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধতার। এই ঐক্যের অভাব হেতুই অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক তুর্কী অশ্বারোহীর আক্রমণ প্রতিহত করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়ত, যুদ্ধ-কৌশলেও ভারতীয়দের তুলনায় সুলতান মামুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। হিন্দুদের চিরাচরিত হস্তিবাহিনীর ব্যবহার যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। বিজয়ের মুহূর্তে আনন্দপালের হস্তীর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ সম্মিলিত হিন্দুবাহিনীর পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল।

ঐক্যের অভাব

যুদ্ধে হস্তিবাহিনী ব্যবহারের অসুবিধা

সুলতান মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Sultan Mahmud) : সুলতান মামুদের রাজসভার কবি ও ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সকল রচনায় সুলতানের গুণাবলী সম্পর্কে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে বটে, তথাপি বিভিন্ন কবি ও লেখকের রচনার একটি নিরপেক্ষ তুলনামূলক বিচারে মামুদের চরিত্রের দোষগুণ উভয়ই বুঝিতে পারা যায়। মামুদ ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী। সাধারণত, তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের পক্ষপাতী, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীচতার আশ্রয় গ্রহণেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইত, আবার অর্থের বিনিময়ে তিনি নিজ ধর্মান্ধতা ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করিতেন না। গজনীর রাজসভার ঐতিহাসিক ইবন্-উল্-আথির মামুদের অর্থ-গৃধ্নুতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে সুলতান মামুদের ধর্মান্ধতা ও অর্থগৃধ্নুতা সমপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষণক্রোধী,

তাঁহার চরিত্র

* "Internal division had proved the undoing of India again and again and sapped the power of mere numbers, which alone could enable the men of the warm plains to stand against the hardy mountain tribes and the relentless horsemen of the Central Asian steppes. To the race and climate, was added the zeal of the Muslim and the greed of the robber. The mountaineers were poor as they were brave, and covetous as they were devout." *Ibid*, p. 23.

মিত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অবিশ্বস্ত।* কিন্তু তিনি যে একজন বিচক্ষণ ও অনন্য-সাধারণ সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুলতান মামুদের কৃতিত্ব বিচার করিতে গিয়া অনেকে তাঁহার ভারত-অভিযানগুলির সাফল্য, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার রাজগণের বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক সাফল্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া থাকেন। এগুলি তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর বিজয়ী বীরগণ সাম্রাজ্য-বিস্তারের অথবা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র লুণ্ঠনই উঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সুলতান মামুদের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা ও হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির লুণ্ঠন করিবার পশ্চাতে তাঁহার ধর্মান্ধতা অপেক্ষা অর্থগৃধ্নুতাই ছিল অধিকতর শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা ও হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনের প্রস্তাবে পার্বত্য অঞ্চলের ধর্মান্ধ ও দুর্ধর্ষ মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। চন্দেল্লরাজ গোণ্ড-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের কালে তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণ ধনরত্ন উৎকোচ দান করিয়া নিরস্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা হইতে বিজয়গৌরব বা পৌত্তলিকদের শাস্তিদান অপেক্ষা অর্থলোলুপতাই যে তাঁহাকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থলুণ্ঠনের আনুষঙ্গিক রীতি হিসাবেই তিনি হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ ও হিন্দু দেব-দেবী চূর্ণ করিবার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দুমন্দিরে ও দেব-দেবীর মূর্তিতে ধনরত্ন যদি একেবারেই না থাকিত তাহা হইলে সুলতান মামুদ কেবল ধর্মের নামে এতগুলি অভিযানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং বিজয়ী বীর হিসাবে সুলতান মামুদের মর্যাদা খুব বেশি তাহা বলা যায় না। তাঁহার ভারতীয় অভিযান মোটেই ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। উপরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে ইসলামধর্মের প্রতি এক বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মামুদের অসংখ্য হিন্দুমন্দির ও পবিত্র স্থান অপবিত্রীকরণ ও লুণ্ঠন এক অতি নীচ ও বর্বর মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ইহা ভিন্ন মামুদের সামরিক পদ্ধতিতে কোন নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন জাতির সৈনিকদের—যথা, আরব, তুর্কী, আফগান ও হিন্দু লইয়া গঠিত বাহিনীকে তিনি নিজ সংগঠনী শক্তির সাহায্যে একক-অধিনায়কত্বাধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা তাঁহার পূর্বে আরও বহু দেশে অনুসৃত হইয়াছিল।

কৃতিত্ব : বিজয়ী বীর

অর্থলোলুপতাই অভিযানের মূল কারণ

* "...(he was) fickle and uncertain in temper and more notable as an irresistible conqueror than as a faithful friend and magnanimous foe." *History of Persian Literature*, Quoted by Ishwari Prasad. p. 105.

সুলতান মামুদ নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। নিজে অবশ্য তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও ধর্ম-সম্পর্কে আলোচনা-সভায় যোগদান করিতেন। তাঁহার রাজসভা 'শাহ্‌নামা'-রচয়িতা ফির্‌দৌসী, দার্শনিক ফারাবী, ঐতিহাসিক উৎবী, আখ্যানরচয়িতা বৈহাকি, কবি আন্‌সারি, মিনু-কিরি, দাকিকি, উজারী, ফর্‌রুকি ও আস্‌উজী, আসদীতুসী প্রভৃতি মনীষিগণ দ্বারা অলংকৃত ছিল। অল্‌বিরুণীও কিছুকাল তাঁহার সভায় ছিলেন। মামুদ গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সমসাময়িক চারি শত কবি, সাহিত্যিক ও গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উজারীকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া মানিতেন। ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্ন তিনি গজনী নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন তিনি একটি যাদুঘর ও একটি গ্রন্থাগারও স্থাপন করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদ নিজ রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই গজনী নগরীতে বহুসংখ্যক সুন্দর গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল এবং গজনী প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল।

মামুদের সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

ভারত-ইতিহাসে মামুদের স্থান নির্ধারণে তাঁহার উপরি-উক্ত কার্যকলাপের কাহিনী অবান্তর বলা চলে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার শিল্পানুরাগ নীচ স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল। তাঁহারই আদেশে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মথুরা নগরীর কেন্দ্রস্থ মন্দিরটি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। শিল্পানুরাগের এইরূপ অভিব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। সাহিত্যানুরাগেও তিনি তাঁহার সংকীর্ণতার পরিচয় দান করিয়াছেন। ফির্‌দৌসীকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া 'শাহ্‌নামা' রচনা করাইয়া তিনি তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিলেন। ফির্‌দৌসী এই কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান মামুদকে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অল্‌বিরুণীও সুলতানের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি গজনী ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং সুলতান মামুদের সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-ই ছিল প্রধান, ইহা অনস্বীকার্য।

সমালোচনা

শাসক হিসাবে সুলতান মামুদ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাবর্গের ধন-প্রাণ রক্ষা ও বিচারকার্যে ন্যায় ও সততা রক্ষা করিয়া তিনি প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যবসায়িগণ বাণিজ্য সামগ্রী লইয়া যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে সেজন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন নূতন আইন প্রবর্তন বা শাসন-পদ্ধতির কোনপ্রকার উন্নয়ন সাধন করিবার মত মৌলিক প্রতিভা তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

প্রজাবর্গের ধন-প্রাণ রক্ষা, ন্যায়বিচার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎসাহদান

সুলতান মামুদ একাধারে দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা, সুদক্ষ শাসক, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও সুবিচারক ছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনি অর্থগৃধ্নু,

দেব-দেবীর মন্দির লুণ্ঠনকারী হিসাবেই পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারত-অভিযানের বিশেষ কোন স্থায়ী ফল ছিল না। বারবার ভারতবর্ষে প্রবেশ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ইসলামের প্রচার বা অপর কোন শিক্ষণীয় বিষয় তিনি ভারতীয়দের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারেন নাই। ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নিজ-দেশে সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উহা ব্যয় করিলেও ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তিনি নিছক লুণ্ঠনকারী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ডক্টর স্মিথ্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার করিলে সুলতান মামুদ ছিলেন একজন 'bandit operating on a large-scale'.

ভারতীয় দৃষ্টিতে সুলতান মামুদ

সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের ফল (The Results of Sultan Mahmud's Invasions) : সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানগুলি প্রধানত লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও সেগুলির কতক স্থায়ী ফলও যে ছিল না, এমন নহে। প্রথমত, পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া বারংবার সসৈন্যে যাওয়া-আসার ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানেই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, সুলতান মামুদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ভারতের হিন্দুরাজগণ তথা হিন্দু জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এজন্য পরবর্তী কালে মুসলমানদের ভারত-আক্রমণে সাফল্যলাভ বহুল পরিমাণে সহজ হইয়াছিল। তৃতীয়ত, সুলতান মামুদ যে পরিমাণ ধনরত্ন উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলি হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহার ফলে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থত, তাঁহার সতরটি অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক শক্তিও বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং এই কারণেই এই সকল রাজ্যের পক্ষে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চমত, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্রীকরণ, বিগ্রহাদির ধ্বংসসাধন প্রভৃতির দ্বারা মামুদ ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রবর্তনের বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে তুর্কী আধিপত্য

পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণের পথ প্রস্তুত

উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক দুর্বলতা, উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগুলির সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত, ইসলামধর্ম প্রবর্তনে বাধার সৃষ্টি

সুলতান মামুদের পরবর্তী গজনী সুলতানগণ (The Ghaznavids after Sultan Mahmud) : সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার দুই পুত্র মাসুদ ও মহম্মদের মধ্যে তীব্র গৃহবিবাদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত মাসুদ জয়ী হইয়া ভ্রাতা মহম্মদের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মাসুদের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০) কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গজনীর অধীন পাঞ্জাবে বিক্ষোভ ও অরাজকতা দেখা দিল। অল্পকালের মধ্যে মাসুদ সলজুক

মাসুদ ও মহম্মদের গৃহবিবাদ

তুর্কীদের হস্তে পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবের দিকে পলাইয়া আসিবার পথে নিজ সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্দী হইলেন এবং তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা মহম্মদ গজনীর আমীর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মাসুদকে মহম্মদের সম্মুখে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে মহম্মদের পুত্র তাঁহাকে হত্যা করিলেন। কিন্তু ইহাতেই গৃহবিবাদের অবসান ঘটিল না। মাসুদের পুত্র মাদুদ্ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহম্মদ ও তাঁহার পুত্রকে পরাজিত করিলেন এবং নিজে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাসক হিসাবে মাসুদের অকর্মণ্যতা এবং পরবর্তী সুলতানগণের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা গজনী রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। এক দিকে সল্জুক তুর্কীদের আক্রমণ, অপর দিকে ঘুর রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গজনীর নিরাপত্তা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১১৭৩) গিয়াস-উদ্দিন মহম্মদ ঘুরী গজনী রাজ্য জয় করিয়া গজনীবংশের শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

মাসুদ ও মহম্মদের পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

গিয়াস-উদ্দিন ঘুরীর হস্তে গজনীবংশের শাসনের অবসান

ঘুরবংশ* (**The House of Ghur**) **:** গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পর্বতসঙ্কুল স্থানে ঘুর রাজ্য অবস্থিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক যথা, লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) ঘুরবংশকে আফগানজাতিসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ঘুরবংশকে পূর্বাঞ্চলীয় পারসিক জাতি বলিয়া মনে করেন।† ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরদলপতিগণ গজনী রাজ্যের (সুলতান মামুদের) আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সুলতান মামুদের পরবর্তী দুর্বল গজনী সুলতানগণের আমলে ঘুরদলপতিগণ গজনী রাজ্যের প্রতি তেমন আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গজনীর সুলতানগণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। এই সূত্রে ঘুরবংশের কুতব-উদ্দিন ও তাঁহার ভ্রাতা সৈফ্-উদ্দিন গজনীরাজ বাহ্রাম শাহের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর এক ভ্রাতা আলা-উদ্দিন হুসেন গজনী রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গজনীর যাবতীয় প্রাসাদ ও হর্ম্যাদি ভস্মীভূত করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গজনী রাজ্য ধ্বংস করিয়া আলা-উদ্দিন 'জাহানসুজ্' (*World Burner*) উপাধি ধারণ করেন।

ঘুর রাজ্যের অবস্থান

গজনী রাজ্যের সহিত ঘুর রাজ্যের সংঘর্ষ

---

* Usually written *Ghor*, but Ghur is co.rect. Vide, *Cambridge History of India*, Vol. III, p. 16 (Foot-note).

† "They have usually been described, on insufficient grounds as Afghans. but there is little doubt that they were, like the Samanids of Balkh, Eastern Persians". *Ibid*, p. 38.

'The petty chief of Ghur, of eastern Persian extraction were originally feudatories of Ghazni'. *Advanced History of India*, p. 276.

এই ঘটনার অল্পকাল মধ্যেই গজনী রাজ্য পুনরায় 'গাজ্' নামে তুর্কী জাতির এক দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাহ্‌রামের অকর্মণ্য, দুর্বল পুত্র খুস্‌রভ্ শাহ্ গজনী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন। সুলতান মামুদের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব তখনও গজনীর অধীন ছিল। গজনী রাজ্য কয়েক বৎসর 'গাজ্' তুর্কীদের অধীনে ছিল বটে, কিন্তু ঘুরবংশের গিয়াস-উদ্দিন মহম্মদ তাহাদিগকে গজনী হইতে বিতাড়িত করিয়া গজনী রাজ্য ঘুরবংশের শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন (১১৭৩)। গিয়াস্-উদ্দিন তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্-সামকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইনিই ভারত-ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে প্রসিদ্ধ।

গজনী রাজ্যের পতন : মহম্মদ ঘুরী গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত

মহম্মদ ঘুরী (Muhammad Ghuri) : মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ভ্রাতৃ-বিরোধ, হিংসা-দ্বেষ ও ভ্রাতৃহত্যার মর্মান্তিকতার পার্শ্বে ঘুরী ও তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের পরস্পর প্রীতি স্বভাবতই পাঠকদের যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গিয়াস্-উদ্দিন তাঁহার জীবদ্দশায় ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরীর অকপট আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘুরী ক্ষমতাবান শাসক ও সমরকুশলী নেতা হইয়াও ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন।

গিয়াস্-উদ্দিন ও মহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতৃপ্রীতি

মহম্মদ ঘুরী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবতই ভারত-বিজয় ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী তাঁহার সর্বপ্রথম ভারত-অভিযানে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে মুলতানে ইসলামধর্মের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় ইসলামধর্মী হইলেও তাহারা খাঁটি ইসলাম ধর্মমত মানিয়া চলিত না বলিয়া গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে বিধর্মী বলিয়া মনে করিত। মহম্মদ ঘুরী প্রথমেই এই সকল 'বিধর্মী'র কেন্দ্রস্থল মুলতান জয় করিলেন।

মহম্মদ ঘুরীর প্রথম ভারত-অভিযান (১১৭৫)

মুলতান অধিকার

তারপর মহম্মদ ঘুরী উচ্ দুর্গটি অবরোধ করিলেন। তথাকার রাণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ঘুরী অতি সহজেই উচ্ দখল করিলেন (১১৭৫-৭৬)। এই ঘটনার দুই বৎসর পর গুজরাট আক্রমণ করিয়া মহম্মদ ঘুরী সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। গুজরাটের বাঘেলা বংশের রাজা ভীমের রাজধানী অন্‌হিল্‌বার দখল করা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া তিনি মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই হারাইলেন।

উচ্ দুর্গ জয় : গুজরাটের রাজা ভীমের হস্তে পরাজয়

কিন্তু মহম্মদ ঘুরী দমিবার পাত্র ছিলেন না। পর বৎসরই (১১৭৯) তিনি পুনরায় এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া পেশোয়ার আক্রমণ করিলেন এবং গজনীবংশের

শেষ সুলতান খুস্‌রুভ্‌ মালিকের অধিকার হইতে পেশোয়ার জয় করিয়া লইলেন।

পেশওয়ার জয় (১১৭৯ : শিয়ালকোটের দুর্গ নির্মাণ

১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জম্মুর রাজা বিজয়দেবের সাহায্য লইয়া গজনী রাজ্যের শেষ অধিকারটুকু - লাহোর দখল করিলেন। খুস্‌রুভ্‌ মালিক মহম্মদ ঘুরীর হস্তে বন্দী হইলেন। ঘুরী শিয়ালকোট-এ একটি সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিয়া খোকর জাতির আক্রমণ হইতে বিজিত রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। খুস্‌রুভ্‌ মালিকের শেষ পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজনীবংশের ভারতীয় রাজ্যের অবসান ঘটিল। পাঞ্জাব মহম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসিবার ফলে ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চল জয়ের পথ তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল। কিন্তু তাঁহার এই অগ্রগতির পথে বাধা আসিল রাজপুত জাতি হইতে।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ, ১১৯০ (The First Battle of Tarain) : ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহম্মদ ঘুরী চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যের ভাতিন্দা নামক স্থান দখল করিলেন। ভাতিন্দা জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পৃথ্বীরাজ বিশাল সেনাবাহিনীসহ মহম্মদ ঘুরীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি স্বভাবতই পৃথ্বীরাজকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের পরস্পর বিভেদ ভুলিয়া গিয়া বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। একমাত্র কনৌজের গাহ্‌ড়বালরাজ জয়চাঁদ এই সম্মিলিত বাহিনীতে যোগদান করিলেন না। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় জয়চাঁদকে তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। টডের মতে পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের অমতে তাঁহার কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পৃথ্বীরাজের উপর বিরূপ ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিলেন। থানেশ্বরের নিকটে তরাওরী (Taraori) বা তরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। ঘুরীর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল এবং ঘুরী স্বয়ং এই যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়া সৈন্যসহ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীর অনুচর জিয়া-উদ্দিনের নিকট হইতে ভাতিন্দা পুনর্দখল করিলেন। কিন্তু ভারতের সীমার বাহির পর্যন্ত পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি না করায় ভবিষ্যতে ঘুরীর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত রহিয়া গেল।

পৃথ্বীরাজের হস্তে ঘুরীর শোচনীয় পরাজয় (১১৯১)

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১১৯২ (The Second Battle of Tarain) : মহম্মদ ঘুরী নিজ কর্মকেন্দ্র গজনীতে পৌঁছিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তার পর বৎসরই ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী লইয়া তিনি পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আফগান, তুর্কী ও পারসিক জাতির মিলিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা

ঘুরীর বিশাল সেনাবাহিনী

ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার, অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল বার হাজার।* পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে হিন্দুরাজগণের মিলিত বাহিনী পূর্বাহ্ণেই তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরীর বিশাল বাহিনীর প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধেই (১১৯১) মহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তিনি এইবার এক নূতন কৌশলে যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিতে সংকল্প করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধের পর সূর্যাস্তের পূর্বে মহম্মদ ঘুরীর শ্রেষ্ঠ বার হাজার অশ্বারোহী হিন্দুবাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বীরত্বের দিক দিয়া হিন্দুবাহিনী মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম ছিল না। কিন্তু তাহাদের চিরাচরিত যুদ্ধরীতি, হস্তিবাহিনীর ব্যবহার প্রভৃতি এবং সর্বোপরি সম্মিলিত বাহিনীর পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত একক-অধিনায়কত্বের অভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ ঘুরীর-ই জয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে ধৃত ও নিহত হইলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরীর জয়লাভ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমান অধিকার প্রায় দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। হান্সি, সামান, গুহরাম, বাকুহরাম ও অপরাপর কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ মহম্মদ ঘুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আজমীর রাজ্য মহম্মদ ঘুরী ও তাঁহার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। আজমীরের হিন্দুমন্দির ও স্থাপত্যশিল্পের অন্যান্য নিদর্শন ধূলিসাৎ করিয়া মহম্মদ ঘুরী সেই স্থলে মসজিদ ও ইসলামধর্মের শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করিলেন। আজমীর নগরটি বাৎসরিক করদানের শর্তে পৃথ্বীরাজের পুত্রের শাসনাধীনে রাখা হইল। পরবর্তী কালে পৃথ্বীরাজের আত্মীয়গণ মুসলমানদের হাত হইতে তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহম্মদ ঘুরী কুতব-উদ্দিন নামে এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ভারতীয় বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুতব্-উদ্দিন দিল্লী জয় করিলেন এবং ক্রমে গোয়ালিওর, অন্‌হিল্‌বাব, কনৌজ প্রভৃতি অধিকার করিয়া মুসলমান অধিকৃত রাজ্যের বিস্তার সাধন করিলেন। কুতব্-উদ্দিন তাঁহারই অনুচর ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন-বিন্-বখ্‌তিয়ার খলজীকে বাংলা ও বিহার জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বাংলা ও বিহার তখন সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের অধীনে ছিল। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেখানে বহুকাল ধরিয়া তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত ত্যাগ: কুতব্-উদ্দিনের রাজ্যবিস্তার

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের বিহার ও বাংলা জয়

* Vide, Lane-Poole, p. 52; *Camb. History of India*, Vol. III, p. 40.

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে মহম্মদ ঘুরী গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সুলতান হইলেন। ইহার পূর্বাবধি মহম্মদ ঘুরী তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের অধীনে গজনীর শাসনকর্তার কাজ করিতেন। সিংহাসন আরোহণের দুই বৎসর পর মহম্মদ ঘুরী মধ্য-এশিয়াস্থ খারজমের শাহের হস্তে পরাজিত হইলে তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। গজনীর সুলতান বংশের জনৈক কর্মচারী মুলতান দখল করিয়া লইলেন। পাঞ্জাবের খোকর জাতি ঘুরীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ ঘুরী সসৈন্যে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিলেন। অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। পর বৎসর নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে এক আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন (১২০৬)।

মহম্মদ ঘুরীর শেষবার ভারত-আগমন : তাঁহার মৃত্যু (১২০৬)

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব (Estimate of Muhammad Ghuri) : মহম্মদ ঘুরী ছিলেন অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি যেমন ছিলেন বীর যোদ্ধা তেমনি ছিলেন দুর্ধর্ষ সমরবিজয়ী নেতা। ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিনের অধীনে শাসক হিসাবে তিনি তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিয়া নিজ প্রতিভাবলে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভ্রাতার প্রতি আনুগত্য, নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাকে সমসাময়িক মুসলমান রাজগণের বহু ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায়ই ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নাই, পর বৎসর ঐ একই প্রান্তরে তিনি হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে ধর্মান্ধতার প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নহে। আজমীরের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে মসজিদ-নির্মাণ তাঁহার পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি তাঁহার ধর্মান্ধতা দ্বারা নিজ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তিনি গজনী রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হইয়াই ভারত-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছিলেন।

সামরিক প্রতিভা

মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

উচ্চাকাঙ্ক্ষা : সাফল্য

সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর তুলনা (Sultan Mahmud and Muhammad Ghuri Compared) : সুলতান মামুদের প্রসিদ্ধির তুলনায় মহম্মদ ঘুরী প্রায় অখ্যাত রহিয়া গিয়াছেন একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুলতান মামুদের ভারত-অভিযান এবং সামরিক দুর্ধর্ষতার দিক দিয়া বিচার করিলে মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযান অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হওয়া

মামুদের প্রসিদ্ধি মহম্মদ ঘুরীর অপেক্ষা বহগুণে বেশি

স্বাভাবিক। সুলতান মামুদ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন নাই, কিন্তু গুজরাট জয় করিতে গিয়া এবং তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মামুদ শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে মহম্মদ ঘুরীর কোন অবদান নাই। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরীর দান সুলতান মামুদের দান অপেক্ষা বহুগুণে বেশি।

মামুদ অপরাজেয়, ঘুরীর দুই বার শোচনীয় পরাজয়

মামুদের অভিযান মাত্রেরই উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিব লুণ্ঠন, পৌত্তলিক হিন্দুদের হত্যা; কিন্তু ধর্মপ্রচারের প্রয়াস মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের পশ্চাতে কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইলেও ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাওয়া-আসার ফলে পাঞ্জাব স্বভাবতই সুলতান মামুদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী— এই দুই সামরিক নেতার অধীনে ভারত-আক্রমণের যে দুই তরঙ্গ আসিয়াছিল তাহার মধ্যে সুলতান মামুদের আক্রমণ-তরঙ্গের বিশেষ কোন স্থায়ী চিহ্ন ছিল না, কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ-তরঙ্গ উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণকে পরাভূত করিয়া ভারত-ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছিল। ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থাপয়িতা হিসাবে ঘুরীর নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

মামুদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু ঘুরীর অনুরূপ গুণের অভাব

মামুদের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও ঘুরীর মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত-বিজয়

ঘুরী ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থাপয়িতা

সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের পার্থক্য (Difference between the invasions of Sultan Mahmud and those of Ghuri): সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী উভয়েই গজনী রাজ্য হইতে ভারত-অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সুলতান মামুদ ছিলেন গজনীর সুলতান, আর ঘুরী ছিলেন নিজ ভ্রাতার অধীনে গজনীর শাসনকর্তা। পদমর্যাদার এই পার্থক্য এই দুইয়ের সামরিক সুযোগ-সুবিধায় কতক পরিমাণে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ভিন্ন এই দুইজন আক্রমণকারীর অভিযানের প্রকৃতি ও আদর্শের মধ্যেও কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল।

সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য

প্রথমত, সুলতান মামুদের অভিযান মাত্রই ধর্মান্ধ নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পৌত্তলিক হিন্দুদিগকে হত্যা, হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ প্রভৃতি তাঁহার এই ধর্মান্ধ নীতিপ্রসূত ছিল। অপরপক্ষে মহম্মদ ঘুরীর অভিযানগুলি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

হইলেও তাঁহার ধর্মান্ধতা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। একমাত্র আজমীর ভিন্ন অন্য কোথাও মহম্মদ ঘুরীর হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিবার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুলতানের ইসলামিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও ঘুরী সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মামুদের ধর্মান্ধতা : মহম্মদ ঘুরীর নীতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আচ্ছন্ন নহে

দ্বিতীয়ত, সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের মূল প্রেরণা ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন, মুসলমান আধিপত্য স্থাপন তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর অভিযানে ভারত-জয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুরাজগণের সহিত তাঁহার পরপর যুদ্ধের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করাই ছিল তাঁহার অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১১৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুলতান ও পর বৎসর উচ্ অধিকার করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া তিনি অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজয়ে দমিবার পাত্র ছিলেন না। পর বৎসরই (১১৭৯) তিনি পেশোয়ার দখল করিয়া শিয়ালকোটে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। এই দুর্গ স্থাপন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজিত রাজ্য রক্ষা করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

ধনরত্ন লুণ্ঠন মামুদের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ঘুরীর উদ্দেশ্য রাজ্যবিস্তার

তৃতীয়ত, বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাতায়াতের ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ সুলতান মামুদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। নিজ অধিকার স্থাপনের কোন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ইহা ঘটে নাই। কিন্তু গজনীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াই মহম্মদ ঘুরী ভারত-আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মনোযোগী হন। এই কারণে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইবাও তিনি নিশ্চেষ্ট হন নাই। দ্বিতীয় বার তিনি ভারতীয় হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই ভাগ্যদেবী তাঁহার উপর প্রসন্না হন এবং তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হন। সুলতান মামুদের অভিযানগুলির ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল, মহম্মদ ঘুরী সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের পর হইতেই ধারাবাহিকভাবে ভারতে মুসলমান বিজয় ও রাজত্বকালের সূচনা হয়।

মামুদের পাঞ্জাব অধিকার পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত নহে—ঘুরীর রাজ্যবিস্তার পূর্ব-পরিকল্পনা-প্রসূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাসবংশ*

(The Slave Dynasty)

কুতব্-উদ্দিন আইবক্ ১২০৬-১০ (Qutb-ud-din Aibak) : মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর কুতব্-উদ্দিনের উপর বিজিত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া গেলেন। মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানে কুতব্-উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, বিদ্যা ও সমরকুশলতার দিক দিয়া তিনিই ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অনুচর।

মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত

কুতব্-উদ্দিন প্রথম জীবনে সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কীস্তান হইতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের সহিত তিনি পারস্যের নিশাপুর নামক স্থানে আসেন। নিশাপুরের কাজী অর্থাৎ বিচারক কুতব্-উদ্দিনকে ক্রয় করেন এবং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাহিত্য, ধনুর্বিদ্যা ও সামরিক কৌশল শিক্ষা দেন। কাজীর মৃত্যুর পর নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া কুতব্-উদ্দিন মহম্মদ ঘুরীর নিকট বিক্রীত হন। মহম্মদ ঘুরীর অধীনে তিনি স্বীয় দক্ষতা প্রমাণ করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই মহম্মদ ঘুরীর সর্বাধিক বিশ্বস্ত কর্মচারীর মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন।

নিশাপুরের কাজীর অধীনে শিক্ষালাভ

মহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুতব্-উদ্দিন 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে স্বাধীনভাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিলেন (১২০৬)। ঐ সময় হইতেই দিল্লী সুলতানির ইতিহাস শুরু হইল। মহম্মদ ঘুরীর প্রধান ক্রীতদাসের মধ্যে অপর দুইজন ছিলেন কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা তাজ-উদ্দিন ইলদিজ এবং মুলতান ও উচ্-এর শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচা। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতব্-উদ্দিনের দিল্লীর সুলতান-পদ লাভ

---

* **দাসবংশ**—কুতব্-উদ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কাইকোবাদ-এর শাসনকাল পর্যন্ত (১২০৬-১২৯০) সুলতানগণ সাধারণত দাসবংশ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুত, এই নামকরণের কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ, যে-সকল ক্রীতদাস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহাসন লাভের পূর্বে প্রত্যেকেই উচ্চ রাজকর্মচারীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি তাঁহারা পূর্ববর্তী সুলতানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্রীতদাস হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকিলেও তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকর্মচারীর মর্যাদা দান করিয়া তাঁহাদের দাসত্বের অবসান ঘটান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন জন্মের দিক দিয়া বিচার করিলেও তাঁহারা প্রায় সকলেই মূলতঃ অভিজাত পরিবারসম্ভূত ছিলেন। ভাগ্যচক্রেই তাঁহারা স্বাধীনতা হারাইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিলেন। ইলতুৎমিস্ নিজ ভ্রাতা কর্তৃক ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হইয়াছিলেন। বলবন মুঘলগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। সুতরাং 'দাসবংশ' নামকরণ ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করিলেও ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজ্‌ গজনী রাজ্যটিও নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কুতব্‌-উদ্দিনের ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাজ-উদ্দিন পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কুতব্‌-উদ্দিন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে গজনী পর্যন্ত নিজ দখলে আনিতে সমর্থ হন। কিন্তু কুতব্‌-উদ্দিনের গজনী অধিকার স্থায়ী হইল না। তাঁহার সৈনিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গজনীবাসীরা গোপনে তাজ-উদ্দিনকে গজনী আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া কুতব্‌-উদ্দিন গজনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের মুসলমান রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এইভাবে বিনষ্ট হইল। কুতব্‌-উদ্দিন সম্পূর্ণ ভারতীয় সুলতানে পরিণত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই (১২১০) কুতব্‌-উদ্দিনের মৃত্যু হইল।

তাজ-উদ্দিনের সহিত সংঘর্ষ—সাময়িকভাবে গজনী দখল

তাঁহার মৃত্যু (১২১০)

স্বাধীন সুলতান হিসাবে চারি বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে কুতব্‌-উদ্দিন কোন নূতন স্থান জয় করিতে পারেন নাই, কোন সুদক্ষ শাসনব্যবস্থাও স্থাপন করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। তথাপি সদাশয় ও স্বাধীনচেতা শাসক হিসাবে তিনি সমসাময়িকদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ্‌-উস্‌-সিরাজের বর্ণনা হইতে তাঁহার সদাশয়তার কথা জানিতে পারা যায়। কুতব্‌-উদ্দিন যে একজন অতিশয় ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক হাসান-নিজামীর রচনায় উল্লিখিত আছে।* দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধি সাধনে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রবর্তনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন এজন্য তাঁহাকে 'লাখ-বক্স'—অর্থাৎ 'যিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন'—নামে অভিহিত করা হইত।

তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ

কুতব্‌-উদ্দিনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুতব্‌-উদ্দিনের পোষ্যপুত্র ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। শাসক হিসাবে আরাম শাহ্‌ ছিলেন একেবারে অকর্মণ্য। লাহোরে আকস্মিকভাবে কুতব্‌-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া কোনপ্রকার গোলযোগ যাহাতে না হইতে পারে সেজন্য লাহোরে 'আমীর' ও 'মালিকগণ' আরাম শাহ্‌কে সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার সম্পর্কে পরিচয় পাইয়া দিল্লীর আমীরগণ কুতব্‌-উদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিসকে দিল্লীর

আরাম শাহ্‌ (১২১০—১২১১)

* "He dispensed even-handed justice to the people and exerted himself to promote the peace and prosperity of the realm." *Taj-un-Ma'asir*, Hasan-un-Nizami, Vide, *An Advanced History of India*, p. 281.

সিংহাসন গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। ইলতুৎমিস্ ঐ সময়ে বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌গণের আমন্ত্রণ পাওয়ামাত্র সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে আরাম শাহ্‌কে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ইল্‌তুৎমিস্ সুলতান-পদ লাভ করিলেন (১২১১)।

ইল্‌তুৎমিস্, ১২১১-৩৬ (Iltutmish): শামসুদ্দিন ইল্‌তুৎমিস্ ইলবেরী তুর্কী জাতিসম্ভূত ছিলেন। তিনি তুর্কী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ফলে তিনি ক্রীতদাস হিসাবে তাঁহার জীবন শুরু করেন। ইল্‌তুৎমিসের বুদ্ধি ও দেহের গঠন ও সৌন্দর্য দেখিয়া কুতব্-উদ্দিন তাঁহাকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন। ইল্‌তুৎমিস্ নিজ প্রতিভাবলে শীঘ্রই কুতব্-উদ্দিনের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। কুতব্-উদ্দিন তাঁহাকে জামাতারূপে বরণ করেন এবং বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতব্-উদ্দিন যখন গজনী আক্রমণ করেন তখন ইল্‌তুৎমিস্ যে সমরকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌দিগের অধিকাংশের মনেই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্যই তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আমীর-ওমরাহ্‌গণ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

ইল্‌তুৎমিসের প্রথম জীবন

তাঁহার সিংহাসন লাভ

সিংহাসন লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইল্‌তুৎমিস্‌কে এক অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মুলতানের শাসনকর্তা ন্যাসির-উদ্দিন কুবাচা নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পাঞ্জাব দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর দিকে তাজ-উদ্দিন মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বিজিত ভারতীয় সাম্রাজ্য অধিকার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মৃত্যুর পর (১২০৬) আলী মর্দান নামে জনৈক খল্‌জী অভিজাত ব্যক্তিকে কুতব্-উদ্দিন বাংলা-দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলী মর্দান কুতব্-উদ্দিনের মৃত্যুর পর 'সুলতান আলা-উদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আরাম শাহের দুর্বলতার সুযোগে গোয়ালিওর ও রণথম্ভোর স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌দের একটি দলও ইল্‌তুৎমিসের বিপক্ষে ছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সমস্যা-জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেও ইল্‌তুৎমিস্ দমিলেন না। তিনি প্রথমেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারী আমীর-ওমরাহ্‌দের দমন করিয়া তাঁহার সিংহাসন নিরঙ্কুশ করিলেন। তারপর তিনি তাজ-উদ্দিনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজ্ খারজমের শাহ্ কর্তৃক গজনী হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং পাঞ্জাব হইতে থানেশ্বর পর্যন্ত সকল স্থান দখল করিয়া লইলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ ইল্‌দিজ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন। এদিকে ন্যাসির-উদ্দিন

তাঁহার সমস্যা

দিল্লীর আমীর ওমরাহ-দমন, তাজ-উদ্দিনের পরাজয়

কুবাচা লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।* ইল্‌তুৎমিস্‌ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তিনি সিন্ধুদেশের চক্কর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ † (Chingiz Khan) তাঁহার বিশাল মোঙ্গলবাহিনী লইয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খাঁ ঐ সময়ে মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়াস্থ দেশগুলি জয় করিয়া খারজম বা খিবা আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্‌ জালাল-উদ্দিন পলাইয়া আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। চিঙ্গিজ খাঁ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। জালাল-উদ্দিন সাময়িকভাবে দিল্লীতে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ইল্‌তুৎমিসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইল্‌তুৎমিস্‌ জালাল-উদ্দিনের উপস্থিতি তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে মনে করিয়া জালাল-উদ্দিনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন এবং জালাল-উদ্দিনের দূতকে গোপনে হত্যা করাইলেন। জালাল-উদ্দিন এইরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যেও চিঙ্গিজ খাঁ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুঝিয়া চলিলেন। কিছুকাল পর দুর্ধর্ষ মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া জালাল-উদ্দিন সিন্ধুপ্রদেশে লুঠতরাজ শুরু করিলেন। নাসির-উদ্দিন কুবাচা বাধ্য হইয়া মুলতানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সিন্ধুপ্রদেশের বহু স্থান বিধ্বস্ত করিয়া জালাল-উদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের গ্রীষ্মের উত্তাপ

চিঙ্গিজ খাঁর সিন্ধুদেশে উপস্থিতি : সর্বপ্রথম মুঘল আক্রমণ

খারজমের শাহ্‌ জালাল্‌-উদ্দিনের ভারত ত্যাগ

* Vide, *An Advanced History of India*, p. 283: Srivastava: *The Sultanate of Delhi*, p. 101.

† চিঙ্গিজ খাঁ (Chingiz Khan) : মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নাম ছিল তেমুচিন (Temuchin)। তের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে চিঙ্গিজ নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু কৈশোরে কঠোর জীবন যাপন করিবার ফলে তিনি স্বভাবতই নির্ভীক, ধৈর্যশালী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে মোঙ্গল জাতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। 'মোঙ্গল' কথাটি 'মোঙ' অর্থাৎ 'নির্ভীক' শব্দ হইতে আসিয়াছে। বস্তুত, মোঙ্গলগণ যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি ছিল নির্ভীক। মানুষের জীবনের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। নির্দোষ নরনারীকে হত্যা করিতে মোঙ্গলদের বাধিত না। এই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির বিভিন্ন দলকে চিঙ্গিজ খাঁ ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ঐক্যবদ্ধ মোঙ্গল জাতির 'খাঁ', অর্থাৎ নেতা উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই দুর্দমনীয় শক্তি লইয়া চিঙ্গিজের নেতৃত্বে মোঙ্গল জাতি চীন, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার সকল দেশ বিধ্বস্ত করিল। বল্খ, বোখরা, সমরকন্দ এবং আরও বহু সুন্দর সুন্দর নগর চিঙ্গিজের আক্রমণে ধূলিসাৎ হইয়াছিল। খারজম ও খারজমের শাহ্‌-এর রাজ্য-আক্রমণের সূত্রেই চিঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশে সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খারজমের শাহ্‌ জালাল-উদ্দিন চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজ রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইলে চিঙ্গিজ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে এবং ভারতবর্ষের গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য বলিয়া চিঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী কালের মোঙ্গল আক্রমণের সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছিলেন।

সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এইভাবে বিনা যুদ্ধেই ইল্‌তুৎমিস্ সর্বপ্রথম মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন।

নাসির-উদ্দিন কুবাচার মৃত্যু : সিন্ধুদেশ দিল্লীর অধিকারভুক্ত

অল্পকালের মধ্যেই ইল্‌তুৎমিস্ নাসির-উদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করেন। নাসির-উদ্দিন পরাজিত হইয়া পলায়নকালে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইলেন। ফলে সিন্ধুদেশ দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল।

খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ রণথম্ভোর নরধিকার করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ বাগ্‌দাদের খলিফার নিকট হইতে ' ন-ই-আজম' (Great Sultan) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পর বৎসর যোধপুরের উত্তরে মন্দোর নামক স্থানটি তিনি জয় করিলেন।

কুতব্-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের খল্‌জী মালিকগণ দিল্লী সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘিয়াস্-উদ্দিন খল্‌জী অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে জাজনগর, কামরূপ, তিরহুত ও গৌড় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলে ঘিয়াস্-উদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইল্‌তুৎমিসের সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করিবামাত্র ঘিয়াস-উদ্দিন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং বিহার অধিকার করিয়া লইলেন। সেই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন ঘিয়াস্-উদ্দিনের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ঘিয়াস্-উদ্দিন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বাংলার খল্‌জী মালিকগণ কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্-এর মৃত্যু হইলে

রণথম্ভোর, বাংলা, গোয়ালিওর পুনরাধিকার— ভিল্‌সা জয়

লক্ষ্মণাবতীর খল্‌জী মালিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। ইল্‌তুৎমিস্ বাংলাদেশের খল্‌জী মালিকদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন।* খল্‌জী মালিকগণ সহজেই পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। ইল্‌তুৎমিস্ আলা-উদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ গোয়ালিওর পুনরায় দখল করিলেন। দুই বৎসর তিনি মালব আক্রমণ করিয়া ভিল্‌সা দুর্গটি অধিকার করিলেন। উজ্জয়িনী নগরটি আক্রমণ করিয়া ধূলিসাৎ করিলেন এবং তথাকার মহাকালের মন্দিরটিও ধ্বংস করা হইল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি তিনি দিল্লীতে লইয়া আসিলেন।

ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু (১২৩৬)

ইহার অল্পকাল পরেই ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু হইল।

---

* *Vide* Ishwari Prasad : *History of Medieval India*, pp. 161-62, 164.

ইল্‌তুৎমিসের কৃতিত্ববিচার (Estimate of Iltutmish) : ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর সুলতানির প্রথম পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন
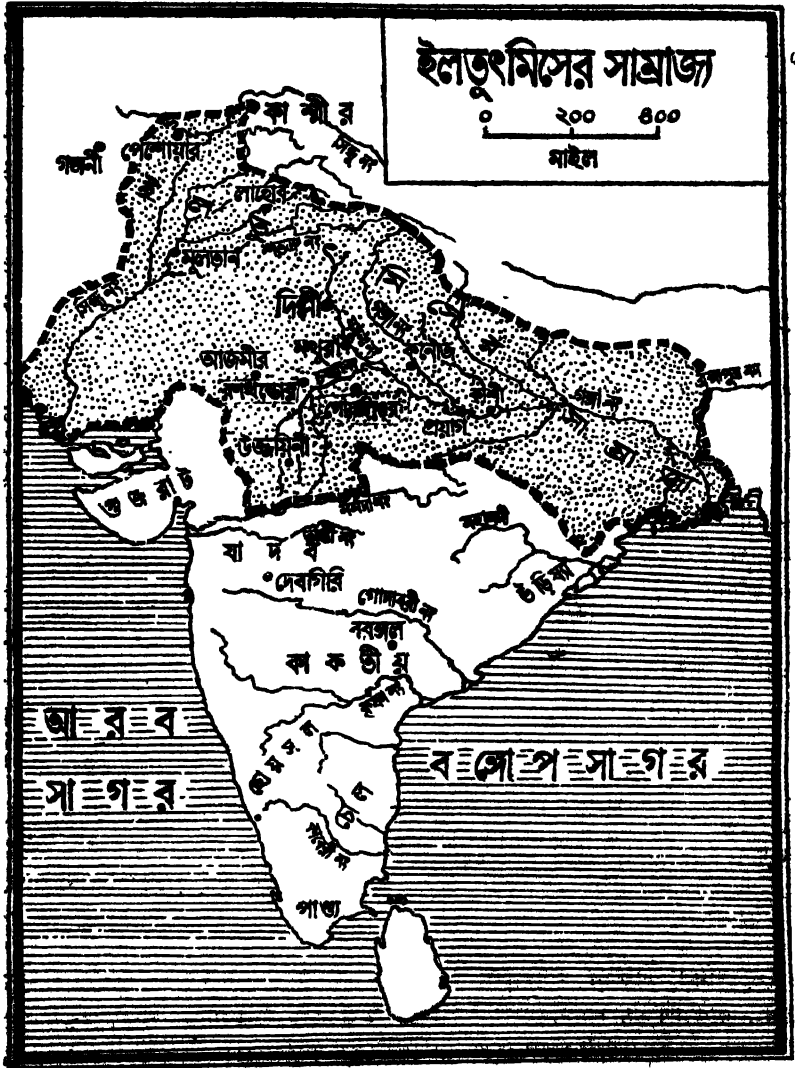
দিল্লীর দাসবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। মহম্মদ ঘুরী ও কুতব্‌-উদ্দিনের বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা আনিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্‌। কুতব্‌-উদ্দিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে

এবং আরাম শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে সিন্ধুদেশ, বাংলা, রণথম্ভোর, গোয়ালিওর প্রভৃতি যখন স্বাধীন হইয়াছিল, দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌গণের মধ্যে যখন স্বার্থ-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল, সেই সংকটকালে ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এইরূপ জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও ইল্‌তুৎমিস্‌ আত্মপ্রত্যয় হারান নাই। তাঁহার সমস্যা তাজ-উদ্দিন ইল্‌দিজের ভারত-অধিকারের আকাঙ্ক্ষা ও মোঙ্গল আক্রমণে অধিকতর জটিল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইল্‌তুৎমিস্‌ একে একে সকল সমস্যার-ই সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার সমস্যা

আরাম শাহ্‌ ও দিল্লীর বিরুদ্ধপক্ষীয় আমীর-ওমরাহ্‌দের পরাজিত করিয়া তিনি নিজ সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর একে একে বিদ্রোহী রাজ্যাংশগুলিকে পুনরধিকার করিয়া তিনি দিল্লী রাজ্য পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। রণথম্ভোর, গোয়ালিওর, বাংলাদেশ, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি তিনি পুনরায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাময়িকভাবে তিনি গজনীরাজ্যও দখল করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভিল্‌সা দুর্গ, মন্দোর প্রভৃতি দখল করিয়া তিনি দিল্লীর অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। খার্‌জমের শাহ্‌কে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়া তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কারণ, জালাল-উদ্দিনকে দিল্লীতে সাময়িকভাবে অবস্থানের সুযোগ দিলে তুর্কী আমীর-ওমরাহ্‌দের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইত, ফলে, ইল্‌তুৎমিসের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য হ্রাস পাইত সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন, চিঙ্গিজ খাঁর শত্রুতাও তাঁহাকে অর্জন করিতে হইত। সুতরাং জালাল-উদ্দিনকে আশ্রয় না দিয়া ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর সুলতানির নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাফল্য

ইল্‌তুৎমিস্‌ দিল্লীর তুর্কীশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার স্থাপিত তুর্কীশাসন টিকিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ জুড়িয়া এক সুদৃঢ় ও সুসংহত শাসন স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

তুর্কীশাসনের স্থায়িত্ব দান

ইল্‌তুৎমিস্‌ একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সামরিক প্রতিভা, দূরদর্শিতা, শাসনদক্ষতা, তাঁহাকে ভারতের মুসলমান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানের মর্যাদা দান করিয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসনের এক সঙ্কট মুহূর্তে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ প্রতিভাবলে এক সুসংবদ্ধ রাজ্য ও এক সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান

প্রতিভাবান সামরিক নেতা ও সুদক্ষ শাসক হিসাবেই ইল্‌তুৎমিস্‌ নিজ পরিচয়

রাখিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সাহিত্য এবং শিল্পেরও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর বিখ্যাত কুতব্-মিনার নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদের নিকটবর্তী উন্ নামক স্থানে খাজা কুতব্-উদ্দিন নামে একজন ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইল্তুৎমিসের শাসনকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইল্তুৎমিস্ ও অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তি মাত্রেই খাজা কুতব্-উদ্দিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারই স্মৃতি-রক্ষার্থে কুতব্-মিনার নির্মিত হইয়াছিল। কুতব্-মিনার সুলতান ইল্তুৎমিসের শিল্পানুরাগের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বিদ্যমান। ইল্তুৎমিস্ ধর্মভীরু ছিলেন। নিয়মিত প্রার্থনা, ধর্মজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহার সদ্গুণের উল্লেখ ঐতিহাসিক মিন্হাজ-উস্-সিরাজের রচনায় পাওয়া যায়।

সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

তাঁহার সদ্গুণাবলী

সুলতানা রাজিয়া, ১২৩৬-৪০ (Sultana Raziyya) : ইল্তুৎমিসের জীবদ্দশায়ই তাঁহার প্রথম পুত্র নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছিল। অপরাপর পুত্রদের অকর্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া ইল্তুৎমিস্ মৃত্যুর পূর্বেই নিজ কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী স্ত্রীলোকের সিংহাসনারোহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য ইল্তুৎমিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইল্তুৎমিসের পুত্র রুক্ন্-উদ্দিন ফিরুজকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রুক্ন্-উদ্দিন যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনই ছিলেন ব্যভিচারী। তাঁহার আমলে স্বভাবতই শাসনের নামে অত্যাচার-অবিচার ও অমিতব্যয়িতা চরমে পৌঁছিল। এই সুযোগে তাঁহার মাতা শাহ্তুর্কান শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। শাহ্তুর্কান ছিলেন নিম্নবংশসম্ভূতা। শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া তিনি ইল্তুৎমিসের উচ্চবংশীয়া বেগমদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করিলেন। মাতা ও পুত্রের স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্রোহ দেখা দিল। ফলে, বদাউন, হান্সি, লাহোর, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য করিয়া চলিল। এমতাবস্থায় দিল্লীর অভিজাতগণ রুক্ন্-উদ্দিন ও তাঁহার মাতা শাহ্তুর্কানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইল্তুৎমিসের কন্যা রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

রুক্ন্-উদ্দিন ফিরুজ

শাহ্তুর্কান

রাজিয়ার সিংহাসন লাভ

রাজিয়ার সমস্যাগুলিও কোন অংশে কম জটিল ছিল না। ওয়াজির (*wazir*) বা প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ জুনিয়াদী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল সুলতানা রাজিয়ার শাসন সরল মনে গ্রহণ করিলেন না। লাহোর, বদাউন, হান্সি, বাংলাদেশ, মুলতান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু সুলতানা রাজিয়া অসাধারণ সাহসিকতা ও কূটকৌশলে বিরুদ্ধবাদী অভিজাতবর্গকে দমন করিলেন। অযোধ্যার সামন্তরাজ নুসরৎ-উদ্দিন রুক্ন্-উদ্দিনের আমলে কেন্দ্রীয়

রাজিয়ার সমস্যা

শাসনক্ষমতা অবমাননা করিয়া চলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজিয়াকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ জুনিয়াদীও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া সিরমুর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এইভাবে রাজিয়া রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহীদিগকে পুনরায় দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। লক্ষ্মণাবতী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হইতে দেবল পর্যন্ত যাবতীয় স্থানের আমীর ও মালিকগণ রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

ওয়াজির মহম্মদ জুনিয়াদীর দমন

রাজিয়ার শাসনকালের প্রথমভাগে নূর-উদ্দিন নামে জনৈক তুর্কী মুসলমানের নেতৃত্বে কিরামিতাহ্ ও মুলাহিদ নামে দুইটি বিধর্মী মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে রাজিয়া তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার বিপদ কাটিল না। জালাল-উদ্দিন ইয়াকুৎ (Jalal-ud-din Yaqut) নামে জনৈক আবিসিনীয় বা হাব্সী অনুচরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তুর্কী অভিজাতগণ রাজিয়ার বিরুদ্ধে ইখ্তিয়ার-উদ্দিন আল্তুনিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আল্তুনিয়া ছিলেন সর্হিন্দের শাসনকর্তা। রাজিয়া সসৈন্যে আল্তুনিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত হইলেন। জালাল-উদ্দিন ইয়াকুৎও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইল্তুৎমিসের অপর এক পুত্র মুইজ্ উদ্দিন বাহ্রামকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। রাজিয়া আল্তুনিয়ার হস্তে বন্দিনী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আল্তুনিয়াকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর আল্তুনিয়া ও তিনি দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রামের সেনাবাহিনীর হস্তে উভয়েই পরাজিত হইলেন। এই দুঃসময়ে তাঁহাদের নিজ সৈন্যগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। এমতাবস্থায় কাইথল নামক স্থানে কতিপয় দস্যুর হস্তে তাঁহারা নিহত হইলেন (১২৪০)। এইভাবে রাজিয়ার শাসনের অবসান ঘটিল।

আল্তুনিয়ার বিদ্রোহ

আল্তুনিয়া ও রাজিয়া নিহত

মুসলমান শাসনকালের ইতিহাসে রাজিয়া-ই ছিলেন একমাত্র স্ত্রীলোক যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহার যে দক্ষতা না ছিল এমন নহে। পিতা ইল্তুৎমিস্‌কে তিনি শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ-উস্-সিরাজের রচনা হইতে জানা যায় যে, রাজিয়া ন্যায়, সততা, সুবিচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। শাসকসুলভ ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যেমন পারদর্শিনী ছিলেন তেমনি দয়া-দাক্ষিণ্যে, সাহিত্যিক ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাজিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কোরান পাঠ করিতে পারিতেন। তিনি পুরুষের পোশাক পরিধান করিয়া রাজদরবারের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা

রাজিয়ার কৃতিত্ব

করিতেন। স্ত্রীলোকের শাসনের প্রতি ঐ সময়ে যে বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান ছিল তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত রাজিয়ার ন্যায় বিদুষী সুলতানারও পতন ঘটিয়াছিল।

মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রাম, ১২৪০-৪২ (Muiz-ud-din Bahram): রাজিয়ার পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুইজ্-উদ্দিন বাহ্রাম দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ইল্তুৎমিসের আমলে চল্লিশ জন তুর্কী আমীর ও মালিক দলবদ্ধ হইয়া শাসনব্যবস্থায় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারা 'বন্দেগান-ই চহেলগান' নামে পরিচিত ছিলেন।

ইল্তুৎমিসের ন্যায় ক্ষমতাবান সুলতানের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালে সুলতানগণের দুর্বলতার সুযোগে এই সকল আমীর ও মালিকের শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহ্রাম ছিলেন সাহসী, সরলপ্রাণ, আড়ম্বরহীন সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে আমীর ও মালিকগণ নানাপ্রকার স্বার্থ-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মালিক বদর-উদ্দিন সুংকর ছিলেন বাহ্রামের গৃহাধ্যক্ষ বা কঞ্চুকি (Lord Chamberlain) এবং নিজাম্-উল্-মুল্ক ছিলেন তাঁহার ওয়াজির বা মন্ত্রী। বদর-উদ্দিনের প্রতি বাহ্রাম ও নিজাম্-উল্-মুল্ক উভয়েই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই কারণে বদর-উদ্দিন বাহ্রামকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজাম্-উল্-মুল্কের মুখে বদর-উদ্দিনের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বাহ্রাম তাঁহাকে বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বদর-উদ্দিন সুলতানের বিনা অনুমতিতে কয়েক মাস পরেই দিল্লীতে আসিযা উপস্থিত হইলেন। এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করা হইল। বদর-উদ্দিন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী চল্লিশ জন আমীরের অন্যতম। তাঁহাকে হত্যা করায় অপরাপর আমীরগণ স্বভাবতই অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সুলতান কখন কাহাকে হত্যা করিবেন এই সন্দেহে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন।

'চাল্লিশ আমীর-এর দল'

বদর-উদ্দিনের হত্যা

আমীরগণের ষড়যন্ত্র

এইভাবে অভিজাত সম্প্রদায় যখন বাহ্রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন ঠিক সেই সময় মোঙ্গল নেতা হুলাগু'র অনুচর বাহাদুর তৈর-এর নেতৃত্বে এক মোঙ্গলবাহিনী পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর শহরটি দখল করিল (১২৪১)। বাহ্রাম লাহোরের শাসনকর্তার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য দিল্লী হইতে লাহোরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নিজাম্-উল্-মুল্কের ষড়যন্ত্রে এই সৈন্যবাহিনী অর্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিল। বাহ্রাম 'সাদা কেল্লা' (White Fort) হইতে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুকাল যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া কয়েক দিন পরই হত্যা করা হইল।

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪১)

আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্, ১২৪২-৪৬ (Ala-ud-din Masud Shah) : বাহ্রাম শাহের হত্যার পর আমীরগণ আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্কে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলা-উদ্দিন ছিলেন ইল্তুৎমিসের পৌত্র রুকন-উদ্দিন ফিরুজ শাহের পুত্র। নিজাম্-উল্-মুল্কের ষড়যন্ত্র ও ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া অপরাপর আমীরগণ তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। নিজাম্-উদ্দিন আবু বকরকে ওয়াজির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং উলুঘ-খাঁ রাজগৃহাধ্যক্ষ বা আমীর-ই-হাজিব নিযুক্ত হইলেন। আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহের আমলে বাংলার শাসনকর্তা তুঘান তুঘ্রিল খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এমন কি, তিনি অযোধ্যাপ্রদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করিলেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ-উস্-সিরাজের অনুরোধে তুঘান তুঘ্রিল খাঁ আর অগ্রসর না হইয়া নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১২৪৫) মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, কিন্তু এইবার তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্ ক্রমেই ব্যভিচারী ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শাসনকার্যে তাঁহার অকর্মণ্যতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহার অত্যাচারও তেমনি বাড়িয়া চলিল। অবশেষে আমীর ও মালিকগণ আলা-উদ্দিন মাসুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইল্তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন (১২৪৬)।

নিজাম্ উল-মুল্কের ষড়যন্ত্র—তাঁহার প্রাণনাশ

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৪৫)

নাসির-উদ্দিন মামুদ, ১২৪৬-৬৫ (Nasir-ud-din Mahmud) : নাসির-উদ্দিন মামুদ ধর্মভীরু, অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক নম্রতা ও অমায়িকতার সুযোগে অভিজাত সম্প্রদায়-ই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিন নামেমাত্রই সুলতান ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনায় যথেষ্ট অতিশয়োক্তি রহিয়াছে। যাহা হউক, ব্যক্তিগত উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও শাসনকার্যে তিনি ছিলেন অক্ষম। তিনি সুলতান হইয়াও দরবেশের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং অবসর সময়ে কোরাণ নকল করিয়া কালাতিপাত করিতেন। ঐতিহাসিক মিন্হাজ-উস্-সিরাজ নাসির-উদ্দিনের অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁহার তবকৎ নাসিরি নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি সুলতান নাসির-উদ্দিনের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নাসির-উদ্দিনের চরিত্র

নিজের শাসনক্ষমতার অভাবহেতু স্বভাবতই তাঁহার মন্ত্রী উলুঘ্ খাঁ প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। উলুঘ্ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বলবন অবশ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা প্রদর্শন

করিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি যাবতীয় শাসন-সংক্রান্ত কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বলবৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী রাজা ও জমিদারের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিলেন। ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈফ-উদ্দিন হাসান মুলতান দখল করিলে বলবন মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুলতান ও উচ্-এর শাসনকর্তা কিসলু খাঁ (Kishlu Khan) দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিতেন তেমনই অপরদিকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ইরাণের মোঙ্গল-নেতা হুলাগু'র আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার তাঁবেদার সুলতানে পরিণত হইলেন। এমন কি ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা কুৎলুঘ খাঁ-এর সাহায্য লইয়া তিনি দিল্লী দখল করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।* প্রায় ঐ সময়ে মোঙ্গলগণ কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইলে বলবন সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মোঙ্গলদের সহিত সংঘর্ষের পর মোঙ্গল-নেতা হুলাগু দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা লঙ্ঘন করিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। তথাপি পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে মোঙ্গলপ্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হইল না।

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের মন্ত্রিত্ব

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত

বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানি 'শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘিস্-উদ্দিন উজ্‌বক (Mughis-ud-din Yuzbak) বাংলাদেশের শাসনকর্তার পদকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া লইলেন।† এমন কি তিনি অযোধ্যা জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। কামরূপ আক্রমণ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে বাংলাদেশের উপর পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হইল। কারা-এর শাসনকর্তাও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন।

বাংলা ও বিহারের উপর প্রাধান্য পুনঃস্থাপন

বলবন কালিঞ্জরের হিন্দু সামন্তরাজ গোয়ালিয়রের রাজা মেওয়াট অঞ্চলের উপজাতীয় দলগুলিকে দমন করিয়া ঐ সকল অঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইভাবে বলবনের চেষ্টায় দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইল। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নাসির-উদ্দিনের

হিন্দুরাজগণের উপর প্রাধান্য পুনঃস্থাপন

* Vide, *Camb. History of India*, Vol. III. p. 70-71.

† Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II. p. 51.

মৃত্যু হইলে ইলতুৎমিসের বংশ বিলুপ্ত হইল। সুলতান নাসির-উদ্দিন বলবনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি নাকি বলবনকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, গিযাস-উদ্দিন বলবন সুলতানের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই।

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের সিংহাসন লাভ

গিয়াস-উদ্দিন বলবন, ১২৬৬-৮৭ (Ghiyas-ud-din Balban) : গিয়াস-উদ্দিন বলবন তুর্কীস্তানের ইলবেরি জাতিসম্ভূত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদের খাজা জামাল-উদ্দিনের নিকট ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হন। জামাল-উদ্দিন তাঁহাকে দিল্লীতে লইযা আসেন এবং সেখানে সুলতান ইলতুৎমিস্ তাঁহাকে ক্রয় করেন। বলবন ইলতুৎমিসের "চল্লিশ জন ক্রীতদাস" (Bandegan-chahelgan or "The Forty")-এর অন্যতম ছিলেন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে সুলতান নাসির-উদ্দিনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার ফলে নাসির-উদ্দিনের উপর বলবনের প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে তিনি শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করিযাছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া তিনি যেমন নিজ শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন তেমনি তিনি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথমেই তুর্কী অভিজাতবর্গকে দমন করিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম প্রধান গুরুদায়িত্ব ছিল। বরণীর রচনায় উল্লেখ আছে যে, ভয়ের কারণ থাকিলে প্রজাবর্গ শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে উপলব্ধি করিয়া গিয়াস-উদ্দিন বলবন পুনরায় রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষত অভিজাত সম্প্রদায়ের মনে ভীতির সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

বলবনের প্রথম জীবন

তাঁহার প্রধান সমস্যা

বলবন প্রথমেই এক বিশাল সামরিক বাহিনী গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাতন সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করিয়া তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমরকুশলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। অভিজ্ঞ, সুদক্ষ এবং অনুগত মালিক ও আমীরদের অধীনে তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অংশকে স্থাপন করিলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে বলবন দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চল ও দোয়াব অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। মেওয়াটী দস্যুদের আক্রমণে দিল্লীর উপকণ্ঠে পর্যন্ত ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। বলবন এই সকল দস্যুকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। দিল্লীর নিরাপত্তার জন্য তিনি চতুর্দিকে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। কাম্পিল, পাতিয়ালী, ভোজপুর প্রভৃতি স্থানে মেওয়াটী দস্যুদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। বলবন স্বয়ং এই সকল স্থানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে

সামরিক সংগঠন

অগ্রসর হইলেন। এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা মেওয়াটী দস্যুদের দমন করিয়া রাস্তা-ঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

মেওয়াটী দস্যু দমন

মেওয়াটী দস্যুদের দমনের ফলে শুধু ধন-প্রাণই রক্ষা পাইল এমন নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্যও পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে মেওয়াটী দস্যুগণ যাহাতে কোন উপদ্রব করিতে না পারে সেজন্য বলবন গোপালগীর নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ এবং জালালী নামক দুর্গটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বলবন কর্তৃক এই দস্যু দমনের সুফল পরবর্তী কালেও পরিলক্ষিত হয়। ষাট বৎসর পরেও ঐতিহাসিক বরণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেশের কোথাও দস্যুদের উপদ্রব ছিল না।

অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে বলবন তাহাদের জমি ভোগ-দখলের শর্তাদি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর পরামর্শে তিনি এই সংকল্প ত্যাগ করেন। তথাপি তিনি 'বন্দেগান-ই-চহেলগান' বা 'চল্লিশ জন ক্রীতদাস'-এর ক্ষমতা খর্ব করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জমিদারী প্রথা পরিবর্তনের সংকল্প ত্যাগ

বলবন জাদ (Jud) অঞ্চলের উপজাতিদের দমন করিবার জন্য এক সামরিক অভিযানে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। বলবনের কার্যাদির মধ্যে মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা বিধানই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বলবনের নিকট-আত্মীয় শের খাঁ ছিলেন সুনাম, লাহোর ও দীপালপুর অঞ্চলের একজন শক্তিশালী জায়গীরদার। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার ব্যাপারে শের খাঁ ইহা ভিন্ন, দুর্ধর্ষ জাঠ, খোকর, ভাট্টি প্রভৃতি উপজাতিকে তিনি নিজ প্রাধান্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাধান্য ও সাফল্যে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া বলবন অদূরদর্শিতার কাজ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনি কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার প্রথম পুত্র মহম্মদকে মুলতানে এবং দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খাঁকে সামানা ও সুনাম নামক স্থানে সসৈন্যে মোতায়েন করিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার এই ব্যবস্থার সাফল্য ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিলক্ষিত হইল। ঐ বৎসর মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করিলে সুলতানের দুই পুত্র অতিশয় তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

শের খাঁ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত (১২৭৯)

মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগ লইয়া বাংলাদেশের শাসনকর্তা তুঘান তুঘ্‌রিল খাঁ

নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বলবন আমীর খাঁ ও মালিক তারুখি-র নেতৃত্বে তুঘান তুঘ্‌রিল খাঁর বিরুদ্ধে পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করিলেন, কিন্তু উভয় অভিযানই ব্যর্থ হইল। অতঃপর বলবন স্বয়ং তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তুঘান তুঘ্‌রিল খাঁ ভয়ে নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া জাজনগরের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ধৃত ও নিহত হইলেন। বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

বাংলার শাসনকর্তা তুঘান তুঘ্‌রিল খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা—পরাজয় ও মৃত্যু

বাংলার বিদ্রোহ দমন শেষ হইতে না হইতেই মোঙ্গলগণ পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে বলবনের প্রথম পুত্র মহম্মদ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। প্রিয়পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পকালের মধ্যেই বলবন প্রাণত্যাগ করিলেন (১২৮৭)।

মোঙ্গল আক্রমণ (১২৮৭)

গিয়াস-উদ্দিন বলবন দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের ন্যায় বিশাল দেশকে শাসনাধীনে রাখিতে হইলে কেবলমাত্র সামরিক বলপ্রয়োগ করিলে চলিবে না। শাসনের দক্ষতা-ই হওয়া চাই উহার মূল ভিত্তি। এইজন্য শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হইতে পারে সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি ছিল সামরিক শক্তির সহিত সুশাসনের সামঞ্জস্য। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁহার অনুমতি ও অনুমোদন ভিন্ন শাসন-সংক্রান্ত কোন কাজ যাহাতে না করা হয় সেই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পুত্রগণও শাসনব্যাপারে কোন স্বাধীনতা ভোগ করিতেন না।

বলবনের শাসনব্যবস্থা

বিচার বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব না ঘটিতে পারে বলবন সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়গণও ন্যায্য বিচার এড়াইতে পারিতেন না। বলবনের সুবিচার ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই অবহিত ছিলেন। সুলতানের নিকট হইতে কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া অভিজাতগণ তাঁহাদের দাস-দাসী, ক্রীতদাস প্রভৃতির প্রতিও অন্যায় আচরণ করিতে সাহস পাইতেন না। জনৈক মালিক অর্থাৎ অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার এক দাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়াছিলেন। বলবন মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীর নিকট হইতে এই অভিযোগ জানিতে পারিয়া স্বয়ং মালিককেই প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বলবনের এক প্রিয়পাত্র হইবৎ খাঁ (Haibat Khan) এক ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীকে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দান করিয়া তাঁহার নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

বিচার-ব্যবস্থা

রাজ্যের কোথায় কি ঘটিয়াছে তাহা সর্বদা যাহাতে সুলতানের কর্ণগোচর হইতে পারে সেইজন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। রাজ্যে অবিচার, অরাজকতা বা অন্যায় আচরণ সম্পর্কে গুপ্তচরগণকে সর্বদা সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত। সুলতানের পুত্র বুগ্রা খাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কেও গুপ্তচরগণকে খোঁজখবর রাখিতে হইত।

গুপ্তচর

বলবনের কৃতিত্ব (Achievements of Balban): উলুঘ্ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের বিশ্বস্ত 'চাল্লিশ জন ক্রীতদাসের' তিনি ছিলেন অন্যতম। ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লীর শাসনব্যবস্থায় যে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমেই দিল্লী সুলতানির ভিত্তি দুর্বলতর করিয়া ফেলিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া অভিজাত সম্প্রদায়—আমীর ও মালিকগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে নাসির-উদ্দিন সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বলবন নাসির-উদ্দিনের শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সুলতান নাসির-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া বলবন নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগণে বৃদ্ধি করেন এবং সুলতানের যাবতীয় কার্য নিজেই সম্পাদন করিতে থাকেন। শাসনকার্যে অপটু নাসির-উদ্দিন নামেমাত্রই সুলতান ছিলেন, প্রকৃত সুলতান ছিলেন বলবন।

প্রথম জীবন

নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে বলবন দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদারগণকে তিনি পুনরায় আনুগত্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উদ্ধত আমীর ও মালিকগণ যাহাতে শাসনকার্যে কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। গোয়ালিওর-এর রাজা, কালিঞ্জরের হিন্দুসামন্তরাজ প্রভৃতিকে তিনি পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তা মুঘিস্-উদ্দিনকে তিনি দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। মুঘিস্-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এইভাবে সুলতান-পদ গ্রহণের পূর্বেই বলবন নিজ শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

নাসির-উদ্দিনের মন্ত্রী হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা

নাসির-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও বহিরাগত শত্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষার জন্য তিনি নিজের দুই পুত্রকে মুলতান, সামান ও সুনাম-এ সৈন্যসহ মোতায়েন রাখিয়াছিলেন।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও বহিরাগত শত্রু হইতে দেশ-রক্ষা

আমীর ও মালিকদের ঔদ্ধত্য দমন করিয়া তিনি দেশের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করিলেন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তিনি স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিলেন এবং দেশের সর্বত্র ন্যায়বিচার স্থাপন করিলেন। গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দেশের সকল অংশ হইতে যাবতীয় অত্যাচার, অবিচার, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

আমীর ও মালিকদের দমন ঃ গুপ্তচর নিয়োগ

দোয়াব অঞ্চলের দস্যুদিগকে দমন করিয়া তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসরের মধ্যে সর্বপ্রথম রাস্তাঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য দিল্লীর চতুর্দিকে কতকগুলি সামরিক চৌকিও (outpost) নির্মিত হইল। মেওয়াটী দস্যুগণ যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য তিনি গোপালগীর নামক স্থানে একটি দুর্গ স্থাপন করিয়া দস্যুদের কর্মকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করিলেন।

মেওয়াটী দস্যু দমন

এইভাবে অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা গিয়াস-উদ্দিন বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিসের পরবর্তী কালে দিল্লী সুলতানির এক সংকট মুহূর্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া বলবন পুনরায় মুসলমান শাসন দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি

সুলতান হিসাবে বলবন যেমন ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল তেমনি নিষ্কলুষ। তিনি পারস্যদেশের রাজসভার অনুকরণে নিজ রাজসভা গঠন করিয়াছিলেন। পারসিক আদব-কায়দা, অনুষ্ঠানপ্রিয়তা প্রভৃতি ছিল তাঁহার রাজসভার বৈশিষ্ট্য। মোঙ্গল আক্রমণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত মধ্য-এশিয়ার পনর জন রাজাকে তিনি নিজ রাজসভায় আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খুস্‌রভ্ বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর খুস্‌রভ্ বা খুস্‌রু ছিলেন ঐ সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি 'ভারতের তোতাপাখী' (*Parrot of India*) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত চরিত্র ঃ মর্যাদাপূর্ণ ও নিষ্কলুষ

রাজকীয় মর্যাদা ও ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বলবন বিশ্বাসী ছিলেন। বিচারক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, মুসলমান হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যধিক ধর্মভীরু এবং সুলতান হিসাবে তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ। ভারতে মুসলমান শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনে বলবনের দান ছিল অপরিসীম।

তাঁহার দান—মুসলমান শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ

কাইকোবাদ, ১২৮৭-৯০ (Kaiqubad) ঃ সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বলবন কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বলবন যে রাজক্ষমতা দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন উহা পরবর্তী দুর্বল শাসকদের আমলে বিনষ্ট হইল। বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পৌত্র কাইকোবাদকে আমীর ও মালিকগণ সিংহাসনে

বলবনের পরবর্তী [illegible] শাসনকার্যে দুর্বলতা

স্থাপন করিলেন। কাইকোবাদের পিতা বুগরা খাঁ ছিলেন তখন বাংলাদেশের শাসনকর্তা। তিনি নিজপুত্রের সুলতান-পদ প্রাপ্তির বিরোধিতা করিলেন না। কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক কাইকোবাদ যেমন ছিলেন শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ তেমনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ। স্বভাবতই শাসনব্যবস্থা তাঁহার আমলে ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অভিজাত শ্রেণী স্বার্থদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজাম-উদ্দিন নামে জনৈক আমীর কৌশলে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন, আর কাইকোবাদ নিজাম-উদ্দিনের হস্তে ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া রহিলেন।

কাইকোবাদের সিংহাসনলাভ—নিজাম-উদ্দিনের প্রাধান্য

এমন সময় মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সামান পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মালিক মহম্মদ বক্‌বক্ (Malik Muhammad Baqbaq) মোঙ্গলগণকে লাহোরের নিকট যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিনি এক হাজার মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসিলে তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ

এদিকে নিজাম-উদ্দিন নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধপক্ষের মালিক ও আমীরদের ক্ষমতাচ্যুত এবং মর্যাদা ও প্রতিপত্তিহীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কাই-খসরুকে হত্যা করিলেন এবং সুলতানের ওয়াজির (*Wajir*) খাজা খাতিরকে প্রকাশ্যে অপমান করিলেন। নিজাম-উদ্দিন সুলতান-পদ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যেই এইভাবে অত্যাচার বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। ফলে, অভ্যন্তরীণ শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

নিজাম-উদ্দিনের ঔদ্ধত্য

এমতাবস্থায় কাইকোবাদের পিতা বুগরা খাঁ পুত্রের অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কাইকোবাদ ও বুগরা খাঁর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে মিলন ঘটিল। কাইকোবাদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং বুগরা খাঁ তাহাকে শাসনসম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়া নিজ কর্মকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলেন।

বুগরা খাঁর অভিযান

নিজাম-উদ্দিনের ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় কাইকোবাদের পক্ষেও তাহা আর সহ্য করা সম্ভব হইল না। তিনি নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। নিজাম-উদ্দিনকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইল।

নিজাম উদ্দিনের হত্যা

কাইকোবাদ খল্‌জী মালিক জালাল-উদ্দিন ফিরুজকে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া বরণ (Baran) প্রদেশের সামন্ত হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। খল্‌জী মালিক ও তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ বিরোধ ছিল। ফলে, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল। এই সময়ে কাইকোবাদ বাতরোগে পঙ্গু হইলে তাঁহারই এক

জালাল-উদ্দিনের সেনাধ্যক্ষপদে নিয়োগ

শিশুপুত্রকে তুর্কী অভিজাতগণ দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই শিশু সুলতানের নামকরণ করা হইল শামস্-উদ্দিন কয়ুমর। তুর্কী অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে দিল্লীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইরূপ জটিলতার সৃষ্টি হইলে জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খলজী বরণ হইতে সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক দিল্লী নগরী দখল করিলেন। তারপর তিনি কাইকোবাদকে গোপনে হত্যা করাইয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অল্পকাল শামস্-উদ্দিন কয়ুমর-এর প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য চালাইবার পর ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সুলতান-পদ গ্রহণ করিলেন। জালাল-উদ্দিনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর দাসবংশের বিলোপ ঘটিল।

তুর্কী অভিজাতগণের ষড়যন্ত্র

জালাল-উদ্দিনের সিংহাসন অধিকার

হিন্দুস্তানে মুসলমানদের সাফল্যের কারণ (Causes of Muslim success in Hindusthan) : ভারত-বিজয়ে মুসলমান সাফল্য এবং হিন্দু রাজগণের দেশরক্ষায় অক্ষমতার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ ছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। কোন একজন সুদক্ষ শক্তিশালী সম্রাটের পক্ষে হয়ত ঐ অব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য আনয়ন করা সম্ভব হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ সময়ে ভারতবর্ষে কোন সুযোগ্য সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যেমন ব্যাপক রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি ব্যাপক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন বলিয়া কিছু আর ছিল না। ভারতের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় আধিপত্যের দুর্বলতার সুযোগে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। ঐক্য বা সংগঠন বলিতে কিছুই এই সকল রাজার মধ্যে ছিল না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক ঐক্য সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইল। এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কোন ভারতীয় হিন্দু রাজারই আর ছিল না। পরস্পর বিবদমান স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্বার্থপরতার ও সংকীর্ণতার চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থা মুসলমান আক্রমণকারীদের সহায়ক হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর অব্যবস্থা ও অনৈক্য : অসংখ্য ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি

দ্বিতীয়ত, মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি একমাত্র রাজপুতদেরই ছিল। সৈনিক হিসাবে রাজপুত জাতি সমসাময়িক কালের যে-কোন জাতির শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের সহিত তুলনীয় হইলেও এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের সাহস ও বীরত্ব তাহাদের থাকিলেও, তাহারা একই সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। তাহাদের পরস্পর হিংসা-দ্বেষ তাহাদের স্ব স্ব প্রাধান্য এবং স্বাতন্ত্র্যের

রাজপুত জাতির পরস্পর বিদ্বেষ

মনোবৃত্তি সৈনিক হিসাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে বিনাশ করিয়াছিল। বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে না দাঁড়াইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই তাহারা মুসলমানদের আক্রমণে হতবল হইয়া পড়িয়াছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেও তাহারা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই।

পর্বতসঙ্কুল শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত মুসলমান আক্রমণ-কারিগণের শৃঙ্খলা ও সংহতি

তৃতীয়ত, মধ্য-এশিয়ার পর্বতসঙ্কুল শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত দুর্ধর্ষ শক্তিশালী মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতীয়দের দুর্বলতা সহজেই অনুমেয়। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সংগঠন-ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিবদমান হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মুসলমান আক্রমণকারীদের শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল।

একক অধিনায়কত্বের অধীনে মুসলমান সৈনিকগণ—হিন্দুদের মধ্যে উহার অভাব

চতুর্থত, মুসলমান আক্রমণকারিগণ একই নেতার অধীনে যুদ্ধ করিত, অপর পক্ষে হিন্দুরাজগণ যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেখানেও সেনাবাহিনী বিভিন্ন রাজার নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিত। সর্বময় একক অধিনায়কত্ব হিন্দু সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল না।

পঞ্চমত, হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথা তাহাদের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। জাতির ভিত্তিতে পরস্পর-বিদ্বেষী শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু সৈন্য ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল না। জাতিভেদ-প্রসূত বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ও দেশাত্মবোধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যেও জাতিভেদ মানিয়া চলা হইত। স্বভাবতই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংহতি তাহাদের মধ্যে জাগিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলমান আক্রমণকারিগণের মধ্যে জাতিভেদ বলিয়া কিছু না থাকায় তাহাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের ঐক্য ধর্মোন্মত্ততায় পরিণত হওয়ায় তাহারা হিন্দু সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।*

হিন্দুদের সংকীর্ণ জাতিভেদ-প্রথা

ষষ্ঠত, হিন্দু রাজগণের নিজ নিজ স্থানীয় স্বার্থ এবং দলগত মনোবৃত্তি তাঁহাদের জাতীয় ঐক্য নাশ করিয়াছিল, কিন্তু আক্রমণকারী মুসলমান সৈন্যের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ঐক্য বিদ্যমান ছিল। হিন্দু রাজগণের মধ্যে না ছিল জাতীয় ঐক্য, না ছিল ধর্মের উন্মত্ততা। ফলে মুসলমান আক্রমণকারিগণ যেখানে ছিল সঙ্ঘবদ্ধ, সেখানে হিন্দু জাতি ছিল বিচ্ছিন্ন।†

হিন্দু রাজগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের অভাব

* "The Indian caste-system is unfavourable to military efficiency as against foreign foes" Lane-Poole, p. 63.

† "Solidarity and zeal, added to their greater energy and versatility gave the Muslims superiority over the nation." Lane-Poole, p. 63; Ishwari Prasad, pp. 204ff.

সপ্তমত, ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা, পৌত্তলিক হিন্দুগণকে হত্যা করিয়া 'গাজী' হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং হিন্দুমন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আত্মসাৎ করিবার আগ্রহ মুসলমান আক্রমণকারীদের দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত করিয়াছিল। হিন্দু রাজগণের মধ্যে এইরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ ছিল না।

পৌত্তলিকদের হত্যার জন্য মুসলমানদের আগ্রহ

অষ্টমত, হিন্দুরাজগণ চিরাচরিত হস্তিবাহিনী, অশ্ববাহিনী, পদাতিক ও রথ—এই চারি প্রকার বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের যুদ্ধ-পদ্ধতি ছিল যেমন প্রাচীন তেমনই অকার্যকরী। হস্তিবাহিনীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব তাঁহারা আরোপ করিতেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তিবাহিনীর দ্বারা হিন্দুপক্ষের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ডক্টর স্মিথ্ বলেন যে, কোন হিন্দু সেনানায়ক শত্রুর যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়া সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা কোনকালেই করেন নাই। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধকৌশল প্রাচীন হিন্দুদের যুদ্ধকৌশলের অপকর্ষতা প্রমাণ করিয়াছিল, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আক্রমণকাল পর্যন্ত হিন্দুরাজগণ সামরিক পদ্ধতির কোন উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধন করিতে সচেষ্ট হন নাই। ফলে আলেকজাণ্ডার যেমন 'আকস্মিক আক্রমণ কৌশল' (shock tactics) দ্বারা হিন্দুদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই মহম্মদ ঘুরী, বাবর, আহম্মদ শাহ্ দুররাণী প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর পরও হিন্দুরাজগণ ঐ প্রাচীন যুদ্ধকৌশলই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফলে যুদ্ধে প্রাণদানে কুণ্ঠিত না হইলেও বা বীরত্ব-প্রদর্শনে হিন্দু সৈনিক মুসলমানদের অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই।

হিন্দুদের সামরিক পদ্ধতির অপকর্ষতা

নবমত, হিন্দু আমলে সামরিক দায়িত্ব এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত থাকায় অপরাপর শ্রেণী সামরিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিল। দেশ ও জাতি যখন জীবন-মরণ সমস্যায় জড়িত, জাতির স্বাধীনতা যখন বিপন্ন তখনও দেশরক্ষার দায়িত্ব একমাত্র সামরিক শ্রেণীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সামরিক বাহিনীর পশ্চাতে সমগ্র জাতির সহায়তা বা সমগ্র জাতির স্বাধীনতা-রক্ষার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। পৌত্তলিকদের হত্যা ও হিন্দুদের মন্দির ও বিগ্রহাদি লুণ্ঠনকার্যে পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমানদের সৈনিকরূপে নিযুক্ত করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু এইরূপ সহজে দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করা হিন্দুরাজগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান আক্রমণকারীদের যুদ্ধ দুইটি ভিন্ন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষ বলিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। হিন্দুসমাজ ছিল অতি প্রাচীন, অপর পক্ষে মুসলমান সমাজ ছিল নূতন ও সজীবতাপূর্ণ। প্রাচীন ও নূতনের সংঘর্ষে নূতনই জয়ী হইল।

সামরিক শ্রেণীর পশ্চাতে সমগ্র জাতির সহায়তার অভাব

দশমত, যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি, হিন্দুদের অদূরদর্শিতা প্রভৃতিও তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে নির্মূল করিবার প্রয়োজনবোধ বা চেষ্টা হিন্দুরাজগণ করেন নাই। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) জয়লাভ করিয়াও হিন্দুরাজগণ মহম্মদ ঘুরীর শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিতে অগ্রসর হন নাই। ফলে, পরবৎসরই ঘুরী ঐ একই প্রান্তরে হিন্দুসেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হিন্দুদের সামরিক ভুল-ভ্রান্তি, পরাজিত শত্রুকে বিনাশের প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

একাদশত, ক্রীতদাস-প্রথা মুসলমান আক্রমণকারীদের শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। মুসলমান ক্রীতদাসদের মধ্য হইতে বহু সুদক্ষ, শক্তিশালী, কর্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। কুতব-উদ্দিন, ইলতুৎমিস, বলবন প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণে ইঁহাদের দান অপরিমেয়।

মুসলমান ক্রীতদাস-গণের দান

সর্বশেষে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আক্রমণকারীদের কতকগুলি স্বাভাবিক সুবিধা থাকে। আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা কোন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখানে যে অব্যবস্থা, ভীতি ও মানসিক দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, তাহা আক্রমণকারী শত্রুর কাজ কতকটা সহজ করিয়া দেয়। মুসলমান আক্রমণকারীদের ধর্মোন্মত্ততা* ও লুণ্ঠন-লিপ্সা মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে এক অদম্য শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। অপর দিকে, হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইলেও তাহাদের মধ্যে মুসলমান আক্রমণকারীদের বীভৎসতার ভীতি-প্রসূত দুর্বলতার অবধি ছিল না। এই সকল কারণে মুসলমান আক্রমণকারিগণ হিন্দুদের পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

আক্রমণকারী শত্রুর স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা

---

* Their very bigotry was an instrument of self-preservation. Lane-Poole, p. 68. Ishwari Prasad, p. 204.

তৃতীয় অধ্যায়

খল্‌জী বংশ
(The Khaljis)

খল্‌জী-বংশের আদি পরিচয় (The Origin of the Khaljis): খল্‌জী বংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে মুসলমান ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দিন ফেরিস্তা ও জিয়া-উদ্দিন বরণীর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। নিজাম-উদ্দিন ফেরিস্তার মতে খল্‌জী বংশ তুর্কী জাতিসম্ভূত।* জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে তাঁহারা ছিলেন তুর্কীদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির লোক। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, খল্‌জী বংশ মূলত তুর্কী জাতিসম্ভূতই বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাঁহারা আফগান জাতির সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুর্কী ও আফগানদের মধ্যে সর্বদাই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। তুর্কীদের সহিত আফগান প্রভাবে প্রভাবিত খল্‌জী বংশের মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না।

আদি পরিচয় সম্পর্কে মতানৈক্য

যাহা হউক, পঙ্গু সুলতান কাইকোবাদের হত্যা ও তুর্কী মালিক ও আমীরদের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর সিংহাসন খল্‌জী বংশের অধিকারে আসিল। বৃদ্ধ মালিক জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩ই জুন, ১২৯০)।

জালাল-উদ্দিন খল্‌জীর সিংহাসন-প্রাপ্তি (১৩ই জুন, ১২৯০)

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্‌জী, ১২৯০-৯৬ (Jalal-ud-din Firuz Khalji): কাইকোবাদ ও তাঁহার শিশুপুত্র শামসু-উদ্দিন কয়ুমর এবং তুর্কী অভিজাতগণের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের প্রাণনাশ করিয়া জালাল-উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দিল্লীর নিকটবর্তী কাইকোবাদ কর্তৃক আরব্ধ কিলোখরী (Kilokhri) নামক প্রাসাদে তিনি তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন না। এজন্য কিছুকাল ধরিয়া কিলোখরী প্রাসাদের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়া তিনি সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। বরণীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি যেমন ছিলেন ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু তেমনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ

হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সিংহাসন প্রাপ্তি

তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী

* Vide, Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 202, fn.

ও উদারচিত্ত। অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি ভূসম্পত্তি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া স্ববশে আনিলেন। ইহার পর তাঁহার দিল্লীতে প্রবেশ করিবার বাধা দূর হইল এবং তাঁহার শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধিতাও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল।

তাঁহার উদারতা

সিংহাসনে আরোহণের সময় জালাল-উদ্দিনের বয়স ছিল সত্তর বৎসর। স্বভাবতই তিনি পরকালের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোনপ্রকার অন্যায় অত্যাচার বা রক্তপাত না করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য তিনি তুর্কী অভিজাতদের অনেককে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিরোধিতা দূর করিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চজ্জু (Chajju)-কে তিনি সেনাধ্যক্ষ পদে পুনর্নিয়োগ করিলেন। জালাল-উদ্দিন নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরও নানা উপাধিতে সম্মানিত করিলেন এবং রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন।

মালিক চজ্জুর বিদ্রোহ

সাময়িক কালের জন্য জালাল-উদ্দিন দেশে শান্তিস্থাপনে সক্ষম হইলেও তাঁহার শাসন মূলত দুর্বল ছিল বলিয়া অল্পকালের মধ্যেই দেশে অরাজকতা দেখা দিল। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চজ্জু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহে অপরাপর মালিকগণও যোগদান করিলে মালিক চজ্জুর শক্তি বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজেকে কারা প্রদেশের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু জালাল-উদ্দিনের পুত্র আরকলি খাঁ (Arkali Khan) এই বিদ্রোহ দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন কিন্তু ইহাতেও ধর্মভীরু বৃদ্ধ জালাল-উদ্দিনের শাসন-নীতির দুর্বলতা দূর করিবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। উপরন্তু জালাল-উদ্দিন বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিয়া তাহাদের স্পর্ধা বৃদ্ধির সাহায্য করিলেন। তাঁহার এই দয়া-প্রবণতাকে দুর্বলতা মনে করিয়া অভিজাত সম্প্রদায় পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। প্রকাশ্যে সুলতানের বিরুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করিতেও তাঁহারা ভীত হইলেন না।

জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতা

এইভাবে দিল্লীর সুলতানির মর্যাদা ধূলিসাৎ হইল। খল্জী অভিজাতগণও জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতায় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জালাল-উদ্দিনের দুর্বলতা দিন দিন সকলের নিকটেই প্রকট হইয়া উঠিলে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত আহম্মদ চাপ নামে জনৈক রাজকর্মচারী ও মালিক তাজ-উদ্দিন কুচি এই দুইজনের মধ্যে একজনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপনের জন্য খল্জী মালিকদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়াও সুলতান জালাল-উদ্দিন অভিজাত সম্প্রদায়কে সাবধান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। কিন্তু আহম্মদ বেগ ছিলেন অতিশয় বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তি। তিনি সুলতানের দুর্বলতায় বিরক্ত হইয়া অনেক সময় স্পষ্ট ভাষায় সুলতানকে সতর্ক করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি জালাল-উদ্দিনের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। এজন্য সিংহাসন অধিকারের পর আলা-উদ্দিন খল্জী তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করাইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন।

প্রয়োজনবোধে কঠোরতা অবলম্বন করিতেও সুলতান জালাল-উদ্দিন যে পারিতেন তাহার প্রমাণ সিদি মৌলার নৃশংস হত্যায় পাওয়া যায়। সিদি মৌলার শিষ্যগণ তাঁহাকে খলিফা (Caliph) পদে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক এই সংবাদ পাইয়া ইসলামধর্মের পৃষ্ঠপোষক জালাল-উদ্দিন ইসলাম ধর্মগুরু খলিফার অবমাননা হইতেছে, এই কারণে হাতীর পায়ের নীচে সিদি মৌলাকে পিষ্ট করাইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু বস্তুত সিদি মৌলা সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই নৃশংসতা জালাল-উদ্দিনের প্রতি জনসাধারণের একাংশকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল।

সিদি মৌলার হত্যা

অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেই জালাল-উদ্দিন যে তাঁহার দুর্বলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এমন নহে। পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও তাঁহার দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবার পথে ঝইন্ (Jhain) দুর্গটি দখল করেন এবং ঐ দুর্গে অবস্থিত দেবমন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস করেন। কিন্তু রণথম্ভোর দুর্গ জয় করিতে অকৃতকার্য হইয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এই অপমানজনক প্রত্যাবর্তনে আমীর-ওমরাহ্‌গণ বিরক্তি প্রকাশ করিলে জালাল-উদ্দিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি একজন মুসলমানেরও প্রাণ বিপন্ন করিয়া রণথম্ভোর দুর্গ জয় করিতে ইচ্ছুক নহেন।

রণথম্ভোর জয়ে বিফলতা

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যাপারে জালাল-উদ্দিন অবশ্য তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা হলাগু বা হলাকুর পৌত্র আবদুল্লা দেড় লক্ষ মোঙ্গল সৈন্যসহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। জালাল-উদ্দিন দিল্লী হইতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া মোঙ্গলদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। অতঃপর দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। চিঙ্গিজ খাঁর পৌত্র উল্‌ঘু তাঁহার কতিপয় অনুচরসহ ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে চাহিলেন। জালাল-উদ্দিন উল্‌ঘুর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া উল্‌ঘু ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করিলেন। অল্পকাল পরেই উল্‌ঘু ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরদের কেহ কেহ দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রহিয়া গেল। ইহারা ইসলামধর্ম এবং মুসলমানদের আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়া 'নব-মুসলমান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ (১২৯২)

মন্দোর ও ঝইন্ অঞ্চলে সামরিক অভিযান সম্পন্ন করিয়া জালাল-উদ্দিন যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ধর্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় সুলতান জালাল-উদ্দিন শান্তিতে মরিতে পারিলেন না। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ্দিন খল্‌জীর হস্তে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল।

মন্দোর ও ঝইন্ অঞ্চলে অভিযান: জালাল-উদ্দিনের অপমৃত্যু

আলা-উদ্দিন খল্‌জী, ১২৯৬-১৩১৬ (Ala-ud-din Khalji) : আলা-উদ্দিন ছিলেন জালাল-উদ্দিন ফিরুজের ভ্রাতুষ্পুত্র। জালাল-উদ্দিনের অভিভাবকত্বাধীনেই

তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন সস্নেহে ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করিয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারা প্রদেশের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত থাকা কালেই আলা-উদ্দিন তথাকার বিদ্রোহী আমীর ও মালিকদের প্ররোচনায় দিল্লীর সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন।* নিজ পত্নী এবং শ্বশ্রূমাতাও (mother-in-law) আলা-উদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের ব্যবহারেও আলাউদ্দিন দিল্লী হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেন এবং সুযোগ পাইলে দিল্লীর প্রাধান্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কারা প্রদেশের শাসন-কর্তাপদে নিয়োগ

১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে জালাল-উদ্দিনের অনুমতিক্রমে তিনি মালব দেশ আক্রমণ করিলেন এবং এই সূত্রে ভিল্‌সা দুর্গটি লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া আসিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে সুলতান জালাল-উদ্দিন খুব প্রীত হইলেন ও আলা-উদ্দিনকে অযোধ্যারও শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

মালব আক্রমণ ও ভিল্‌সা দুর্গ লুণ্ঠন (১২৯২)

আলা-উদ্দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। ভিল্‌সা দুর্গ লুণ্ঠনের পর হইতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। ঐ দুর্গটি আক্রমণ করিতে গিয়াই আলা-উদ্দিন দেবগিরি বা দৌলতাবাদের ঐশ্বর্যের সংবাদ পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দেবগিরিতে যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। আলা-উদ্দিন এইবার জালাল-উদ্দিনের বিনা অনুমতিতেই দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া রামচন্দ্র আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব অধিকাংশ সেনাবাহিনীসহ রাজধানী হইতে অনুপস্থিত থাকায় রামচন্দ্র সহজেই পরাজিত হইলেন। তিনি দেবগিরির সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এমন সময় আলা-উদ্দিন গুজব রটাইয়া দিলেন যে, দিল্লীর সুলতান শীঘ্রই বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য আসিতেছেন। এই মিথ্যা রটনায় আলা-উদ্দিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রামচন্দ্র আর যুদ্ধ না করিয়া আপস-মীমাংসা-ই সমীচীন হইবে মনে করিলেন। চুক্তির শর্তানুসারে আলা-উদ্দিনকে পঞ্চাশ মণ সোনা, সাত মণ মণিমুক্তা, চল্লিশটি হাতী ও কয়েক হাজার ঘোড়া দেওয়া স্থির হইল। ইহা ভিন্ন, দেবগিরি নগরটি লুণ্ঠন করিয়া আলা-উদ্দিন যে পরিমাণ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি লইয়া যাইতে পারিবেন স্থির হইল। এমন সময় রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করদেব

দেবগিরি আক্রমণ

দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পরাজয়

* "The crafty suggestions of the Kara rebels made a lodgement in his brain, and from the very first year of his occupation of that territory, he began to follow up his design of proceeding to some distant quarter and amassing money".—Barani, Vide, *An Advanced History of India*, p. 297.

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি এই অপমানজনক চুক্তির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিয়া আলা-উদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া তিনি পিতৃ-প্রতিশ্রুত শর্তাদি মানিতে এবং তদুপরি ইলিচপুর নামক স্থান ও প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইলিচপুর অবশ্য রামচন্দ্রের অধীনেই রহিল, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে আলা-উদ্দিনের নিকট বাৎসরিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল।

দেবগিরি বিজয়ের গুরুত্ব

আলা-উদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল না। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম মুসলমান অভিযান। ভবিষ্যতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সূত্রপাত এই সময় হইতেই হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজগণের সামরিক দুর্বলতাও মুসলমান সুলতানদের নিকট এই সময় হইতেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবগিরি হইতে বিজয়গৌরবে আলা-উদ্দিন কারায় ফিরিয়া আসিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি তিনি দিল্লীর রাজভাণ্ডারে প্রেরণ না করিয়া নিজেই তাহা আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু আলা-উদ্দিনের এইরূপ স্বাধীন কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন জালাল-উদ্দিন উপলব্ধি করিলেন না। স্নেহান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার সভাসদ্‌গণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া আলা-উদ্দিনকে দেবগিরি অভিযানের জন্য স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কারায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে জালাল-উদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দিনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করা হইল। তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া উহা আলা-উদ্দিনের নিকট উপস্থিত করা হইল।* এইভাবে পিতৃকল্প স্নেহান্ধ পিতৃব্যকে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সাহায্যে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিন স্বয়ং দিল্লীর সুলতানপদ অধিকার করিলেন।

আলা-উদ্দিন কর্তৃক জালাল-উদ্দিনের প্রাণনাশ

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জালাল-উদ্দিনকে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলেন, কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই তাঁহাকে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। জালাল-উদ্দিনের অনুগত অভিজাতগণ আলা-উদ্দিনের উপর জালাল-উদ্দিনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন। জালাল-উদ্দিনের পত্নী মালিকা জাহান নিজ পুত্র কাদর্ খাঁ (Qadr Khan)-কে রুকন-উদ্দিন ইব্রাহিম উপাধিতে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর কোনপ্রকার সমর্থন না পাওয়ায় তাঁহার পক্ষে সিংহাসনলাভ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

তাঁহার সমস্যা

অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ

আলা-উদ্দিন অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণ উৎকোচদানে সন্তুষ্ট করিলেন। জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হইল। এইভাবে তিনি অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণকে নিজ পিতৃব্যের প্রাণনাশের কথা ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন।

* Vide, Camb. History of India, Vol. III. p 98.

তারপর আলা-উদ্দিন সুলতানের আর্কলি খাঁ, কাদর্ প্রভৃতি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বন্দী করিলেন এবং তাঁহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হান্‌সি দুর্গে নিক্ষেপ করিলেন। মালিকা জাহান এবং চক্ষু-উৎপাটিত অবস্থায় আহ্‌মদ চাপকে দিল্লীর কারাগারে কঠোর প্রহরাধীনে রাখা হইল। নিজ-সিংহাসন এইরূপে নিরঙ্কুশ করিয়া আলা-উদ্দিন যে অভিজাতগণ পূর্বে জালাল-উদ্দিনের অনুগত ছিলেন, কিন্তু পরে অর্থের লোভে আলা-উদ্দিনের পক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তিদানে ত্রুটি করিলেন না। কারণ, যাহারা অর্থের লোভে যে-কোন পক্ষ সমর্থনে রাজী হয় তাহারা যে বিশ্বাসভাজন নহে, একথা তাঁহার অজানা ছিল না।

সিংহাসনাধিকার নিষ্কণ্টককরণ

সিংহাসনাধিকার নিরঙ্কুশ হইলেও আলা-উদ্দিনের সমস্যার জটিলতার অবসান ঘটিল না। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, মোঙ্গল আক্রমণ, রাজপুতানা, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ, তুর্কী অভিজাতবর্গের বিরোধিতা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিল।

অপরাপর সমস্যা

মোঙ্গল আক্রমণ ও আলা-উদ্দিন (Mongal raids and Ala-ud-din) : মোঙ্গল আক্রমণ বহুদিন ধরিয়াই দিল্লীর সুলতানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া বারবার পরাজিত হইয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যাপারে আলা-উদ্দিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আলা-উদ্দিনের সিংহাসনারোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনকর্তা জাফর খাঁ জলন্ধরের নিকট মোঙ্গলদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ

প্রথম আক্রমণ (১২৯৬)

আলা-উদ্দিনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (১২৯৭) মোঙ্গলগণ তাহাদের নেতা সল্‌দি (Saldi)-র অধীনে অগ্রসর হইয়া দিল্লীর অনতিদূরে সিরি দুর্গটি অধিকার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এবারও তাহারা জাফর খাঁর হস্তে পরাজিত হয়। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা কুৎলুঘ্ খাজা দুই লক্ষ মোঙ্গল অনুচর লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। এবারও জাফর খাঁ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু তাঁহার সামরিক দক্ষতার ফলে মোঙ্গলবাহিনীর মনে যে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবত সেই কারণেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। জাফর খাঁর মৃত্যুতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার অসুবিধা বৃদ্ধি পাইলেও আলা-উদ্দিন তাহাতে খুশিই হইলেন, কারণ তিনি জাফর খাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলা-উদ্দিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

দ্বিতীয় আক্রমণ (১২৯৭)

তৃতীয় আক্রমণ (১২৯৯)

জাফর খাঁর মৃত্যু

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। এইবার তাহারা লাহোর-এর উত্তরে আমরোহা (Amroha) পর্যন্ত অগ্রসর হইলে সুলতানী সৈন্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু দুর্ধর্ষ মোঙ্গলগণ দমিবার পাত্র ছিল না। তাহারা ১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইক্‌বাল মন্দ্‌-এর নেতৃত্বে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আলা-উদ্দিন তাহাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সুলতানী সৈন্যের নিকট মোঙ্গল-বাহিনী পরাজিত হইল। ইক্‌বাল মন্দ যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং বহু সংখ্যক মোঙ্গল বন্দী হইল। এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়া মোঙ্গলগণ হিন্দুস্থান আক্রমণের নেশা ত্যাগ করিল। আলা-উদ্দিনের সেনাবাহিনীর সমরদক্ষতা ও পরাজিত মোঙ্গলবাহিনীর উপর নৃশংসতা মোঙ্গল নেতাদের মনে হিন্দুস্থান সম্পর্কে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিল।

চতুর্থ আক্রমণ (১৩০৪)

পঞ্চম ও সর্বশেষ আক্রমণ (১৩০৭-৮)

মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিয়া আলা-উদ্দিন রাজ্য-জয়ে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু মোঙ্গল জাতি ভবিষ্যতেও যাহাতে হিন্দুস্থান আক্রমণের সুযোগ না পায় সেজন্য তিনি প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং সামান ও দীপালপুর নামক স্থানে দুইটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। এই দুই স্থানে একমাত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি সেনাবাহিনী সর্বদা মোতায়েন রাখিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিককে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে তিনি একসারি দুর্গ নির্মাণ করাইলেন এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিলেন। এইভাবে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের জনসাধারণ যেমন শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ পাইল তেমনি আলা-উদ্দিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আলা-উদ্দিনের মোঙ্গল-নীতি

সামান ও দীপালপুরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে দুর্গ নির্মাণ

দিল্লীর উপকণ্ঠে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল 'নব-মুসলমান' বসবাস করিতেছিল তাহারা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইলেই উচ্চ রাজকর্মচারিপদে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সাধারণ সৈনিকের কাজ ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুজরাট হইতে ফিরিবার পথে আলা-উদ্দিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সকল 'নব-মুসলমান' উপস্থিত ছিল তাহারা একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে আলা-উদ্দিন তাহাদিগকে সেনাবাহিনী হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই ঘটনার ফলে নবমুসলমানদের অসন্তোষ আরও

নব-মুসলমানদের বিদ্রোহ

বৃদ্ধি পায়। তাহারা আলা-উদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে আলা-উদ্দিনের আদেশে এক দিনে ত্রিশ হাজার 'নব-মুসলমান'কে হত্যা করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল। উপরি-উক্তভাবে আলা-উদ্দিন খল্‌জী অভ্যন্তরীণ ও বাহিরাগত মোঙ্গল-সমস্যার সমাধান করিলেন।

ত্রিশ হাজার 'নব-মুসলমান' হত্যা

আলা-উদ্দিনের দিগ্বিজয় (Conquests of Ala-ud-din) : প্রথম জীবনে মালব ও দেবগিরির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া আলা-উদ্দিনের রাজ্যজয়লিপ্সা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পৃথিবী-বিজেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকেন। ধর্মের দিক দিয়াও তিনি নিজেকে ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের সহিত তুলনা করিতেন এবং দিগ্বিজয় ও এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন, এই উভয় প্রকার বিজয়ের আশা পোষণ করিতেন।* ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণীর রচনা হইতে জানা যায় যে, দিগ্বিজয়ী ও ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আলা-উদ্দিন তাঁহার কটোয়াল নিজাম্-উল্-মুল্ক-এর মতামত জানিতে চাহিলে স্পষ্টবক্তা নিজাম্-উল্-মুল্ক আলা-উদ্দিনকে ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি আলা-উদ্দিনকে পৃথিবী বিজয়ের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতের ঐক্য, মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সুদক্ষ রাজকর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।† কটোয়াল নিজাম্-উল্-মুল্ক-এর এই সকল উপদেশ আলা-উদ্দিন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেও আলা-উদ্দিন নিজেকে আলেক-জাণ্ডারের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজ মুদ্রায় 'দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার' উপাধি মুদ্রিত করিয়া উচ্চাভিলাষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা : দিগ্বিজয় ও এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন

কটোয়াল নিজাম্-উল্-মুল্ক-এর উপদেশ

'দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডার' উপাধি ধারণ

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে গুজরাট জয়ে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে গুজরাটের রাজা ছিলেন কর্ণদেব। উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁ গুজরাটের রাজধানী অনহিল্‌বার আক্রমণ করিলে কর্ণদেব কাপুরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার রাণী কমলাদেবী সুলতানী সৈন্যের হস্তে ধরা পড়িলেন। সুলতানের সেনাপতিদ্বয়ের হস্তে গুজরাটের

গুজরাট জয় (১২৯৭)

* "Ala-ud-din......dreamed of spiritual as well as material conquests. In the latter he sought to surpass Alexander of Macedon and in the former Muhammad." *The Cambridge History of India*, Vol. III, p. 104.

† Vide, *The Cambridge History of India*, Vol. III, pp. 101-2; *An Advanced History of India*, p. 301 Ishwari Prasad, *History of Mediaeval India*, pp. 226-27.

রাজধানী অনহিলবার বিধ্বস্ত হইল। গুজরাট জয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া নুসরৎ খাঁ ক্যাম্বে (Cambay)-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে বণিকদের নিকট হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন আদায় করিয়া লইয়া আসিলেন। ঐ স্থান হইতে কাফুর নামে এক অতি সুদর্শন খোজা (eunuch)-কেও লইয়া আসা হইল। ইনিই আলা-উদ্দিনের বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর নামে ইতিহাসে পরিচিত।

ক্যাম্বে আক্রমণ

১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন রণথম্ভোর বিজয়ে উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কুতব-উদ্দিন সর্বপ্রথম রণথম্ভোর জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রণথম্ভোর স্বাধীন হইয়া গেলে ইলতুৎমিস পুনরায় উহা জয় করেন। কিন্তু ইহার পরও রাজপুতগণ রণথম্ভোর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়। আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে হামীর দেব ছিলেন রণথম্ভোরের রাণা। তিনি কয়েকজন বিদ্রোহী নব-মুসলমানকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইজন্য আলা-উদ্দিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। হামীর দেবের বিরুদ্ধে উলুঘ্ খাঁ ও নুসরৎ খাঁর অভিযান বিফল হইলে আলা-উদ্দিন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্ভোর আক্রমণকালে পথিমধ্যে তিলপৎ নামক স্থানে আলা-উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আকৎ খাঁ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। আলা-উদ্দিন আকৎ খাঁ কর্তৃক আহত হইলেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। আকৎ খাঁ ধৃত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রণথম্ভোর জয় (১২৯৯)

রণথম্ভোর জয় করিতে সমর্থ হইয়া আলা-উদ্দিন রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবার আক্রমণে সাহসী হইলেন। মেবার রাজ্য ছিল পাহাড় ও ঘন জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। স্বভাবতই মেবার তথা চিতোর জয় করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু আলা-উদ্দিন ইহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। চিতোর আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গুহিলা রাজপুত রাণা রতন সিংহের অনন্যাসুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করা।* পদ্মিনী-সংক্রান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া ডক্টর কে. এস. লাল, জি. এইচ. ওঝা প্রভৃতি আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌গণ মনে করিয়া থাকেন। রতন সিংহ বীরদর্পে আলা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও ধৃত হইলেন। কিন্তু রাজপুতগণ এক অভিনব কৌশলে তাঁহাকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিল। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। রাজপুত

চিতোর জয় (১৩০৩)

* "The immediate cause of the invasion was his (Ala-ud-din's) passionate desire to obtain possession of Padmini, the peerless queen of Rana Ratan Singh, renowned for her beauty all over Hindustan." Ishwari Prasad, *History of Mediaeval India* p. 230 : for Feristah's account also see footnote pp. 230-31.

বীর গোরা ও বাদল অসাধারণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিশাল সুলতানী বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ 'জৌহর' অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এইভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাঁহারা সুলতানী সৈন্যের হস্তে বন্দী হওয়ার অপমান হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।* আলা-উদ্দিন নিজ পুত্র খিজির খাঁকে চিতোরের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া আসিলেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খিজির খাঁ চিতোরে রহিলেন। কিন্তু ঐ বৎসর রাজপুতদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া আসিলেন। অতঃপর জালোর-এর মালবদেবকে আলা-উদ্দিন চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইনি কয়েক বৎসর পর রাণা হাম্মীর দেবের নিকট চিতোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে।

চিতোর জয় করিয়া আলা-উদ্দিন মালবদেশের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। মালবরাজ রায় মাহলক দেব (Rai Mahlak Deva) আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নিজদেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে আলা-উদ্দিন তাঁহার একান্ত সচিব (Confidential Chamberlain) আইন-উল্-মুল্ককে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

মালব জয়

মালব জয়ের পর আলা-উদ্দিন উজ্জয়িনী, ধারা, চান্দেশ্বরী ও মাণ্ডু জয় করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। উত্তর-ভারত জয় শেষ করিয়া আলা-উদ্দিন দক্ষিণ-ভারত জয়ে মনোযোগী হইলেন। ইতিমধ্যে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র ইলিচপুরের জন্য প্রতিশ্রুত

উজ্জয়িনী, ধারা, চান্দেশ্বরী ও মাণ্ডু জয়

* "The funeral pyre was lighted within the great subterranean retreat in chambers impervious to the light of the day and the defenders of Chitor beheld in procession the queens, their own wives and daughters, to the number of several thousands. The fair Padmini closed the throng...They were conveyed to the cavern, and the opening closed upon them, leaving them to find security from dishonour in the devouring element." Vide, *An Advanced History of India*, pp. 282-33. Also vide A. L. Srivastava: "*The Sultanate of Delhi*, p. 167. The episode of Padmini has received a great deal of prominence in connection with Alauddin's conquest of Chitor. The bardic chronicles of Rajputana represent the invasion of Chitor as solely due to the Sultan's desire to get possession of Padmini, the beautiful queen of Rana Ratan Singha of Chitor and they have woven round it a long tale of romance, heroism and treachery, too well-known to need any repetitions. Later writers like Abu'-l-Fazl, Hazi-ud-Dabir, Ferishta, and Neusi have accepted the story, but many modern writers are inclined, to reject it altogether." *The Delhi Sultanate*—Bharatiya Vidyabhaban Publication, Vol. VI, pp. 26-27.

বাৎসরিক করদান বন্ধ করিলে আলা-উদ্দিন মালিক কাফুরকে দেবগিরির বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। কাফুরের হস্তে পরাজিত হইয়া রামচন্দ্র আলা-উদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযান

ঐ সময়ে কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন বরঙ্গলের রাজা। দেবগিরির পতনের সংবাদ পাইয়া প্রতাপরুদ্রদেব মালিক কাফুরের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মালিক কাফুরের সমরকুশলতার সহিত যুঝিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। ইহা ভিন্ন, বাৎসরিক করদানে স্বীকৃতি এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন, বহুসংখ্যক হাতী ও ঘোড়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতেও তিনি বাধ্য হইলেন।

বরঙ্গল রাজ্যের বশ্যতা

বরঙ্গল রাজ্য জয় করিয়া মালিক কাফুর হোয়সলরাজ বীরবল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করিলেন। তিনিও দেশ রক্ষার্থ যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং যাবতীয় সঞ্চিত ধনরত্ন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিতে এবং দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

হোয়সল রাজ্যের বশ্যতা

পাণ্ড্য রাজ্যে ঐ সময়ে রাজপরিবারের মধ্যে এক ভ্রাতৃবিরোধ চলিতেছিল। এই সুযোগে অতি সহজেই মালিক কাফুর পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার করিলেন।

পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার

পাণ্ড্য রাজ্য জয়ের পর মালিক কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে (১৩২২) দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শংকরদেব রাজা হইলেন। তিনি পিতৃ-প্রতিশ্রুত করদান বন্ধ করিলে মালিক কাফুর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্যও আলা-উদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আলা-উদ্দিন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের মর্যাদা লাভ করিলেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রগতি : দেবগিরির বিরুদ্ধে অভিযান

আলা-উদ্দিনের শাসন (Administration of Ala-ud-din) : আলা-উদ্দিনের শাসন-নীতি পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতানদের শাসন-নীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া আলা-উদ্দিন এক নূতন শাসন-পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নিজে একজন অতি গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি ধর্মের দ্বারা নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না। স্বীয় রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা দ্বারা তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন, শাসনকার্যে কাজী বা উলেমাদের মতামত বা নির্দেশের তিনি ধার ধারিতেন না। তাঁহার শাসন-পদ্ধতির মূলকথা ছিল সুলতানের প্রাধান্য সর্বময় করিয়া তোলা। শাসনকার্যে সুলতানের আদেশ আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে, ধর্মের আইন শাসনকার্যে সম্পূর্ণ অচল

তাঁহার শাসন-নীতি

বলিয়া তিনি মনে করিতেন। স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা চালু রাখাই ছিল তাঁহার

শাসনের মূল নীতি। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বিদ্রোহ, সুলতানের আদেশ অমান্য এবং কর্তব্য কার্যে অবহেলা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আলা-উদ্দিনের শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী

করিয়া তুলিয়াছিল। সুদৃঢ় শাসন বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বনে তিনি ন্যায়-অন্যায় বা ধর্মাধর্মের ধার ধারিতেন না।*

আলা-উদ্দিন কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী সামরিক প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন, এমন নহে। শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিবার মত রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। আকৎ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও হাজী মৌলার বিদ্রোহ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহী মনোভাবের পশ্চাতে আলা-উদ্দিন চারিটি বিশেষ কারণ নিহিত আছে উপলব্ধি করিলেন। এইগুলি হইল অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থবল, শাসনকার্য সম্পাদনে অবহেলা, অত্যধিক মদ্যপান এবং পরস্পর মেলামেশার অবাধ সুযোগ। এই সকল কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে আলা-উদ্দিন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন

প্রথমত, আলা-উদ্দিন বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। অভিজাত সম্প্রদায় বা রাজকর্মচারিগণ কোনপ্রকার সন্দেহাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে সেই সংবাদ গোপনে সুলতানের কর্ণগোচর করা ছিল গুপ্তচরদের কর্তব্য। গুপ্তচরগণের নিকট হইতে কাহারও সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহজনক কার্য-কলাপের সংবাদ পাইলে সুলতান তাহার বিরুদ্ধে সমুচিত শাস্তিবিধান করিতেন।

গুপ্তচর নিয়োগ

দ্বিতীয়ত, রাজকর্মচারিগণকে জায়গীর দানের প্রথা তিনি উঠাইয়া দিলেন। সরকারী ভাতা বা অপর কোন সাহায্য দান তিনি বন্ধ করিলেন। যে-কোন অজুহাতে প্রজাবর্গের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল। অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেই বিদ্রোহের মনোবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে, এই ছিল আলা-উদ্দিনের ধারণা। এজন্য তিনি ধনবান হিন্দুমাত্রকেই নানাভাবে শোষণ করিয়া তাহাদের অর্থবল নাশ করিলেন।† মোরল্যান্ড (Moreland)-এর মতে 'হিন্দু' কথাটি বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইত। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সুযৌক্তিক মনে করেন না।‡ দোয়াব

জায়গীর প্রথা, ভাতা, সরকারী সাহায্য প্রভৃতির বিলোপ সাধন

* "Men are heedless, disrespectful, and disobey my commands; I am then compelled to be severe to bring them to obedience. I do not know whether this is lawful or unlawful; whatever I think to be for the good of the state, or suitable for the emergency that I decree, and as for what may happen to me on the approaching day of judgment that I know not." *Alauddin to Qazi Mughis-ud-din*. Vide, Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 243.

† "No Hindu could hold up his head, and in his house no sign of gold or silver or any superfluity was to be seen." Vide, Smith; *The Oxford History of India*, p. 234.

‡ Vide, Moreland: *Agrarian System of Moslem India*, p. 32 fn.

"Moreland adds that the Hindu refers to the upper classes and not the peasants, but this interpretation is at least doubtful." Vide, *The Delhi Sultanate*, Bharatiya Vidyabhaban, p. 24.

অঞ্চলের হিন্দু কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইতে লাগিল। আমীর, মালিক, মহাজন প্রভৃতি কাহারও হাতে যাহাতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে তিনি সেই ব্যবস্থা করিলেন।

রাজকর্মচারী তথা অভিজাতবর্গের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ

তৃতীয়ত, তিনি মদ্যপান বা অপর কোন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। সুলতান নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সুলতানের অনুমতি ভিন্ন সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে অভিজাত শ্রেণী তথা রাজকর্মচারিবৃন্দের অবাধ মেলামেশার যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করা হইল। ফলে, ষড়যন্ত্রের সুযোগও আর রহিল না।

সেনাবাহিনীর সংগঠন

চতুর্থত, আলা-উদ্দিন অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সেনাবাহিনীর প্রসার সাধন করিলেন। সেনাবাহিনীকে নূতন পদ্ধতিতে সংগঠিত ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তিনি খলজী সামরিক পদ্ধতির (Khalji militarism) গোড়াপত্তন করিলেন। বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়-সংকুলান করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি সৈনিকদের অতি সামান্য বেতনেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত ধনরত্নের প্রাচুর্যের ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জিনিসপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সৈনিকগণ অল্প বেতনেই যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে সেজন্য তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যথা

জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

চাউল, আটা, চিনি, তেল, কাপড় প্রভৃতির দাম বাঁধিয়া দিলেন। ইহাতে সৈনিক ও অপরাপর বেতনভোগী ব্যক্তি মাত্রেরই সুবিধা হইল বটে, কিন্তু কৃষকদের দুর্গতির সীমা রহিল না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের* অধিক কেহ লইতে সাহস পাইত না। সুলতানের ভয়ে রাজকর্মচারিগণও সততা রক্ষা

* Wheat	7½ Jital[1] per maund
Barley	4 " " "
Paddy	5 " " "
Pulse	5 " " "
Sugar	1½ " " seer
Gur	1½ " " 3 seers
Butter	1 " " 3 seers
Salt	5 " " 2½ maunds
Oil sesamum	1 " " 2½ seers
Mash	5 " " maund
Moth	3 " " maund

1. Jital = $\frac{1}{64}$ of a silver rupee, i.e., 1½ farthing more or less. Vide, Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 248.

করিয়া চলিতেন। ফলে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছিল। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে আলা-উদ্দিনই সর্বপ্রথম চালু করিয়াছিলেন।

উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব দান: সরকারী গুদামে ফসল মজুত রাখিবার ব্যবস্থা

পঞ্চমত, রাজস্ব উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। রাজস্ব হিসাবে গৃহীত এই ফসল কোন আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী গুদামে মজুত রাখা হইত। সরকার ভিন্ন অপর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যবসায়ীদের উপর কড়া নজর

ষষ্ঠত, ওজনে কম দিয়া ব্যবসায়িগণ যাহাতে কাহাকেও ঠকাইতে না পারে সেজন্য নিয়ম করা হইয়াছিল যে, বিক্রেতা ওজনে যে পরিমাণ জিনিস কম দিবে ঠিক সেই পরিমাণ মাংস তাহার শরীর হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে, ফলে কেহই ওজন কম দিতে সাহস পাইত না।

সামগ্রী মজুত রাখা নিষিদ্ধ

সপ্তমত, ব্যবসায়ী মাত্রকেই সরকারের নিকট নাম রেজেস্ট্রী করিতে হইত; ভবিষ্যতে বেশী মুনাফার লোভে কাহারো কোন জিনিস মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

সমালোচনা (Criticism): আলা-উদ্দিনের শাসন-সংস্কার, তাঁহার সামরিক সংগঠন প্রভৃতির ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। বহিরাগত মোঙ্গল শত্রুর আক্রমণও প্রতিহত হইল এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী রাজগণ ও অভিজাত শ্রেণী সুলতানের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিতে লাগিলেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ হইল, কারণ একমাত্র কৃষক শ্রেণী ভিন্ন অপরাপর সকলের পক্ষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক হইয়াছিল। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের মূল্য অতি অল্প ছিল বলিয়া কৃষকদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা—বহিরাগত শত্রু হইতে দেশরক্ষা

স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্ব: রাজকর্মচারী বা প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব

আলা-উদ্দিন আমলা শ্রেণীর মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ফলে শাসনকার্যে অবহেলা করিতে কেহ সাহসী হইত না। সুলতানের আদেশ অমান্য করার শাস্তি যেমন ছিল কঠোর তেমনি ছিল নির্মম। বলপূর্বক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার পক্ষে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও প্রজা ও রাজকর্মচারিবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর সুলতানের শক্তি নির্ভর করিত না বলিয়াই আলা-উদ্দিনের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহার শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। মালিক কাফুর সেই সুযোগে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া আলা-উদ্দিনকে হাতের পুতুলে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

হিন্দুরাজগণের প্রতি আলা-উদ্দিনের স্বৈরাচারী ব্যবহার, তাঁহাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণ স্বভাবতই সুলতানের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক আনুগত্যের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। অনুগত রাজগণের প্রতি সম্রাটসুলভ উদারতা আলা-উদ্দিন প্রদর্শন

করেন নাই, ফলে হিন্দুরাজগণ দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতেন। হিন্দু জনসাধারণের উপর অসহনীয় করভার স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে দরিদ্র করিয়া আলা-উদ্দিন নিজ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লাঞ্ছিত হিন্দুগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিবার সুযোগ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে সুলতানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্য এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় আলা-উদ্দিনের শাসনের মূলভিত্তি যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, বলা বাহুল্য। তাঁহার রাজত্বকালের শেষদিকে গুজরাট, চিতোর, দেবগিরি প্রভৃতি দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল।

হিন্দুরাজগণ ও হিন্দু প্রজাবর্গের বিদ্বেষ

নব-মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, আমীর ও মালিক তথা পদস্থ রাজকর্মচারিবৃন্দের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব এবং তাঁহাদের অবাধ জীবনযাত্রার অধিকারনাশ আলা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজকর্মচারিগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বাধীনে থাকেন সেই কারণে আলা-উদ্দিন মুসলমান সমাজের নিম্ন পর্যায় হইতে বহু ব্যক্তিকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি অখণ্ড আনুগত্য লাভ করিলেও তাঁহার অবর্তমানে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির পথ বন্ধ হইয়াছিল। আপাত-দৃষ্টিতে আলা-উদ্দিনের শাসন সাফল্যলাভ করিলেও এই সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলি দুর্বলতা লুক্কায়িত ছিল এবং তাঁহার শেষ জীবনে এগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সংস্কারের কোন চিহ্নই আর ছিল না।

নব-মুসলমান ও রাজকর্মচারীদের প্রতি কঠোরতা

আলা-উদ্দিনের সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যানুরাগ (Ala-ud-din's Patronage of literature, art and architecture): আলা-উদ্দিন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্যানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার আমলে আমীর খসরু ও হাসানের ন্যায় কবি ও বিদ্বান ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। খসরু ও হাসান আলা-উদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান পদলাভের পর আলা-উদ্দিন ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা

আলা-উদ্দিন শিল্পকলা এবং স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে আলাই দুর্গটি নির্মাণ-কৌশলের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আদেশে কুতব মসজিদটি আরও বড় করিয়া নির্মাণ শুরু হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি একটি নূতন মিনার নির্মাণ শুরু করিয়াছিলেন। এই মিনারটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে ইহা কুতব মিনারের প্রায় দ্বিগুণ হইত বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু এই মিনারটিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

আলা-উদ্দিনের শেষ জীবন (Last days of Ala-ud-din Khalji) : ভাগ্যদেবী চঞ্চলা। আলা-উদ্দিনের ভাগ্যও চিরদিন সমান রহিল না। শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞান লোপ পাইল। সুযোগ বুঝিয়া মালিক কাফুর আলা-উদ্দিনের মন তাঁহার পত্নী ও পুত্রদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিলেন। এইভাবে কাফুর শাসনকার্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজ হস্তগত করিলেন। বৃদ্ধ সুলতান আলা-উদ্দিন খল্‌জী মালিক কাফুরের হাতে ক্রীড়নকস্বরূপ হইলেন। পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনের নৃশংস হত্যার শাস্তিস্বরূপই যেন আলা-উদ্দিন বৃদ্ধ বয়সে দৈহিক এবং মানসিক যাতনায় ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৩১৬)।

দৈহিক ও মানসিক যাতনা : মালিক কাফুরের প্রাধান্য

মৃত্যু (১৩১৬)

আলা-উদ্দিনের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Ala-ud-din) : আলা-উদ্দিনের কৃতিত্ব বিচারে মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইব্‌নু বতুতা আলা-উদ্দিনকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানগণের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ্‌ ইব্‌নু বতুতার এই উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং প্রকৃত ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নহে বলিয়া মনে করেন। আলা-উদ্দিনের সুলতান পদ লাভের ইতিহাস বা তাঁহার রাজত্বকালের কার্যকলাপ দ্বারা ইব্‌নু বতুতার এই 'অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক' উক্তি সমর্থিত হয় না।* ডক্টর স্মিথ্‌ বলেন যে, জিয়া-উদ্দিন বরণী আলা-উদ্দিনের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনায় বরণী আলা-উদ্দিনকে নিষ্ঠুর চক্রান্তকারী ও পাপাচারী সুলতান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বরণীর মতে আলা-উদ্দিন মিশরের ফ্যারাওগণের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর এবং নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাতে অধিকতর সিদ্ধহস্ত ছিলেন।†

ইব্‌নু বতুতার উক্তি

ডক্টর স্মিথের মন্তব্য

জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনা

উভয় মতের আংশিক সত্যতা

ইব্‌নু বতুতা ও জিয়া-উদ্দিন বরণীর মত পরস্পর-বিরোধী বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে উভয়ের মত-ই আংশিকভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

---

* "The African traveller Ibn Batuta in the fourteenth century expressed the opinion that Ala-ud-din deserved to be considered *one of the best Sultans.* That somewhat surprising verdict is not justified either by the manner in which Ala-ud-din attained power or by history of his acts as Sultan." Smith, *The Oxford History of India*, pp. 231-32.

† "Zia-ud-din Barani, the excellent historian who gives the fullest account of his reign, justly dwells on his *crafty cruelty* and his addiction to disgusting vice. *He shed, we are told, more innocent blood than ever Pharaoh was guilty of* and he did not *escape the retribution for the blood of his patron.*" Ibid, p. 232.

আলা-উদ্দিন ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন। নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে তিনি ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারিতেন না। নিজ পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করিতে তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। বহুসংখ্যক নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া নিজ সিংহাসনাধিকার নিরঙ্কুশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, সন্দিগ্ধ মনোভাব, পরের গুণ গ্রহণ না করা প্রভৃতি ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন যেমন ক্ষণক্রোধী ও উদ্ধত তেমনি ছিলেন অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু। তাঁহারই আদেশে একদিনে ত্রিশ হাজার নব-মুসলমানের প্রাণনাশ করা হইয়াছিল।

আলা-উদ্দিনের নিষ্ঠুরতা

অভিজাত শ্রেণীর অনেকেরই সাহায্য-সহায়তায় আলা-উদ্দিন সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন-আরোহণের পর তিনি সেই সকল ব্যক্তির ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কৃতজ্ঞতার লেশও তাঁহার অন্তরে ছিল না। জাফর খাঁ মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আলা-উদ্দিনের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জাফর খাঁ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে যখন প্রাণ হারাইলেন তখন আলা-উদ্দিন দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। জাফর খাঁর দক্ষতায় তিনি স্বভাবতই ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরণী আলা-উদ্দিনকে নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ফেরিস্তার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলতান হওয়ার পর আলা-উদ্দিন ফারসী গ্রন্থাদি পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার অকৃতজ্ঞতা

বিত্তশালী হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে যাহাতে কোন প্রকার ধন-দৌলত সঞ্চিত না হইতে পারে, তিনি সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দু কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি সকল জিনিসপত্রের মূল্য এমনভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, কৃষক ও অপরাপর উৎপাদনকারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না।

অত্যাচারী শাসক

উপরি-উক্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া জিয়া-উদ্দিন বরণী আলা-উদ্দিনকে নিষ্ঠুর, পাপাচারী, অকৃতজ্ঞ এবং অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মন্তব্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, বলা বাহুল্য।

জিয়া-উদ্দিন বরণীর মন্তব্যের সত্যাসত্য

তথাপি আলা-উদ্দিনের চরিত্র ও শাসনের অপর একটি দিকও ছিল। তিনি একজন অসীম সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার প্রতিটি সামরিক অভিযানই সফল হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে গুজরাট, মালব, চিতোর, রণথম্ভোর, উজ্জয়িনী, মণ্ডু, ধার, চান্দেরী প্রভৃতি রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র,

চরিত্র ও শাসনের বৈশিষ্ট্য

মাদুরা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। গিয়াস-উদ্দিন বলবন যে মুসলমান সামরিক পদ্ধতির গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন আলা-উদ্দিন উহার চরম উন্নতিসাধন করিয়া ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্য মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আলা-উদ্দিন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি কাজী, উলেমা প্রভৃতির নির্দেশ মানিতেন না। নিজে গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি ছিল সুদৃঢ় ও সুদক্ষ শাসন স্থাপন করা। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি সুলতানী শাসনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায় যাহাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে না পারে সেইজন্য তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং মদ্যপান, অবাধ মেলামেশা, বিনা অনুমতিতে বিবাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তিনি দেশের বিভিন্ন অংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

সুলতানী রাজত্বের নিরাপত্তা বিধান

ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে আমীর খসরু, হাসান প্রভৃতির ন্যায় কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছিল। আলা-উদ্দিন স্বয়ং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি কুতব মসজিদটিকে আরও বড় করিবার এবং কুতব মিনারের দ্বিগুণ আকারের একটি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করাইয়াছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

আলা-উদ্দিনের চরিত্রের এই দিকটি দেখিলে এবং তাঁহার সাফল্যের নিরপেক্ষ বিচার করিলে তাঁহাকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না। মানুষ হিসাবে আলা-উদ্দিন সংকীর্ণতা ও নীচতার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজেতা ও শাসক হিসাবে তাঁহার স্থান যে উচ্চে ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমরকুশল নৃপতি সামরিক সংগঠক, দিগ্বিজয়ী বীর ও সুদক্ষ শাসক হিসাবে আলা-উদ্দিন নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে একথা স্বীকার্য যে, জিয়া-উদ্দিন বরণী ও ইব্‌ন্ বতুতার পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য একটি অপরটির পরিপূরক মাত্র; উভয় মন্তব্য আলা-উদ্দিনের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

মানুষ হিসাবে হীন হইলেও শাসক, সামরিক সংগঠক ও বিজেতা হিসাবে দক্ষতা

বরণী ও বতুতার মন্তব্য পরস্পর পরিপূরক

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খল্‌জী শাসন (Khalji rule after Ala-ud-din): আলা-উদ্দিনের মৃত্যুর সময়ের সুযোগ লইয়া মালিক কাফুর শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি খিজির খাঁর বিরুদ্ধে আলা-উদ্দিনের মন বিষাইয়

দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিহাব-উদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকার দিয়া যাইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। আলা-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র শিহাব-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মালিক কাফুর যাবতীয় শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। খিজির খাঁ ও সাদি খাঁ—অর্থাৎ আলা-উদ্দিনের প্রথম পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং আলা-উদ্দিনের প্রথমা পত্নীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারক খাঁকেও বন্দী করা হইল। তাঁহারও চক্ষু উৎপাটন করিবার ইচ্ছা কাফুরের ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাফুরের ঔদ্ধত্য এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, খল্‌জী সুলতানের অনুরক্ত অভিজাত ও দাসগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারককে সিংহাসনে স্থাপন করিল। মুবারক প্রথমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাব-উদ্দিন উমর-এর প্রতিনিধিরূপে শাসন শুরু করিয়া সামান্য কয়েক দিন পরেই তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বয়ং কুতব-উদ্দিন মুবারক শাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

কাফুরের অত্যাচারী শাসন

মুবারক শাহ্-এর সিংহাসন লাভ

কুতব-উদ্দিন মুবারক শাহ, ১৩১৬-২০ (Qutab-ud-din Mubarak Shah): সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়া কুতব-উদ্দিন মুবারক প্রথমে শাসনক্ষমতার পরিচয় দিলেন বটে এবং আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে যে-সকল কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিয়া তিনি সাধারণ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে বন্দী মাত্রকেই মুক্তি দিলেন, আমীর ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাহাদের ভূ-সম্পত্তি আলা-উদ্দিন বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন তাহাও ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃতজ্ঞতার স্থলে অকৃতজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হইল। সুলতানের উদারতাকে দুর্বলতা মনে করিয়া সর্বত্র সুলতানের আদেশ-অমান্য শুরু হইল। সুলতান মুবারক শাহ্‌ও ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। তিনি আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানে রত হইলেন। তিনি খুসরুভ্ খাঁ নামে এক নীচ বংশসম্ভূত ব্যক্তির অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে প্রধান উজির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সাধারণ্যে শ্রদ্ধার সৃষ্টি

মুবারক শাহের অকর্মণ্যতা

মুবারক শাহ্-এর আমলে গুজরাট ও দেবগিরিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে আইন্-উল্-মুল্‌ক গুজরাটের বিদ্রোহ এবং সুলতান স্বয়ং দেবগিরিতে বিদ্রোহ দমন করিলেন। সৌভাগ্যবশত মুবারক শাহের আমলে কোন মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে নাই, নতুবা ভারতবাসীর দুর্দশার অন্ত থাকিত না। যাহা হউক, দেবগিরি অভিযানের সাফল্যে মুবারকের ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ইসলাম জগতের প্রধান নেতা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করা দূরের কথা, স্বয়ং খলিফার 'অল্ ওয়াসিক্ বিল্লাহ্', উপাধি ধারণ করিলেন। কিন্তু অধিককাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে খুস্‌রুভ্-এর

গুজরাট ও দেবগিরির বিদ্রোহ দমন

প্ররোচনায় মুবারক শাহ্‌কে হত্যা করা হইল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে খলজী বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিল।

খসরভ্ (Khusrav): মুবরাক শাহের হত্যার পর খুস্‌রভ্ নাসির-উদ্দিন খুস্‌রভ্ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। পাঞ্জাবের দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক অপরাপর অভিজাতবর্গের সহায়তা লাভ করিয়া খুস্‌রভ্ শাহ্‌কে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন। আলা-উদ্দিনের কোন বংশধর না থাকায় অভিজাতগণের অনুরোধে গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০)।

চতুর্থ অধ্যায়

তুঘ্‌লক বংশ

(The Tughluqs)

গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক, ১৩২০-২৫ (Ghiyas-ud-din Tughluq) : দাস বংশের অবসানের পর জালাল-উদ্দিন যেমন দিল্লীর সুলতানী শাসন রক্ষাকল্পে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ খল্‌জী বংশের অবসানে সুলতানী শাসনের এক সংকট মুহূর্তে গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল-উদ্দিনের ন্যায় তিনিও বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গিয়াস-উদ্দিন বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার সাহস ও মানসিক বলের অভাব ছিল না। অল্প কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি আলা-উদ্দিন খল্‌জীর আইন-কানুনের মধ্যে যেগুলি দেশের প্রকৃত মঙ্গলজনক ছিল সেগুলি পুনরায় কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কী। স্বভাবতই অসংখ্য তুর্কী মালিক, আমীর-ওমরাহ্‌গণের আনুগত্য লাভ করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইল।

বৃদ্ধ বয়সে গিয়াস-উদ্দিনের সিংহাসন-লাভ

খল্‌জী বংশের প্রতি আনুগত্যপূর্ণভাবে যে-সকল কর্মচারী কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন গিয়াস-উদ্দিন তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে জায়গীর হিসাবে জমি দান করিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও তিনি উদার ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। নিজ পুত্র ফকর্‌-উদ্দিন মহম্মদ জুনা খাঁকে তিনি 'উলুঘ্‌ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কাহারও ন্যায্য দাবি তিনি অস্বীকার করিলেন না। খুস্‌রু শাহ্‌-এর রাজত্বকালে অথবা আলা-উদ্দিনের কঠোর আইনের প্রয়োগের ফলে যে-সকল ব্যক্তি সম্পত্তি হারাইয়াছিল গিয়াস-উদ্দিন তাহাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার উদারতা

কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি সেচের ব্যবস্থা করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করাইয়া প্রয়োজনবোধে কৃষকগণ যাহাতে দস্যুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিলেন। রাস্তা-ঘাট দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে নিরাপদ করিলেন। বড় বড় উদ্যান তিনি তৈয়ার করাইলেন। উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি-ই হইল রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। বলপূর্বক অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারিলেও তাহাতে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া বরঞ্চ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এই কথা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারিগণকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

কৃষি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতির উন্নতি-বিধান ; দস্যু-তস্করের উপদ্রব নিবারণ

হিন্দুদের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি আলা-উদ্দিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

ডাক চলাচলের ব্যবস্থা

সরকারী ডাক-চলাচলের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। ঘোড়ার পিঠে করিয়া এবং লোক মারফত ডাক একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল।

তাঁহার চরিত্র

গিয়াস-উদ্দিন ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ধর্মের অনুশাসন তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিতেন। তিনি নিজে মদ্য স্পর্শ করিতেন না এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমানদের মদ্যপান ও মদ প্রস্তুত করাও নিষিদ্ধ ছিল। গিয়াস্-উদ্দিন ছিলেন আড়ম্বরহীন, সদাশয় ও সরলপ্রাণ ব্যক্তি, সুলতান-পদের মর্যাদার অহংকার তাঁহার ছিল না।

বরঙ্গল পুনরধিকার

সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল মধ্যেই গিয়াস-উদ্দিন কাকতীয় বংশের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে পুত্র জুনা খাঁকে এক সামরিক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুবারক শাহ্-এর রাজত্বের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রতাপরুদ্রদেব বরঙ্গলের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রথম অভিযান সফল না হইলেও দ্বিতীয় অভিযানে জুনা খাঁ প্রতাপরুদ্রদেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে, বরঙ্গল দিল্লীর সুলতানের আনুগত্যাধীন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই কাকতীয় বংশের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা চিরতরে লোপ পায়।

বাংলায় সুলতানী আধিপত্য পুনঃস্থাপন

জুনা খাঁ যখন দাক্ষিণাত্যে কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেবকে দমন করিতে ব্যস্ত তখন মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। মোঙ্গলবাহিনী অবশ্য অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। প্রায় এই সময়েই বাংলাদেশের সিংহাসন লইয়া এক আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। শামস্-উদ্দিন ফিরুজের পুত্র শিহাব-উদ্দিন, নাসির-উদ্দিন ও বাহাদুর-এর মধ্যে কলহ দেখা দিলে শিহাব-উদ্দিন ও নাসির-উদ্দিন গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্লকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানের আধিপত্য নামেমাত্রই স্বীকার করিত, প্রকৃতক্ষেত্রে বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। গিয়াস্-উদ্দিন তুঘ্লক সুযোগ বুঝিয়া বাংলাদেশে দিল্লীর প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুত্র জুনা খাঁকে দিল্লীতে প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বাহাদুর শাহ্ পরাজিত হইলেন, নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। ফলে, বাংলাদেশ দিল্লীর আধিপত্যাধীনে আসিল।

তিরহুত জয়

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গিয়াস-উদ্দিন তিরহুতের রাজা হরিসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া সেই রাজ্য দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্যাধীনে আনিলেন।

গিয়াস-উদ্দিন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে দিল্লীর ছয় মাইল দূরে আফগানপুর নামক স্থানে পুত্র জুনা খাঁ পিতার সম্বর্ধনার জন্য একটি তোরণ নির্মাণ করান। গিয়াস-উদ্দিন ঐ তোরণের নিকটবর্তী হইলে উহা ধসিয়া পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইব্‌ন্ বতুতা, আবুল-ফজ্‌ল, নিজাম-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ, বদাউনী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই তোরণ ধসিয়া পড়িবার পশ্চাতে জুনা খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া মনে করেন। গিয়াস-উদ্দিনের এইভাবে মৃত্যু ঘটিলে (১৩২৫) জুনা খাঁ 'মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক' উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াস-উদ্দিনের মৃত্যু (১৩২৫)

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক, ১৩২৫-৬১ (Muhammad-bin-Tughluq): আদর্শবাদী মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতানৈক্য রহিয়াছে, অপর কোন সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে এতটা অনৈক্য আছে কিনা সন্দেহ। স্টেন্‌লি লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) তাঁহাকে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুলতানদের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ (Ishwari Prasad)-এর মতে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান।* জিয়া-উদ্দিন বরণী তাঁহাকে প্রকৃতির এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক ইব্‌ন্ বতুতা মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় হইতে মহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি একাধারে দয়ার সাগর ও রক্তপিপাসু ছিলেন।† বস্তুত, মহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্রে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়।

তাঁহার চরিত্র

দয়ার সাগর ও রক্ত-পিপাসু

মহম্মদ তুঘ্‌লক-এর চরিত্রে কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার দিক দিয়া বিচার করিলে মধ্যযুগে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে তিনি আলা-উদ্দিন অপেক্ষাও দুঃসাহসী ছিলেন, আদর্শবাদের দিক দিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্‌কেও হার মানাইয়াছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সমসাময়িক-দের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার বিস্ময়কর সংমিশ্রণ

---

* "Muhammad Tughluq was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle Ages." Ishwari Prasad, *History of Medieval India*, p. 269.

† "This king is of all men the one who most loved to dispense gifts and to shed blood; his gateway is never free from a beggar whom he has relieved and a corpse which he has slain".—Vide, Lane-poole, *Ibn Batuta*, p. 127.

মহম্মদ তুঘ্‌লক একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও গণিতশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। গ্রীক দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ভেষজ-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অতি চমৎকার। বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। দান-দক্ষিণায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। বহু লোক তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি মৌলিক প্রতিভা ও কৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং তাঁহার সংকল্প ছিল অচল ও অটল। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল পবিত্র ও নিষ্কলুষ। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন যেমন উদার তেমনি অনাড়ম্বর। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান।

একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ভাষা-তাত্ত্বিক, চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্

ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও নিষ্কলুষ

এইরূপ বহুবিধ গুণের আধার হইয়াও মহম্মদ তুঘ্‌লক ইংলণ্ডের রাজা এথেলরেড্-দি-আনরেডি (Ethelred the Unready or Redeless)-এর ন্যায় অপরের সৎপরামর্শ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক উৎকর্ষ সব কিছুই তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল।* নিজ খেয়ালের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার পরিকল্পনা মাত্রেই বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং দেশের সর্বত্র অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনস্টোনের মতে মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লকের অবিমৃশ্যকারিতা তাঁহার প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়াছিল। স্বৈরাচারী শক্তির সহিত খেয়ালী মনোবৃত্তির সংমিশ্রণে মহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্যাদি অব্যবস্থিতচিত্তের পরিচায়ক হইয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করা, খোরাসান ও কারজল (ফেরিস্তার মতে চীন) বিজয়ের পরিকল্পনা, তামার নোটের প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর অত্যধিক করভার স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইতিহাসে তিনি ডন্ কুইকজোট (Don Quixote)-এর ন্যায় খামখেয়ালী রাজা বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার চরিত্রে স্বভাবতই কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় (*He was a mixture of opposities*)।

বিচক্ষণতার অভাব

অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয়

কিন্তু ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মহম্মদ তুঘ্‌লককে

* "Yet the whole of these splendid talents and accomplishments were given to him in vain; they were accompanied by a perversion of judgement which after allowance for the intoxication of absolute power, leaves us in doubt whether he was not affected by some degree of insanity." Vide, *Elphinstone* : *Oxford History of India*, p. 283.

পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতীক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত তিনি সেরূপ ছিলেন না।
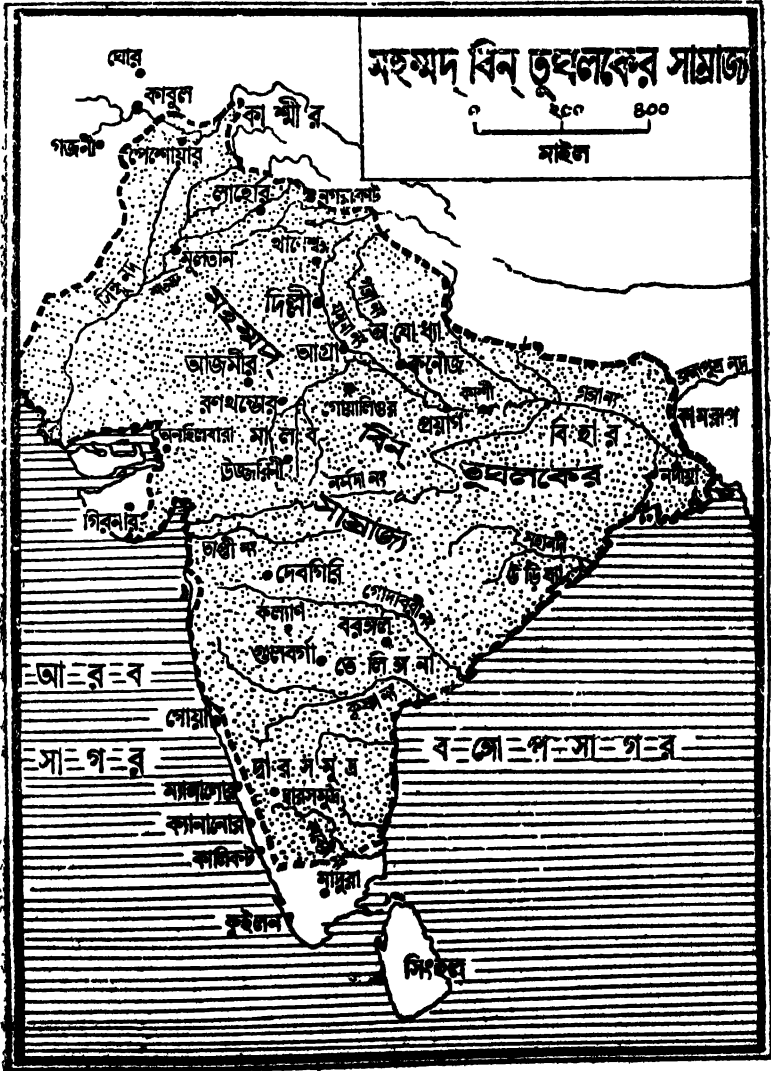
মহম্মদ তুঘ্‌লক স্বভাবতই অব্যবস্থিতচিত্ত বা রক্তপিপাসু ছিলেন, এমন নহে। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী একক অধিনায়কদের মত কোন কোন পরিস্থিতিতে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি

বর্বরোচিত শাস্তি হয়ত দিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা অনুচিত হইবে বলিয়া ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করেন। নর-হত্যায় তাঁহার আনন্দ ছিল, এই কথা সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তাঁহার কার্যাদির মধ্যে যেটুকু অব্যবস্থিতচিত্ততা লক্ষ্য করা যায়, তাহা তাঁহার মস্তিষ্কের অসুস্থতাজনিত মনে করা ভুল হইবে। তাঁহার মূল ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার সংস্কারকার্যাদি সম্পন্ন করেন নাই। বস্তুতপক্ষে, তাঁহার কার্যকলাপের পশ্চাতে সুচিন্তিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিফলতাকে সহজ মনে গ্রহণ করিবার মত মানসিক বল তাঁহার ছিল না, সংস্কারকার্যে প্রয়োজনীয় ধৈর্যও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার কার্যাদি বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। "মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক সম্পর্কে মূল কথা হইল এই যে, তিনি সহজেই ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহার আদর্শবাদী সংস্কার যখন জনসাধারণ আশানুরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিল না, তখন ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি বহু অযৌক্তিক কার্যাদি করিয়াছেন।" কিন্তু তদানীন্তন দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের পক্ষে বাস্তব জগতের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলা বা সংস্কার-কার্যে প্রয়োজনীয় ধৈর্য অবলম্বন না করা বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।*

ঈশ্বরীপ্রসাদের মতবাদ

তাঁহার অসাফল্যের কারণ

তাঁহার কার্যাদি (His works): সিংহাসন আরোহণের পর সর্বপ্রথমেই মহম্মদ তুঘ্লক দোয়াব অঞ্চলে কৃষকদের করভার বাড়াইয়া দিলেন। ফলে, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। দোয়াব অঞ্চলের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কৃষকগণ কর দিতে না পারায় তাহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। বদাউনীর মতে এই করভার বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল দোয়াব অঞ্চলের বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা এবং আনুষঙ্গিভাবে রাজকোষ অর্থদ্বারা পূর্ণ করিয়া তোলা।† গার্ডনার ব্রাউনের মতে জিয়া-উদ্দিন বরণীর বর্ণনায় দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর অত্যাচারের যে বীভৎস রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কতকটা অতিরঞ্জনের ফল। বস্তুত, সেই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাই ছিল কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা হউক, সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া সেখানকার প্রজাবর্গকে রক্ষার চেষ্টা করিলেন। অপর মতানুসারে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সুলতান দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের নিকট হইতে যাবতীয় শস্য দখল করিয়া

দোয়াব অঞ্চলে কর-বৃদ্ধি : কৃষকদের দুর্দশা

* Vide, *The Delhi Sultanate*: Bharatiya Vidyabhaban Publication, p. 85.

† Badauni's view has been accepted by Wolseley Haig, *Ibid*, p. 61.

লাইয়াছিলেন। কিন্তু ফলে দোয়াব অঞ্চলে খাদ্যাভাব এক চরম পর্যায়ে পৌঁছিলে সুদীর্ঘ দীর্ঘ ছয় মাস ধরিয়া বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করিয়াছিলেন।* রাজকোষের অর্থাভাব, দোয়াব অঞ্চলের প্রজাবর্গের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও তাহাদের অর্থবল সংকোচনের করবৃদ্ধির পশ্চাতে মূল যুক্তি ছিল। এই করবৃদ্ধির ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং উহা দমন করিতে গিয়া অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য।†

১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘ্‌লক দিল্লী হইতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। দেবগিরির নূতন নামকরণ হইল দৌলতাবাদ। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিক হইতে বিচার করিলে দেবগিরি সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্থান (central position) ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দিক দিয়া বিচার করিলেও দিল্লী অপেক্ষা দেবগিরি রাজধানীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই, কারণ মোঙ্গলগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই অনায়াসে দিল্লীর নিকটবর্তী হইতে পারিত। কিন্তু দূরবর্তী দেবগিরি ছিল এ-বিষয়ে অধিকতর নিরাপদ। গার্ডনার ব্রাউনের মতে মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের সিংহাসনারোহণের সময় সুলতানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ-ভারতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত পাঞ্জাব তখন রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাইয়াছিল। এদিক দিয়া দৌলতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান। ডক্টর হুসেন-এর মতে মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক দেবগিরিকে ইসলামীয় কৃষ্টির কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।‡ কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিলেই যে রাজধানী আপনা-আপনিই স্থানান্তরিত হইত মহম্মদ তুঘ্‌লক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দিল্লীর যাবতীয় লোককে দৌলতাবাদে যাইতে আদেশ দিয়া দিল্লীবাসীদের যেমন অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, তেমনই রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পরিকল্পনার ব্যর্থতাও ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে গিয়া দিল্লীবাসীদের কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করা হইয়াছিল, তাহা বরণী, ইব্‌ন্ বতুতা ও ইসামির রচনায় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরেই তিনি সকলকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইসামির মতে দেবগিরি হইতে লোকদের ফিরিয়া আসিবার আদেশ দিবার পশ্চাতে মূল যুক্তি ছিল জনমানবহীন দিল্লীকে পুনরায় জনাকীর্ণ করিয়া

দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর

* The failure monsoon in 1333, left the Sultan no alternative but to seize the grain of the Doab peasants and when Ibn Batuta reached Delhi in March, 1334 he found the citizens being given rations for the next six months", Vide Delhi Sultanate, Habib and Nizami, pp. 48-49.

† Ibid pp. 64-65.

‡ Ibid, p. 68.

কোয়া।...কিন্তু বরণী মন্‌স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেবগিরিতে প্লেগ মহামারীর শেষে কোন সময়ে মহম্মদ তুঘ্‌লক সকলকে দিল্লী ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন।*

১৩২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে তর্‌মাশিরীন্‌ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে এবং সমস্ত পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়। মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লকের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের দুর্বলতার সুযোগেই এইরূপ ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সুলতান প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন উৎকোচ দান করিয়া তর্‌মাশিরীন্‌ খাঁকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। বদাউনী, এহিয়া-বিন্‌-আহ্‌ম্মদ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক মুস্‌লক বুগ্‌রাকে দশ হাজার সৈন্য সহ তর্‌মাশিরীন্‌ খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোঙ্গল সেনাদের যুদ্ধ-বাজনার শব্দে দিল্লীর সেনাবাহিনী কতকটা হতচকিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তর্‌মাশিরীন্‌ খাঁ তাহাদের হস্তে পরাজিত হন। তর্‌মাশিরীন্‌ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মোঙ্গল আক্রমণ মহম্মদের সীমান্ত-নীতির দুর্বলতার পরিচায়ক ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে।

মোঙ্গল আক্রমণ

অক্সুনদী-অঞ্চল, খোরাসান ও ইরাক জয়ের আশায় মহম্মদ তুঘ্‌লক তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের এক বাহিনী এক বৎসর পোষণ করিয়া অবশেষে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ইহা অনেকে মহম্মদ তুঘ্‌লকের অল্পবুদ্ধিতা ও চিত্তচঞ্চলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতপক্ষে, ঐ সময়ে পারস্য দেশের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল এবং উপযুক্ত সামরিক শক্তির সাহায্যে পারস্য দেশ জয় করা কঠিন ছিল না। মিশরের রাজা এ-বিষয়ে মহম্মদ তুঘ্‌লককে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মহম্মদ তুঘ্‌লকের পারস্য-জয়ের পরিকল্পনা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পারস্য বিজয়ের পরিকল্পনা

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কারাজল বা কুর্মাচল প্রদেশ জয় করিবার জন্য মহম্মদ তুঘ্‌লক এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতেও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতি প্রায়ই সুলতানী সাম্রাজ্য আক্রমণ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া এই স্থানের পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আকস্মিক বারিপাতের ফলে সুলতান-প্রেরিত অভিযান বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তথাপি কুর্মাচল আক্রমণের সুফল পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত পার্বত্য জাতির শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

কারাজল বা কুর্মাচল অভিযান

বিরাট সেনাবাহিনীর ব্যয়-সঙ্কুলান, মুক্তহস্তে দান ও শাসনকার্যে ব্যয়বাহুল্যের ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই আর্থিক অনটন দূর করিবার উদ্দেশ্যে

* The Delhi Sultanate: Habib & Nizami, P. 492

মহম্মদ তুঘ্‌লক চীনদেশের অনুকরণে তামার নোটের প্রবর্তন করেন। নিছক নূতনত্বের আনন্দেই সুলতান এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। কিন্তু অল্প মূল্যের ধাতুর মুদ্রাকে অধিক মূল্যের মুদ্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে যে-সকল সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, তিনি তাহা করেন নাই। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে তামার নোট ব্যাপকভাবে জাল করা শুরু হইল। বিদেশী বণিকগণ তাঁহার মুদ্রা স্বভাবতই গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া মহম্মদ তুঘ্‌লক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে যাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে নোট চালু করা বা অল্প মূল্যের ধাতুতে সরকারী ছাপ দিয়া অধিক মূল্যের প্রতীক (token) হিসাবে চালু করিবার সমস্যা সহজেই অনুমেয়। সুলতানের চেষ্টা স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

তামার নোটের প্রচলন

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের শাসন ছিল যেমন উদার তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিতেন পূর্ববর্তী সুলতানদের কেহ সেইরূপ করেন নাই। রতন নামে জনৈক হিন্দু কর্মচারী সুলতানের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, একথা ইব্‌ন্ বতুতার বর্ণনায় উল্লেখ আছে। তিনি ধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। চিতোর ও রণথম্ভোর-এর রাজপুতগণকে পদানত রাখা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ধর্মনিরপেক্ষ উদার শাসন

বিচার বিষয়ে মহম্মদ তুঘ্‌লক অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি বিচার বিষয়ে কাজী, উলেমা প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার নাকচ করেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা। কাজী, মুফ্‌তী প্রভৃতি তথাকথিত আইনজ্ঞদের মতামত ন্যায্য বিচারের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলে তিনি তাঁহাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য দিতেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদেরও প্রয়োজনবোধে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না।

বিচার বিষয়ে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা

কৃষির উন্নতিসাধন এবং দুর্ভিক্ষের সময় ঋণদান প্রভৃতি কাজের জন্য মহম্মদ তুঘ্‌লক 'আমীর্‌কোহী' নামে এক কর্মচারি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কৃষির উন্নতিসাধন

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের বিফলতার কারণ ও ফলাফল (The Causes and Effects of Mahammad-bin-Tughluq's failure) : সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ্-এর ন্যায়ই বহুমুখী প্রতিভা এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক কাজেই বিফল [illegible] হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিকল্পনার অসাফল্যের জন্য তাঁহার বিফলতা [illegible]

তাঁহার বিফলতার কারণ :

এজন্য নহে, উহার প্রধান কারণ ছিল পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য আবশ্যিক পদ্ধতির ত্রুটি। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইলে কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিলেই চলিত, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। পারস্য জয় বা কুর্মাচল জয়ের ক্ষেত্রেও তাঁহার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত ছিল সন্দেহ নাই।

(৬) কার্যপদ্ধতির ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পরিকল্পনাগুলি ছিল সমসাময়িক কালের ধারণা ও বিশ্বাস হইতে বহুল পরিমাণে অগ্রবর্তী। স্বভাবতই জনসাধারণের সহানুভূতি সেগুলির পশ্চাতে ছিল না। তাঁহার তামার নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

(২) জনসাধারণের ধারণা ও বিশ্বাস হইতে অগ্রবর্তী আদর্শ

তৃতীয়ত, প্রতিভাবান, আদর্শবাদী সুলতান হইলেও মহম্মদ তুঘ্লক অপরের সৎ পরামর্শেরও ধার ধারিতেন না। সংস্কার কার্যে অস্থিরতা এবং অপরের পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা তাঁহার বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচ্য।

(৩) অপরের সৎ পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা

চতুর্থত, সংস্কার কার্যের জন্য যে পরিমাণ ধৈর্যের প্রয়োজন, মহম্মদ তুঘ্লকের তাহা ছিল না। ফলে, কোন একটি সংস্কার বিফলতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেন, ফলে অপর কাজেও বিফলতা তিনি ডাকিয়া আনিতেন।

(৪) ধৈর্যের অভাব

সর্বশেষে, রাজকর্মচারিবৃন্দের নিকট হইতেও তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানত রাজকর্মচারীদের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবেই কার্যকরী হয় নাই।

(৫) রাজকর্মচারীদের সহায়তার অভাব

সুলতান মহম্মদ তুঘ্লকের বিফলতার ফলে দিল্লী সুলতানীর মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাবহেতু শাসনকার্যের দক্ষতা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মহম্মদ তুঘ্লকের রাজত্বের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজা কৃষ্ণনায়ক ও হোয়সলরাজ বীরবল্লাল এক সামরিক সংঘ স্থাপন করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে সমুদ্র ও করমণ্ডল উপকূল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। দেবগিরিতে আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আলা-উদ্দিন বহমন শাহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। বাংলা ও গুজরাটেও ঐ সময়ে বিদ্রোহ দেখা দিলে মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন। [illegible] তাঘী গুজরাটের শাসনকর্তাকে হত্যা করিয়া অতঃপর [illegible]

ফলাফল: দাক্ষিণাত্য, দেবগিরি, বাংলা, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ

হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুলতান তাহাকে তকাজপুরে নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ইহার পর কিছুকাল গুজরাটে অবস্থান করিয়া এবং গুজরাটের বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া তিনি সিন্ধু আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং থাট্টা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩৫১)।* এইভাবে তাঁহার মৃত্যুকালে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর করিয়া সুলতানী শাসনকে দৃঢ় করা আর সম্ভব হয় নাই। ফলে, এই অরাজকতা ও অব্যবস্থা দিল্লী সুলতানির পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।† মহম্মদ তুঘলকের সংগঠনী শক্তির অভাব, তাঁহার অধৈর্য এবং সর্বোপরি জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পদ্ধতি সুলতানী শাসনের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

দিল্লী সুলতানির পতনের অন্যতম কারণ

মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের কৃতিত্ব-বিচার (Estimate of Muhammad-bin-Tughluq): মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। এল্‌ফিন্‌স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ, লেন-পুল প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহম্মদ তুঘলকের কার্যকলাপে তাঁহার বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় পাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, গার্ডনার ব্রাউন (Mr. Gardner Brown), ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মহম্মদের বিরুদ্ধে রক্তলোলুপতা ও বিকৃতমস্তিষ্কের অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহম্মদ-বিন্-তুঘলককে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া বিবেচনা করেন। ইব্‌ন্ বতুতার বর্ণনায় অথবা জিয়া-উদ্দিনের রচনায় মহম্মদ তুঘলককে, বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। জিয়া-উদ্দিন বরণী সুলতানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। সুলতান যদি প্রকৃতই বিকৃতমস্তিষ্ক হইতেন তাহা হইলে জিয়া-উদ্দিন বরণী উহার বর্ণনা করিতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য তাঁহার বর্ণনায় মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সামঞ্জস্যহীন কার্যকলাপ ও রক্তলোলুপতার কথা আছে। ইব্‌ন্ বতুতাও বলিয়াছেন যে, সুলতান মহম্মদ তুঘলক যেমন ছিলেন দয়ার সাগর, তেমনি ছিলেন রক্তপাতে সিদ্ধহস্ত। উপরি-উক্ত পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যের

মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য

* Vide, *The Delhi Sultanate*: Bharatiya Vidyabhaban, P. 80.

† "Endowed with extra-ordinary intellect and industry, he lacked the essential qualities of a constructive statesman and his ill-advised measures and stern policy enforced in disregard of popular will sealed the doom of his empire." *An Advanced History of India*, P. 326. "He had brought exceptional abilities and highly cultivated mind to the task of governing the greatest Indian Empire that had so far been known, and he had failed stupendously. It was a tragedy of high intentions self-defeated." Lane-Poole, P. [illegible]

নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, এল্‌ফিন্‌স্টোন, স্মিথ, হ্যাভেল প্রভৃতির রচনায় সুলতানের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে যেমন সামান্য অতিশয়োক্তি আছে, তেমনি গার্ডনার ব্রাউন ও ঈশ্বরীপ্রসাদের রচনায় সুলতানের দোষ স্খালনের আগ্রহাতিশয্য রহিয়াছে।

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। দর্শন, বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, গ্রীকদর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া মহম্মদ তুঘ্‌লক সমসাময়িক রাজগণের নিকট এক বিস্ময়ের পাত্র হইয়াছিলেন। একাধারে এইরূপ বহুবিধ গুণের সংমিশ্রণ অন্তত রাজগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণের সহিত বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা মহম্মদ তুঘ্‌লকের বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতা ও উহার মৌলিক যৌক্তিকতা যদি কাহারো কৃতিত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে মহম্মদ তুঘ্‌লকের স্থান পৃথিবীর বহু রাজারই ঊর্ধ্বে, বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রজাবর্গের প্রকৃত হিতসাধন এবং দেশের সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং পরিকল্পনার কার্যকারিতাই যদি রাজ-কর্তব্যের সাফল্যের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে মহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্যকলাপ কেবল বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার বাস্তব জ্ঞানহীনতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয়ও দিয়াছিল।

তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা

তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি

দোয়াব অঞ্চলে করভার বৃদ্ধির পশ্চাতে বিদ্রোহাত্মক ও বিত্তশালী প্রজাবর্গকে শাস্তিদানের মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। দোয়াব অঞ্চলের প্রজাবর্গের দুর্দশামোচনে সুলতানই স্বয়ং ঋণদানের আদেশ দিয়াছিলেন। শাসনকার্যে অকর্মণ্যতার ফলেই সুলতানের কার্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরের পরিকল্পনার পশ্চাতে যুক্তি ছিল বটে, কিন্তু স্থানান্তর করিবার উপায় সম্পর্কে তাঁহার কোন বাস্তব জ্ঞান ছিল না। কেবলমাত্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করিয়াই যে রাজধানী স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দিগ্বিজয় সম্পর্কেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাস্তবতাবর্জিত। পারস্য দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে উহা জয় করিবার ইচ্ছা অযৌক্তিক এই কথা বলা যায় না, কিন্তু মিশরের রাজার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পারস্য-জয় করা সম্ভব হইলেও তাহা হইতে যে জটিলতার সৃষ্টি হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনা অবশ্য মিশরের রাজার সাহায্যের অভাবে কার্যকরী হয় নাই। এক্ষেত্রেও সুলতান অভিজ্ঞ রাজনীতি-সুলভ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলা চলে না। কুর্মাচলের অভিযান অবশ্য আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অনেকে এই অভিযানকে চীনদেশের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া মনে করিয়া

দোয়াব অঞ্চলে করভার বৃদ্ধি

দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ

পারস্য জয়ের যৌক্তিকতা

কুর্মাচল অভিযানের আংশিক সাফল্য

থাকেন কিন্তু বরণীর রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সুলতান চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কারাজল বা কুর্মাচল জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতি ভারতের সীমান্ত দেশে আক্রমণ ও লুণ্ঠনকার্যে লিপ্ত থাকিত। সুলতানের সামরিক অভিযান আকস্মিক বারিপাতে বিফল হইলেও ইহার পর তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। অবশ্য এই অভিযানের সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র দশজন অশ্বারোহী জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সুলতান অভিযানের বিফলতার সংবাদ পাইয়া এই দশজনকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। তামার নোটের প্রচলন করিতে গিয়াও উহা জাল করার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রতি ঘরে ঘরে তামার নোট জাল হওয়ায় এই ব্যবস্থা বিফল হইয়াছিল এবং তামার নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মহম্মদ তুঘ্‌লক যাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তামার নোটের প্রচলন

মোঙ্গল নেতা তর্‌মাশিরীন্ খাঁকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিরস্ত করিবার পশ্চাতে সুলতানের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফেরিস্তার এই উক্তি আমরা যদি গ্রহণ না করি এবং বদাউনী ও এহিয়া-বিন্-আহম্মদের বর্ণনায় মহম্মদ তুঘ্‌লক কর্তৃক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিবার কথা যদি সত্য হয়, তথাপি মহম্মদ তুঘ্‌লকের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের নীতির দুর্বলতার দরুনই যে মোঙ্গলগণ দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মোঙ্গল নীতি

বিচার-ব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে স্থাপন করা, ধর্মনিরপেক্ষভাবে শাসন পরিচালনা, হিন্দুদের প্রতি উদারতা, কৃষির উন্নতিসাধন প্রভৃতি মহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসনের আংশিক সাফল্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালীন নামাজ বা প্রার্থনার পর মহম্মদ-বিন্ তুঘ্‌লক ধর্মালোচনা সভায় বসিতেন। সেখানে হিন্দু, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তারা উপস্থিত হইতেন। জৈন শাস্ত্রবিদ্ রাজশেখর, জীনপ্রভ সুরির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে।* আর্থিক দুর্বলতা হেতু শাসনকার্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে সুলতান তাহা দূর করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে, দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধুদেশ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিল এবং বিশাল সুলতানী সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক শিক্ষা, সংস্কৃতি, উচ্চ আদর্শ ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও সুলতানী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তববর্জিত কার্যকলাপ, যুগধর্মের অগ্রবর্তী ধ্যান-ধারণা, অনভিজ্ঞতা, ধৈর্য ও স্থৈর্যহীনতা সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বিচার, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন, কৃষি

তাঁহার বিফলতা

* Habib & Nizami, P. 594.

ফিরুজ তুঘ্লক, ১৩৫১-১৩৮৮ (Firuz Tughluq) : সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নেতৃবিহীন সেনাবাহিনীর মধ্যে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সুলতানের সেনাবাহিনীতে ভাড়াটিয়া মোঙ্গল সৈনিকগণ সিন্ধুর বিদ্রোহী নেতাদের সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া সুলতানী সৈন্যের শিবির লুণ্ঠন শুরু করিলে উপস্থিত অভিজাতবর্গের অনুরোধে ফিরুজ শাহ্ সুলতান-পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে সুলতান-পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত অভিজাতবর্গের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। ফিরুজ শাহের বয়স তখন ৪৬ বৎসর। সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়া (মার্চ, ১৩৫১) ফিরুজ শাহ্ প্রথমেই সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুলতান-পদ গ্রহণ (মার্চ ১৩৫১)

এদিকে খাজা-ই-জাহান নামে মহম্মদ তুঘ্লকের জনৈক অনুচর এক শিশুকে মহম্মদ তুঘ্লকের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজ অভিভাবকত্বাধীনে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মহম্মদ তুঘ্লকের কোন পুত্রসন্তান ছিল বলিয়া অভিজাতবর্গের কাহারও জানা ছিল না, তদুপরি সুলতানির ঐ সঙ্কটকালে কোন নাবালককে সিংহাসনে স্থাপন করাও সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া অভিজাতগণের প্রায় সকলেই ফিরুজ তুঘ্লকেব পক্ষ গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের ভগিনী খোদাবন্দ জাদা নিজ পুত্রের স্বার্থে ফিরুজ তুঘ্লকের নির্বাচনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘ্লক সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে খাজা-ই-জাহান আত্মসমর্পণ করিলেন। ফিরুজ খাজা-ই-জাহানকে মার্জনা করিলেন এবং সামান নামক স্থানে জীবনের অবশিষ্ট সময় শান্তিতে কাটাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সামান ও সুনাম অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ শের খাঁর জনৈক অনুচর কর্তৃক খাজা-ই-জাহান নিহত হইলেন।

খাজা-ই-জাহান কর্তৃক এক শিশুকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন

খাজা-ই-জাহানের আত্মসমর্পণ

ফিরুজ তুঘ্লকের দিল্লীর সিংহাসন লাভ কতদূর আইনসঙ্গত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ফিরুজ ছিলেন গিয়াস-উদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন জনৈকা রাজপুত রমণী। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে মহম্মদ তুঘ্লক মৃত্যুকালে ফিরুজ তুঘ্লককে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'খুলাসাত-উৎ-তারিখ' প্রণেতা সুজনরায় ভাণ্ডারী এবং ফিরুজ তুঘ্লকের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের মতে মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। খোদাবন্দ্ জাদা কর্তৃক নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন দাবি এই তথ্যকে সমর্থন করে। যাহা হউক,

ফিরুজের সিংহাসন দাবির যৌক্তিকতা

ফিরুজ তুঘ্‌লকের সিংহাসন অধিকারের মূলে এবং প্রধান যুক্তি ছিল তৎকালীন সংকটজনক পরিস্থিতি।

ফিরুজ তুঘ্‌লক সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলে তিনি উচ্চ রাজকর্মচারি-পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁহার চরিত্র

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা শাসনকার্যে পারদর্শিতা অর্জন করিলেও মূলত ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্‌লক ছিলেন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাহীন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অপেক্ষা ধর্মকর্মেই তিনি অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরণী ও শামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ্‌ ফিরুজ শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ 'মুসলমান শাসক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরণী ও আফিফ্‌-এর মতে ফিরুজ শাহ্‌ যেমন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান ও সত্যনিষ্ঠ তেমনি ছিলেন সদাচারী ও ধর্মভীরু। তাঁহার ধর্মপ্রবণতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সততা ও মানবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিক, বিশেষভাবে জিয়া-উদ্দিন বরণীর অভিমত ঐতিহাসিক ডক্টর স্মিথ্‌ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। ফিরুজ শাহ্‌ রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের কোন চেষ্টাই করেন নাই, বরঞ্চ অপাত্রে দয়া প্রদর্শনের ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র।*

যাহা হউক, ফিরুজ নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী দয়াপ্রবণতা, প্রজাহিতৈষণা, ন্যায়-পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সামরিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অকর্মণ্য এবং দয়া প্রদর্শনে কোন বুদ্ধি-বিবেচনার ধার ধারিতেন না। তাঁহার পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতা তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ দেব-দেবীর মূর্তি অপবিত্র করিয়াছিলেন। সীরাৎ-ই-ফিরুজশাহী নামক সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনায় এই বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-উল্‌-মুল্‌ক-এর রচনায় ইহার সমর্থন রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ধর্মান্ধতা সমসাময়িক উলেমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তারিখ-ই-ফিরুজশাহী ও তারিখ-ই-মোবারকশাহী গ্রন্থে তাঁহার গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণের উপকার সাধন তাঁহার শাসনের মূলসূত্র ছিল। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

ফিরুজ তুঘ্‌লকের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের তথা কোরাণের নীতির ভিত্তিতে

* সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ফিরুজশাহের দয়াপ্রবণতা সম্পর্কে প্রশংসা করিতে গিয়া যে-সকল উদাহরণ দিয়াছেন, সেগুলি নিরপেক্ষ বিচারে সুলতানের অকর্মণ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহার আমলে রাজকর্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ না করিয়া কোন কর্তব্যই সম্পাদন করিত না। একদা জনৈক সৈনিককে ক্রন্দনরত দেখিয়া সুলতান উহার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই সৈনিকটির ঘোড়া উচ্চ কর্মচারী কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য হাজির করিতে হইবে, অথচ এক মোহর উৎকোচ না দিতে পারিলে ঐ দুর্বল ঘোড়া পরিদর্শনে অবশ্যই বাতিল হইয়া যাইবে। সুলতান সৈনিকটিকে এক মোহর দান করিয়া তাহার ঘোড়া যাহাতে পরিদর্শনে টিকিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। দিল্লী সুলতানিকে তিনি এক-ধর্মাশ্রয়ী শাসনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রজাবর্গের উন্নতি সাধন করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বলা বাহুল্য। শাসনকার্যে উদারতা অবলম্বনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য

সুলতান-পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরুজ শাহ্‌কে নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। মহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি স্বাধীন সুলতান হিসাবে নিজ রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মণাবতী (Lakhanauti) ও পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া তিরহুত আক্রমণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ফিরুজ শাহ্ ইলিয়াস্ শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়াস্ শাহ্ সুলতানের অভিযানের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একডালা দুর্গটি ছিল দিনাজপুরে অবস্থিত। ফিরুজ শাহ্ একডালা দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজের মতে সুলতান ফিরুজ একডালা দুর্গস্থ নরনারী ও শিশুর কাতর আর্তনাদে অভিভূত হইয়া দুর্গটি জয় না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। অপরাপর ঐতিহাসিকদের মতে আকস্মিকভাবে বর্ষা নামিলে ফিরুজ তুঘ্‌লক একডালা দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তাঁহার সামরিক নৈপুণ্যহীনতা প্রমাণিত হইয়াছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের বিফলতা

ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ বাংলার সুলতান হইলে ফিরুজ তুঘ্‌লক পুনরায় বাংলা জয় করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সিকন্দর শাহ্ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সুরক্ষিত একডালা দুর্গটি জয় করা ফিরুজের পক্ষে সহজ হইল না। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায়ও সিকন্দর একডালা দুর্গটি রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে বর্ষা শুরু হইলে ফিরুজ শাহ্ সিকন্দরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন (১৩৫৪)। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলার সুলতানগণ নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে দিল্লীর সুলতানগণ আর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন নাই।

বাংলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের বিফলতা

বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরুজ শাহ্ জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার হিন্দুরাজা নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া তৈলঙ্গানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরুজ শাহ্ পুরী প্রবেশ করিয়া পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির অপবিত্র করিলেন এবং মন্দির হইতে জগন্নাথদেবের

উড়িষ্যা জয়

মূর্তিটি মুসলমানগণ কর্তৃক রাজপথে পদদলিত করাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী লইয়া গেলেন।* পশ্চাতক রাজা কুড়িটি হাতী উপঢৌকন দিয়া এবং প্রতি বৎসর কুড়িটি হাতী কর হিসাবে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি ফিরুজের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষ দিকে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সেই সুযোগে নগরকোট দুর্গটি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। ফিরুজ তুঘ্‌লক নগরকোট দুর্গটি পুনরধিকার করেন। নগরকোট দুর্গস্থ জ্বালামুখীর মন্দিরে প্রাপ্ত তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফিরুজ শাহের আদেশে তাঁহার সভাকবি আজ-উদ্দিন-খালিদ-খানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদ গ্রন্থ 'দালাল-ই-ফিরুজশাহী' নামে পরিচিত।

নগরকোট জয়

১৩৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ শাহ্ সিন্ধু প্রদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে ৯০ হাজার পদাতিক ও ৪৮০টি হস্তীসহ যাত্রা করিলেন। শামস্-ই-সিরাজের মতে সিন্ধুর স্থানীয় নেতৃবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন করিয়া সেখানে দিল্লী সুলতানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য পুনঃস্থাপন ছিল ফিরুজ শাহের সিন্ধু অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।† সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছিয়া তিনি বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তারপর সিন্ধুর 'জাম' (শাসক)-এর রাজধানী তট্টা অবরোধ করিলেন। কিন্তু 'জাম' বন্‌হ্‌বিনা (Banhbina) বীরত্ব সহকারে এই অবরোধ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। সেই সময়ে সুলতানের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক খাদ্যাভাব ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।‡ সুলতানের নৌবাহিনীও শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইল। সৈন্যসংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে সুলতান গুজরাটে কিছুকাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। গুজরাটের পথে এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে পড়িয়া ফিরুজ শাহ্‌কে সসৈন্যে কচ্ছ প্রদেশের জলাভূমিতে দীর্ঘ ছয়মাস পথভ্রান্ত অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে তিনি সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুদেশ মহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। প্রায় একাদশ বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করিয়া সিন্ধুদেশ পুনরায় ফিরুজ শাহের চেষ্টায় দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল।

সিন্ধুদেশ জয়

ফিরুজ শাহের শাসনব্যবস্থা ইসলামধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনকার্যে

* "Firuz reached Puri, occupied the Raja's palace, and took the great idol, which he sent to Delhi to be trodden under foot by the faithful" *Cambridge History of India* Vol. III, P. 178.

† According to Shams-i-Siraj Afif—"the turbulent activities of those chiefs (of Sind) for years, engendered by a hostile and rebellious spirit furnished a clear excuse for the Sind campaign." "...We need hardly wonder that Firuz should have undertaken a fresh one (campaign) to indicate the imperial prestige."—*The Delhi Sultanate* P. 95.

‡ *Ibid*, p. 95.

ঔদারতার পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মান্ধতা সেই ঔদারতার সুফল বিনাশ করিয়াছিল। অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে তিনি ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অ-মুসলমান প্রজাবর্গের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। কোরাণে

শাসনব্যবস্থা

উল্লিখিত চারি প্রকার কর তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা: (১) 'খারাজ' বা ভূমি-রাজস্ব (জমির ফসলের দশমাংশ), (২) 'জাকাৎ' বা সরকারকে দান (benevolence), (৩) 'জিজিয়া' বা অ-মুসলমানদের উপর ধার্য মাথাপিছু কর ও (৪) 'খাম্‌স্‌' বা খনিজ দ্রব্যাদির পংমাংশ কর। এই চারিপ্রকার কর ভিন্ন 'শারব' বা সেচকর, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একাংশ প্রভৃতিও গ্রহণ করা হইত। পূর্বে নানাপ্রকার অবৈধ কর আদায় করা হইত। কিন্তু ফিরুজ শাহ্ এই সকল অবৈধ কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

খারাজ, জাকাৎ, জিজিয়া, খাম্‌স্‌, শারব প্রভৃতি কর স্থাপন

ফিরুজ শাহ্ অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য উড়িষ্যা-রাজ ফিরুজ তুঘ্‌লকের সহিত সন্ধির প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করিলেন এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। পূর্বে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে কোন সামগ্রী চালান দিতে হইলে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক দিতে হইত। এই শুল্ক-প্রথা রহিত করিবার ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধা হইল। শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসারে ফিরুজের শুল্কনীতির সুফল পরিলক্ষিত হইল। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সরকারী রাজস্বের পরিমাণও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ফিরুজ শাহের আমলে একমাত্র দোয়াব অঞ্চল হইতেই ছয় কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তাঁহার আমলে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইহা ভিন্ন, ফিরুজ শাহ্ বিস্তীর্ণ পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন এবং উহা হইতে যে আয় হইত, তাহা ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারকল্পে ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।*

শুল্কনীতির পরিবর্তন: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিবিধান

ফিরুজ তুঘ্‌লক বহুসংখ্যক সেচ-খাল খনন করাইয়া কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এই সেচ-খালগুলির একটি শতদ্রু নদী হইতে ঘাগর পর্যন্ত এবং অপর একটি যমুনা নদী হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর আরও দুইটি খালের মধ্যে একটি মাণ্ডবী ও সিরমুর পাহাড় হইতে হান্‌সী ও হিসার পর্যন্ত এবং অপরটি ঘাগর নদী হইতে হিরনীখেরা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সেচ-খাল খনন: কৃষির উন্নতিসাধন

নির্মাতা হিসাবেও ফিরুজ তুঘ্‌লকের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি বহুসংখ্যক শহর ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ফতেবাদ, জৌনপুর, হিসার,

---

* *Vide*: *An Advanced History of India*, (2nd Edn. 1960—reprint), p. 332.

ফিরুজপুর বা ফিরুজাবাদ নামে শহরগুলি তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহুসংখ্যক হাসপাতাল, মসজিদ, সরাইখানা, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার স্থাপত্য শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলা-উদ্দিন নির্মিত ত্রিশটি উদ্যানের তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং নিজে মোট বারোশত নূতন উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোক-নির্মিত দুইটি স্তম্ভ তিনি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি অশোকস্তম্ভের একটি মীরাট হইতে এবং অপরটি খিজিরাবাদ হইতে তিনি আনাইয়াছিলেন।*

শহর স্থাপন, উদ্যান রচনা : অশোক নির্মিত স্তম্ভ দিল্লীতে স্থানান্তরিত

ফিরুজ শাহ্ বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি হস্তপদছেদন প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তি-প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে বহুল পরিমাণে উদার ও মানবোচিত করিয়াছিলেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি 'কর্মসংস্থান সংস্থা' (Employment bureau) স্থাপন করিয়াছিলেন। দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় (Dar-ul-Shafa) এবং তাহাদিগকে অর্থসাহায্য দানের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার (Diwan-i-khairat) স্থাপন করিয়াছিলেন। মুদ্রানীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া তিনি উহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'আধা' ও 'বিখ্' নামে দুই প্রকার মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রার সর্বপ্রথম প্রচলন তিনিই করিয়াছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার : কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : দাতব্য চিকিৎসালয় : সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার : মুদ্রানীতির সংস্কার

সামন্ত-প্রথার ভিত্তিতে ফিরুজ তুঘলক সামরিক সংগঠন করিয়াছিলেন। সৈনিকদিগকে তিনি জায়গীর ভোগ-দখলের অধিকার দিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে নিযুক্ত সৈনিকদিগকে অবশ্য নগদ বেতন দিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন সামরিক কর্মচারী কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের রাজস্ব ভোগ করিবার অধিকার পাইতেন।

সামন্ত-প্রথার ভিত্তিতে সামরিক সংগঠন

ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে দিল্লীতে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে দেশে মোট এক লক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস ছিল। প্রতিশ্রুত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমীরগণ ফিরুজ শাহ্কে প্রায়-ই উপঢৌকনস্বরূপ ক্রীতদাস প্রেরণ করিত। সুলতান তাঁহাদের আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেন। ফলে, একদিকে যেমন সরকারী রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইত,

ক্রীতদাসের সংখ্যা-বৃদ্ধি : রাজস্বের ক্ষতি

---

* অশোকস্তম্ভ দুইটি কিভাবে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহার এক অতি সুন্দর বর্ণনা সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।
Vide, Elliot's *History of India*, Vol. III, P. 350.

অপর দিকে তেমনি অধিকতর সংখ্যক ক্রীতদাসের ভরণপোষণের ভার সুলতানকে বহন করিতে হইত।

ফিরুজশাহ্ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ও পণ্ডিত ফিরুজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জালাল-উদ্দিন রুমী ফিরুজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। তাঁহার আমলেই বরণী, আফিফ্, আইন-উল্-মুল্ক প্রভৃতি তাঁহাদের ইতিহাস গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহের আদেশে আজ-উদ্দিন-খালিদ-খানী তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফিরুজের জাঁকজমক-পূর্ণ রাজসভা

ফিরুজ শাহ্ জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার পক্ষপাতী ছিলেন। অনুষ্ঠানাদির সময় তিনি তাঁহার রাজসভা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করাইতেন।

বৃদ্ধবয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যুতে ফিরুজ তুঘ্লকের দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহার শাসন-ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাঁহার বিচার ও বিবেচনা-বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র জাফর খাঁরও মৃত্যু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনে চরম দুর্বলতা দেখা দেয়। দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সুলতানেরই তৃতীয় পুত্র মহম্মদ খাঁ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার কুফল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পূর্বেই রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে আত্মরক্ষা করা কঠিন বিবেচনা করিয়া মহম্মদ খাঁ দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। ফিরুজ তুঘ্লক নিজ পৌত্র তুঘ্লক খাঁকে শাসনভার দান করিয়া ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যু: ফিরুজ তুঘ্লকের দুর্বলতা

তাঁহার মৃত্যু (১৩৮৮)

ফিরুজ শাহের কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Firuz Tughluq): মহম্মদ তুঘ্লকের আকস্মিক মৃত্যুতে সুলতানী সেনাবাহিনীতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতে অভিজাতবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরুজ শাহ্ সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া উহাকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া যাইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমরকুশলতা বা সামরিক সংগঠক হিসাবে তিনি কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সম্মুখীন সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন বা কোন দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হওয়া ফিরুজ তুঘ্লকের পক্ষে সম্ভব হইত না। সামরিক অভিযান মাত্রেই তিনি অব্যবস্থিতচিত্ততা ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার দুইটি অভিযান-ই তাঁহার সামরিক

অক্ষমতার পরিচায়ক। সিন্ধুদেশে তিনি দিল্লীর অধিকার পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই অভিযানেও সামরিক দুর্বলতা ও সেনাপতিসুলভ দূরদর্শিতার অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবেই কচ্ছ প্রদেশের জলাভূমিতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল সসৈন্যে কাটাইতে হইয়াছিল। দিল্লী হইতে সময়মত সামরিক সাহায্য উপস্থিত না হইলে তাঁহার সিন্ধুজয়ের পরিকল্পনাও বিফল হইত, বলা বাহুল্য। একমাত্র জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা) বিজয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ইহাও উড়িষ্যার হিন্দুরাজার রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়নের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে না। দাক্ষিণাত্যের যে-সকল অংশ সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিযাছিল, সেগুলি জয় করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। সামরিক নেতৃত্বের ক্ষমতা ফিরুজ শাহ্ তুঘ্‌লকের মোটেই ছিল না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাযগীর-প্রথার উপর তাঁহাব সামরিক সংগঠন নির্ভরশীল ছিল। ইহার ফলে সৈনিকগণের তথা সামরিক কর্মচারিবর্গের কেন্দ্রীয় সরকারেব উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের সুবিধা এই জায়গীর-প্রথার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সামরিক নেতা হিসাবে ফিরুজ তুঘ্‌লক

ফিরুজ শাহ অত্যধিক ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি কোরাণের নির্দেশানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার গোঁড়ামি ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হইযাছিল। পুরীর মন্দিরের বিগ্রহ দিল্লীতে মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি লইয়া গিয়াছিলেন; পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন পরম ধর্ম বলিয়া তিনি মনে করিতেন, কিন্তু হিন্দুস্তানের সুলতানের পক্ষে হিন্দুধর্মের প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্মাচরণের পশ্চাতে হিন্দু-নির্যাতনের কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও নিজধর্ম পালনে অত্যধিক গোঁড়ামি প্রদর্শন করিতে গিয়া তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন। কোরাণের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিতে গিয়া তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গের উপর অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।* হিন্দু নির্যাতনের কোন উদ্দেশ্য তাঁহার যে ছিল না তাহা ফিরুজ শাহের প্রজাহিতৈষী সংস্কার হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিচার-ব্যবস্থার কঠোরতা দূর করিয়া, সেচকার্যের জন্য খাল খনন করিয়া এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়া জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং এই জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। দরিদ্র ও পীড়িত প্রজাবর্গের সুবিধার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়, সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার, বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য

শাসক হিসাবে ফিরুজ শাহ্

* "Kindly to the Hindus, he yet sternly forbade public worship of idols and painting of portraits and taxed the Brahmanas who had hitherto been exempt." Lane-Poole, p. 149.

'কর্মসংস্থান সংস্থা' স্থাপন করিয়া ফিরুজ তুঘ্‌লক তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল কার্যকলাপের ফলে প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য; সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেই ফিরুজ শাহের শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঐতিহাসিকের রচনায় ফিরুজ শাহের চরিত্রের গুণাবলী ও তাঁহার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বরণী ও আফিফ্‌ কর্তৃক সুলতানকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান প্রভৃতি গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা ডক্টর স্মিথ্‌ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও ফিরুজ শাহ্‌ যে প্রজাহিতৈষী, ধর্মভীরু, দয়াপ্রবণ সুলতান ছিলেন, তাহা নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থিত হইবে। আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেই ফিরুজ শাহ্‌ সম্পর্কে এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের প্রশংসা

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত

তথাপি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবহেতু ফিরুজ তুঘ্‌লক অপাত্রে দয়া প্রদর্শন এবং জাগীর-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* মহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলে দিল্লী সুলতানির যে পতনের সূচনা হইয়াছিল, ফিরুজ তুঘ্‌লক তাহা রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই সাম্রাজ্যের নানাস্থানে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। নির্মাতা হিসাবে ফিরুজ তুঘ্‌লকের উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তিনি অসংখ্য উদ্যান, মসজিদ, সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া এবং হিসার, ফিরোজপুর, ফিরুজাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি শহরের গোড়াপত্তন করিয়া তাঁহার নির্মাণ-শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু মুসলমান ধর্মজ্ঞানী, যথা রুমী, ঐতিহাসিক বরণী, আফিফ্‌, কবি আজ-উদ্দিন-খালিদ-খানী প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভিমত

নির্মাতা হিসাবে ফিরুজ শাহ্‌

ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা

মানবতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ফিরুজ তুঘ্‌লক প্রশংসার পাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি যেমন ছিলেন দয়াবান তেমনি ছিলেন স্নেহশীল। ধর্মবিষয়ে সংকীর্ণতার পরিচয় দান করিলেও তিনি স্বভাবতই উদারচিত্ত ও জনকল্যাণকামী সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার আমলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নানাবিধ গুণের অধিকারী হইয়াও ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লী সুলতানির পতনোন্মুখতা রোধ করিতে সক্ষম হন নাই।

মানবতার বিচারে ফিরুজ শাহ্‌

* "Firoz was loved, perhaps respected, but certainly not feared." Lane-Poole, p. [illegible].

তুঘ্লক বংশের অবসান (End of the Tughluq Dynasty) : ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তুঘ্লক বংশের দুর্বলতর সুলতানদের হস্তে দিল্লী সুলতানি পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইল। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্লক শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩৮৮)। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারই সম্পর্কিত ভ্রাতা—ফিরুজ তুঘ্লকের দ্বিতীয় পুত্র* জাফর খাঁর পুত্র আবুবক্র গোপনে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া নিজে সিংহাসন দখল করিলেন। আবুবক্র-এর ভাগ্যেও বেশীদিন সুলতান-পদ ভোগ সম্ভব হয় নাই। নাসির-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইলেন এবং কারাগারেই কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। নাসির-উদ্দিনও সিংহাসন লাভ করিয়া বেশিদিন রাজত্ব করিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর (১৩৯৪) তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন সিকন্দর শাহ্ সিংহাসন আরোহণের প্রায় দুই মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পর নাসির-উদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিই ছিলেন তুঘ্লক বংশের শেষ সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁ এবং জৌনপুরের মালিক সারওয়ার নামে জনৈক খোজা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লীর অভিজাতগণের কয়েকজন নুসরৎ শাহ্ নামে ফিরুজ তুঘ্লকের অপর এক পৌত্রকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে সুলতান-পদ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতির ফলে যখন দিল্লী সুলতানির পতন আসন্নপ্রায় ঠিক সেই সময়ে তৈমুরলঙ্গের ভারত-আক্রমণ উহার উপর চরম আঘাত হানিল।

গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্লক শাহ্, আবুবক্র, নাসির-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্, আলা-উদ্দিন সিকন্দার শাহ্

নাসির-উদ্দিন মাহমুদ-শাহ্ (২য়)—তুঘ্লক বংশের শেষ সুলতান

তৈমুর লঙ্গ (Timur the Lame) : মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন 'লঙ্গ' অর্থাৎ খোঁড়া (Lame), এই কারণে তিনি তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত। খোঁড়া হইলেও তৈমুরের ন্যায় দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা ইতিহাসে বিরল। ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তৈমুর 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মোঙ্গলবীর চিঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য লইয়া দিগ্বিজয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি চাঘ্তাই তুর্কীজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া একে একে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটামিয়া প্রভৃতি জয় করেন। তারপর তিনি হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইলেন। কোন দেশ আক্রমণ ব্যাপারে তৈমুরের কোন অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না, তাঁহার দুর্ধর্ষ

জন্ম ও প্রথম জীবন

* Zafar Khan was the second son of Firuz Tughluq and not the third son as mentioned in *The Delhi Sultanate*. Bharatiya Vidyabhavan Publication, p. 110. Vide, *Tarikh-i-Mubarakshahi*, English Translation by Prof. K. K. Basu, p. 149 ff. *An Advanced History of India*, p. 604.

সামরিক শক্তিই ছিল যুদ্ধ-সৃষ্টির একমাত্র যুক্তি। ন্যায়, অন্যায় বা উপযুক্ত কারণের ধার তিনি ধারিতেন না।

ভারতবর্ষ আক্রমণের ক্ষেত্রে অবশ্য তৈমুর লঙ্গের অজুহাতের অভাব হইল না। দিল্লীর সুলতানগণ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন না করিয়া পৌত্তলিক হিন্দুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন ইহা তৈমুরের সহ্য হইল না। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিনাশসাধনের ইচ্ছা ভিন্ন রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠনের সুযোগও তিনি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-অভিযানের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লুণ্ঠনই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। পৌত্তলিকতার অবসান ঘটাইয়া হিন্দু-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিকট অজুহাত মাত্র।

ভারতবর্ষ আক্রমণের অজুহাত

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ একদল সৈন্যসহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সহজেই মুলতান দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ঐ বৎসর তৈমুরও ভারতবর্ষে পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনীসহ একে একে সিন্ধু, ঝিলাম ও রাভী নদী অতিক্রম করিয়া মুলতানের নিকটবর্তী তলম্ব (Talamba) নামক শহরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তলম্ব শহর আক্রমণ করিয়া তৈমুর সেখানকার অধিবাসিগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। তলম্ব হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রাপথে দীপালপুর, ভাতনেইর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া এবং অসংখ্য নর-নারীর প্রাণনাশ করিয়া তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে তিনি প্রায় একলক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যা করিয়া এক নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত করিলেন। এই পৈশাচিক কাণ্ডের একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, দিল্লী আক্রমণকালে হিন্দু বন্দিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।

ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৩৯৮) : পৈশাচিক হত্যা ও লুণ্ঠন

সুলতান নাসির-উদ্দিন মহম্মদ ও তাঁহার মন্ত্রী মল্লু ইক্‌বাল (Mallu Iqbal) তৈমুরকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ ও মল্লুকে পরাজিত করিয়া তৈমুর সহজেই দিল্লী অধিকার করিলেন। পরাজিত হইয়া মহম্মদ গুজরাটের মল্লু বরণ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তৈমুর নাগরিকদের প্রাণনাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন বটে, কিন্তু তৈমুরের সেনাবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হিন্দুনাগরিকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হইল। তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনী অগণিত হিন্দু নর-নারীর রক্তে দিল্লীর রাজপথ রঞ্জিত করিল।* দিল্লী হইতে বহুসংখ্যক স্থপতিকে সমরকন্দের জুম্মা মসজিদ

তৈমুরের দিল্লী প্রবেশ : হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন

* "So complete was the desolation that the city (Delhi) was utterly ruined, and those of the inhabitants who were left died, while for two whole months not a bird moved wings in Delhi." Vide, *Cambridge History of India*, Vol. III, p. 201.

(Friday Mosque) নির্মাণের জন্য ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল। দিল্লী নগরীতে কয়েকদিন ধরিয়া পৈশাচিক হত্যালীলা ও লুণ্ঠনের পর তৈমুর সিরি, জাঁহাপনা ও পুরাতন দিল্লী প্রভৃতি আরও তিনটি শহরে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইলেন।

মীরাট, কাংড়া, জম্মু প্রভৃতি জয়

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-বিস্তার তৈমুরের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পনর দিন দিল্লীতে অবস্থানের পর ফিরুজাবাদ ও মীরাট হইয়া স্বদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। হরিদ্বারের নিকটে তিনি এক হিন্দু বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কাংড়া ও জম্মুও দখল করিলেন। তিনি খিজির খাঁ সৈয়দকে মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন।

তৈমুরের আক্রমণ ভগবানের অভিসম্পাত স্বরূপ

ভারতবাসীর দিক হইতে বিচার করিলে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ ছিল ভগবানের অভিসম্পাতস্বরূপ।* অপর কোন আক্রমণকারী ভারতবাসীর উপর এইরূপ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত করেন নাই।

তাঁহার মৃত্যু (১৪০৫)

দিল্লী হইতে ফিরিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৈমুর লঙ্গের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার বিজিত সাম্রাজ্যের অতিক্ষুদ্র একাংশমাত্র তাঁহার অধীনে ছিল। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া তৈমুর ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তৈমুরের আক্রমণের ফলাফল

তৈমুরের আক্রমণ পতনোন্মুখ দিল্লী সুলতানির উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। তৈমুরের অবাধ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দিল্লী সুলতানির পতনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই আঘাতের পর দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিয়াছিল। দিল্লী সুলতানদের একদা বিশাল সাম্রাজ্যের স্পর্ধিত রাজধানী দিল্লী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। তৈমুরের আক্রমণের পর যে ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিল। আর ভারতবাসীদের দুর্দশার সীমা ছিল না।

তৈমুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে দিল্লীর রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া অভিজাত শ্রেণী স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ফিরুজ শাহের অপর এক

* He left india "after inflicting on India more misery than had ever before been inflicted by any conqueror in a single invasion." *Ibid*, p. 200.

পৌত্র নুসরৎ শাহ্‌কে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিতে প্ররোচিত করিল। এই সময়ে নুসরৎ শাহ্ দোয়াব অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন। অভিজাত-বর্গের প্ররোচনায় তিনি দিল্লী দখল করিলেন বটে (১৩৯৯), কিন্তু শীঘ্রই মল্লু-ইক্‌বালের হস্তে পরাজিত হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মল্লু-ইক্‌বাল পলাতক সুলতান নাসির-উদ্দিন মহম্মদকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকগণ স্বাধীন হইয়াছিলেন। নাসির-উদ্দিন মহম্মদের প্রাধান্য দিল্লী, রোটক, দোয়াব ও সম্বল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাসির-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান-পদে কেবল নামে মাত্রই অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রকৃত শাসনভার ছিল, মল্লু-ইক্‌বালের হস্তে। স্বভাবত দুর্বল সুলতান নাসির-উদ্দিন ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গিয়াস্-উদ্দিন স্থাপিত তুঘ্‌লক বংশের অবসান ঘটিল।

তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তী কালের রাজনৈতিক অবস্থা

তুঘ্‌লক বংশের অবসান (১৪১৩)

সুলতান নাসির-উদ্দিন মহম্মদের মৃত্যুতে দুই শতাধিক বৎসরের তুর্কী-শাসনের অবসান ঘটিল (১৪১৩)। আমীর ও মালিকগণ দৌলত খাঁকে তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ করিলেন। দৌলত খাঁ কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ না করিয়াই কেবলমাত্র অভিজাতবর্গের নেতা হিসাবে দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি কাটিহারের হিন্দু সামন্ত-রাজগণকে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু পর বৎসরই তৈমুর লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী আক্রমণ করিয়া দৌলত খাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া (১৪১৪) এক নূতন সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দৌলত খাঁর নেতৃপদ লাভ

খিজির খাঁ কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত

সৈয়দ বংশ, ১৪১৪-৫০ (The Sayyid Dynasty) :

খিজির খাঁ, ১৪১৪-২১ (Khijir Khan) : খিজির খাঁ নিজেকে সৈয়দ বংশ অর্থাৎ ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সৈয়দ বংশ' নামেই ইতিহাসে পরিচয় লাভ করিয়াছে। খিজির খাঁ তৈমুর লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন, সুতরাং দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াও তিনি কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত মৌখিকভাবে হইলেও নিজেকে তৈমুরের অধীন শাসনকর্তা বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহ্ রুখ্

খিজির খাঁর সৈয়দ বংশসম্ভূত বলিয়া দাবি

তৈমুরের বংশের প্রতি আনুগত্য

(Shah Rukh)-এর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নিজ আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

ফেরিস্তার বর্ণনায় খিজির খাঁ উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু খিজির খাঁ মোট সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াও দিল্লী সুলতানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার আমলে সুলতানী সাম্রাজ্য দিল্লীর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্ষুদ্র-পরিসর রাজ্যেও কোনপ্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কনৌজ, পাতিয়ালী, এটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু জমিদারগণ দিল্লীর প্রভুত্ব অমান্য করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক, এইরূপ বিদ্রোহাত্মক অবস্থার সহিত যুঝিয়া খিজির খাঁ ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র মোবারক শাহ্‌কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

খিজির খাঁর মৃত্যু

মোবারক শাহ্‌, ১৪২১-৩৪ (Mubarak Shah): মোবারক শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অরাজকতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার আমলেই এহিয়া-বিন্‌-আহ্‌ম্মদ 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী' নামে একখানি ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মোবারক শাহের রাজত্বকালের অতি নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়।

এহিয়া-বিন্‌-আহ্‌ম্মদ রচিত 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'

মোবারক শাহ্‌ ভাতিন্দা ও দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিয়া অনাদায়ী কর আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু খোকর জাতিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুলতানির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া খোকর জাতি দিল্লী অধিকার করিবার আশা পোষণ করিত। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লীর হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্রে মোবারক শাহ্‌ প্রাণ হারাইলেন। ষড়যন্ত্রকারী অভিজাতবর্গ খিজির খাঁর পৌত্র মহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

ভাতিন্দা ও দোয়াব অঞ্চলে মোবারক শাহের সাফল্য

মহম্মদ শাহ্‌, ১৪৩৪-৪৫ (Muhammad Shah): মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম দিকে অভিজাতবর্গের নেতা ওয়াজির বা মন্ত্রী সারওয়ার-উল্‌-মুলক্‌ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সারওয়ার-এর মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ্‌ যখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা পাইলেন, তখনও তিনি রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করিলেন। ফলে, অভিজাতবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ মহম্মদ শাহের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মালবের শাসনকর্তা মামুদ শাহ খল্‌জী দিল্লী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। শিরহিন্দ ও লাহোরের শাসনকর্তা বহ্‌লুল খাঁ লোদী (Bahlul Khan Lodi) মালবের শাসনকর্তার

ওয়াজির সারওয়ার উল্‌-মুলকের শাসন-ক্ষমতা

বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সুলতানের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া বহ্‌লুল খাঁ লোদী নিজেই দিল্লী অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যুতে তাঁহার এক পুত্রকে অভিজাতবর্গ সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইনি 'আলা-উদ্দিন আলম্ শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দিল্লী সুলতানের ক্ষমতা তখন দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মহম্মদ শাহের অকর্মণ্যতা

আলা-উদ্দিন আলম্ শাহ্, ১৪৪৫-৫১ (Ala-ud-din Alam Shah) : আলা-উদ্দিন সুলতান-পদের অযোগ্য ছিলেন। দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তিনি বহ্‌লুল খাঁ লোদীর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বদাউনে চলিয়া গেলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের অবসান ঘটিল।

তাঁহার অকর্মণ্যতা : বহ্‌লুল খাঁ লোদীর নিকট সিংহাসন ত্যাগ

লোদী বংশ (The Lodi Dynasty) :

বহ্‌লুল খাঁ লোদী, ১৪৫১-৮৯ (Bahlul Khan Lodi) : বহ্‌লুল লোদী ছিলেন আফগান জাতির 'লোদী' উপদলসম্ভূত। তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন রাজ্যের মধ্যেও অরাজকতা ও অব্যবস্থার শেষ ছিল না। বহ্‌লুল লোদী কিন্তু কেবলমাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সুলতানী শাসনকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আফগানসুলভ সামরিক দক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি প্রথমেই নিজেকে মন্ত্রী হামিদ খাঁর প্রভাবমুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী হামিদ খাঁর সহায়তায় তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হামিদ খাঁর প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে না পারিলে শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কোন স্বাধীনতা থাকিবে না বিবেচনা করিয়াই বহ্‌লুল লোদী হামিদ খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন। জৌনপুরের মহম্মদ শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন, বহ্‌লুল লোদী তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তগণের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই বহ্‌লুল পুনরায় দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন।

বহ্‌লুল লোদীর কার্যাদি

শাসক হিসাবে বহ্‌লুল লোদী ফিরুজ শাহ্ তুঘ্‌লকের পরবর্তী দিল্লী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিধ্বস্ত সুলতানী সাম্রাজ্যের মর্যাদা বা শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনা তখন কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। উদ্ধত আফগান অভিজাতবর্গের ক্ষমতালিপ্সা বহ্‌লুল লোদী কর্তৃক দিল্লী সুলতানির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। আফগান

আফগান অভিজাত-বর্গের ঔদ্ধত্য

অভিজাতবর্গ বহ্‌লুল লোদীকে সুলতানের সম্মান দিতেন না। বাধ্য হইয়া আফগান অভিজাতবর্গের প্রধান হিসাবে যতটুকু সম্মান পাওয়া সম্ভব ছিল তাহাতেই বহ্‌লুল লোদীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, বহ্‌লুল লোদীর চেষ্টায় দিল্লী সুলতানির হৃত ক্ষমতা ও মর্যাদা কতক পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বহ্‌লুল লোদীর আংশিক সাফল্য

ব্যক্তি হিসাবেও বহ্‌লুল লোদী অনাড়ম্বর, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি দয়া, বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা, শাসন ব্যাপারে দক্ষতা বহ্‌লুল লোদীর চরিত্রের অপরাপর বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিওর জয় করিয়া ফিরিবার পথে বহ্‌লুল লোদী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং জলালী নামক শহরের নিকট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

সিকন্দর লোদী, ১৪৮৯-১৫১৭ (Sikandar Lodi): বহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বহ্‌লুল লোদীর দ্বিতীয় পুত্র নিজাম খাঁকে অভিজাতবর্গের একদল সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলে প্রথম পুত্র বারবক শাহ্‌ কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন। বহ্‌লুল লোদী কর্তৃক বারবক শাহ্‌ জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

নিজাম খাঁ 'সিকন্দর শাহ্‌ লোদী' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান-পদ গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই সিকন্দর শাহ্‌ বারবক শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ফলে, বারবক শাহ্‌ সিকন্দরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তা হিসাবেই রাখা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া সিকন্দর শাহ্‌ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তিনি যাহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিতে না পারেন, সেজন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

নিজাম খাঁর সিকন্দর শাহ্‌ নাম ধারণ: তাঁহার সাফল্য

সিকন্দর শাহ্‌ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনের বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া তিনি সুলতানী শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি তিরহুত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল জয় করিয়া সুলতানী রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিলেন এবং বাংলাদেশের সুলতান হুসেন শাহের সহিত তিনি মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না, এই শর্তবদ্ধ হইলেন।

তিরহুত ও বিহার জয়; বাংলাদেশের সহিত সন্ধি

আফগান অভিজাতবর্গের ঔদ্ধত্য দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের জায়গীরের হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা হইতে আফগান অভিজাতবর্গকে তিনি বঞ্চিত করিলেন। সরকারী আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। বহুসংখ্যক গুপ্তচর

সিকন্দর শাহের শাসনব্যবস্থা

নিয়োগ করিয়া তিনি প্রজাবর্গের মতামত সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শস্যকর এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সিকন্দর লোদীর প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। দৃঢ়চেতা, ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তিনি সমসাময়িক ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। দরিদ্র প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভূতি, বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিচার ব্যাপারে সততা তাঁহার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজেও ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার সুশাসনের ফলস্বরূপ রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা যেমন ফিরিয়া আসিয়াছিল, প্রজাবর্গের জীবনযাত্রাও তেমনি স্বচ্ছন্দতর হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা শহরটি তাঁহার আমলেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে সিকন্দর শাহ্ লোদী অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি হিন্দুদের নির্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মথুরার হিন্দু মন্দির তাঁহারই আদেশে ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল। হিন্দুদিগকে যমুনা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। জনৈক ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, এই কথা বলিবার অপরাধে সুলতানের আদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্র

তাঁহার ধর্মান্ধতা

ইব্রাহিম লোদী, ১৫১৭-২৬ (Ibrahim Lodi): ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ্ লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু অভিজাতবর্গের একদল ইব্রাহিম লোদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খাঁ লোদীকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইব্রাহিম লোদী জালাল খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সুলতানী রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ রোধ করিলেন।

সিংহাসন লাভ

ইব্রাহিম লোদীর সামরিক দক্ষতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার বিচার-বিবেচনা ও দূরদর্শিতা বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি আফগান এবং অপরাপর অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন করিবার চেষ্টা শুরু করিলে স্বভাবতই অভিজাত শ্রেণী তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দরিয়া খাঁ লোহানীর অধীনে বিহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর পুত্র দিলওয়ার খাঁর প্রতি সুলতান ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহার অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ (ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত) ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীর বাবর (Babar)-এর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবর ছিলেন তৈমুরের বংশধর। তাঁহার যুদ্ধ-ক্ষমতা যেমন ছিল অনন্যসাধারণ, তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তেমনি অপরিসীম। বাবর এই আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম

তাঁহার কার্যকলাপ: অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতা

লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিলেন। এইভাবে দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিল।

দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Delhi Sultanate): দিল্লী সুলতানি দুই শতাব্দীর অধিককাল ভারতবর্ষের এক সুবিশাল অংশে প্রভুত্ব করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বস্তুত, তুঘ্‌লক বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কী শাসন তথা দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পর সৈয়দ ও লোদী বংশ কিছুকাল দিল্লী সুলতানি হস্তগত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোদী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতানি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এই পতনের পশ্চাতে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই দুই প্রকার কারণই ছিল।

পতনের দুই প্রকার কারণ: অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত

অভ্যন্তরীণ কারণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দিল্লী সুলতানি ছিল সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য বা জাতীয়তাবোধের উপর নহে। সুলতানির নিরাপত্তা বা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। জনসাধারণের এইরূপ নির্লিপ্ততার ফলে সুলতানি শাসনের ভিত্তি স্বভাবতই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের বাহ্যিক রূপ যতটা প্রভুত্বব্যঞ্জক ছিল ঠিক সেই তুলনায় উহা ছিল শক্তিহীন, বলা বাহুল্য।

অভ্যন্তরীণ

(১) সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্য

দ্বিতীয়ত, সুলতানী শাসন সামন্ত-প্রথা অনুসরণ করিয়া চলিত। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সহজাত ত্রুটি-ই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীন হইয়া যাইত। ফলে, একই স্থান পুনঃপুনঃ জয় করিবার অথবা ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করিবার প্রয়োজন হইত। রাজকর্মচারিবর্গ, সামরিক নেতৃবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের ক্ষমতালিপ্সা ও স্বার্থপরতা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের অভাব শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি করিত। স্বার্থান্বেষণে ব্যগ্র রাজ-কর্মচারিগণের উপর নির্ভরশীল শাসনব্যবস্থার সংহতি বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বের শেষ ভাগে এইরূপ দুর্বলতার চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সিন্ধুদেশ, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য ঐ সময়েই স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল।

(২) সামন্ততান্ত্রিক শাসনের সহজাত দুর্বলতা

তৃতীয়ত, সুলতানগণ ও অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবনতি ও রাজসভার বিলাস-ব্যসন সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। একমাত্র আলা-উদ্দিন খল্‌জীর আমলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস ব্যসন বন্ধ ছিল, কিন্তু অপরাপর সুলতানদের আমলে ব্যাপক বিলাসপ্রিয়তা ও দুর্নীতি সুলতানদের দেশ শাসনের নৈতিক দাবি বিনষ্ট করিয়াছিল।

(৩) সুলতানগণ ও অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবনতি ও বিলাস-ব্যসন

চতুর্থত, সুলতানী আমলের শেষ দিকে ক্রীতদাসের সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের ভরণপোষণে রাজকোষের প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইত। ইহা ভিন্ন, সুলতানদিগকে ক্রীতদাস উপঢৌকন দিয়া সামন্ত রাজগণ ও স্থানীয় শাসনকর্তাগণ তাহাদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক কর বা রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া লইতেন। ফলে, রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। সুলতানী আমলের প্রথম দিকে ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে ইল্‌তুৎমিস্‌, বলবন ও কুতব-উদ্দিনের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে কোন উল্লেখযোগ্য শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই।

(৪) অকর্মণ্য ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কুফল

পঞ্চমত, সুলতানী আমলের শেষ ভাগে সুলতানগণের অধিকাংশ-ই যেমন ছিলেন শাসনকার্যে অক্ষম, তেমনি ছিলেন নৈতিকতাবর্জিত। ইহার ফল শাসনকার্যের দুর্বলতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

(৫) পরবর্তী সুলতানগণের দুর্বলতা

ষষ্ঠত, মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লকের অবাস্তব আদর্শবাদিতা ও অকার্যকর পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তিই দুর্বল হইয়াছিল এমন নহে, সুলতান-পদের মর্যাদাও হ্রাস পাইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধু কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। এই পতনোন্মুখতা রোধ করিবার, অথবা দিল্লী সুলতানিকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা পরবর্তী কোন সুলতানেরই ছিল না। সামরিকক্ষেত্রে অকর্মণ্য ফিরুজ তুঘ্‌লক বাংলাদেশ পুনরধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। দাক্ষিণাত্য পুনরধিকারের চেষ্টাও তিনি করেন নাই। উপরন্তু তিনি জায়গীর-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া ও অপাত্রে দয়া প্রদর্শন করিতে গিয়া সুলতানী শাসনকে অধিকতর দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অযৌক্তিক উদারতায় অভিজাত শ্রেণী শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(৬) মহম্মদ তুঘ্‌লকের আমলের অব্যবস্থা

সপ্তমত, বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব, সুলতান, রাজকর্মচারিবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দেশরক্ষা ও জনকল্যাণের দায়িত্ব স্বভাবতই সকলে ভুলিয়া গিয়া দুর্নীতিপূর্ণ আনন্দে নিমজ্জিত রহিলেন। ফলে, ঐ সময়ে বিদেশী আক্রমণ শুরু হইলে স্বভাবতই তাঁহারা দেশরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না।

(৭) বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার অক্ষমতা

সর্বশেষে, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুলতানদের অধিকাংশ-ই তাঁহাদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানের সুলতানদের পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন পরিচালনার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। জিজিয়া কর স্থাপন ও প্রকাশ্যে পৌত্তলিক ধর্মপালন নিষেধ করিয়া অ-মুসলমান প্রজাবর্গের আনুগত্য তাঁহারা হারাইয়াছিলেন।

(৮) অ-মুসলমান প্রজাবর্গের প্রতি বিভেদমূলক ব্যবহার

দিল্লী সুলতানির পতনের বহিরাগত কারণ ছিল দুইটি। প্রথমত, দিল্লী সুলতানি যখন পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, তখন তৈমুর কর্তৃক ভারত-আক্রমণ এবং দিল্লীতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সুলতানির উপর যে আঘাত হানিয়াছিল, তাহার কুফল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তৈমুরের আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক সংহতি বিনাশ করিয়া দিল্লী সুলতানির পতন ঘটাইয়াছিল।

বহিরাগত কারণ ঃ
(১) তৈমুরের আক্রমণ

দ্বিতীয়ত, লোদী বংশের শাসনের দুর্বলতা, ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচার ও অকর্মণ্যতা অভিজাত শ্রেণী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের আমীর বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবরের সাহায্যে দিল্লী সুলতানি দখল করা-ই ছিল দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্যত দেখা গেল সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে এক নূতন প্রভু আনয়ন করিয়াছিলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লী সুলতানির তথা তুর্কী-আফগান শাসনের অবসান ঘটাইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

(২) বাবরের আক্রমণ

———

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ

(Independent Kingdoms out of the ashes of the Sultanate)

(১)

দিল্লী সুলতানির দুর্বলতা : স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

উত্তর-ভারতীয় রাজ্যসমূহ (Kingdoms of Northern India) : দিল্লী সুলতানির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল স্বাধীনতা ভোগের পরই প্রায় সব কয়টি রাজ্যই মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ ও মুঘল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্তর্বর্তী কালের ইতিহাস এই সকল রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীন ইতিহাস। এই ইতিহাস স্বভাবতই পৃথকভাবে আলোচনা করা সমীচীন।

শর্কী বংশের প্রতিষ্ঠা

জৌনপুর (Jaunpur) : ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের আমলে মালিক সারওয়ার নামক জনৈক ক্ষমতাবান খোজা (eunuch) জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সারওয়ার তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আলিগড় ও পূর্বে তিরহুত পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। সারওয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজবংশ শর্কী (Sharqi) বংশ নামে পরিচিত। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সারওয়ারের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র মালিক করণফুল 'মোবারক শাহ্ শর্কী' নাম ধারণ করিয়া জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামান্য তিন বৎসর রাজত্বের পর ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ্ শর্কী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম শর্কী বংশের শ্রেষ্ঠ শাহ্ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আমলে জৌনপুরে যে সকল মসজিদ ও হর্ম্যাদি নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলিতে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতাল মসজিদ (*Atala Masjid*) আজিও হিন্দু স্থাপত্য-প্রভাবিত মুসলমান নির্মাণশিল্পের নিদর্শন হিসাবে বিদ্যমান আছে। ইব্রাহিম বাংলাদেশের রাজা গণেশ-এর বিরুদ্ধে

ইব্রাহিম শর্কী—'শর্কী বংশের শ্রেষ্ঠ শাহ্'

অভিযানে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ্ মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি চুণার জেলার অধিকাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কাল্পী জয় করিতে গিয়া তিনি অকৃতকার্য হন। দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি বহ্লুল লোদীর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। মামুদ শাহ্-এর মৃত্যুর (১৪৫৭) পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলে হুসেন শাহ্ (১৪৫৮-৭৯) সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন শাহ্ বহ্লুল লোদীর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন এবং তিরহুতের স্বাধীন জমিদারগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তথাকার হিন্দু রাজার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন। গোয়ালিওর দুর্গ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হইতে না পারিলেও রাজা মানসিংহের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তিনি আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি বহ্লুল লোদীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং জৌনপুর পুনরায় দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়।

মামুদ শাহ্ ও মহম্মদ শাহ্

হুসেন শাহ্

কাশ্মীর (Kashmir): প্রথমে কাশ্মীর দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বটে, কিন্তু ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ মিরজা নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান কাশ্মীরের হিন্দুরাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। শাহ্ মির্জা 'শামস্-উদ্দিন শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪৬)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র জামসিদ্, আলা-উদ্দিন, শিহাব-উদ্দিন ও কুতব-উদ্দিন পরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব-উদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৩৯৪) তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দর শাহ্ ছিলেন হিন্দুবিদ্বেষী ও ধর্মোন্মত্ত অত্যাচারী শাসক। তাঁহার অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। এইভাবে কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমানদের যে সংখ্যাধিক্য ঘটে তাহাই কাশ্মীরের বর্তমান জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের মূল কারণ। তৈমুর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সিকন্দর শাহ্ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র আলি শাহ্ এবং পরে দ্বিতীয় পুত্র শাহী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'জৈন-উল্ আবিদীন' উপাধি গ্রহণ করেন।

কাশ্মীরে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন

সিকন্দর শাহের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

কাশ্মীরের মুসলমান রাজগণের মধ্যে জৈন-উল্-আবিদীন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী, উদারচেতা ও সুদক্ষ শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি যে-সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার অত্যাচারে দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সকল ধর্মের লোককেই ধর্মপালনের চূড়ান্ত স্বাধীনতা দান করেন। তাঁহার প্রজাহিতৈষণা ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতা মুঘলসম্রাট আকবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রজার মঙ্গলের জন্য জৈন-উল্-আবিদীন রাজপথে দস্যু-তস্করের উপদ্রব নিবারণ করেন। গ্রাম্য-শাসনভার তিনি গ্রামের প্রতিনিধিবর্গের উপর ন্যস্ত করেন। ইহা ভিন্ন, মুদ্রা-নীতির উন্নতি সাধন করিয়া দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া তিনি প্রজাবর্গের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া প্রজামাত্রেরই অধিকার যে সমান সেই নীতি তিনি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

জৈন-উল্-আবিদীন
(১৪২০-৭০)

তাঁহার প্রজাহিতৈষী উদার নীতি

জৈন-উল্-আবিদীন নিজ মাতৃভাষা ভিন্ন হিন্দী, ফারসী ও তিব্বতীয় ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ তিনি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা, প্রজাহিতৈষণা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতার জন্য তাঁহাকে 'কাশ্মীরের আকবর' (*The Akbar of Kashmir*) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা: 'কাশ্মীরের আকবর'

জৈন-উল্-আবিদীন পরবর্তী রাজগণের অকর্মণ্যতাহেতু মির্জা হায়দর নামে মুঘল-সম্রাট হুমায়ুনের জনৈক আত্মীয় কাশ্মীর জয় করিতে সমর্থ হন (১৫৪০)। কয়েক বৎসর পরে (১৫৫৫) কাশ্মীরের অভিজাতবর্গ মির্জা হায়দরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চক্ বংশ (The Chakks) নামে এক নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মুঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে।

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

মালব (Malawa): চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে (১৩০৫) আলা-উদ্দিন খলজী মালব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া দিল্লীর সুলতানের অধীন থাকিবার পর ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার শাসনকর্তা দিলওয়ার খাঁ ঘুরী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিলওয়ার খাঁ জাতিতে ছিলেন আফগান। অল্পকালের মধ্যেই হুসাং শাহ্ (Hushang Shah) কর্তৃক দিলওয়ার খাঁর পুত্র নিহত হন। হুসাং শাহ্ সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি অতর্কিতে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজার নিকট হইতে ৭৫টি হাতী আদায় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি খেরল (Kherl)

হুসাং শাহের রাজ্যবিস্তার

জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লী, গুজরাট, বহমনী রাজ্য, জৌনপুর প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির সহিত তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মালবে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা

হুসাং শাহের মৃত্যুর অল্পকাল পরই মামুদ খাঁ খলজী মালবের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। মামুদ ছিলেন হুসাং শাহের পুত্র গজনী খাঁর মন্ত্রী। মামুদ খাঁ খলজী গুজরাটের আহম্মদ শাহের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার অভিযান বিফলতায় পর্যবসিত হয়। মেবারের রাণা কুম্ভ এবং বহমনী সুলতানদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মামুদ খলজী মালবের মুসলমান রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। শাসনকার্যের দক্ষতা, সামরিক প্রতিভা, ব্যবহারিক অমায়িকতা, সততা ও বিদ্যোৎসাহিতা তাঁহাকে সমসাময়িক সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল।

মামুদ খলজী

আকবর কর্তৃক মালব বিজয় (১৫৬১)

পরবর্তী কালে মালবের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। মামুদ খলজী (২য়) মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের হস্তে পরাজিত ও ধৃত হন। তাঁহার-ই রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ মালব জয় করেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক মালব দেশ বিজিত হওয়ার পূর্বেও সম্রাট হুমায়ুন ও শের শাহ্ মালব অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুজরাট (Gujarat)ঃ ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন খলজী গুজরাট দিল্লী সুলতানির অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীর পর তথাকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা জাফর খাঁ তুঘলক বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৪০১)। জাফর খাঁ সাময়িক কালের জন্য নিজ পুত্র তাতার খাঁ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিল্লীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে জাফর খাঁ পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন। এইবার তিনি সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ্ নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

মুজফ্‌ফর শাহ্

মুজফ্‌ফর শাহ্ মালবের সুলতান হুসাং শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ধার নামক স্থানটি অধিকার করেন। তিনি জৌনপুরের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুজফ্‌ফর শাহের পৌত্র আহ্‌মদ শাহ্ (১৪১১-৪২) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সুলতান ছিলেন। তিনি মালব, খান্দেশ ও কতিপয় রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নতি এবং বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই আহম্মদাবাদ শহরটি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আহ্‌মদ শাহ্

এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আহ্‌মদ শাহের পৌত্র আবুল ফত খাঁ (Abul Fath Khan)। তিনি ইতিহাসে মামুদ বেগরহা (Mahmud Begarha) নামে

পরিচিত। তিনি মালবদেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া গিরনার ও চম্পানীর জয় করেন। তিনি জগৎ (দ্বারকা) নামক স্থানের দস্যুদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার আমলে গুজরাট রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কেবল রাজ্য বিস্তার করিয়াই মামুদ বেগরহা ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রজার মঙ্গলসাধন, ন্যায্য বিচার এবং ইসলামধর্ম প্রবর্তনের জন্যও তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিতেন। তিনি মিশরের সুলতানের সহিত যুগ্মভাবে পোর্তুগীজ জল-দস্যুদের দমন করিতে চেষ্টা করেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশর ও গুজরাটের এক যুগ্ম নৌ-বাহিনী বোম্বাই-এর সন্নিকটে এক জলযুদ্ধে পোর্তুগীজদের পরাজিত করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর (১৫০৯) পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনী এই যুগ্ম বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ইহার ফলে পোর্তুগীজগণ মামুদ বেগরহা-এর নিকট হইতে দিউ (Diu) নামক স্থানে কুঠি স্থাপনের অধিকার লাভ করে।

মামুদ বেগরহা

পোর্তুগীজ দমন

পরবর্তী সুলতানগণ দ্বিতীয় মুজফ্ফর শাহ্ ও বাহাদুর শাহ্ রাজপুতদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ্ চিতোর বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৫৩৪)। তিনি মালব জয় করিয়া গুজরাট রাজ্যের সীমা আরও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মুঘলসম্রাট হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হইয়া তিনি মালব ও নিজ রাজ্যের একাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের একাংশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বাহাদুর শাহ্ পুনরায় এই সকল স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করেন। বাহাদুর শাহ্-ই ছিলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান। তিনি পোর্তুগীজদের জলদস্যুতা দমনের উদ্দেশ্যে পোর্তুগীজ গবর্ণর নুনহো দা চুনহা (Nunho da Cunha)-র সহিত সাক্ষাতের জন্য এক পোর্তুগীজ জাহাজে উঠিলে পোর্তুগীজরা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার অনুচরদের হত্যা করে। বাহাদুর শাহের পরবর্তী সুলতানদের স্বাধীনভাবে শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না। সেই সুযোগে অভিজাতবর্গ শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

দ্বিতীয় মুজফ্ফর শাহ্ ও বাহাদুর শাহ্

পোর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতা

(২)

বাংলাদেশের ইতিহাস (History of Bengal) : সুলতানী শাসনের চরম প্রতিপত্তিকালেও বাংলাদেশের উপর দিল্লীর সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দূরত্বই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী (Ikhtyar-Uddin Muhammad-Bin Bakhtyar Khalji) ঃ বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী। প্রথম জীবনে বখ্‌তিয়ার খল্‌জী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের ন্যায় গজনীতে শিহাবুদ্দিন ঘুরীর সেনা-বাহিনীতে চাকরী গ্রহণের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। ইহার পর দিল্লীতে মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতব-উদ্দিন আইবকের সভায় আসিয়াও তিনি নিরাশ হন। অবশেষে বদাউন প্রদেশের শাসনকর্তার অধীনে কিছুকাল বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে কাজ করিয়া তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাম-উদ্দিনের চাকরী গ্রহণ করেন (১১৯৭ খ্রীঃ)। হুসাম-উদ্দিন তাঁহাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার একাংশে দুইটি ক্ষুদ্র পরগণার জায়গীর দান করেন। এই অঞ্চলের জায়গীরদার হিসাবে অবস্থানকালেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গহড়বাল নেতৃবর্গকে পরাজিত করিয়া বখ্‌তিয়ার খল্‌জী প্রথমেই নিজ জায়গীরের সীমা প্রসারিত করেন। তারপর কর্মনাশা নদীর পূর্বতীর ধরিয়া তিনি বর্তমান বিহার অঞ্চলের দিকে অভিযান শুরু করেন। সেই সময় খল্‌জী ও তুর্কী মালিকদের অনেকেই ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। যাহা হউক, বখ্‌তিয়ার খল্‌জী উত্তর-বিহারে কর্ণাটক বংশের অধীনে শক্তিশালী মিথিলা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি দক্ষিণ-বিহারের দিকে অভিযান শুরু করিলেন। কুতব-উদ্দিন আইবক্‌ মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের নেতৃত্বে ইসলামের সাফল্যে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে 'খিলাৎ'* প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কিন্তু ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব অল্প সময়ে এবং অল্প রক্তপাত করিয়া অধিক পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা।† তিনি দক্ষিণ-বিহার অঞ্চলে একটি সুরক্ষিত 'বিহার' (Hisar-i-Bihar) অধিকার করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় লোককে হত্যা করিলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। এই বিহারটি ছিল

প্রথম জীবন

ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

দক্ষিণ-বিহারে অভিযান

অভিযানের উদ্দেশ্য

---

* "Malik Qutbuddin Aibak is said to have hailed the rising star of Islam (Muhammad Bakhtyar) by sending him a *khilat* with words of praise and encouragement." *History of Bengal* (D. U.) Vol. II, pp. 2-3.

† "Muhammad Bakhtyar was not the knight-errant of Islam to seek out and fight only his most formidable Hindu adversaries of whom there were several in the neighbourhood...His object was to secure a maximum of booty at a minimum of risk and bloodshed." *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 3.

'ওদন্তপুর বিহার' নামে পরিচিত। এই 'বিহার' নাম হইতেই মুসলমানগণ বিহার প্রদেশের নামকরণ করিয়াছিল।* পর বৎসর (১২০০ খ্রীঃ) মহম্মদ বখ্তিয়ার পুনরায় দক্ষিণ-বিহারের দিকে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়া সেই অঞ্চলে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক শাসনকার্যও শুরু করিলেন। ইহা হইতে একথা স্বভাবতই মনে করা যাইতে পারে যে, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মহম্মদ বখ্তিয়ার দক্ষিণ-বিহারের কতকাংশে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।†

দক্ষিণ-বিহারে মুসলমান অধিকার স্থাপন

পর বৎসর (১২০১ খ্রীঃ) মহম্মদ বখ্তিয়ার খল্জী বাংলার লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। একদিন শীতের মধ্যাহ্নে মাত্র ১৮ জন‡ অশ্বারোহী অনুচরসহ বখ্তিয়ার নদীয়ার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বণিকের ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিতে তাহাদের কোন অসুবিধা হইল না। লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া তাহারা আকস্মিকভাবে তরবারি বাহির করিয়া আক্রমণ শুরু করিলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এক দারুণ ভীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইল। লক্ষ্মণ সেন রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নৌকাযোগে গোপনপথে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে বখ্তিয়ার খল্জীর সেনাবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে সমগ্র নদীয়া নগরটি বখ্তিয়ারের অধিকারে আসিল। এইভাবে বাংলাদেশে হিন্দু আধিপত্যের অবসান ঘটিয়া মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইল। পূর্ববঙ্গে অবশ্য লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহম্মদ বখ্তিয়ার খল্জীর নদীয়া আক্রমণ

বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার স্থাপন

মহম্মদ বখ্তিয়ার কর্তৃক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অধিকার স্থাপনের বিবরণ সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবকাৎ-ই-নাসিরী, ফতুয়া-উস্-সালাতিন, রিয়াজ-উস্-সালাতিন প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে

---

* "As the Muslims learnt afterwards that it was a *Vihara* or *Madrasa* they gave the whole country the name of Bihar...The fortified monastery which Bakhtiyar captured probably in 1199 A. D. was known as *Andand Bihar* or *Odandapura-Vihara.*" *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 3.

† *Riyaz-us-Salatin* quoted in *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 3.

‡ ১৮ জন অশ্বারোহী অনুচরসহ বখ্তিয়ার খল্জী, অর্থাৎ মোট ১৯ জন (১৮+১)। Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 242, Vol. II, p. 4.

পরস্পর-বিরোধী বিবরণ রহিয়াছে। মিনহাজ-উদ্দিন তাঁহার 'তবকৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে মহম্মদ বখ্তিয়ারের নদীয়া-জয় সম্পর্কে এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, বখ্তিয়ার কর্তৃক বিহার-জয়ের কথা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গ জানিবার পর তাঁহার মন্ত্রী, জ্যোতিষী, সকলেই তাঁহাকে নদীয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মন সেন অবশ্য এই কাপুরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রীদের কেহ কেহ, ধনী বণিক সম্প্রদায়, ধর্মভীরু ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি অনেকে পূর্বাহ্নেই পলাইয়া গিয়া পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায়ও বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া যান নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে একদিন দ্বিপ্রহরে রাজা লক্ষ্মন সেন যখন মধ্যাহ্নাহারে বসিয়াছেন, সেই সময়ে মহম্মদ বখ্তিয়ার ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ রাজধানীর তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ বখ্তিয়ারের বিশাল বাহিনীর অন্য সকলে তখনও পশ্চাতে ছিল, কারণ তাহারা বখ্তিয়ার-এর সহিত অশ্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই। মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে সক্ষম হইয়াছিল।* রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন গোপনপথে নগ্নপদে রাজধানী ত্যাগ করিয়া গেলেন।†

মিনহাজের বিবরণ: মহম্মদ বখ্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণ

লক্ষ্মণসেনের নদীয়া ত্যাগ

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিনহাজের এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে করেন না। মহম্মদ বখ্তিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকৃত হইবার সংবাদ পাইবার পরও লক্ষ্মণ সেন দেশরক্ষা বিশেষভাবে রাজধানী-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই, একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মিনহাজ-উদ্দিন, 'ফতুয়া-উস্-সালাতিনে'র রচয়িতা ইসামির রচনায় একথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে যে, মহম্মদ বখ্তিয়ার খলজী ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইসামির বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহম্মদ বখ্তিয়ার বণিকের ছদ্মবেশে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে উপঢৌকন দিতে গিয়া নিজের অনুচরবর্গকে হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ শুরু করিবার ইঙ্গিত করেন। হিন্দুগণ এইভাবে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াও রাজা লক্ষ্মণ সেনের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া এবং মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিল। তাহাদের পারদর্শিতায় মুসলমান সৈনিকদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তারপর মহম্মদ খলজীর অনুচরগণ যখন একই সঙ্গে হিন্দু সৈনিকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত

মিনহাজ ও ইসামির বর্ণনার সামঞ্জস্য

ইসামির বিবরণ

* Minhaj : Tabaqat-i-Nasiri, quoted in *History of Bengal* (D. U.), Vol. I, p. 242.

† Ibid, p. 243.

তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। রাজা লক্ষ্মণ সেন মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের হস্তে বন্দী হইলেন।*

যাহা হউক, মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ ও ইসামির বিবরণ হইতে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। ইহা ভিন্ন, ১৮ জন অনুচরসহ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, একথাও যে সত্য নহে তাহা মিন্‌হাজ-উদ্দিনের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়। মধ্যাহ্নকালে স্নানাহারের সময় বাংলাদেশের সর্বত্র (অন্ততঃ সেই যুগে) শিথিলতা দেখা দিত। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার এইরূপ সময়ে নদীয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে উহা অধিকার করা সহজ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, তিনি যখন ১৮ জন অশ্বারোহী অনুচরসহ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অশ্বারোহীদের অপর একদল নগরের মধ্যস্থল এবং তৃতীয় দল তোরণদ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কারণ, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যখন আক্রমণ শুরু করেন, তখন একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, নগরের মধ্যস্থল এবং তোরণদ্বার—এই তিন অংশ হইতে আক্রমণসূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সুতরাং মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়া বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বাংলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তী নিছক কিংবদন্তী ভিন্ন অপর কিছু নহে।†

মিন্‌হাজ ও ইসামির বিবরণের প্রকৃত মূল্য

মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণ সেনকে উদারচেতা, দয়াবান ও পরাক্রমশালী 'রায়' অর্থাৎ 'রাজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনকে দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়া বীরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।‡

---

*..."Muhammad Bakhtyar reached Nadia in the disguise of the leader of a merchant caravan from Seistan and induced Rai Lakhmaniya to come out of the palace to inspect the thorough bred Tartar horses and excellent brocade of China, besides vast stores of the rare products of every clime which he had brought for sale. When the Rai reached the *Karwan* (halting place of the caravans) Muhammad offered him a rich *peshkash* of precious things and at the same time made a signal to a party of his soldiers, to fall upon the Hindus. The Turks charged and defeat befell the Hindu soldiers, party of whom, however, stood their ground firmly around the Rai which created alarm among the Turks......At last when the brave warriors of the Khilji breed made a hurricane-like onslaught and killed some Hindu *Sawars*, the Rai fell a prisoner to Bakhtyar."—Isami; *Futuh-us-Salatin*, Vide: *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 4-5.

† Vide: *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 6-8.

‡ Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. I., p.p. 246-47.

ক্রমে পূর্ববঙ্গ ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর অংশেও মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়।

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য

বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা কতকটা দলীয় সামন্ত-প্রথার ন্যায় ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের মৃত্যুর পর আলি মর্দান বাংলাদেশের শাসন সাময়িককালের জন্য হস্তগত করেন। ইহার পর মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তিব্বত জয় করিবার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। অই অভিযানের ব্যর্থতার ফলে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের শক্তি-সামর্থ্য ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলে বিহার তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে আলি মর্দান খল্‌জী তাঁহাকে হত্যা করেন বলিয়া কথিত আছে (১২০৬ খ্রীঃ)।* কিন্তু মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর অনুগত খল্‌জী মালিক ইয়াজ-উদ্দিন মহম্মদ শিবান ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলি মর্দানকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া খল্‌জী মালিকদের ইচ্ছাক্রমে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনিধি কুতব-উদ্দিন আইবক্‌ স্বাধীন সুলতান-পদ গ্রহণ করিলে আলি মর্দান বন্দিদশা হইতে পলাইয়া গিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলি মর্দানের অনুরোধে সুলতান কুতব-উদ্দিন অযোধ্যার শাসনকর্তা রুমিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। রুমি ইয়াজ-উদ্দিন মহম্মদ শিবানের স্থলে হুসান-উদ্দিন ইয়াজকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা-পদে স্থাপন করেন (১২০৮)। ইহার অল্পকাল পর আলি মর্দান কুতব-উদ্দিনের পার্শ্বচর হিসাবে গজনীর তাজ-উদ্দিন

কুতব-উদ্দিনের পার্শ্বচর হিসাবে আলি মর্দান

ইল্‌দিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া শেষ পর্যন্ত ইল্‌দিজের সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় কুতব-উদ্দিনের সহিত মিলিত হন। আলি মর্দানের বীরত্বে ও আনুগত্যে প্রীত হইয়া কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতীর অর্থাৎ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হুসান-উদ্দিন ইয়াজ কুতব-উদ্দিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলি মর্দানের লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তৃপদ গ্রহণে প্রকাশ্য বাধার সৃষ্টি করিলেন না। পরবর্তী দুই বৎসর ১২১০-১২১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলি মর্দান এক অত্যাচারী

আলি মর্দানের স্বাধীনতা ঘোষণা

শাসন চালাইয়া দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিলেন। ইতিমধ্যে কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে মুলতান ও সিন্ধু-প্রদেশের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচার ন্যায় আলি মর্দানও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার

তাঁহার মৃত্যু

নূতন নাম হইল 'সুলতান আলা-উদ্দিন'। কিন্তু আলি মর্দানের (সুলতান আলা-উদ্দিন) অত্যাচারী শাসনের ফলে তাঁহার অনুচরদের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সুযোগে হুসান-উদ্দিন ইয়াজ গোপনে ষড়যন্ত্র

* *Vide, History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 10-11.

করিয়া আলি মর্দানকে হত্যা করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১২১৩ খ্রীঃ)। তাঁহার নূতন উপাধি হইল সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খলজী।

সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খলজী, ১২১৩-২৭ (Sultan Ghyasuddin Iwaz Khilji, 1213-27) : সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গিয়াস-উদ্দিন শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় সম্রাট তৃতীয় অঙ্গভীমের সেনাপতি ও মন্ত্রী বিষ্ণু রাঢ় দেশ আক্রমণ করেন। তিনি বীরভূমের লক্নোর নামক স্থানটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হইবার পর মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে এক হতাশা দেখা দেয়। যাহা হউক, সৈনিকদের মধ্যে জেহাদের জিগীর তুলিয়া এবং সুলতানের তথা ইসলামের মর্যাদা রক্ষার কথা বলিয়া তাহাদের মনে কতকটা উৎসাহের সৃষ্টি করা হইল।

তাঁহার সমস্যা

আনুমানিক ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন লক্নোর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর লক্নোর গিয়াস-উদ্দিন কর্তৃক পুনরাধিকৃত হইল। মিন্হাজ-উদ্দিনের রচনায় উল্লিখিত আছে যে, গিয়াস-উদ্দিন লক্নোর পুনরুদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অজয় নদীর তীর হইতে শুরু করিয়া দামোদর নদী ও বিষ্ণুপুর পর্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিলেন। মিন্হাজ-উদ্দিনের মতে বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), কামরূপ ও তিরহুত গিয়াস-উদ্দিনকে নিয়মিত কর প্রেরণ করিত। আধুনিক ঐতিহাসিক এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া মনে করেন না।* যাহা হউক, গিয়াস-উদ্দিন যে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন এবং দক্ষিণ-বিহার পুনর্দখল করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার রাজ্য লক্ষ্মণাবতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জরা, ঘোড়াঘাট, বর্তমান বগুড়া ও রাজসাহীর কতকাংশ, টাণ্ডা, শরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, দক্ষিণ-বিহার প্রভৃতি কতকগুলি সরকারে বিভক্ত ছিল।† তিনি তাঁহার রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গিয়াস-উদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারের যে সকল অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল সেগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। গিয়াস-উদ্দিন গৌড়কে বাৎসরিক প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দেবকোট ও লক্নোর শহর দুইটিকে গৌড়ের সহিত প্রশস্ত রাস্তা, খেয়া প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

লক্নোর পুনরাধিকার

তাঁহার রাজ্যসীমা

রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান

এইভাবে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াস-উদ্দিন দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিলে পর, ঐ বৎসর দিল্লী সুলতান ইল্তুৎমিস্ বাংলা ও বিহার জয় করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। গিয়াস-উদ্দিনও ইল্তুৎমিস্কে

ইল্তুৎমিসের বিহার ও বাংলা আক্রমণ

* *Vide, History of Bengal,* (D. U.), Vol. II, p. 22-23.

† *Vide, History of Bengal* (D. U), Vol. II, p. 29.

বাধাদানের উদ্দেশ্যে পদাতিক ও নৌবাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের অবস্থা শকরিগলি ও তেলিয়াগাড়ির নিকটে ইলতুৎমিসের অগ্রগতি প্রতিহত হইল। গিয়াস-উদ্দিন ও ইলতুৎমিসের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। গিয়াস-উদ্দিন ইলতুৎমিসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার পর ইলতুৎমিস্ আলা-উদ্দিন জানি নামে জনৈক মালিককে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস-উদ্দিন আলা-উদ্দিন জানিকে বিতাড়িত করিয়া বিহার পুনর্দখল করিলেন।

এদিকে অযোধ্যার পৃথু নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ইলতুৎমিস্ নিজ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাসির-উদ্দিনের নেতৃত্বে গিয়াস-উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা। নাসির-উদ্দিন অযোধ্যায় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত আছেন ভাবিয়া গিয়াস-উদ্দিন পূর্ববঙ্গ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সুযোগে নাসির-উদ্দিন বাংলাদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়াস-উদ্দিন পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য সংখ্যক সৈন্য সহ দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া গৌড়ের অনতিদূরে নাসির-উদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া নাসির-উদ্দিনের হস্তে অনুচরগণসহ বন্দী হইলেন। নাসির-উদ্দিনের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল (১২২৭ খ্রীঃ)। গিয়াস-উদ্দিন বলবন আমিন খাঁকে তুঘ্রিল খাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুঘ্রিল খাঁ আমিন খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। পর বৎসর বলবন তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে অপর এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হইলে বলবন স্বয়ং সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তুঘ্রিল খাঁ জাজনগর (বর্তমান উড়িষ্যা)-র এক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সুলতানী সৈন্য কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। বলবন নিজপুত্র বুগ্রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন (১২৮১ খ্রীঃ)।

ইলতুৎমিসের পুত্র নাসির-উদ্দিনের হস্তে গিয়াস-উদ্দিনের পরাজয় ও প্রাণনাশ

বলবনের আমলে বাংলাদেশ

বুগ্রা খাঁ—সুলতান নাসির-উদ্দিন, ১২৮২-৯০ খ্রীঃ (Bughra Khan—Sultan Nasiruddin, 1282-90): বলবনের পুত্র বুগ্রা খাঁ সামান প্রদেশের (বর্তমান পাতিয়ালা রাজ্য) শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশে তুঘ্রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে অভিযানে আসেন। তুঘ্রিল খাঁর পরাজয়ের পর বুগ্রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াস-উদ্দিন বলবন নিজ পুত্রের কর্তব্যকার্যে অবহেলা এবং আমোদ-প্রমোদপ্রিয়তার কথা জানিতেন। এজন্য তিনি দুইজন পরামর্শদাতাকে বুগ্রা খাঁর শাসনকার্যে যথাযথ পরামর্শ দিবার

বুগ্রা খাঁর প্রথম জীবন

জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইজন পরামর্শদাতারই নাম ছিল ফিরুজ।* ইহা ভিন্ন, তিনি বাংলা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বুগ্‌রা খাঁকে কতক উপদেশ লিখিতভাবে দিয়া গিয়াছিলেন। এই লিখিত উপদেশে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া একথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বুগ্‌রা খাঁ এই সকল উপদেশ মানিয়া চলিবেন না, উপরন্তু, আমোদ-প্রমোদেই নিমজ্জিত থাকিবেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি পিতার কর্তব্য এইভাবে করিয়া গিয়াছিলেন।†

বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

বুগ্‌রা খাঁ ছিলেন অত্যধিক আরামপ্রিয়। তিনি আরাম ও আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকিলেও তাঁহার অনুচরবৃন্দ সোনারগাঁও, সাতগাঁও প্রভৃতি অঞ্চল লক্ষ্মণাবতী রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াস-উদ্দিন বলবন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বুগ্‌রা খাঁকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্বেই বলবনের প্রথম পুত্র মহম্মদ মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বলবনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বুগ্‌রা খাঁ এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বাংলায় তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। গিয়াস-উদ্দিন বলবন মৃত্যুকালে তাঁহার নাবালক পৌত্র কাই খসরুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিয়া গেলেন। কিন্তু উজীর নিজাম-উদ্দিন বুগ্‌রা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এদিকে পিতার মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খাঁ 'সুলতান নাসির-উদ্দিন মামুদ' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

রাজ্যবিস্তার

গিয়াস-উদ্দিন বলবনের মৃত্যু (১২৮৭)

বুগ্‌রা খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা: 'সুলতান নাসির-উদ্দিন মামুদ' উপাধি ধারণ

দিল্লী সুলতানদের উজীর নিজাম-উদ্দিন কাইকোবাদকে আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিবার সুযোগদান করিয়া নিজে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইলেন। বুগ্‌রা খাঁ অর্থাৎ নাসির-উদ্দিন নিজ পুত্রের এই অকর্মণ্যতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বহু উপদেশপূর্ণ পত্রালাপ করিলেও যখন তাঁহার কোন চৈতন্য হইল না, তখন বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি বিহার অধিকার করিয়া অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে অবশ্য যুদ্ধ হইল না। কাইকোবাদ বুগ্‌রা খাঁকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলিয়া স্বীকার করিলেন। বুগ্‌রা খাঁ পুত্রকে শাসনকার্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়া পিতার কর্তব্য পালন করিলেন। ইহার পর হইতে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন দেশ হিসাবেই রহিয়া গেল। বুগ্‌রা খাঁর বিরুদ্ধে কাইকোবাদের এই অভিযানকালে কবি আমির খসরু সঙ্গে ছিলেন। তিনি 'কিরান-

বুগ্‌রা খাঁর স্বাধীনতা স্বীকৃত

* *Vide*, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 70.

† *Idem.*

উস্-সা-আদিন' নামক কবিতায় পিতা-পুত্রের মিলন-কাহিনীর ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগ উপস্থিত হইলে গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক সেই সুযোগে পুনরায় বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। তিনি বাংলাদেশকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করিলেন—লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম এবং সোনারগাঁও ছিল এই তিনটি অংশের তিনটি পৃথক রাজধানী। কিন্তু বাংলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিলেও তথাকার রাজনৈতিক জটিলতার অবসান হইল না। এই তিন অংশের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই রহিল। মহম্মদ-বিন্ তুঘ্‌লক এই তিন অংশের তিনজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কাদের খাঁ লক্ষ্মণাবতীর, আজ্জ্‌-উল্-মুল্ক সাতগাঁওয়ের এবং বাহ্‌রাম খাঁ ও গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌কে যুগ্মভাগে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন সুলতানের ন্যায় শাসন চালাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে* হাজী ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশ নিজ শাসনাধীনে আনিয়া 'শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

গিয়াস-উদ্দিনের আমলে বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন

নাসির-উদ্দিন মামুদ, ১২২৭-২৯ (Nasiruddin Mahmud, 1227-29): গিয়াস্-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌জীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নাসির-উদ্দিন স্বয়ং বাংলার শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অযোধ্যাকেও বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। নাসির-উদ্দিন গৌড় হইতে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত করিলেন এবং গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ কর্তৃক সঞ্চিত অর্থ দিল্লীর উলেমাদের বণ্টন করিয়া দিলেন। এদিকে ইল্‌তুৎমিস্ খলিফা অলমুস্তানাসির বিল্লাহ-এর নিকট হইতে খিলাৎ প্রাপ্ত হইলে উহার মধ্য হইতে একটি পোশাক, একটি লাল রংয়ের ছাতা ও একটি লাল সামিয়ানা নিজ পুত্র নাসির-উদ্দিনের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে 'মালিক-উস্-শরক' (Lord of the East) উপাধিতেও ভূষিত করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নাসির-উদ্দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌জীর অন্যতম বিশ্বস্ত খল্‌জী অনুচর মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জী বাংলাদেশ হইতে দিল্লী সুলতানের সেনাবাহিনী বিতাড়িত করিয়া নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানী শাসন হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত

ইল্‌তুৎমিস্ কর্তৃক নিজ পুত্রের নিকট খিলাৎ প্রেরণ

নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু: ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জীর স্বাধীনতা ঘোষণা

* *Vide, History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 103.

প্রায় দুই বৎসর পর সুলতান ইল্‌তুৎমিস্‌ ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কা খল্‌জীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন ইল্‌তুৎমিসের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল। বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লী সুলতানির অধীনে আসিল। বিহারের শাসনকর্তা আলা-উদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবক্‌কে বিহারের শাসনভার দেওয়া হইল।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বল্‌কার পরাজয় ও শিরশ্ছেদ

আলা-উদ্দিন জানি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

আলা-উদ্দিন জানি ছিলেন তুর্কীস্তানের জনৈক শাহ্‌জাদা। মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজকীয় আচার-আচরণ, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি তাঁহার উচ্চ বংশের পরিচয় বহন করিত। অল্প-কালের মধ্যেই কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পদচ্যুত হন এবং বিহারের শাসনকর্তা মালিক সৈইফ-উদ্দিন অইবক্‌ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। বদাউনের শাসনকর্তা তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ বা তুঘ্‌রল-তুঘান খাঁকে বিহারের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। সৈইফ্‌-উদ্দিন তিন বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত বাংলার শাসনকার্যাদি পরিচালনা করেন। পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি অভিযানও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান সাফল্যলাভ না হইলেও তিনি সেই অভিযানে কয়েকটি হাতী ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই হাতীগুলি তিনি ইল্‌তুৎমিসের নিকট উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করিলে সুলতান খুশি হইয়া তাঁহাকে 'য়ুঘান-তৎ' *Yughan-tat* উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (২৯শে এপ্রিল) সুলতান ইল্‌তুৎমিসের মৃত্যু ঘটিলে সমগ্র হিন্দুস্থানে এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ঐ সময়ে সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবক্‌ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুলতান ইল্‌তুৎমিস্‌ এবং উহার অব্যবহিত পরে সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবকের মৃত্যুতে বাংলাদেশে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সেই সুযোগে আওর খাঁ অইবক্‌ নামে জনৈক তুর্কী মালিক লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া লইলেন। বিহারের শাসনকর্তা তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ আওর খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

আলা-উদ্দিন জানির পদচ্যুতি, সৈইফ্‌-উদ্দিন আইবকের শাসনকর্তারূপে নিযুক্তি

সুদক্ষ শাসন

ইল্‌তুৎমিস্‌ ও সৈইফ্‌-উদ্দিন-এর মৃত্যু ঃ ব্যাপক বিশৃঙ্খলা

আওর খাঁ আইবক্‌

তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁ স্বয়ং বিহার ও বাংলায় (রাঢ় ও বরেন্দ্র) স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন, কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকারে ত্রুটি করিলেন না। মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ তুঘান-তুঘ্‌রিল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ-উদ্দিন রচিত তবকৎ-ই-নাসিরীতে তুঘান খাঁর ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। তুঘান খাঁ দিল্লী সুলতানির

তুঘান-তুঘরিল খাঁ (১২৩৬-৪৫)

আনুগত্য কখনও অস্বীকার করেন নাই। যখনই ইলতুৎমিসের কোন বংশধর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখনই তুঘান তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বিলম্ব করিতেন না। এইভাবে তিনি দিল্লীর রাজনৈতিক জটিলতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন।

দিল্লী সুলতানির আনুগত্য স্বীকার

তুঘান খাঁ নিজ অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিরহুত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিরহুত অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, তুঘান খাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অযোধ্যা, কারা, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল অধিকার করিয়া সমগ্র পূর্ব-ভারতের সার্বভৌমত্ব লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল নৌবাহিনী গঠন করেন। ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানদী পথে তিনি বিহারে উপস্থিত হন এবং বিনা বাধায় চুণার, বানারস, এলাহাবাদ এবং কারা পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্। তুঘান তাঁহাকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খিলাৎ লাভ করিয়াছিলেন (১২৪৩ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (নভেম্বর, ১২৪৩ খ্রীঃ) উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কারা হইতে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর লক্ষ্মণাবতী প্রত্যাবর্তনে যে কালক্ষেপ হইয়াছিল তাহার সুযোগ লইয়া উড়িষ্যারাজ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া তুঘান খাঁর সেনাবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন।* এই পরিস্থিতিতে তুঘান খাঁ দিল্লী সুলতানদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্ কারা ও মাণিকপুরের শাসনকর্তা মালিক কারাকাশ খাঁ ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমর খাঁকে তুঘান খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যারাজ নরসিংহ লক্‌নোর অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তাদের সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে উড়িষ্যার সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিল। তমর খাঁ এই সুযোগে তুঘান খাঁকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহের পক্ষে তমর খাঁর ন্যায় পরাক্রমশালী ব্যক্তির বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বিধান করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় নাসির-উদ্দিন মামুদ তুঘ্‌রিল-তুঘান খাঁকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু অযোধ্যায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ঠিক ঐ সময়ে তমর খাঁও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে

তুঘানের সামরিক অভিযান

উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ

তমর খাঁ কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকার : স্বাধীন শাসন (১২৪৫-১২৪৭ খ্রীঃ)

*"The Muslims, sustained an overthrow, and a great number, of those holy warriors attained martyrdom."—Minhaj. Vide. *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 49.

১২৪৫-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার স্বাধীন ও বিদ্রোহী শাসনের অবসান ঘটিল। মালিক আলা-উদ্দিন জানির পুত্র মালিক জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানি বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১২৪৭-১২৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত চারি বৎসর বাংলা ও বিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন উজবক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেবের জামাতা রাঢ় অঞ্চলের একাংশ বর্তমান হুগলী জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ লইয়া একটি শক্তিশালী সামন্তরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মদারণ। মিন্‌হাজ-উদ্দিন ইহাকে 'মিদারণ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন উজবক এই সামন্তরাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনবার অভিযান করিয়া তৃতীয় অভিযানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তিনি দিল্লী সুলতানের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইলেন। তারপর নিজেই পুনরায় মদারণ আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিলেন। ক্রমে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন ছিলেন স্বভাবতই বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন দুইবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুলতান নাসির-উদ্দিনের শ্বশুর ও দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ উলুঘ-খাঁর অনুরোধে নাসির-উদ্দিন দুইবারই তাঁহাকে মাফ করিয়াছিলেন। এইবার রাঢ় অঞ্চল জয় করিয়া তিনি পুনরায় 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল 'সুলতান মুঘিস্ অল্ দুনিয়া ওয়াল-দিন আবুল মুজফ্ফর উজবক অল-সুলতান'। ইহার পর সুলতান মুঘিস্-উদ্দিন উজবক অযোধ্যা প্রদেশটি জয় করিয়া লক্ষ্মণাবতী (বাংলা), বিহার ও অযোধ্যায় নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কামরূপ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করিলেন। তিনি বর্তমান রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ও গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কামরূপরাজ সুলতান মুঘিস্‌কে কোন প্রকার বাধাদান না করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং বাৎসরিক করদানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সুলতান মুঘিস্ রাজধানীর যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন এবং সমগ্র কামরূপ রাজ্যটি নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার আশায় বাৎসরিক করদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর তিনি কয়েকমাস কামরূপ রাজ্যেই অবস্থান করিলেন। কিন্তু বর্ষা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপরাজের হিন্দু প্রজাবর্গ রাজধানীতে কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও পশুর (ঘোড়া) খাদ্যাদি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। এইভাবে সুলতান মুঘিস্ উজবককে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করিয়া কামরূপরাজের সকল

জালাল-উদ্দিন মাসুদ জানি (১২৪৭-৫১ খ্রীঃ)

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত

রাঢ় অঞ্চল হইতে উড়িষ্যারাজের আধিপত্য বিনাশ

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণা

লক্ষ্মণাবতী, বিহার ও অযোধ্যায় নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপন

কামরূপ অভিযান

হিন্দুপ্রজা সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এমতাবস্থায় কামরূপ হইতে পরিবার-পরিজন ও সেনাবাহিনীসহ পলাইতে গিয়া সুলতান মুঘিস্‌ পথিমধ্যে কামরূপরাজের সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তিনি বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে শত্রুর এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে তাঁহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া নিজ সেনাবাহিনী ও পরিবার-পরিজনসহ আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে সুলতান মুঘিস্‌-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে লক্ষ্মণাবতী (বাংলা) পুনরায় সুলতান নাসির-উদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল।

কামরূপ অভিযানের ব্যর্থতা ঃ মৃত্যু

বাংলার পরবর্তী শাসকগণের মধ্যে ইজ্‌-উদ্দিন বলবন-ই-উজবকী, মালিক তাজ-উদ্দিন আর্‌স্‌লান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম উল্লেখযোগ্য। আর্‌স্‌লান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন।

ইজ্‌-উদ্দিন উজবকী ও তাজ-উদ্দিন আর্‌স্‌লান

মুঘিস্‌-উদ্দিন তুঘ্‌রিল খাঁ, ১২৬৮-৮১ খ্রীঃ (Mughisuddin Tughril Khan, 1268-81): পরবর্তী কালে মুঘিস্‌-উদ্দিন তুঘ্‌রিল খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুঘ্‌রিল খাঁ ছিলেন একজন সাহসী প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন তুর্কী বীর। তিনি প্রথমে বাংলার শাসনকর্তা আমিন খাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। আমিন খাঁ ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। তাঁহাকে তদুপরি বাংলার শাসনকর্তা-পদও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত শাসন-কার্যের ভার ছিল তুঘ্‌রিল খাঁর উপর। তুঘ্‌রিল খাঁ ছিলেন ক্ষমতাশালী শাসক ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি পূর্ববঙ্গের বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সীমা বিস্তার করেন এবং ঢাকার প্রায় পঁচিশ মাইল নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন (Qila-i-Tughral)। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন গিয়াস-উদ্দিন বলবন।

আমিন খাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত

তুঘ্‌রিল খাঁ বাংলার শাসনকর্তা-পদ লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীন বাংলার সুলতান হওয়া। এদিকে মোঙ্গল আক্রমণে সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বলবন যখন ব্যতিব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝিয়া তুঘ্‌রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি সুলতান মুঘিস্‌-উদ্দিন নাম ধারণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজসভা জাঁকজমক ও রাজকীয়তায় দিল্লী সুলতানের রাজসভার সমকক্ষ ছিল।

স্বাধীনতা ঘোষণা

তুঘ্‌রিল খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় গিয়াস-উদ্দিন বলবন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।* আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তুঘ্‌রিলকে কিভাবে দমন করা যায় সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

বলবন কর্তৃক তুঘ্‌রিল খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ

* "Sultan Balban lost his sleep and appetite—as Barni says—when the news of Tughril's assumption of sovereignty in Bengal reached him." *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 61.

বাংলার ইলিয়াসশাহী বংশ (Ilyas Shahi Dynasty of Bengal)

শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্, ১৩৪২-৫৭ খ্রীঃ (Shamsuddin Ilyas Shah, 1342-57) : ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'শামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া ইলিয়াস শাহের লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘ্লক। তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে তখন ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। গোরখপুর, চম্পারণ, তিরহুত প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দুরাজগণ সেই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ নিজেও এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিরহুতের হিন্দুরাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইলে ইলিয়াস শাহ্ সহজেই তিরহুত জয় করিয়া লইলেন। ইহার পর ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করিয়া কাঠমণ্ডু পর্যন্ত প্রবেশ করেন। স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ ও শাক্যমুনির পবিত্র ধ্বজা তিনি ভস্মীভূত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি কাঠমণ্ডু হইতে সসৈন্যে অপসরণ করেন। কাঠমণ্ডুর পার্বত্য পরিবেশ ও বাংলাদেশের সহিত যোগাযোগের অসুবিধাহেতু নেপাল ইলিয়াস শাহ্ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

উত্তর-ভারতে অব্যবস্থা

তিরহুত জয়

নেপাল অভিযান

তিরহুত ও নেপাল অভিযানের সাফল্য ইলিয়াস শাহ্কে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তিনি উড়িষ্যার দিকে অভিযান শুরু করিলেন। উড়িষ্যার মেঘেশ্বর বলরাম, পুরীর জগন্নাথ ও কোণারকের সূর্যদেবের মন্দির সেই সময়ে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডারস্বরূপ ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানগণ এই সকল মন্দিরের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইলেও উড়িষ্যার তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব, প্রথম নরসিংহ ও দ্বিতীয় নরসিংহ প্রভৃতি রাজগণের আমলে উড়িষ্যার নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। ইলিয়াস শাহের আমলে উড়িষ্যার রাজবংশ পূর্ব পরাক্রম হারাইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ উড়িষ্যার মধ্য দিয়া সসৈন্যে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। উড়িষ্যা হইতে তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন ও ৪৪টি হাতী লইয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার রাজ্যসীমা বানারস পর্যন্ত বিস্তার করিলেন। এইভাবে ইলিয়াস শাহের সামরিক অভিযানের সাফল্যে তাঁহার অন্তরে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই জাগিল।* ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এর সুলতানকে পরাজিত করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গও নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ফলে, তাঁহার সম্রাট-পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সেই সময়ে মহম্মদ-বিন্

উড়িষ্যা অভিযান

সম্রাট-পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা

সোনারগাঁও জয়

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 105.

তুঘ্‌লকের মৃত্যু হইলে ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লীর সুলতান হইলেন এবং ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌কে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে ৯০ হাজার অশ্বারোহী, এক বিশাল সংখ্যক পদাতিক ও ধনুর্বিদ এবং এক হাজার রণতরী ছিল।

ফিরুজ শাহের বাংলাদেশ আক্রমণ

সিরাজ আফিফ্‌-এর রচনা হইতে জানা যায় যে, বাংলার নৌবাহিনী গোগ্‌রা ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে দিল্লী সুলতানের নৌবাহিনীকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহা হউক, সুলতান ফিরুজ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ইলিয়াস শাহের রাজধানী পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ তাঁহার সুরক্ষিত 'একডালা' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিল্লী সুলতানের সেনাবাহিনী শত চেষ্টায়ও এই দুর্গটি অধিকার করিতে পারিল না। ফিরুজ তুঘ্‌লক কূটচালে ইলিয়াস শাহ্‌কে দুর্গের বাহিরে আনিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাধুকে গুপ্তচর হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। এই সকল গুপ্তচরের নিকট হইতে দিল্লীর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে জানিতে পারিয়া এবং তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইলিয়াস শাহ্‌ ফিরুজ শাহের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত হইলেন। বস্তুত, একডালা দুর্গ হইতে ইলিয়াস শাহ্‌কে বাহিরে আনাই ছিল ফিরুজ তুঘ্‌লকের কূটনীতির উদ্দেশ্য। যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের পরাজয় ঘটিলে তিনি পুনরায় 'একডালা' দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ফিরুজ শাহ্‌ এই দুর্গটি অবরোধ করিয়াও শেষ পর্যন্ত অধিকার করিতে অকৃতকার্য হইলেন। 'সিরাৎ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একডালা দুর্গের অভ্যন্তর হইতে মুসলমান নারীদের আর্তনাদে ও সনির্বন্ধতায় ফিরুজ শাহ্‌ এই দুর্গটি অধিকার করেন নাই। জিয়া-উদ্দিন বরণীর মতে ফিরুজ শাহ্‌ একডালা দুর্গ পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার অনুচরবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন।* যাহা হউক, সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ফিরুজ শাহ্‌ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ অধিকার না করিয়াই দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ স্বাধীন সুলতান হিসাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ্‌ দিল্লী সুলতানের সহিত মিত্রতাসূচক উপহার প্রেরণ করিয়া দিল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

ফিরুজ তুঘ্‌লকের কূটচাল

ইলিয়াস শাহের পরাজয় ও একডালা দুর্গে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ

ফিরুজ শাহের দিল্লী প্রত্যাবর্তন—ইলিয়াস শাহের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা

পর বৎসর (১৩৫৭ খ্রীঃ) সুলতান ফিরুজ শাহ্‌ বাংলাদেশ হইতে কয়েকটি হাতী চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ মালিক তাজ-উদ্দিনের মারফত দিল্লীতে কয়েকটি হাতী প্রেরণ করিলে সুলতান ফিরুজ শাহ্‌ তাঁহাকে কয়েকটি তুর্কী ও আরবীয় ঘোড়া, খোরাসানী ফল এবং

ফিরুজ শাহের সহিত ইলিয়াস শাহের মিত্রতা

* Vide, History of Bengal (D. U.), Vol. II, p. 109.

অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য প্রতিদান হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন করিবার ফলে ইলিয়াস শাহ্ নির্বিঘ্নে কামরূপ জয়ের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে ইলিয়াস শাহ্ কামরূপ জয় করিয়া তাঁহার সামরিক শক্তির শেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের ব্যক্তিগত জীবন, শাসনব্যবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী আছে যে, তিনি 'হাজিপুর' নামক শহর নির্মাণ ও ফিরুজাবাদে অর্থাৎ আদিনায় একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ঠিক কোন্ সময়ে শেষ হইয়াছিল সেবিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। তারিখ-ই-মুবারকশাহী ও সিরাৎ-ই-ফিরুজশাহী অনুসারে ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার আমলের মুদ্রা হইতে অবশ্য জানা যায় যে, ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছিল।*

কামরূপ জয়

তাঁহার রাজত্বের অবসান

ইলিয়াস শাহ্ বাংলাদেশের স্বাধীন শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং তাহার ফলে সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্থাপত্যশিল্প এবং অপরাপর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তিনি উৎসাহ দান করিয়াছিলেন।

সিকন্দর শাহ্ ১৩৫৭-১৩৮৯ (Sikandar Shah, 1357-1389): ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ বাংলার সুলতান হন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায়ই সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ফিরুজ তুঘ্‌লক পুনরায় বাংলাদেশ অধিকারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। শেষ পর্যন্ত সিকন্দর শাহ্ ও ফিরুজ তুঘ্‌লকের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং উভয় পক্ষে উপহার আদান-প্রদান হয় (১৩৫৯)। ঐ বৎসর হইতে প্রায় দুইশত বৎসর বাংলাদেশ দিল্লী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সিকন্দর শাহ্ ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তাঁহার আমলে বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই আদিনা মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫০৭ ফুট এবং প্রস্থে ২৮৫ ফুট। এইরূপ বিশাল আকৃতির আর কোন মসজিদ সমগ্র ভারতে নাই।† 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই মসজিদটি নির্মাণে চারি বৎসর অপেক্ষাও অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই মসজিদটি নির্মাণে বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর কারুকার্যখচিত বিভিন্ন অংশ লাগান হইয়াছিল। লক্ষণাবতীর শ্রেষ্ঠ হিন্দু স্থাপত্যকার্য বিনাশ করিয়া সেগুলির অংশ দ্বারা এই

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 111.

† "This sumptuous mosque extending 507 ft from north to south and 285 ft from east to west surpasses in sheer dimension any other building of its kind in India." Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 113.

মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।* আদিনা মসজিদ ভিন্ন আখ্-ই-সিরাজ-উদ্দিন মসজিদ, কটোয়ালী দরওয়াজা প্রভৃতির স্থাপত্যকার্যও সেই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার আমলের কতকগুলি অতি সুন্দর স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজপুত্র গিয়াস-উদ্দিন আজমের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

গিয়াস-উদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯)

গিয়াস-উদ্দিন আজম পিতৃহন্তা হইলেও ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। প্রচলিত আইন-কানুন মানিয়া তিনি দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি হাফেজ-এর সহিত তিনি পত্র বিনিময় করিতেন। তাঁহার আমলে চীনদেশ হইতে এক দূত বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সৈইফ্-উদ্দিন হাম্জা শাহ্ (১৪০৯-১০)

রাজা গণেশ (১৪১০-?)

যদু ঃ জালাল-উদ্দিন মহম্মদ (?—১৪৩১)

শামস্-উদ্দিন আহ্মদ শাহ্ (১৪৩১ ৪২)

আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈইফ্-উদ্দিন হাম্জা শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজা গণেশ নামে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি দনুজমর্দনদেব উপাধি ধারণ করেন এবং স্বাধীনভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর পুত্র যদুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু যদু অল্পকালের মধ্যেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া জালাল-উদ্দিন মহম্মদ নাম ধারণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্-উদ্দিন আহ্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনি অকর্মণ্য। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই কর্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার পর হাজী ইলিয়াসের পৌত্র নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্কে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে রাজা গণেশের বংশধরদের হস্ত হইতে বাংলার শাসনভার পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের হস্তে ন্যস্ত হয়।

নাসির-উদ্দিন মামুদ (১৪৪২-৫৯)

নাসির-উদ্দিন মামুদ শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। স্থাপত্যশিল্পেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে সাতগাঁও ও গৌড়ে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। সতর বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার পুত্র রুকন্-উদ্দিন বারবক্ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আবিসিনীয় বা হাব্সী ক্রীতদাসের এক বিরাট বাহিনী পোষণ করিতেন। এই বিদেশী ক্রীতদাসদের অনেককে তিনি উচ্চ কর্মচারিপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই হাব্সী ক্রীতদাসগণ বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থায় এক প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রুকন্-উদ্দিন বারবক্ শাহ্ (১৪৫৯-৭৪)

* "It is not improbable that the finest monuments of the Hindu Capital of Lakhnawati were demolished to produce this one Muhammadan mosque." Percy Brown, Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p 118.

বারবক্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইয়ুসুফ্ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার আমলে সিলেট (Sylhet) বা শ্রীহট্ট জেলা মুসলমান অধিকারে আসে। ইয়ুসুফ্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ (২য়) কিছুকালের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নাসির-উদ্দিনের অপর এক পুত্র জালাল-উদ্দিন ফত্ শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। জলাল-উদ্দিন হাব্‌সীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাদেরই হস্তে প্রাণ হারাইলেন। হাব্‌সী নেতা বারবক্ শাহ্ 'সুলতান শাহ্‌জাদা' উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু বারবক্ শাহের ভাগ্যে অধিককাল রাজত্বভোগের সুযোগ মিলিল না। ইন্দিল খাঁ নামে অপর একজন হাব্‌সী নেতার হস্তে তিনি নিহত হইলেন। ইন্দিল শাহ্ সৈইফ্-উদ্দিন ফিরুজ নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইন্দিল শাহের মৃত্যুর পর ফত্ শাহের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইলে সিদি বদ্‌র নামে জনৈক হাব্‌সী সিংহাসন দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে হাব্‌সী শাসনকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা উভয়ই বিনষ্ট হইল। সিদি বদ্‌র-এর রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছিল তখন রাজকর্মচারীদের অনেকেই হাব্‌সী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। বদ্‌র-এর মন্ত্রী আলা-উদ্দিন হুসেনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে বদ্‌র-এর রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায়-ই বদ্‌র-এর মৃত্যু হইলে বাংলার অভিজাতবর্গ আলা-উদ্দিন হুসেনকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। আলা-উদ্দিন 'হুসেন শাহ্' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় শুরু হইল।

ইয়ুসুফ্ শাহ্ (১৪৭৪-৮১)

শিকন্দর শাহ্ (২য়) (১৪৮১) ফত্ শাহ্ (১৪৮১-৮৭)

বাংলাদেশে হাব্‌সী শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩)

হুসেনশাহী বংশ (Hussain Shahi·Dynasty) :

আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ (Alauddin Hussain Shah, 1493-1519) : হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে বাংলার স্বাধীন সুলতানির এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হইয়াছিল। বাঙালী জাতির মনীষা ও সৃজনীশক্তি এই যুগে এক চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হুসেন শাহ্ ছিলেন যেমন বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক তেমনি ছিলেন উদারচিত্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। বাংলার স্বাধীন শাসকবর্গের মধ্যে হুসেন শাহ্ ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয়।

হুসেন শাহের চরিত্র ও জনপ্রিয়তা

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুসেন শাহ্ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হাব্‌সীদের প্রভাব হইতে বাংলার রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন; প্রাসাদ-রক্ষিগণও সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। হুসেন শাহ্ তাহাদেরও দমনপ্লুকরিলেন।

হাব্‌সী বিতাড়ন ও প্রাসাদ-রক্ষী দমন

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করিয়া হুসেন শাহ্ বাংলার হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তিনি জৌনপুরের শর্‌কী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর নিকট হইতে উত্তর-বিহার জয় করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত বাংলার রাজ্য বিস্তার করিলেন। আসামের অহোম রাজ্যটি তিনি জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অহোমরাজ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। কোচবিহারের কাম্‌তাপুর নামক স্থানটিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্ পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে পরপর চারিটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু এই সকল অভিযান ও পুনঃপুনঃ যুদ্ধের পর ত্রিপুরা রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোনারগাঁও-এ প্রাপ্ত একটি লিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।* এইভাবে রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াই হুসেন শাহ্ ক্ষান্ত রহিলেন না। রাজ্যসীমার নিরাপত্তা-বিধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি অবলম্বন করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

হুসেন শাহের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং শাসনদক্ষতার ফলে তাঁহার প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের কোন স্থানে কোনপ্রকার বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। হুসেন শাহ্ কেবলমাত্র সামরিক এবং শাসন-সংক্রান্ত কার্যকলাপেই পারদর্শী ছিলেন এমন নহে; বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা, স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগ, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতির জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রতি জেলায় মসজিদ ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞানীদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ভাতার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কুতব্-উল্-আলম নামে জনৈক ইসলাম ধর্মজ্ঞানীর সমাধি এবং তাঁহার নামে স্থাপিত একটি বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতালের ব্যয়সংকুলানের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে হুসেন শাহ্ সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, তাঁহার চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, টাঁকশালের প্রধান কর্মচারী অনুরূপ প্রভৃতি সকলেই ছিল

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

পুরন্দর খাঁ, রূপ ও সনাতন গোস্বামী

* 'Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 148-49.

হিন্দু। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের 'দবীর খাস' (Private Secretary)। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি সেযুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন।

মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র

হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এজন্য হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর কবীন্দ্র নামে জনৈক কবি মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সুশাসনে সমৃদ্ধ বাঙালী জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' এই দুই উপাধিতে হুসেন শাহ্‌কে সম্মানিত করিবার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল।*

হুসেন শাহ্ আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করেন নাই। জৌনপুরের শরকী বংশের সুলতান হুসেন শাহ্ শরকী সিকন্দর লোদী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী হইলে হুসেন শাহ্ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভাগলপুরের নিকট কোলগঙ্গ (Colgong) নামক স্থানে হুসেন শাহ্ শরকী তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা

হুসেন শাহের আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রীতি দেখা দিয়াছিল তাহার-ই নিদর্শনস্বরূপ 'সত্যপীর'-এর আরাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুসেন শাহ্ বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একই সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে এই উভয় ধর্মের সংমিশ্রণে সত্যপীরের আরাধনার প্রচলন করিয়াছিলেন। সত্যপীর হিন্দুদেবতা সত্যনারায়ণেরই এক বিকল্প সংস্করণ সন্দেহ নাই। সত্যনারায়ণের 'সিন্নি' কথাটি আজও বাংলাদেশের হিন্দুগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর প্রসাদকে 'সিন্নি' বলা হয় না, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টা—সত্যপীরের কল্পনা

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জনপ্রিয় স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাসীর খাঁ 'নুসরৎ শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মৃত্যু (১৫১৯)

নুসরৎ শাহ্, ১৫১৯-৩২ (Nusrat Shah, 1519-32): নুসরৎ শাহ্ পিতার ন্যায়ই উদারচিত্ত ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণ ও পিতার নিকট হইতে যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে যাহাতে স্বার্থের

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 151.

সংঘাত শুরু হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতার আমলে শাসনকার্যাদি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা রাজ্যশাসন, সামরিক কর্তব্য সম্পাদন ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কূটনীতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিরহুত রাজ্য জয় করেন। শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার আদেশে গৌড়ের কদম রসুল ও বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

চরিত্র

নুসরৎ শাহের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী সুলতানির পতন শুরু হইলে বিহারে 'লোহানী' ও 'ফরমূলী' মালিকগণ জৌনপুর হইতে পাটনা পর্যন্ত বিহারের এক বিরাট অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে শুরু করিলেন। নুসরৎ শাহ্ এই সকল বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিরহুত জয় করিয়া উত্তর-বিহার অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে নিজ অধিকারে আনিলেন। গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে হাজিপুর নামক স্থানে তিনি একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করিলে নুসরৎ শাহ্ পূর্বাঞ্চলের আফগান সর্দারদের লইয়া মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন। কিন্তু বাবরের পুত্র হুমায়ুন কনৌজ, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করিতে সমর্থ হইলে নুসরৎ শাহ্ মুঘল বাহিনীর পরাক্রম বুঝিতে পারিয়া নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিলেন এবং বাবরের নিকট নানাপ্রকার উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু গোপনে তিনি আফগান সর্দারদের সহিত মৈত্রী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এইভাবে কূটকৌশলে একাধিকবার মুঘল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্যের ভান করিয়া আফগানদের সহিত মিত্রতার মাধ্যমে মুঘলদের বিরোধিতা করিয়া চলিলেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে লোদী বংশধর মামুদ, আফগান বীর শের খাঁ প্রভৃতির সহিত একযোগে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মিত্র-সংঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। নুসরৎ শাহ্ কূটকৌশলে মুঘল সম্রাট বাবরের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইয়া সরাসরি মুঘল আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ্ পুনরায় মুঘল-বিরোধী মিত্র-সংঘ গড়িয়া তুলিলেন। হুমায়ুন নুসরৎ শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নুসরৎ শাহ্ মালিক মরজন নামে জনৈক দূতকে পাঠাইলেন। এতদাবস্থায় হুমায়ুন প্রথমে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধেই অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই

রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান

মুঘলদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংগ্রাম

বাবরের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ্ কর্তৃক পুনরায় মিত্র-সংঘ গঠন

তাঁহার মৃত্যু

সময়ে আততায়ীর হস্তে নুসরৎ শাহের মৃত্যু হইলে মুঘল-বিরোধী সংঘ সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া গেল।

অহোম রাজ্যের সহিত যুদ্ধ

নুসরৎ শাহের আমলে অহোম জাতির সহিত একাধিক যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটিয়াছিল। নুসরৎ শাহের মৃত্যুর পরও সেই চেষ্টা অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার সুলতানগণ অহোমদের সহিত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নুসরৎ শাহ্ নিজ প্রাসাদ-রক্ষী জনৈক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নুসরৎ শাহের ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮) কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্ শের-শাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। গিয়াস-উদ্দিন মামুদই ছিলেন বাংলার হুসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান।

(৩)

দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ

(Independent Kingdoms of Southern India)

খান্দেশ (Khandesh): তাপ্তী নদীর উপত্যকায় খান্দেশ মহম্মদ-বিন-তুঘ্লকের অধীনে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। ফিরুজ তুঘ্লক দিল্লী রাজসভায় জনৈক আমীরের বংশধর মালিক রাজা ফারুকীকে খান্দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মালিক ফারুকী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গুজরাটের সুলতান মুজফ্ফর শাহের সহিত যুদ্ধে তিনি একাধিকবার পরাজিত হন। বহ্মনী রাজ্যের সুলতানদের সহিতও তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মালিক ফারুকী হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। পরবর্তী সুলতান মালিক নাসির সুরক্ষিত অসীরগড় দুর্গটি তখনকার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। গুজরাটের সুলতানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মালিক নাসির তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহ্মনী সুলতানের হস্তেও মালিক নাসিরের পরাজয় ঘটিয়াছিল। পরবর্তী সুলতান

মালিক ফারুকী

খান্দেশ রাজ্যের শক্তিহীনতা

আদিল খাঁ, মুবারক খাঁ এবং দ্বিতীয় আদিল খাঁর আমলে খান্দেশ রাজ্য দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে। দ্বিতীয় আদিল খাঁ খান্দেশের শক্তি ও প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গণ্ডোয়ানা জয় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খান্দেশ রাজ্য ক্রমেই শক্তিহীন হইতে থাকে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর অসীরগড় দুর্গটি জয় করিয়া খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

আকবরের খান্দেশ বিজয় (১৬০১)

বহ্‌মনী রাজ্য (Bahmani Kingdom) : মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের শেষদিকে দেবগিরির অভিজাত সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসননীতিই ছিল এজন্য দায়ী। বিদ্রোহী অভিজাতবর্গ দৌলতাবাদ দুর্গটি অধিকার করিয়া ইস্‌মাইল মুখ্ নামক তাঁহাদেরই এক নেতাকে তথাকার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৃদ্ধ ইস্‌মাইল মুখ্ নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষমতা হেতু নিজেই জাফর খাঁ হাসানের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। জাফর খাঁ হাসান 'আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া দৌলতাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩৪৭)।

বহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৭)

বহ্‌মন শাহ্, ১৩৪৭-৫৮ (Bahman Shah) : ফেরিস্তার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হাসান প্রথম জীবনে গাঙ্গু নামে দিল্লীর জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কারণ অপর কোন সমসাময়িক রচনায় ফেরিস্তার উক্তির কোন সমর্থন নাই। আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহ্ পারস্যের খ্যাতনামা বীর বহ্‌মন-এর বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। তাঁহার স্থাপিত সুলতান বংশও 'বহ্‌মনী বংশ' নামে পরিচিত।

বহ্‌মন শাহের পরিচয়

বহ্‌মন শাহ্ দৌলতাবাদ হইতে তাঁহার রাজধানী গুলবর্গায় (Gulbarga) স্থানান্তরিত করেন। ইহার পর তিনি মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ রাজ্যসীমা বিস্তারে মনোযোগী হন। মহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পর ফিরুজ তুঘ্‌লক দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই। ফলে, বহ্‌মন শাহ্ নির্বিবাদে রাজ্যবিস্তার করিয়া চলিলেন। তিনি গোয়া, কোলাপুর, দভল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান জয় করিয়া বহ্‌মনী রাজ্যসীমা উত্তরে ওয়াইন-গঙ্গা নদী হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পূর্বে ভোঙ্গীর হইতে পশ্চিমে দৌলতাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয় অভিযানই বিফল হইয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

সুলতান বহ্‌মন শাহ্ বহ্‌মনী রাজ্যকে চারিটি 'তরফ' বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি

দিল্লী সুলতানির অনুকরণ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। বহ্‌মনী রাজ্যের চারিটি তরফ ছিল, যথা—গুলবর্গা, বেরার, বিদর ও দৌলতাবাদ। সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে বহ্‌মন শাহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থা

মহম্মদ শাহ্‌ (১ম), ১৩৫৮-৭৭ (Muhammad Shah): আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ্‌ (১ম) সুদক্ষ শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া শাসনকার্যের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সহিত অবিরাম সংঘর্ষ। রায়চুর, দোয়াব অঞ্চলের অধিকার লইয়াই প্রধানত এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দুই দেশের সহিত যুদ্ধে মহম্মদ শাহ্‌ জয়লাভ করিয়াছিলেন। বরঙ্গলের রাজা পরাজিত হইয়া গোলকুণ্ডা মহম্মদ শাহ্‌কে অর্পণ করিতে এবং প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহ্‌মনী রাজ্যের আনুগত্যও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যও মহম্মদ শাহের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল এবং মহম্মদ শাহের সৈন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চারি লক্ষ হিন্দুর প্রাণনাশ করিয়াছিল।

বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সহিত বহ্‌মনী রাজ্যের যুদ্ধ

মুজাহিদ শাহ্‌, ১৩৭৭-৭৮ (Mujahid Shah): বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহ্‌মনী রাজ্যের দ্বন্দ্ব মুজাহিদ শাহের আমলেও চলিয়াছিল। মুজাহিদ শাহ্‌ অবশ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন সাফল্য-লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ

মহম্মদ শাহ্‌, ১৩৭৯-৯৭ (Muhammad Shah): পরবর্তী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিতেন না। তিনি শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ স্থাপিত হইয়াছিল। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তিনি বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহের পৌত্র তাজ-উদ্দিন ফিরুজ বহ্‌মনী সিংহাসন অধিকার করেন।

অন্তর্বিরোধ

তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহ, ১৩৯৭-১৪২২ (Taj-ud-din Firuz Shah): তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহ্‌ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসক। তাঁহার আমলে রাজ্যের যাবতীয় বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে। ধর্ম বিষয়েও কোনপ্রকার অনাচার তিনি ঘটিতে দিতেন না। জ্ঞানী ও গুণীদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনায় তিনি কালাতিপাত

করিতে আনন্দ পাইতেন। তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের এই সকল গুণ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। তিনিও সমসাময়িক কলুষতায় নিমজ্জিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যগুলি, বিশেষত বিজয়নগরের সহিত তিনি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের সহিত তিনি দুইবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার রাজার নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এমনকি এক রাজকন্যাকে নিজ হারেমের জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় অভিযানে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের সেনাবাহিনী বহ্‌মনী রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এই পরাজয়ের গ্লানিতে তাজ-উদ্দিন ফিরুজ শাহের দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। শাসনকার্যের দায়িত্ব হইতে তিনি নিজেকে ক্রমেই সরাইয়া লইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ ভ্রাতা আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলেন।

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে পরাজয়

আহ্‌ম্মদ শাহ্‌, ১৪২২-৩৫ (Ahmmad Shah): সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা দেবরায়কে (২য়) প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিলেন। দেবরায় আহ্‌ম্মদ শাহ্‌কে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইয়া চুক্তিবদ্ধ হইলেন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আহ্‌ম্মদ শাহের উৎসাহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। তিনি বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে পদানত করিলেন। কাকতীয় রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া তিনি বরঙ্গল বহ্‌মনী রাজ্যভুক্ত করিলেন। আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি গুজরাটের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মালবের সুলতান হুসাং শাহ্‌কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইভাবে বহ্‌মনী রাজ্যের সীমা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ গুলবর্গা হইতে তাঁহার রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করিলেন। আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ ধর্মোন্মত্ত সংকীর্ণমনা দুর্ধর্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যা এবং বিদ্বানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ—বিজয়নগরের করদানে স্বীকৃতি

বরঙ্গল জয়

মালবের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

তাঁহার চরিত্র

আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ, ১৪৩৫-৫৭ (Ala-ud-din Ahmmad): আহ্‌ম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের রাজা দেবরায় (২য়) আহ্‌ম্মদ শাহের হস্তে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নূতনভাবে সামরিক সংগঠন সম্পন্ন করিয়া রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ পিতার ন্যায়ই সমরকুশল সুলতান ছিলেন। তিনি দেবরায়কে পরাজিত করিয়া

বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ

শান্তিস্থাপনে বাধ্য করিলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুত বাৎসরিক করও দেবরায়-এর নিকট হইতে তিনি আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। আলা-উদ্দিন কোঙ্কনের কতিপয় হিন্দু সামন্তরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদও একজন অতি কঠোর শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্থাপত্যশিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

কোঙ্কনের সামন্ত-রাজগণের আনুগত্য লাভ

পরবর্তী সুলতান হুমায়ুন শাহ্ (১৪৫৭-৬১) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনি ছিলেন রক্ত-লোলুপ। তাঁহার অত্যাচারে বহ্‌মনী রাজ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সাধারণ্যে তিনি 'জালিম্' (oppressor) নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বহ্‌মনী রাজ্যের প্রজাবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল। কবি নাজির হুমায়ুন শাহের মৃত্যু ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হুমায়ুনের নাবালক পুত্র নিজাম শাহের রাজত্বকালে (১৪৬১-৬৩) উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার হিন্দুরাজগণ ও মালবের মামুদ খল্‌জী বহ্‌মনী রাজ্য আক্রমণ করেন। মামুদ খল্‌জী বহ্‌মনী রাজ্যের রাজধানী বিদর অবরোধ করিলে নিজাম শাহের অনুরোধে গুজরাটের সুলতান মামুদ বোগ্‌রা সাহায্য প্রেরণ করেন। এই সাহায্য পাওয়ার ফলেই মামুদ খল্‌জীকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী সুলতান মহম্মদ (৩য়)-ও ছিলেন নাবালক। এই সময়ে মামুদ গাওয়ান নামে জনৈক পদস্থ কর্মচারী বৃদ্ধ মন্ত্রী খাজা জাহানকে হত্যা করাইয়া স্বয়ং 'খাজা জাহান' উপাধি ধারণ করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন।

হুমায়ুন শাহ্ (১৪৫৭-৬১)

নিজাম শাহ্ (১৪৬১-৬৩)

মহম্মদ (৩য়) (১৪৬৩-৮২)

মামুদ গাওয়ান (Mahmud Gawan): মামুদ গাওয়ান ছিলেন একজন বিদেশী মুসলমান। কিন্তু তিনি বহ্‌মনী রাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া চরম আনুগত্যসহকারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা, কূটকৌশল, সমরকুশলতা, শাসনকার্যে দক্ষতার ফলেই বহ্‌মনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ ও আড়ম্বরহীন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। বিদরে তিনি একটি মহাবিদ্যালয় ও একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

গাওয়ানের চরিত্র

মামুদ গাওয়ান কোঙ্কনের হিন্দুরাজগণকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কতিপয় সুরক্ষিত দুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা সঙ্গমেশ্বরের নিকট হইতে 'খেলনা' নামক দুর্গটিও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কোঙ্কনের বহুসংখ্যক দুর্গ ও শহর গাওয়ান দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থ বুর্‌হান-ই-মা-আসির (*Burhan-i-ma'asir*)-এ উল্লিখিত আছে। কোঙ্কন হইতে গাওয়ান প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন, বহুসংখ্যক ঘোড়া,

তাঁহার কার্যাদি

হাতী, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্য হইতে গোয়া নামক বন্দরটি তিনি দখল করেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বাধীনেই বহ্‌মনী রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ রাজমহেন্দ্রী ও কোন্দবীর নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। গাওয়ান ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে কয়েকটি হাতী ও কতক পরিমাণ ধনরত্ন দানে বাধ্য করেন। কয়েক বৎসর পর (১৪৮১) গাওয়ান কাঞ্চী আক্রমণ করিয়া তথাকার মন্দিরস্থ যাবতীয় ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় মামুদের রাজত্বকালে মন্ত্রী গাওয়ানের চেষ্টায় বহ্‌মনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু সুলতান নিজে ক্রমেই ব্যভিচার ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা গাওয়ানের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কুপরামর্শে মামুদ (৩য়) গাওয়ানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। গাওয়ান বহ্‌মনী রাজ্যের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতানের এইরূপ অকৃতজ্ঞতায় এবং স্বার্থান্ধ অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহ্‌মনী রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

গাওয়ানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা—তাঁহার প্রাণদণ্ড

মামুদ অল্পকালের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। তাই জীবনের অবশিষ্টাংশ অনুশোচনায় কাটাইয়া ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মামুদের মৃত্যু (১৪৮২)

বহ্‌মনী রাজ্যের পতন (Fall of the Bahmani Kingdom): বৃদ্ধ মন্ত্রী গাওয়ানকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তৃতীয় মামুদ যে ভুল করিয়াছিলেন সেজন্য মর্মবেদনা ও অনুতাপে নিজেও অল্প কালের মধ্যেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহ্‌মনী রাজ্যের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ তিনি বন্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরবর্তী সুলতান মামুদ শাহ্ (১৪৮২-১৫১৮) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত। কোন সুযোগ্য মন্ত্রীরও তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলে বহ্‌মনী রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় অভিজাতবর্গ ও বিদেশীয়দের মধ্যে এক দারুণ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব-স্ব স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। ফলে সুলতানের ক্ষমতা নিজ রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ্ বিজাপুরে আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৪৯০)। বেরারে ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ ইমাদ্‌শাহী বংশের, আহম্মদনগরে নিজাম শাহ্ নিজামশাহী বংশের এবং গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহ্ কুতুবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর মামুদ শাহের পরবর্তী কয়েকজন সুলতান বিদর

মামুদের (৩য়) পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অব্যবস্থা

বহ্‌মনী রাজ্যের পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্তি

অর্থাৎ কেবলমাত্র রাজধানীতেই নামেমাত্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিদরের শাসন-ক্ষমতাও মন্ত্রী আমীর বারিদের হস্তগত হইয়াছিল। অবশেষে শেষ বহমনী সুলতান কালিমুল্লাহ্ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমীর বারিদের অধীনে বিদরে বারিদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এইভাবে বহমনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

আথেনেসিয়াস্ নিকিতিন (Athanasius Nikitin) নামক জনৈক রুশ পর্যটক বহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে আসিয়াছিলেন। তিনি বহমনী রাজ্যের সাধারণ প্রজা ও অভিজাতবর্গের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অভিজাতবর্গ মাত্রেই বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহারা বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত থাকিতেন। জনসাধারণের বিশেষত গ্রামাঞ্চলের লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় আর সুলতান ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয়। তিনি বিশাল সেনাবাহিনী, হস্তী-বাহিনী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে শিকারে বাহির হইতেন। বিদর তখন অত্যন্ত জনবহুল শহর ছিল। বিদেশীয় অর্থাৎ খেরাসানী অভিজাতবর্গ দেশের শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল।

আথেনেসিয়াস্ নিকিতনের বিবরণ

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি (The Five Sultanates of the Deccan): বহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, আহ্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং বিদর—এই পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পাঁচটি সুলতানির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি: বেরার, আহ্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিদর

(১) **বেরার (Berar):** বহমনী রাজ্য হইতে বেরার প্রদেশটিই সর্বপ্রথম স্বাধীন হইয়া যায়। ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ ছিলেন বেরারের শাসনকর্তা। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইমাদ্ শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইমাদ্শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা খান-ই-জাহান-এর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। খান-ই-জাহান-এর মৃত্যুর পর তিনিই বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে বহমনী সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ নিজেকে স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইমাদ্শাহী বংশ ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। ঐ বৎসর আহ্মদনগরের নিজামশাহী বংশ কর্তৃক বেরার অধিকৃত হয়।

ফতুল্লাহ্ ইমাদ্ শাহ্ কর্তৃক বেরার-এর ইমাদ্শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

(২) **বিজাপুর (Bijapur):** ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁ ছিলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করিয়া ইয়ুসুফ্ আদিল

খাঁ নিজ প্রতিভাবলে বিজাপুরের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেরার-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনিও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনিই ছিলেন বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের স্থাপয়িতা।

ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁ মুসলমান হইলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ। শাসনকার্যে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। রাজকীয় কর্তব্য পালনে তিনি কখনও অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। রাজকর্মচারিবৃন্দ ও মন্ত্রিবর্গকে তিনি সর্বদা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে

ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁ কর্তৃক বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

উপদেশ দান করিতেন। তুর্কীস্তান, পারস্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে জ্ঞানী-গুণীদের তিনি তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁর আমলে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়ুসুফ্ এই আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আদিল খাঁর চরিত্র ও কার্যাদি

ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁর পরবর্তী সুলতানগণ ইসমাইল আদিল খাঁ (১৫১০-৩৪), মল্লু (১৫৩৪), ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (১ম) (১৫৩৪-৫৭) এবং আদিল শাহ্ (১৫৫৭-৭৯) প্রভৃতির আমলে বিজাপুরে নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (২য়) (১৫৭৯-১৬২৬) ছিলেন এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইয়ুসুফ্ আদিল খাঁর পরই তাঁহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার আমলেও বিজাপুরের শাসনব্যবস্থা প্রজাবর্গের মঙ্গলকামী ছিল। ধর্মের ব্যাপারেও ইব্রাহিম আদিল শাহ্ চরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজাপুর রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িলেও ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্বাবধি নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতা

ইব্রাহিম আদিল শাহ্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান

মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৮৬)

(৩) **আহ্মদনগর (Ahmadnagar):** আহ্মদনগরের নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন আহ্মদ নিজাম শাহ্। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আহ্মদনগরকে বহমনী রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ঐ সময়ে এই প্রদেশটি জুনার নামে পরিচিত ছিল। আহ্মদ নিজাম শাহ্ সামরিক সুবিধার জন্য আহ্মদনগর শহরটি স্থাপন করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই শহরের নাম হইতেই আহ্মদনগর রাজ্যটির নামকরণ করা হইয়াছে। আহ্মদ নিজাম শাহ্ ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ দখল করিতে সমর্থ হন। দৌলতাবাদ জয় করিবার ফলে তাঁহার রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৫০৮) তাঁহার পুত্র বুরহান নিজাম শাহ্ সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং নিজ শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজয়নগরের সম্রাটের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতান হুসেন নিজাম শাহ্ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। আহ্মদনগরের পরবর্তী ইতিহাসের মধ্যে চাঁদবিবি কর্তৃক মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবাহিনী আহ্মদনগর বিধ্বস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উহা সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব

আহ্মদ নিজাম শাহ্ কর্তৃক আহ্মদ-নগরের নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৩৩)

হয় নাই। ঐ বৎসর (১৬৩৩) আহম্মদনগর যখন মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, শাহ্জাহান তখন দিল্লীর সম্রাট।

(৪) **গোলকুণ্ডা (Golkunda):** বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বহ্মনী রাজ্য বরঙ্গল দখল করিয়াছিল। বরঙ্গলেই গোলকুণ্ডা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন কুলী কুতব শাহ্। ইনি জাতিতে ছিলেন তুর্কী। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহ্মনী রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর (১৫৪৩) পর তাঁহার দুই পুত্র জম্সীদ ও ইব্রাহিম ক্রমান্বয়ে সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে গোলকুণ্ডা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানি রাজ্যের সহিত যুগ্মভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

কুলী কুতব শাহ্ কর্তৃক গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬৮৭)

(৫) **বিদর (Bidar):** বহ্মনী রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে কেবলমাত্র রাজধানী বিদরে বহ্মনী বংশের শেষ সুলতানগণ নামেমাত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল আমীর আলী বদ্র-এর হস্তে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলী বদ্র বহ্মনী বংশের শেষ সুলতান কালিমুল্লাহ্কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিদরে 'বারিদশাহী' বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদর অবশ্য ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হয়।

আমীর আলী বদ্র কর্তৃক বিদরে বারিদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

বিজাপুর রাজ্যভুক্তি (১৬১৮)

বিজয়নগর সাম্রাজ্য (The Vijaynagar Empire): বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে. সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্কই ছিলেন প্রধান। মাধব বিদ্যারণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য বিজয়নগরের ভিত্তি স্থাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে বা কাহারা সে-বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য থাকিলেও দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের জাতীয়তাবোধের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া বিজয়নগর মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি

রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে দিল্লী সুলতানদের প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত হইলে এবং সেই স্থলে বহ্‌মনী রাজ্য মুসলমান প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হইলে বিজয়নগর সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ ও প্রজাসাধারণের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয়নগর এক বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গুরুত্ব

সঙ্গম বংশ (Sangam Dynasty): বিজয়নগরের সর্বপ্রথম রাজবংশ সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের হরিহর ও বুক্ক মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুঝিয়া বিজয়নগরের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের চেষ্টায় হোয়সল রাজ্যের অধিকাংশই বিজয়নগরের অধিকারভুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন, পার্শ্ববর্তী আরও বহু স্থান হরিহর ও বুক্কের রাজত্বকালে বিজয়নগরের প্রাধান্যাধীনে আসে। হরিহর ও বুক্ক অবশ্য কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন নাই। বুক্ক চীন সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৩৭৪)। ইহা হইতেই তাঁহার স্বাধীন মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। বুক্কের শাসনকালেই তাঁহার পুত্র কুমার কম্পন মাদুরার মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করিয়া মাদুরা বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন। বুক্ক বহ্‌মনী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ ও মুজাহিদ শাহের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বুক্কের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর রাজা হইলেন।

হরিহর ও বুক্ক

দ্বিতীয় হরিহর সর্বপ্রথম সম্রাটোচিত উপাধি ধারণ করেন। তিনি নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ', 'রাজপরমেশ্বর' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালেও বহ্‌মনী রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলিতে থাকে। রায়চুর দোয়াব দখল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ফিরুজ শাহ্‌ বহ্‌মনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। মহীশূর, কাঞ্চী, কানাড়া, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি তাঁহার আমলেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় হরিহর শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম দেবরায় সিংহাসন অধিকার করিলে পুনরায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।

দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৯-১৪০৪)

প্রথম দেবরায়ের আমলেও বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অব্যাহত রহিল। বহ্‌মনী সুলতান ফিরুজ শাহ্‌ বিজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া

দেবরায়কে পর পর দুইবার পরাজিত করেন। ফলে, দেবরায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং ফিরুজ শাহের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতেও যুদ্ধের অবসান ঘটিল না। দেবরায়ও এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে নিরস্ত রহিলেন না। বহ্‌মনী সুলতানের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেন এবং বহ্‌মনী রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ বিজয়নগরের সেনাবাহিনী অধিকার করিয়া লইল। এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরুজ শাহ্‌ অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দেবরায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

প্রথম দেবরায়
(১৪০৬-১৪২২)

দ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনিও বহ্‌মনী রাজ্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া তিনি বিজয়নগরের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোযোগী হইলেন। বহ্‌মনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিবার জন্য তিনি নিজ সেনাবাহিনীতে মুসলমান সৈনিক নিযুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্য, নৌবহর প্রভৃতিরও উন্নতি সাধন করিলেন। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তিনি সমুদ্রবাহী বাণিজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু বহ্‌মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে না পারিলেও দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি এবং পারসিক পর্যটক আবদুর রজাক্‌ তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। উভয়েই দেবরায়কে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উভয়েই বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দেবরায়
(১৪২২-৪৬)

দেবরায়ের মৃত্যুর পর মল্লিকার্জুন সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা বহ্‌মনী সুলতানের সহিত যুগ্মভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। মল্লিকার্জুন এই যুগ্ম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় বিরুপাক্ষ অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি ও বহ্‌মনী সুলতান যুগ্মভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ দেখা দিল। মামুদ গাওয়ান গোয়া দখল করিয়া লইলেন এচং পাণ্ড্যরাজ কাঞ্চী আক্রমণ করিলেন। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি যখন অভ্যন্তরীণ ও বাহিরগত আক্রমণে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে সেই সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চন্দ্রগিরি প্রদেশের শাসনকর্তা নরসিংহ দ্বিতীয় বিরুপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮৬)। নরসিংহ পূর্বে

মল্লিকার্জুন
(১৪৪৬-৬৫)

বিরুপাক্ষ (১৪৬৫-৮৬)

হইতেই বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সংকট মুহূর্তে তিনি সিংহাসন অধিকার করিয়া যেমন এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন তেমনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যকেও এক নবজীবন দান করিলেন।

সালুভ বংশ (Saluva Dynasty): নরসিংহ ছিলেন সালুভ বংশসম্ভূত। এজন্য তাঁহার স্থাপিত রাজবংশ সালুভ বংশ নামে পরিচিত। নরসিংহ সালুভ কর্তৃক বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হইল। নরসিংহ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক; বিজয়নগরের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁহার সিংহাসন আরোহণের মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রথমেই বিদ্রোহী প্রদেশগুলির উপর বিজয়নগরের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিলেন। অবশ্য বহমনী সুলতানদের হাত হইতে রায়চুর দোয়াব এবং উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম গজপতির অধিকার হইতে উদয়গিরি তিনি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তামিল রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইম্মাদি নরসিংহ সম্রাট হইলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার কোন ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। স্বভাবতই পিতার আমলের বিশ্বস্ত সেনানায়ক নরস নায়ক সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নরস নায়কের শাসন-দক্ষতায় সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রহিল। নরস নায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ পিতার পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি সালুভ বংশের অকর্মণ্য সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই সিংহাসন দখল করিলেন। এইভাবে বিজয়নগরের দ্বিতীয় রাজবংশের অবসান ঘটিল।

নরসিংহ সালুভ (১৪৮৬-৯৩)

ইম্মাদি নরসিংহ: নরস নায়ক

বীর নরসিংহ তুলুভ কর্তৃক সিংহাসন দখল (১৫০৫)

তুলুভ বংশ (Tuluva Dynasty): বীর নরসিংহ ছিলেন তুলুভ বংশসম্ভূত। বীর নরসিংহ ধর্মপরায়ণ, সুদক্ষ শাসক ছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপি (inscription) ও বৈদেশিক পর্যটক নুনিজ-এর বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে। তুলুভ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বীর নরসিংহের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায়।

বীর নরসিংহ—তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত। তিনি একাধারে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সমরকুশলী সেনাপতি, অতিথিপরায়ণ, উদারচিত্ত, পরধর্মসহিষ্ণু শাসক ছিলেন। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদেব রায় সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৫-৩০)

তাঁহার চরিত্র

শাসনকার্য গ্রহণ করিয়াই কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যারাজ একাধিকবার বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়গিরি অধিকার করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং ইহা ভিন্ন, কোণ্ডবিধু নামক স্থানটিও জয় করিলেন। ইতিমধ্যে (১৪৮৯) বহমনী রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাপুর, বেরার প্রভৃতি পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উদ্ভব হইয়াছিল। বিজাপুরের সুলতান তখন রায়চুর দোয়াবের অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া রায়চুর দোয়াব দখল করিলেন। ইহা ছিল তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা। তিনি সাময়িকভাবে বিজাপুর রাজ্য দখল করিয়া গুলবর্গা দুর্গটি ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিজয়গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে উড়িষ্যা, বিজাপুর প্রভৃতি রাজ্যের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণে নিজ সাম্রাজ্য-সীমা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল।

তাঁহার কার্যাদি

কৃষ্ণদেব রায় কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এমন নহে, শাসনকার্যেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংগঠনে ব্যয় করিয়াছিলেন। পোর্তুগীজ গবর্ণর অলবুকার্ক (Albuquerque)-কে তিনি ভাটখাল নামক স্থানে একটি ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দান করিয়াছিলেন (১৫১০)। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) কৃষ্ণদেব রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দেবায়তনগুলির ব্যয়সংকুলানের জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শাসনদক্ষতা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অচ্যুত রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পোর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ (Nuniz) অচ্যুত রায়কে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি সেরূপ ছিলেন না। সমসাময়িক সাহিত্য ও লিপিতে তাঁহার সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নুনিজের বর্ণনার অসারতা প্রমাণিত হয়। মাদুরার শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অচ্যুত রায় তাঁহাকে দমন করেন। ইহা ভিন্ন, তিনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকেও আনুগত্যাধীনে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে বিজাপুর সুলতান রায়চুর দোয়াব দখল করিয়া লইয়াছিলেন, অচ্যুত রায় তাহা

অচ্যুত রায়

পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি যে পরিমাণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ক্রমেই যেন হ্রাস পাইতে থাকে। তিনি ক্রমেই শাসনকার্যে শিথিলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তিরুমাল* নামে তাঁহার দুই শ্যালক শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দুই শ্যালকের নামই ছিল তিরুমাল। তিরুমাল ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকবর্গ অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে, বেঙ্কট, তিরুমাল ও রাম নামে আরবিডু বংশের তিন ভ্রাতার নেতৃত্বে এই বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এইভাবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পূর্ব-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অচ্যুত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বেঙ্কট সিংহাসনে আরোহণ করিলে অল্পকালের মধ্যেই সদাশিব নামে অচ্যুত রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। সদাশিব রায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রহিল মন্ত্রী রামরায়ের হস্তে। রামরায় ছিলেন আরবিডু বংশসম্ভূত।

বেঙ্কট রায়, সদাশিব রায়

রামরায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু কূটকৌশল এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির বিবাদে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক সময়ে এক এক পক্ষে যোগদান করিয়া তাহাদের পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। ইহাতে প্রথমে তিনি কতকটা সাফল্যলাভ করিলেন। ফলে, তিনি আরও উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিলেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত যুগ্মভাবে বিজাপুর আক্রমণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের মন্ত্রী আসদ খাঁর কূটচালে এই যুগ্ম আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার কয়েক বৎসর পর (১৫৫৮) বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর যুগ্মভাবে আহম্মদনগর আক্রমণ করিল। এই আক্রমণকালে বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া আহম্মদনগরের প্রজাবৃন্দ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইল। রামরায়ের ব্যবহারে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা সকলে একযোগে বিজয়নগর আক্রমণ করা স্থির করিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র বেরার ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপরাপর সুলতানি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী তালিকোটা নামক প্রান্তরে বিজয়নগরের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল। রামরায় বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। বিজয়নগরের গৌরবসূর্য তালিকোটার প্রান্তরে চিরতরে অস্তমিত হইল।

রামরায়

রামরায়ের অদূরদর্শিতা

তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)

---

* উভয় ভ্রাতার নামই ছিল তিরুমাল।

বিজয়ী মুসলমান সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া অবাধ লুণ্ঠন চালাইল। বুরহান-ই-মা-সির এবং ফেরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কল্পনাতীত পরিমাণ মণি-মুক্তা, ধনদৌলত, অসংখ্য হাতী, উট, ঘোড়া, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী বিজয়ী সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের ভাগে যে পরিমাণ সোনা, রূপা ও মণি-মুক্তা পড়িয়াছিল তাহাতে প্রত্যেকেরই ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিজয়ী সেনাবাহিনী কেবলমাত্র মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, বিজয়নগরকে তাহারা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়নগরের ন্যায় সমৃদ্ধ নগরীর এইরূপ আকস্মিক ধ্বংসস্তূপে পরিণতির দৃষ্টান্ত বিরল। নগরের যাবতীয় মন্দির, প্রাসাদ, হর্ম্যাদি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াও বিজেতাদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতার অবসান ঘটিল না। অবশেষে অগণিত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের রক্তে বিজয়নগরের ধূলি রঞ্জিত করিয়া তাহারা লুণ্ঠন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল।* রামরায়ও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন।

বিজয়নগর লুণ্ঠন

কিছুকাল পূর্বাবধি ধারণা ছিল যে, তালিকোটার যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর শহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইলেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে নাই। যাহা হউক, তালিকোটার যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের প্রধান যুদ্ধগুলির অন্যতম ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উপর এই আঘাত দাক্ষিণাত্যে তুর্কী প্রাধান্য বিস্তারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। তালিকোটার পরও আরবিডু বংশের অধীনে বিজয়নগর সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিলেও হিন্দু স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আর বিজয়নগরের ছিল না। ইহা ভিন্ন, বিজয়নগরের শক্তিহীনতায় ভবিষ্যতে মারাঠা শক্তির উত্থানের পথও প্রস্তুত হইয়াছিল।

তালিকোটার যুদ্ধের ফলাফল

আরবিডু বংশ (Arbidu Dynasty) : তালিকোটার যুদ্ধের পর রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমাল বিজয়নগর হইতে পেনুগোণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া আরবিডু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের মধ্যে পুনরায় বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হইলে তিরুমাল বিজয়নগরের শক্তি

তিরুমাল

* "Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought so suddenly, on so splendid a city, teeming with a wealthy and industrious population in the full plentitude of prosperity one day and on the next seized, pillaged and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description". Sewel ; *A Forgotten Empire*, Vide, *Advanced History of India*, p. 378.

ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। তিরুমালের মৃত্যুর পরও তাঁহার অনুসৃত নীতি তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রঙ্গ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় রঙ্গের পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় বেঙ্কট সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনিই ছিলেন আরবিডু বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। দ্বিতীয় বেঙ্কট চন্দ্রগিরিতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার আমল পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য তিনিই রাজা উদেয়ারকে মহীশূর রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দান করিয়া (১৬১২) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি বিনাশের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বেঙ্কটের মৃত্যুর পর তৃতীয় রঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে বহিরাগত আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থলোলুপতা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসকর্তাগণের দেশাত্মবোধের অভাবহেতু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় বেঙ্কট

তৃতীয় রঙ্গ

বিজয়নগরের শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি (Administrat on, Society and Cultu.e in Vijaynagar Empire):

শাসনব্যবস্থা (Administration): বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান হইতে পতন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস। এমতাবস্থায় বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থায় সামরিক প্রভাব প্রতিফলিত হইলেও আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিজয়নগরের সম্রাটগণ তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা সামরিক প্রভাবমুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের শাসনদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও বিজয়নগরের সম্রাটগণ এককেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সামরিক প্রভাবমুক্ত শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ধারণা অনুযায়ী সম্রাটের ক্ষমতা ছিল স্বৈর ও সীমাহীন। সামরিক, বে-সামরিক ও বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হইলেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল ও জনমতের প্রতি বিজয়নগরের সম্রাটগণ কখনও উদাসীন ছিলেন না। কৃষ্ণদেব রায় রচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, শাসনকার্যে সম্রাট ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইবেন। প্রজাবর্গের উপর গুরু করভার স্থাপন না করা, প্রজাবর্গের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং তাহাদের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে সম্রাটের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং এ কথা বলে

সম্রাটের ক্ষমতা

করা যাইতে পারে যে, বিজয়নগরের সম্রাটগণ এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।

শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। মন্ত্রিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায় হইতেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্রাট ও মন্ত্রিসভার অধীনে একটি বিরাট দপ্তর ছিল। রাজকোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সচিব, পুলিশ বাহিনীর অধিকর্তা, 'ভাট' বা রাজপ্রশস্তি গায়ক প্রভৃতি ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী। বিজয়নগরের রাজসভা বহুসংখ্যক পণ্ডিত, পুরোহিত, সাহিত্যিক, জ্যোতিষী, সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা অলংকৃত ছিল।

মন্ত্রিসভা

বিজয়নগর সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই সকল প্রদেশ আবার জেলা (ভেংটি), মহকুমা (নাড়ু), পরগণা (সীম), গ্রাম এবং স্থল (গ্রামের অংশ) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন করিয়া 'নায়ক' অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি শাসনকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সাধারণত রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কিত অথবা অভিজাত শ্রেণী হইতে নায়কগণ নিযুক্ত হইতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

বিজয়নগরের গ্রাম্য শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ ছিল। গ্রাম্যসভার হস্তে পুলিশ, বিচার ও শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। গ্রাম পাহারা দিবার এবং গ্রামের রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বেগার শ্রম গ্রহণের রীতি ছিল। 'মহানায়কাচার্য' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী গ্রাম্য শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা

ভূমি-রাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। জমির উর্বরতার পর্যায়ক্রমে রাজস্বের তারতম্য হইত। উর্বর জমি, বনাকীর্ণ জমি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে জমিকে ভাগ করিয়া রাজস্ব নির্ধারণের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শুল্ক, খেয়া, পথকর প্রভৃতি অপরাপর কর হইতেও সরকারী আয় হইত। রাজস্ব বা কর অর্থ অথবা ফসল দ্বারা দেওয়া চলিত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ প্রায়ই প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হইলে উহার প্রতিকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হইত।

রাজস্ব

সম্রাট স্বয়ং সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারকার্যের জন্য সম্রাটের অধীনে বহুসংখ্যক বিচারালয় ও বিচারপতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রচলিত রীতি-নীতি আইনের ন্যায় বলবৎ ছিল। এই সকল রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বিচারকার্য সম্পাদন করা হইত।

বিচারব্যবস্থা

অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা এবং বহিরাগত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুলতানিগুলির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া বিজয়নগরের সম্রাটগণ বাধ্য হইয়াই এক বিশাল সামরিক বাহিনী পোষণ করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোক-ই সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হইত। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী, হস্তীবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী লইয়া বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল।

সামরিক ব্যবস্থা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠু ও সংহতিবদ্ধ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন বলিয়াই কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিস্তারের যে সুযোগ ছিল তাহা গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা বিজয়নগরের সম্রাটগণ অবলম্বন করেন নাই। বিজয়নগরের পতনের পশ্চাতে এই দু'-টি বিশেষ ত্রুটিই পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটি

সমাজ-জীবন (Social life) : সমসাময়িক লিপি (Inscription), সাহিত্য এবং বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে বিজয়নগরের সমাজ-জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণগণ সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-জাতি সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করিতেন। সমাজে স্ত্রী-জাতির যথেষ্ট সম্মান ছিল। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত এমন কি মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা প্রভৃতিতে স্ত্রী-জাতি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতেন। পোর্তুগীজ পর্যটক নুনিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগরের সম্রাটগণ স্ত্রী-মল্লযোদ্ধা পোষণ করিতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাবতীয় খরচপত্রের হিসাব রক্ষার কাজেও স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইত। স্ত্রী-জ্যোতিষীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং রাজপত্নীগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান

স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদা

ব্রাহ্মণগণ নিরামিষভোজী ছিলেন। অপরাপর শ্রেণীর লোক প্রায় সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ করিতেন। বিজয়নগরবাসীরা মাছ খাইতে ভালবাসিতেন। সমাজে নিম্নস্তরের অনার্যগণ বিড়াল, গিরগিটি প্রভৃতিরও মাংস খাইত।

খাদ্য

বিজয়নগরবাসীদের অনেকে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও অচ্যুত রায়ও ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। বিজয়নগরে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। ইহা ভিন্ন, খ্রীষ্টান, ইহুদি এবং আফ্রিকাবাসী মুসলমান প্রভৃতিও বিজয়নগরে নির্বিবাদে বাস করিত।

ধর্ম

সংস্কৃতি (Culture) : বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বিজয়নগরের সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা মাধববিদ্যারণ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয়নগরের সম্রাটগণ মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। আটজন খ্যাতনামা কবি 'অষ্টদিগ্‌গজ' কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। পেড্ডন ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের রাজকবি। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 'আমুক্ত মাল্যদা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, তর্কশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু গ্রন্থ ঐ সময়ে রচিত হইয়াছিল। রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের মধ্যেও বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যসেবা দ্বারা বিজয়নগরের কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতীয় কৃষ্টি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

সাহিত্য

স্থাপত্যশিল্পেও বিজয়নগর যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়ী সৈন্যের বর্বরতায় বিজয়নগরের সুদৃশ্য প্রাসাদ, মন্দির ও হর্ম্যাদি ধূলিসাৎ হইয়াছিল, তথাপি সেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্ব-কালে নির্মিত বিখ্যাত 'হাজার মন্দির' হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। বিঠলস্বামী মন্দিরটিও বিজয়নগরের স্থাপত্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শিল্প

চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতিও বিজয়নগরে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় এবং রামরায় সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জনসাধারণকে আনন্দদান করিবার জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থাও বিজয়নগরে ছিল।

চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত-শাস্ত্র

বিজয়নগরের সম্রাটগণ ধর্মব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের কৃষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজেরা হিন্দুধর্মালম্বী হইলেও বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদিদিগের ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা তাঁহারা দান করিয়াছিলেন।

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা (Foreign Travellers' Accounts) : বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির কালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারসিক পর্যটক আব্দুর রজাক্ এবং পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুনিজ বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বিজয়নগরের শক্তি ও সমৃদ্ধি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

নিকোলো কন্টি, আব্দুর রজাক্, পায়েজ ও নুনিজ

নিকোলো কন্টি (১৪২০) বিজয়নগরের সম্রাটকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আব্দুর রজাক্ (১৪৪২-৪৩) বিজয়নগরের সমৃদ্ধি

সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের অগণিত অধিবাসীর প্রত্যেকেই মণি-মুক্তা অলংকার হিসাবে ব্যবহার করিত। রাজকোষে সঞ্চিত সোনা ও মণি-মুক্তার পরিমাণ ছিল অশ্রুতপূর্ব। রাজকোষের একটি বিরাট গহ্বর সোনা দ্বারা পূর্ণ ছিল। পোর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনিগো পায়েজ (Dominigos Paes) রাজকোষের ঐশ্বর্যের অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনী ও বহুসংখ্যক যুদ্ধহস্তীর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করিয়া পায়েজ বলিয়াছেন যে, 'বিজয়নগর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যসমৃদ্ধ নগরী'।* এডোয়ার্ডো বারবোসা (Eduarda Barbosa) নামে অপর একজন পর্যটক বিজয়নগরকে অত্যন্ত জনবহুল নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়নগর ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি অতি সমৃদ্ধ কেন্দ্র, একথাও তিনি বলিয়াছেন। বিজয়নগরের বণিকগণ পেগু হইতে হীরা, চুনী প্রভৃতি আমদানি করিত। চীন ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রেশম, মালাবার হইতে কর্পূর, গোলমরিচ, সিন্দুর, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতিও তাহারা বিজয়নগরে আমদানি করিত।†

বিজয়নগরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা

নগরের পথে ও বাজারে মণি-মুক্তা বিক্রয় হইত। জনসাধারণের সকলেই হাত, কান, গলা, কোমর ও কব্জীতে গহনা পরিধান করিত। ইহা হইতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

মণি-মুক্তার প্রাচুর্য—উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বত্রই কৃষি খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কৃষির উন্নতির উপরই বিজয়নগরের অধিবাসিবৃন্দের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল। কৃষির সুবিধার্থে সেচের ব্যবস্থা রাষ্ট্র হইতে করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, খনিশিল্প প্রভৃতি ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান শিল্প। বিভিন্ন শিল্পের শিল্পকারদের এবং ব্যবসায়ীদের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ (Guild) ছিল। আব্দুর রজাকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ছোট বড় তিনশত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। মালাবার উপকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কালিকট। বাণিজ্য-বন্দরগুলির মাধ্যমে বিজয়নগরের বণিকগণ ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, পারস্য, আরব, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। বিজয়নগর তথা সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যপোত মাত্রেই মালদ্বীপে (Maldive Islands) প্রস্তুত

কৃষি ও শিল্প

বাণিজ্য

* "This is the best provided city in the world." *Paes*, Vide, *An Advanced History of India*, p. 374.

† "The City of Vijaynagar is described as "of great extent, highly populous, and the seat of an active commerce in country diamonds, rubies from Pegu, silks from China and Alexandria and cinnabar, camphor, musk, pepper and sandal from Malabar". *Eduarda barbosa*, Vide, *An Advanced History of India*, p. 375.

হইত। বিজয়নগর হইতে লোহা, সোরা, চাউল, চিনি, মসলা, কাপড় প্রভৃতি রপ্তানি হইত এবং বিদেশ হইতে ঘোড়া হাতী, প্রবাল, তামা, পারদ, মখমল, রেশম প্রভৃতি বিজয়নগরে আমদানি করা হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা হইতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে খুব উন্নত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য খুব কম ছিল। জনসাধারণকে অত্যধিক পরিমাণ কর দিতে হইত সেই কথা সমসাময়িক লিপি হইতে প্রমাণিত হয়।

মুদ্রা

সোনা, রূপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। মুদ্রার ছাপ হইতে বিজয়নগর রাজগণের ধর্ম-সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

(৪)

অপরাপর রাজ্যসমূহ

(Other Kingdoms)

উড়িষ্যা (Orissa) : একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনন্তবর্মন্ চোড়গঙ্গ নামে জনৈক রাজা উড়িষ্যাকে এক অতি প্রতিপত্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য গঙ্গা নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্তবর্মন্ ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আমলেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অনন্তবর্মন্
(১০৭৬-১১৪৮)

চোড়গঙ্গের বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-৬৪) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কোণারকের সূর্যমন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

প্রথম নরসিংহ
(১২৩৮-৬৪)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনন্তবর্মন্ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কপিলেন্দ্র নামে জনৈক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। কপিলেন্দ্র উড়িষ্যার লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের সহিত দ্বন্দ্বে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজ্যসীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজয়নগরের অন্তর্গত উদয়গিরি নামক স্থানটি তিনি দখল করিয়াছিলেন।

কপিলেন্দ্র

পরবর্তী রাজা পুরুষোত্তম গজপতি (১৪৭০-৯৭) দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে তিনি এই সকল স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন, তবে রাজা কপিলেন্দ্র-এর আমলে উড়িষ্যার রাজ্যসীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল ঠিক ততদূর পর্যন্ত তিনি পুনরাধিকার করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

পুরুষোত্তম গজপতি (১৪৭০-৯৭)

পুরুষোত্তম গজপতির পুত্র প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০) উড়িষ্যার রাজ্যসীমা রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সিংহাসনারোহণকালে উড়িষ্যা বাংলার হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা হইতে মাদ্রাজের গুন্টুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া গোদাবরী নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গোলকুণ্ডার সুলতান ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে একবার উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণও করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে উড়িষ্যাবাসী ক্রমেই সামরিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এরূপ মনে করা ভুল হইবে না।

প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০)

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কপিলেন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। গোবিন্দ কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ ভোই বংশ নামে পরিচিত। কিন্তু এই বংশের রাজত্বও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন ভোই বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি উড়িষ্যার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন এবং ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কররাণী সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা রাজ্য অধিকৃত হয়। ঐ সময়ে কালাপাহাড় নামে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দু সেনাপতি জগন্নাথের মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল এবং জগন্নাথদেবের মূর্তি চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

মুকুন্দ হরিচন্দন

কররাণী সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা জয়

মেবার (Mewar): রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। গুহিলা রাজপুতগোষ্ঠীর নেতা বাপ্পারাও কর্তৃক মেবার রাজ্যটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্থাপিত হইয়াছিল। আরব সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাসিম মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলা-উদ্দিন খলজী মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বীর হাম্মীর দেব মুসলমান অধিকার হইতে চিতোর উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাম্মীর দেবের মৃত্যুর (১৩৮২) পর মেবারের সিংহাসন

মেবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

লইয়া এক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাণা কুম্ভের মেবারের সিংহাসন আরোহণের পূর্বাবধি মেবার রাজ্যে কোন শান্তি ছিল না।

হামীর দেব

রাণা কুম্ভ ভারত-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম. সন্দেহ নাই। তিনি গুজরাট ও মালবের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মালবের সুলতান মামুদ খলজীকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিবেশী মুসলমান নৃপতিদের মেবার বিজয়ের চেষ্টাও ব্যাহত করিয়াছিলেন। মেবার রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি মোট ৩২টি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে কুন্তলগড় দুর্গটিই ছিল প্রধান। তাঁহার আদেশে নির্মিত জয়স্তম্ভ স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। রাণা কুম্ভ স্বয়ং একজন কবি এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নিজ পুত্র উদয়করণ কর্তৃক নিহত হন। পিতৃহন্তা উদয়কে সিংহাসনে স্থাপন করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রাজপুতগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্লকেই রাণা বলিয়া স্বীকার করিলেন। রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম মেবারের সিংহাসনে আরোহণ (১৫০৯) করিলে মেবারের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি দিল্লী, মালব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের অধিকাংশগুলিতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। রাণা সঙ্গ এক জীবনে শতাধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরে ৮০টি ক্ষত-চিহ্ন ছিল। দিল্লী সুলতানির পতনের পর ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেবারের সৈন্যবল ও অর্থবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বাবর পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) জয়ী হইয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হইলে স্বভাবতই সংগ্রাম সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বৃদ্ধ সংগ্রাম সিংহ তখন এক চক্ষুহীন ও পঙ্গু। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে নির্বাপিত হইল।

রাণা কুম্ভ

রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ

বাবরের হস্তে সংগ্রাম সিংহের পরাজয়

সিন্ধু রাজ্য (Kingdom of Sind) : চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশ আলা-উদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ দিল্লী সুলতানির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের শেষভাগে সিন্ধুদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ফিরুজ তুঘলক বহু চেষ্টায় সিন্ধুদেশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে সিন্ধুদেশ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের

আরঘুন বংশের প্রতিষ্ঠা

শাসনকর্তা শাহ্ বেগ আর্ঘুন বাবরের হস্তে পরাজিত হইয়া ভাগ্যান্বেষণে বাহির হন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিয়া সেখানে আর্ঘুন্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কামরূপ (Kamrup) ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয় তখন আসাম কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে কামরূপ রাজ্যটিই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ইহা 'কাম্তা রাজ্য' নামেও পরিচিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাম্তা রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কাম্তাপুর নামে উহার এক নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাম্তা বা কামরূপ রাজ্য বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কামরূপ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়।

হুসেন শাহ্ কর্তৃক কামরূপ অধিকার

কামরূপের পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি

(Administration, Society and Culture under the Sultanate)

শাসনব্যবস্থা (Administrative System) : তুর্কী-আফগান শাসনাধীনে ভারতবর্ষ একটি ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান ছিলেন এই ধর্মাশ্রয়ী (theocratic) রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ। তাঁহার রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতা ছিল একমাত্র কোরাণের বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইসলাম ধর্মানুসারে সমগ্র মুসলমান জগতের অধিকর্তা ছিলেন বাগদাদের খলিফা। ভারতের সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তত মৌখিকভাবে হইলেও খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের সুলতানগণ ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁহাদের ক্ষমতার প্রকৃত উৎস ছিল তাঁহাদের সামরিক শক্তি। শাসনকার্যের সমালোচনার কোন প্রশ্নই তখন ছিল না। সুলতান একাধারে ছিলেন সর্বোচ্চ শাসনকর্তা, সেনাপতি, আইন-প্রণেতা এবং সর্বোচ্চ বিচারক। বস্তুত তখনকার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি ছিল সামরিক। হিন্দুরাজ্যগুলির বিরোধিতা, মোঙ্গলদের আক্রমণ এই দুইয়ের স্বাভাবিক ফলস্বরূপই সুলতানী শাসনের প্রকৃতি ঐরূপ হইয়াছিল। সুলতানপদ বংশানুক্রমিক ছিল বটে, কিন্তু উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট আইন-কানুন না থাকায় সুলতানগণ মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাইতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর অকর্মণ্যতাহেতু অভিজাতবর্গ কর্তৃক সুলতান নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু এই নির্বাচনের মধ্যে কোনপ্রকারের গণতান্ত্রিকতা ছিল মনে করা ভুল হইবে। এই ব্যাপারে অভিজাত-বর্গের স্বার্থ-ই ছিল প্রধান যুক্তি। সুলতানী শাসনের মূল প্রকৃতির অপর বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিকতা। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বা সামরিক নেতাগণ জায়গীর ভোগ করিতেন। ফলে, সামন্ততান্ত্রিক শাসনের সহজাত ত্রুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও সামরিক নেতাগণ স্ব-স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিতেন।

ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র

শাসনের প্রকৃতি

সুলতানী শাসনকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। শাসনকার্য, বিচার, আইন-প্রণয়ন, যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে স্বৈর ক্ষমতা ছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়।

সুলতানের স্বৈর ক্ষমতা

এই কারণে দিল্লীর সুলতানগণও বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই সকল রাজকর্মচারী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার খুশিমত পদচ্যুত হইতেন।

মজ্‌লিস্‌-ই-খালওয়াৎ (Majlis-i-Khalwat) নামে সুলতানগণের বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধু-বান্ধবের একটি সভা ছিল। শাসনকার্যে কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে এই সভার মতামত গ্রহণ করা হইত, কিন্তু এই সভার মতামত অনুযায়ী সুলতানকে কাজ করিতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। মালিক, আমীর, খাঁ প্রভৃতি অভিজাতবর্গ যে কক্ষ বা সভায় সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন উহা 'বার্‌-ই-খাস্‌' (Bar-i-Khas) এবং যে কক্ষে বসিয়া সুলতান বিচার করিতেন উহা 'বার্‌-ই-আম্‌' (Bar-i-Am) নামে অভিহিত হইত।

'মজ্‌লিস্‌-ই-খালওয়াৎ' বা মন্ত্রণাসভা

'বার্‌ ই-খাস্‌' ও 'বার্‌-ই-আম্‌'

রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজীর (Wazir)। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি পৃথক পৃথক বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ওয়াজীর ছিলেন রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, ইহা ভিন্ন, তিনি অপরাপর বিভাগগুলিরও পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। রাজস্ব বিভাগের নাম ছিল দিওয়ান-ই-ওয়াজীরাৎ। ইহা ভিন্ন আপীল বিভাগ বা দিওয়ান-ই-রিসালৎ, সামরিক বিভাগ বা দিওয়ান-ই-আর্‌জ্‌, ক্রীতদাস বিভাগ বা দিওয়ান-ই-বন্দেগান্‌, সরকারী চিঠি-পত্রাদি প্রেরণ বিভাগ বা দিওয়ান-ই-ইন্‌শান্‌, বিচার, গুপ্তসংবাদ ও ডাক-বিভাগ বা দিওয়ান-ই-কাজা-ই-মমালিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগ এক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অধীন ছিল। সরকারী ভাতা, কৃষি, অনাদায়ীকৃত রাজস্ব, টাঁকশাল, কারখানা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। ইসলাম ধর্মনীতি কার্যকরী করিবার জন্য সদর-ই-সুদুর, হিসাব পরীক্ষার জন্য মুস্তাফি-ই-মমালিক, নৌবাহিনীর তদারকের জন্য অমীর-ই-বেহুর, সৈনিকদের বেতন দিবার জন্য বক্‌সি-ই-ফৌজ প্রভৃতি রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রধান বিচারপতি বা কাজী-উল-কাজাৎ ছিলেন বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। মুফ্‌তিগণ প্রধান বিচারপতিকে কোরাণের আইন বিশ্লেষণে সাহায্য করিতেন। জমি-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের বিচার রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত। রাজস্ববিভাগের অধিকাংশ কর্মচারীই ছিলেন হিন্দু। দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্‌লক দণ্ডবিধির কঠোরতা কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিলেন।

ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী

বিভিন্ন সরকারী বিভাগ

বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী

দণ্ডবিধির কঠোরতা

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভার ছিল কটোওয়ালের উপর। মুহ্‌তাসিব জনসাধারণের আচার-আচরণের উপর দৃষ্টি রাখিতেন এবং বাজারে ওজন প্রভৃতি ঠিক দেওয়া হইতেছে কিনা প্রভৃতি দেখিতেন। আমীর-ই-দাদ নামে কর্মচারীর কর্তব্য ছিল অপরাধীদিগকে কাজীর নিকট বিচারের জ

জন্য উপস্থিত করা। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। গ্রাম্য এলাকার বিচার ও শাসনভার ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর। গ্রাম চৌকিদার গ্রামে পুলিশের কাজ করিত।

গ্রাম্য শাসন

সুলতানী আমলে রাজস্ব হানাফি আইন বিধির (Hanafi School) নির্দেশ অনুযায়ী আদায় করা হইত। মুসলমান প্রজাবর্গের নিকট হইতে জাকৎ বা ধর্মকর আদায় করা হইত। অ-মুসলমানগণকে জিজিয়া কর দিতে হইত। জমিদার ও হিন্দু সামন্তগণের নিকট হইতে খারাজ বা ভূমিকর আদায় করা হইত। যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ কর হিসাবে গ্রহণ করা হইত। ইহাকে 'খামস' বলা হইত। এই সকল রাজস্ব ও কর ভিন্ন গোচারণ কর, গৃহকর প্রভৃতি নানাপ্রকার করও আদায় করা হইত। সুলতানের নিজস্ব জমির রাজস্ব, জায়গীরদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর প্রভৃতিও সরকারী আয়ের উৎস ছিল।

রাজস্ব

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নায়েব-সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। সুলতানী আমলে মোট প্রদেশের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে বিশ হইতে পঁচিশ পর্যন্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সুলতান যে স্থান অধিকার করিতেন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় ঠিক অনুরূপ স্থান অধিকার করিতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও যুদ্ধ, শাসন ও বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে শাসনের ব্যয় সংকুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইত। সুলতানী সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে দূরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা মাত্রেরই স্বাধীন হইবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশ ভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজগণের অধীনেও যথেষ্ট পরিমাণ জমি ছিল। এই সকল সামন্তরাজ সুলতানকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে বংশপরম্পরায় ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুলতানগণের শক্তির উৎস ছিল তাঁহাদের সমরবাহিনী। স্বভাবতই বিশাল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার এবং বহিরাগত শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সুলতানগণকে এক সুবিশাল সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইত। পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী-আরোহী সৈন্য লইয়া সুলতানী সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। এই তিন প্রকার সৈন্যের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকগণই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অশ্বারোহী সৈনিকদের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিত।

সুলতানী সেনাবাহিনী

সুলতানী সেনাবাহিনী আরব, তুর্কী, আফগান, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল। সৈন্য-সংখ্যার অধিকাংশই বিদেশী ছিল বলিয়া সেনাবাহিনী দেশপ্রেম

আলা-উদ্দিন কর্তৃক স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন

বা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সামরিক বিভাগ দিওয়ান-ই-আর্জ নামক বিভাগের অধীন ছিল। সুলতান আলা-উদ্দিনের পূর্বাবধি কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষণের ব্যবস্থা ছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তাঁহার অধীনে নানা পর্যায়ের সেনাপতি ছিলেন। মালিক ও খাঁ-দের মধ্য হইতে সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। সেনাপতির নিম্ন পর্যায়ের সামরিক কর্মচারী ছিলেন শিপাহ্-শলার। প্রত্যেক সিপাহ্-শলার-এর অধীনে দশজন করিয়া সার্-ই-খইল থাকিতেন। সার্-ই-খইলদের প্রত্যেকে দশজন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা ছিলেন। এইভাবে সামরিক কাঠামো উপর হইতে নীচের দিকে ঠিক পিরামিডের ন্যায় ক্রমশ প্রসারিত হইয়াছিল। সুলতানী সেনাবাহিনীতে কোন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না বলিলেই চলে, তবে 'বলিস্ত' (Balista) নামক একপ্রকার প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্রের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

'বলিস্ত'-এর ব্যবহার

সমাজ-জীবন (Social Life): মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি বিভিন্ন সময়তরঙ্গে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ভারতের হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তুর্কী বিজেতাদের বিজয়ের অহংকার ইহার জন্য প্রধানত দায়ী ছিল। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণকারীদের ধর্মান্ধতা এবং বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং হিন্দু মন্দির ও ঐশ্বর্য লুণ্ঠনাদি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সংমিশ্রণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষ জয় করে তখন তাহাদের একটি সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, অপর পক্ষে হিন্দু সমাজেও রক্ষণশীলতা-প্রসূত সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছে, স্বভাবতই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংমিশ্রণের পরিবর্তে পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারও ইহার জন্য দায়ী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দুগণ নিজ দেশেই বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইত। ইসলামীয় রাষ্ট্রে তাঁহারা ছিল 'জিম্মি'—অর্থাৎ বিশেষ শর্তাধীনে বসবাস করিবার অধিকারপ্রাপ্ত। জিজিয়া কর প্রদানই এই বিশেষ শর্তগুলির প্রধান ছিল। হিন্দু নির্যাতন মুসলমান আইনজ্ঞদের (jurists) দ্বারা সমর্থিত হইত। মিশরের জনৈক ইসলামীয় আইনবিশারদ্ আলা-উদ্দিনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "শুনিলাম আপনি নাকি হিন্দুদের এমন অবস্থা করিয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানদের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ কাজ করিয়া আপনি ইসলামধর্মের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। একমাত্র এ

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্য

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের স্থান

ইসলামীয় আইন-বিশারদ ও উলেমাদের সংকীর্ণতা

কাজের জন্যই আপনার সকল পাপ স্খালন হইবে।"* উলেমাদের ধর্মান্ধতা এবং শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাববিস্তার সুলতানী শাসনের সংকীর্ণতা এবং মুসলমানের মনে হিন্দুবিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক একতার মাধ্যমে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিনষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পর পরস্পরকে কতক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য। হিন্দুদের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক লোক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হইবার ফলে হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ মুসলমান সমাজে বিবাহাদির ব্যাপারে শ্রেণীগত বৈষম্যের প্রচলন করিয়াছিল। ইসলামধর্মের কোনপ্রকার জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান বিবাহাদি ব্যাপারে রক্ষণশীলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা প্রধানত হিন্দু সমাজেরই প্রভাবের ফল। হিন্দু সমাজের সাধুসন্তদের অনুকরণে মুসলমান সমাজেও পীরদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। সুলতানদের অনেকে হিন্দু পত্নী গ্রহণ করিবার ফলেও হিন্দু সমাজের আচার-আচরণের অনেক কিছু মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

মুসলমান সমাজের উপর হিন্দু সমাজের প্রভাব

সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্ত্রী-জাতি পুরুষদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। পারিবারিক জীবনের বাহিরে অপর কোন কিছুতে অংশ গ্রহণের পূর্বরীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিদ্যা-চর্চার রীতি ছিল। রূপমতী ও পদ্মাবতী ঐ যুগের বিদুষী রমণীদের দৃষ্টান্তস্বরূপ। পর্দা-প্রথা মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যেও উহার প্রচলন হইয়াছিল। স্ত্রী-জাতির উপর নানাপ্রকার অবিচার-অত্যাচারের দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে তখন স্ত্রী-জাতিকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। হিন্দু সমাজে 'সতী' প্রথা এবং 'জোহর' প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্ত্রীলোকদের কেহ কেহ 'সতী' হইয়াছেন অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেও আত্মাহুতি দিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

স্ত্রী জাতির স্থান

মুসলমান আমলে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইবন্ বতুতা হিন্দু সমাজের নৈতিকতা ও আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি

* "I have heard you have degraded the Hindus to such an extent that their wives and children beg their bread at the doors of Muslims. You are, in doing so, rendering a great service to religion. All your sins will be pardoned by reason of this single act." *An Egyptian jurist to Alauddin*, vide, Sinha and Banerjee, p. 317.

সুলতানী আমলে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণের রীতির ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান আমীর, মালিক, খাঁ সকলে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণ করা আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। সুলতানেরও বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী থাকিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচার সুলতানী আমলের শেষভাগে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপকতা

মুসলমান অভিজাতবর্গ (Muslim Nobility) : মধ্যযুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থার উপর নানাভাবে প্রতিফলিত হইত। সুলতানী আমলে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ও শাসনব্যবস্থার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া মুসলমান অভিজাত শ্রেণী কেবলমাত্র সুলতানের নিম্নে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইত। সময় সময় তাঁহারা সুলতান নির্বাচনও করিতেন। এরূপ অভিজাতবর্গকে যথাসম্ভব ক্ষমতাহীন করিয়া রাখাই ছিল দূরদর্শী সুলতানমাত্রেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বলবন বা আলা-উদ্দিন খল্‌জীর ন্যায় সুলতানগণ অভিজাত শ্রেণী দমন শাসনকার্যের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে অনুসরণ করিতেন। দুর্বল সুলতানদের আমলে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত। ফিরুজ তুঘ্‌লকের আমলে অথবা লোদী বংশের শাসনকালে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি

পাশ্চাত্য দেশে অভিজাত শ্রেণীর আভিজাত্য ছিল বংশানুক্রমিক। রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণকামী করিতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতানী আমলের মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর আভিজাত্য বাংশানুক্রমিক ছিল না। বিভিন্ন দেশীয় লোক সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইত। তুর্কী, আরবীয়, মিশরীয়, হাব্‌সী, আফগান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংহতি, দেশাত্মবোধ বা পরস্পর সহিষ্ণুতা কিছুই ছিল না। স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুলতানের স্বেচ্ছাচার রোধ করিবার মত ক্ষমতা বা মনোবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসংবাদের ফলে শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মুসলমান অভিজাতবর্গের ঔদ্ধত্য, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও স্ব-স্ব প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক পরিমাণে দায়ী ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থপরতা

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) : সুলতানী আমলে ভারতবর্ষের সকল অংশের অর্থনৈতিক অবস্থাও একরূপ ছিল না, এই কারণে ঐ সময়ের কোন

নিখ্ৰ্ত অর্থনৈতিক চিত্র অংকন করা সম্ভব নহে। তবে সমসাময়িক বিবরণ, সাহিত্য, লোকগীতি, বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা প্রভৃতি হইতে তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

নিখ্ৰ্ত অর্থনৈতিক চিত্র অংকনের অস্ববিধা

ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। স্বলতানী আমলে কৃষিই ছিল লোকের প্রধান উপজীবিকা। স্বলতানী শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বা উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা সরকারী দায়িত্ব বলিয়া কোনকালেই বিবেচিত হইত না। তবে একাধিক স্বলতান কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘলকের সেচব্যবস্থা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শহর এলাকায় এবং গ্রামাঞ্চলে নানাপ্রকার শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। অবশ্য ইহার পশ্চাতে পৃষ্ঠপোষকতাও যে না ছিল এমন নহে। স্বলতান ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একমাত্র দিল্লীতে 'সরকারী কারখানায়' (Royal *Karkhanas*) চারি হাজার তাঁতী নিযুক্ত ছিল। এইভাবে অপরাপর সামগ্রী প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা ছিল। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, ছাপা শাড়ী ও ধ্বতি, রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি, চিনি, কাগজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমীর খুস্রু, বিদেশী পর্যটক মাহুয়ান (Mahuan), বারথেমা (Barthema), এডোয়ার্ডো বারবোসা ((Eduarda Barbosa) প্রভৃতি বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রী বিশেষভাবে বয়ন-শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশ ও গুজরাট সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্বতীদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিত। স্বলতানী আমলে বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, পারস্য, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত জলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বণিকগণ ভারতীয় ধনসম্পদের লোভে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইত। পর্যটক বারথেমা বাংলাদেশকে বস্ত্র, খাদ্যশস্য, চিনি, আদা, মাংস প্রভৃতির প্রাচুর্যের দিক দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* ইবন্ বতুতাও বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম যে অতি সস্তা ছিল, একথার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশ অপেক্ষা অধিকতর সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রয় হইতে তিনি কোথাও দেখেন নাই এ কথাই তিনি লিখিয়াছেন।

কৃষি

শিল্প

বাণিজ্য

বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, স্বলতানী আমলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল ইহার

---

* "...the richest country is Bengal in world for cotton, ginger, sugar, grain and flesh of every kind." *Brathema*, Vide, *An Advanced History of India*, p. 398.

বিপরীত। সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায় আরাম ও ঐশ্বর্যে জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা শাসক সম্প্রদায়ের অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইত তাহাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অসহনীয় করভার, আবওয়াব (অতিরিক্ত কর), অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-চলাচলের অসুবিধা প্রভৃতির ফলে কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। আমীর খুসরুভ কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দরিদ্র কৃষকদের রক্ত বিগলিত অশ্রুকণা।*

কৃষক ও শ্রমজীবীদের দুর্দশা

সুলতানী আমলের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বহুবার বিভিন্ন বিদেশী আক্রমণকারী প্রভূত পরিমাণে ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সুলতান মামুদের লুণ্ঠন, মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের অমিতব্যয়িতা, তৈমুরের লুণ্ঠন প্রভৃতি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিদেশী আক্রমণকারী-দের লুণ্ঠন

সুলতানী আমলে গ্রামাঞ্চল মাত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ গ্রামেই উৎপাদন করিয়া লইত, এজন্য তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না।

সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Art, Literature and Culture): সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলন ও মিশ্রণ নানাকারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণের পূর্বে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ক্রমে ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতীয় আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, ভাব-ভাষা, রীতি-নীতি সব কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। আরব মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত মুসলমান সভ্যতা এক দুর্জয় শক্তি লইয়া যখন দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখন স্থানীয় সমাজ ও সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াই উহা নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতাকে যেমন উহা সম্পূর্ণভাবে কবলিত করিতে পারে নাই, ভারতীয় সভ্যতাও তেমনি মুসলমান সভ্যতাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমান সভ্যতা উভয়ই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকিবার ফলে এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি এবং প্রাচ্য ও

হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল

* "Every pearl in the royal crown is but the crystallised crop of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants."—*Amir Kusrau*, Ibid, p. 399.

পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র আরব দেশে উৎপত্তি ঘটিবার ফলে মুসলমান সভ্যতা এক শক্তিশালী, উন্নত সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শক্তিশালী ও উন্নত অথচ সম্পূর্ণ পৃথক সভ্যতার পরস্পর প্রভাবে এক অতি অপূর্ব শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য শিল্প গড়িয়া উঠে। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার যুগ্ম প্রচেষ্টায় উদ্ভূত ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য যুগযুগান্তর ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শক ও পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।*

শিল্প ও স্থাপত্য (Art and Architecture) : হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার সংমিশ্রণে উদ্ভূত শিল্প ও স্থাপত্যের কি পরিমাণ কোন্ সভ্যতার দান তাহা অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। কোন কোন ঐতিহাসিক, যথা ফারগুসন্ (Fergusson) এই শিল্প ও স্থাপত্যকে মুসলমান শিল্পপদ্ধতিরই ভারতীয় সংস্করণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আবার হ্যাভেল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইহাকে হিন্দু শিল্পপদ্ধতিরই সামান্য পরিবর্তিত ধরন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকমাত্রেই ইহাকে হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের দান সম-পরিমাণ ছিল মনে করা সঙ্গত হইবে না।† হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্প ও স্থাপত্যের উপর মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাবের ফলেই এই মিশ্রিত শিল্প ও স্থাপত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। স্থানীয় প্রভাব, ব্যক্তি-বিশেষের রুচিজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের শিল্প ও স্থাপত্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়াছিল। জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ, বিজাপুর প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে গঠনসৌষ্ঠবের যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা স্থানীয় প্রভাব ও প্রয়োজন এবং নির্মাতার রুচিজ্ঞানের পার্থক্যের ফলেই ঘটিয়াছে, বলা বাহুল্য। ঠিক অনুরূপ কারণেই ইসলাম প্রাধান্যাধীন বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্পরীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সুলতানী যুগের শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত

ভারতীয় ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ

* "The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their culture and their religions, make the history of their impact peculiarly instructive and lend an added interest to the art and above all to the architecture with their united genius called into being. *The Camb. Hitory of India*, Vol. III. p. 568.

† "Broadly speaking, Indo-Islamic architecture derives its character from both sources, though not always in an equal degree." *The Cambridge History of India*, Vol. III, p. 568.

"Indo-Islamic art is not merely a local variety of Islamic art nor is it merely a modified form of Hindu art"...*Sir John Marshall*, Vide, *An Advanced History of India*, p. 410.

ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প ও স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের অন্যতম কারণ ছিল মুসলমান সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কর্তৃক হিন্দু স্থপতি ও শিল্পকার নিয়োগ। ইহা ভিন্ন, ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তারের প্রথম দিকে হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলেও হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সামান্য পরিবর্তন সাধন করিয়াই মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাও ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প ও স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের পথ সহজ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যে আলংকারিক কারুকার্যাদি এবং স্তম্ভ নির্মাণ-পদ্ধতির মৌলিক সামঞ্জস্য ছিল। ফলে, এই দুই শিল্প ও স্থাপত্যের স্বাভাবিক সংমিশ্রণ সহজ হইয়াছিল।

ভারতীয় ও মুসলমান স্থাপত্যের সংমিশ্রণের কারণ

সুলতানী যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে কুতব মিনার, নিজাম-উদ্দিন আউলিয়ার দরগা, কুতব মিনারের আলাই দরওয়াজা, অতাল মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ইট ও পাথর একই সঙ্গে ব্যবহার করিয়া একপ্রকার শিল্প-রীতি গড়িয়া উঠে। হিন্দু মন্দির, হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যে ব্যবহৃত পদ্ম প্রভৃতি আলংকারিক কারুকার্যের অনুকরণে মধ্যযুগে বহু মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, হুসেন শাহের আমলে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ, নুসরৎ শাহের আমলে নির্মিত বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল প্রভৃতি সুলতানী যুগে বাংলাদেশের শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গুজরাট, জৌনপুর, মালব প্রভৃতি স্থানে ঐ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। গুলবর্গার জামি মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার প্রভৃতি ঐ যুগের শিল্পনিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিল্প-স্থাপত্য নিদর্শন

বাংলার শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শন

কিন্তু বিজয়নগর, উড়িষ্যা, মেবার প্রভৃতি রাজ্য ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্প-রীতি অনুসারে নির্মিত মন্দিরাদি ঐ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির, বিজয়নগরের 'হাজার মন্দির' ও 'বিঠলস্বামী মন্দির' প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্য

সাহিত্য ও ধর্ম (Literature & Religion) : ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের সুফল কেবলমাত্র শিল্প ও স্থাপত্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল, এমন নহে। সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রেও ইহার সুফল দেখা গিয়াছিল।

ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সুলতানদের কথা বাদ দিলেও দিল্লীর সুলতানদের এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই আরবী, ফারসী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানির আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নের ঐকান্তিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের ফল

দিল্লীর সুলতানগণ আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কোন কোন সুলতান সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে। গিয়াস-উদ্দিন বলবন আমীর খুসরু বা খুসরুভকে তাঁহার সভায় স্থান দিয়াছিলেন। আমীর খুসরু প্রথমে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবেই বলবনের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। খুসরুর রচনায় বহু হিন্দি শব্দ স্থান পাইয়াছিল। খুসরু ভিন্ন সুলতানী আমলের অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহলবি।

কবিতা ও সাহিত্য

সুলতানী আমলে ইতিহাস-সাহিত্য রচনার এক অভূতপূর্ব আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মিনহাজ-উস্-সিরাজ, জিয়া-উদ্দিন বরণী, সামস্-ই-সিরাজ আফিফ্, আজ-উদ্দিন খালিদ-খানী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের রচনায় সুলতানী আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস জানিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস ও সাহিত্য

সুলতানী যুগে আরবী ও ফারসী ভাষা সাহিত্যেই বিশেষভাবে আলোচিত হইত বটে, কিন্তু সুলতান এবং মুসলমান লেখকদের কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পর অলবেরুণী দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নগরকোট দুর্গ জয় করিয়া জ্বালামুখী মন্দিরে প্রাপ্ত তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ ফিরুজ তুঘলকের আদেশে ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। লোদী বংশের সুলতান সিকন্দর লোদীও কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পঁচিশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল্ আবিদীনও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতানী যুগের হিন্দুগণও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য পূর্বেকার তুলনায় ঐ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ঐ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে পার্থসারথি মিশ্র, জয়সিংহ সুরী, রবিবর্মণ, বিদ্যানাথ, বামন ভট্টবাণ, গঙ্গাধর, রূপ গোস্বামী, পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপতি উপাধ্যায়, বাচস্পতি, রঘুনাথ, সায়নাচার্য, মাধব বিদ্যারণ্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

মুসলমান মনীষীদের অনেকে সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মালিক মহম্মদ জয়সীর 'পদ্মাবৎ কাব্য' এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য: হিন্দি, ব্রজভাষা, মারাঠী, বাংলা ও তেলেগু

প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দি, ব্রজভাষা, মারাঠী, বাংলা, তেলেগু প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ ঐ যুগে সাধিত হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর তাঁহাদের কবিতার দ্বারা হিন্দি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কবীরের 'দোঁহা' এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে নামদেবের যথেষ্ট দান রহিয়াছে। ব্রজভাষায় রচিত ভজনের দ্বারা মীরাবাঈ ঐ ভাষার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি লেখকগণ ঐ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও বাংলাদেশের কবি হিসাবেই সাধারণ্যে পরিচিত। বাংলার স্বাধীন সুলতানীর আমলেও বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। নুসরৎ শাহের আমলেও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। হুসেন শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্য হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ধর্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হুসেন শাহের আমলে সত্যপীরের কল্পনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা ভিন্ন, ইসলামের প্রভাবে একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর হইয়াছিল তেমনি অপরদিকে উহার ফলে 'ভক্তিবাদ' নামক উদার ধর্মনীতিরও উদ্ভব ঘটিয়াছিল। স্মৃতি-সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাদি, যথা—মাধব বিদ্যারণ্যের পরাশর স্মৃতির টীকা 'কালনির্ণয়', বিশ্বেশ্বরের 'মদন পারিজাত' প্রভৃতি ঐ যুগের রক্ষণশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। অপরদিকে সর্বধর্মের সমতা, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে ভগবৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি মূলনীতির উপর গঠিত 'ভক্তিবাদ'ও ঐ সময়ে প্রচারিত হয়। ভক্তিবাদের প্রচারকগণের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, কবীর ও নানকের নাম ভারতের ধর্মনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দুইটি বিপরীতমুখী প্রভাব: রক্ষণশীলতা ও উদার ভক্তিবাদ

রামানন্দ (Ramananda): বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য রামানন্দ এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। তিনি কনোজী ব্রাহ্মণ পরিবারসম্ভূত ছিলেন। রামানন্দ রাম ও সীতার উপাসক ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকেই তাঁহার

পরিচয়

শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। তিনি উত্তর-ভারতের যাবতীয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করিতেন না। ভগবদ্‌ প্রেমে ছোট-বড় বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, মুচি প্রভৃতি সকল ধর্ম ও শ্রেণীর লোক ছিলেন। কবীর ছিলেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রধান। রামানন্দ হিন্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতেন।

রামানন্দের ধর্মমত ঃ রামের উপাসনা

বল্লভাচার্য, ১৪৭৯-১৫৩১ (Ballavacharyya) ঃ বল্লভাচার্য এক তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ কাশীধামে তাঁহার জন্ম হয়। বারাণসীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেবরায়ের রাজসভায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। বিজয়নগরের রাজসভায় তিনি শৈব পণ্ডিতগণকে ধর্মালোচনায় পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভক্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র। তিনি মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিজ আত্মার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন অর্থাৎ পৃথিবীর সকল সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মাকে উৎসর্গ করাই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা। ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের টীকা এবং 'শুদ্ধ অদ্বৈত' নামে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নানাপ্রকার ভোগবিলাস দেখা দিয়াছিল।

পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা

শ্রীচৈতন্য, ১৪৮৫-১৫৩৩ (Sri Chaitanya) ঃ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আদি বাসস্থান ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে। শিশুকাল হইতে শ্রীচৈতন্য বিদ্যানুরাগী ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পুরীতে অতিবাহিত করেন। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া কাটাইতে পারে—ইহাই চৈতন্যের ধর্মের মূলকথা। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। জাতি-ধর্ম, ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকলের নিকটই তিনি ভগবৎ-প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মের বাণী বাংলার ধর্মজগতে এক প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

কবীর (Kabir) ঃ রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। প্রথম জীবনে কবীর ছিলেন মুসলমান। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুকাল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

কিংবদন্তী আছে যে, কবীর ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। নিরু নামে এক মুসলমান তাঁতী তাঁহাকে লালন-পালন করে। প্রথমে কবীর তাঁতীর কাজই গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার মন সংসার অপেক্ষা ধর্মের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। হিন্দুদর্শন এবং সুফী ফকির ও কবিদের প্রভাব তাঁহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে শুরু করেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে করিয়া গিয়াছিলেন। রাম ও আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয় ইহাই ছিল তাঁহার মূল বাণী। হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত দুইটি পাত্র বিশেষ—এই কথা তিনি বলিতেন। তাঁহার রচিত 'দোঁহা' দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের কোনটিরই তিনি সমর্থন করিতেন না। অন্তরকে পাপমুক্ত এবং ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনই হইল সর্বধর্মের সার—এই ছিল তাঁহার ধারণা। বহু হিন্দু ও মুসলমান কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিচয়

ধর্মমত

নানক (Nanak) : নানক লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী গ্রামে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক। সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি প্রচার করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক মিলনের চেষ্টাতেই তিনি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমতেও কবীরের নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবীরের ন্যায় তিনিও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, একথা বলিতেন। আন্তরিকভাবে ভগবানের উপাসনা ও চিত্তকে শুদ্ধ রাখা—এই ছিল তাঁহার প্রচারিত ধর্মপালনের পন্থা। হিন্দু বা ইসলামধর্মের অর্থহীন কুসংস্কার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি তিনি সমর্থন করিতেন না। ধর্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

পরিচয়

ধর্মমত

নামদেব (Namadeva) : মারাঠী সন্ত নামদেবও ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নীচজাতিসম্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় এই কথা তিনি প্রচার করিতেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্ম, একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার দুইটি পথ ভিন্ন অপর কিছু নহে, এই কথাই তিনি বলিতেন। ভগবানকে প্রেমের দ্বারা লাভ করিতে হইবে। ইহাতে হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের কোন প্রশ্ন নাই। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের চেষ্টা তিনিও করিয়া গিয়াছিলেন।

ধর্মমত

সপ্তম অধ্যায়

মুঘল শাসনের সূচনা ঃ মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

(Establishment of the Moghul Rule : Moghul-Afghan Contest)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ (The First Battle of Panipat) : লোদীবংশের সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া অভিজাতবর্গ প্রকাশ্যভাবে সুলতানী শাসনের বিরোধিতা শুরু করিলেন। এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁর প্রতি ইব্রাহিম লোদীর দুর্ব্যবহার দৌলত খাঁকে ইব্রাহিম লোদীর শাসন অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ দিল্লীর সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। তিনিও দৌলত খাঁর সহিত যোগদান করিলেন। উভয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে ভারত-আক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন। বাবর পূর্ব হইতেই হিন্দুস্তানে রাজ্যবিস্তারের আশা পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং এই আমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক বিভেদ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব বাবরের অভিযানের সাফল্যের সহায়ক হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পানিপথের রণাঙ্গনে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিমের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে অধিক থাকা সত্ত্বেও বাবরের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। পানিপথের যুদ্ধে (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬) জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। এইভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল।

ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারী শাসন—দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ কর্তৃক বাবরকে আমন্ত্রণ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)—ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু : মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

বাবর, ১৪৮৩-১৫৩০ (Babur) : জহির-উদ্দিন মহম্মদ ইতিহাসে বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরঘনা (Farghana) নামক রুশ-তুর্কীস্তানের এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে আমীর উমর শেখ মির্জার পুত্র বাবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক হইতে তিনি তৈমুরের ও মাতার দিক হইতে চিঙ্গিজ্ খাঁর বংশধর ছিলেন। এশিয়ার এই দুই দুর্ধর্ষ বিজেতার রক্ত যাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত, তিনি বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসী ও যুদ্ধামোদী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বাবরের বাল্যজীবন তাঁহার অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও বিদুষী মাতামহীর প্রভাবাধীনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবে বাল্যজীবনে শিক্ষালাভের

পিতৃপরিচয়

সুযোগ হওয়ায় বাবর স্বভাবতই সাহসী, ধর্মভীরু ও সদাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।
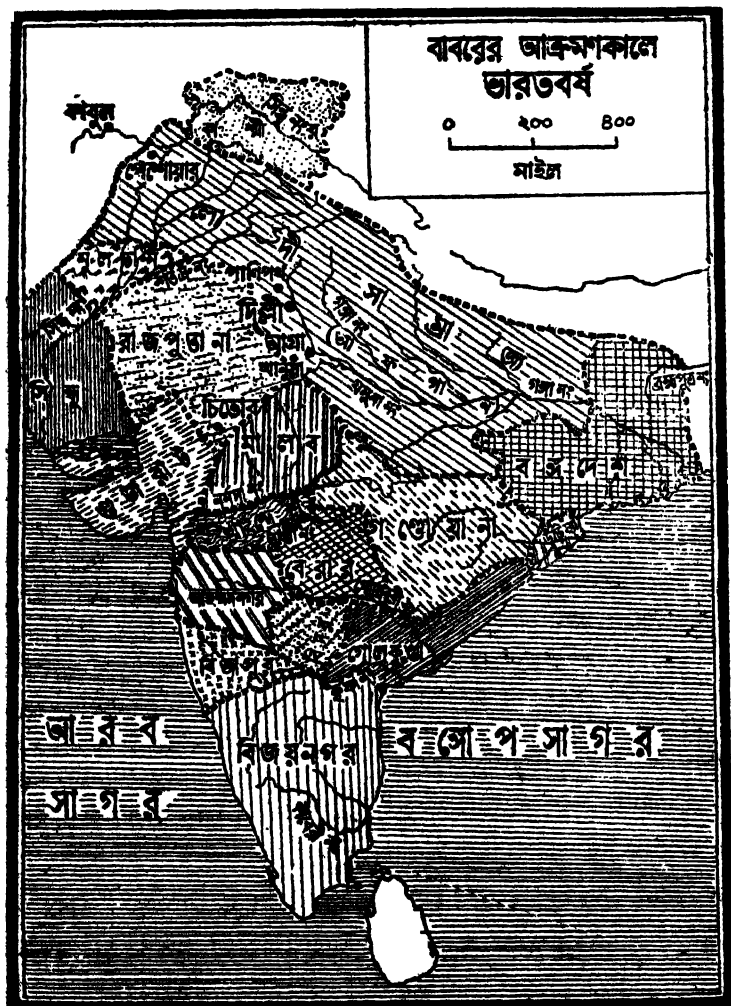
পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে বাবর ফরঘনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফরঘনা রাজ্য তখন চতুর্দিকে শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত। বাবরের সিংহাসন আরোহণের অতি অল্পকালের মধ্যেই সমরকন্দের সিংহাসন লইয়া তৈমুরের

বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ শুরু হইয়াছিল। বাবর বাল্যকাল হইতেই তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনঃসঞ্জীবিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। তিনিও সমরকন্দের সিংহাসন দখলের চেষ্টা শুরু করিলেন। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি সাময়িকভাবে সমরকন্দ জয় করিতেও (১৪৯৭) সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ফরঘনায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হইলে তিনি সমরকন্দ ত্যাগ করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই সমরকন্দ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অবশ্য ইহার অল্পকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় সমরকন্দ জয় করেন। কিন্তু উজ্‌বেক দলপতি সাহেবানী খাঁর নেতৃত্বে উজবেকগণ বাবরের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আরচিয়ান নামক স্থানে সাহেবানী খাঁর হস্তে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ফলে, তিনি কেবলমাত্র সমরকন্দ হইতেই নহে, পৈতৃক রাজ্য ফরঘনা হইতেও বিতাড়িত হন। হৃতসর্বস্ব হইয়া বাবর যখন স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন ঐ সময়েই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের সংকল্প গ্রহণ করেন। এক বৎসর রাজ্যহারাভাবে নানা দুঃখ-দুর্দশায় কাটাইয়া তিনি জীবনের বহু কঠোর এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পর বৎসর (১৫০৪) উজবেক শাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তিনি কাবুল রাজ্য দখল করেন। এইভাবে বাবর নিজেকে পুনরায় রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। পারস্যের শাহ্ ইসমাইল সফবীর সহায়তা লইয়া তিনি সাহেবানী খাঁকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এইভাবে দুর্ধর্ষ উজবেকদের পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া বাবর দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ফলে দুর্বল ভারতবর্ষ তখন বাবরকে সুযোগ দান করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বাবর কয়েকটি প্রাথমিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বজৌর (Bajour) দুর্গ, ঝিলামের তীরে ভির (Bhira) নামক স্থান এবং চীনাব নদীর অববাহিকা অংশে প্রভৃতি তিনি একপ্রকার বিনা বাধায়-ই জয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শে ইব্রাহিম লোদীর নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া পূর্বে তুর্কীদের অধিকারে যে-সকল স্থান ছিল সেগুলি দাবি করিলেন। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ বাবরের দূতকে কিছুকাল বন্দী করিয়া রাখিলেন। মুক্তি পাইবার পর বাবরের দূত দিল্লীর সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। দূতের এই দুর্দশাভোগ বাবরকে স্বভাবতই দিল্লী সুলতানের শত্রুতে পরিণত করিল। যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অর্থাৎ পরীক্ষামূলক কয়েকটি অভিযানের পর বাবর ভারত-আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদী তাঁহাকে হিন্দুস্থান

প্রথম জীবন

রাজ্যচ্যুত বাবরের কাবুল অধিকার

ভারত জয়ের পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযান

দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণ

আক্রমণের জন্য আহ্বান জানাইলে বাবর স্বভাবতই উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বাদাক্‌শান ও কান্দাহার জয় করিয়া হুমায়ুনকে বাদাক্‌শানের এবং কাম্‌রানকে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমেই লাহোর অধিকার করিলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের সহায়তা চাহিয়াছিলেন, প্রভু হিসাবে বাবরকে তাঁহারা আহ্বান করেন নাই। সুতরাং বাবরের লাহোর জয় তাঁহাদের মনঃপুত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে, বাবরকে সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারা হিন্দুস্থানের এক নূতন প্রভু ডাকিয়া আনিয়াছেন। স্বভাবতই দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের বিরোধিতা শুরু করিলেন। বাবর এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারত জয় পূর্ণোদ্যমে শুরু না করিয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫২৫) পুনরায় তিনি সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। দৌলত খাঁ এইবার বাবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর পানিপথের প্রান্তরে বাবরের হস্তে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। পানিপথের যুদ্ধের ফলে লোদী বংশের শাসনের অবসান ঘটিল এবং দিল্লী সুলতানীর স্থলে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। বাবরের ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও পানিপথের যুদ্ধজয় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাবর এই জয়ের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ করিলেন, এবং কাবুলের প্রতি নর-নারীকে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দান করিয়া বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধের ফলে হিন্দুস্থানের প্রভুত্ব বাবরের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল মনে করা উচিত হইবে না। কারণ, তখনও আফগান দলপতি এবং সংগ্রাম সিংহের অধীনে রাজপুতগণ বাবরের অবিজিত শত্রু হিসাবে রহিয়াছিলেন। বস্তুত পানিপথের যুদ্ধের পরই বাবরের ভারত বিজয় শুরু হইয়াছিল বলা উচিত হইবে।* পানিপথের যুদ্ধজয় মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল মাত্র।

দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর বিরোধিতা—বাবরের ভারত ত্যাগ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের ফলাফল

বাবর প্রথমেই দোয়াব অঞ্চলে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের আফগান অভিজাতবর্গকে দমন করিবার কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দোয়াব অঞ্চলের আফগান অভিজাতদের দমন করিয়া তিনি নিজ বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে অপরাপর আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ও অভিজাতবর্গের চেষ্টায় জৌনপুর, ঢোলপুর, গাজীপুর, কাল্পি, বিয়ানা, গোয়ালিওর

আফগান ও অভিজাতবর্গ দমন

* "The magnitude of Babur's task could be properly realised when we say that it actually began with Panipath. Panipath set his foot on the path of empire-building and in this path the first obstacle was the opposition of the Afghan tribes.' Vide, *An Advanced History of India*, p. 427.

প্রভৃতি স্থান মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এদিকে বাবর আগ্রায় থাকিয়া রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাজপুত নেতা মেবারের রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের সহিত বাবরের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। তুর্কী-আফগান সুলতানি পতনোন্মুখতার সুযোগে হিন্দুস্থানে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপন ছিল রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ রাণা সংগ্রাম সিংহের আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং তিনি বাবরকে নির্বিবাদে হিন্দুস্থানের প্রভুত্ব অর্জন করিতে দিবেন, এই আশা করা সম্ভব ছিল না। বাবর তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাণা সংগ্রাম সিংহ কাবুলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি দিল্লি আক্রমণ করিলে সংগ্রাম সিংহ আগ্রার দিকে আক্রমণ শুরু করিবেন। কিন্তু কার্যত সংগ্রাম সিংহ তাহা করেন নাই।* ইহা হইতে সংগ্রাম সিংহের সহায়তার পরিবর্তে যে বাবরকে তাঁহার বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

রাণা সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধের কারণ

রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন শতাধিক রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীর যোদ্ধা। তাই বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য রাণা এক বিশাল রাজপুত সংঘ গঠন করিলেন। চান্দেরী, অম্বর, মাড়বার, গোয়ালিওর, আজমীর প্রভৃতি দেশের রাজগণ এবং আরও বহুসংখ্যক রাজপুত দলপতি মেওয়াটের হাসান খাঁ এবং সুলতান সিকন্দর লোদীর পুত্র মামুদ লোদী প্রভৃতি সংগ্রাম সিংহের সহিত যোগদান করিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের সামরিক প্রস্তুতি বাবরের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিল। বাবর নিজ সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাদিগকে মানুষ মাত্রেই যে মরণশীল তাহা স্মরণ করাইয়া সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া শহীদ হওয়া—কাপুরুষতা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ এই কথা বুঝাইলেন। বাবর কর্তৃক এইভাবে সেনাবাহিনীকে উৎসাহদান ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাবরের প্রেরণায় তাঁহার সেনাবাহিনী যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। খানুয়ার রণাঙ্গনে বাবর ও সংগ্রাম সিংহের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৬ই মার্চ, ১৫২৭)। আট লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও পাঁচশত হাতীর এক বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া

রাণা সংগ্রামের সম্মিলিত বাহিনী

বাবরের সেনাবাহিনীর ভীতি ঃ বাবর কর্তৃক উৎসাহ দান

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

---

* "Although Rana Sanga, the Pagan, when I was in Kabul, had sent me an ambassador with professions of attachment and had arranged with me that, if I would march from the quarter into the vicinity of Delhi he would march from the other side upon Agra, yet when I defeated Ibrahim, and took Delhi and Agra, the Pagan during all my operations did not make a single movement." *Babur's Memoirs*, II., p. 254. Vide, Iswari Prasad's *A Short History of Muslim Rule in India*, Vol. II p. 299.

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র যুদ্ধ-কৌশলের অপকর্ষতার ফলে রাণা সংগ্রামের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে, ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল। শক্তিশালী রাজপুত সংঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় মুঘল শক্তি প্রতিহত করিবার মত আর কোন উপযুক্ত শক্তি রহিল না। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে বাবরের প্রাধান্য দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। এই যুদ্ধের পর হইতেই মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা আর বাবরের রহিল না।* খানুয়ার যুদ্ধের পরে আর যে-সকল যুদ্ধে বাবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার, সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান নহে।

খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল

পর বৎসর (১৫২৮) বাবর মেদিনী রাওয়ের অধীন দুর্ভেদ্য রাজপুত দুর্গ চান্দেরী অবরোধ করিলেন। মেদিনী রাও বীরত্ব সহকারে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ের অল্পকালের মধ্যে বৃদ্ধ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু ঘটিলে রাজপুত সংঘের পুনরুজ্জীবনের আশাও চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

চান্দেরী দুর্গ জয়

রাজপুত শক্তির বিনাশ সাধন করিয়া বাবর আফগান দলপতিদের দমনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। গোগ্‌রা বা ঘাগ্‌রা নদীতীরে তিনি বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। আফগানদের সম্মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল (৬ মে, ১৫২৯)। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশ বাবরের অধিকারভুক্ত হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে গোয়ালিওর এবং অক্ষু নদী হইতে গোগ্‌রা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। পর বৎসর (ডিসেম্বর ২৬, ১৫৩০) বাবরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল এক অদ্ভুত ঘটনার

গোগ্‌রার যুদ্ধ (১৫২৯)

* "In the first place, the menace of Rajput supremacy which had loomed large before the eyes of Muhammadans in India for the last few years was removed once for all. The powerful confederacy which depended so largely for its unity upon the *strength and reputation of Mewar, was shattered by a single great defeat* and ceased henceforth to be a dominant factor in the politics of Hindusthan. Secondly, the Mughal empire of India was soon firmly established......And it is significant of the new stage in his career which this battle marks that never afterwards does he have to stake his throne and life upon the issue of stricken field......It is never fighting for his throne......henceforth the centre of gravity of his power is shifted from Kabul to Hindustan." Rushbrook-Williams: *Empire Builders of the Sixteenth Century*, pp. 156-157.

উল্লেখ করিয়াছেন। বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলে তিনি নাকি হুমায়ুনের শয্যাপার্শ্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্রের পীড়া নিজের দেহে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর হইতে হুমায়ুন ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন এবং বাবরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতে থাকে এবং পুত্রের আরোগ্যলাভের তিন মাসের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু ঘটে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ইহাকে নিছক কাহিনী বলিয়াই মনে করেন।

বাবরের মৃত্যু (১৫৩০)

সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে (১৫২৬-'৩০) বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু উহার অভ্যন্তরীণ শাসক-সম্পর্কে কোন প্রকার নূতন আইন-কানুন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ এই কয়েক বৎসর তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। তিনি হিন্দুস্থানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া উহাই চালু রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া জায়গীরদারদের অধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। তুর্ক-আফগান আমলে জায়গীরদারগণ যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেন, সেই পরিমাণ স্বাধীনতা অবশ্য বাবর তাঁহার সামন্তদিগকে দান করেন নাই। রাজস্বনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে বাবরের শাসনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বাবরের অমিতব্যয়িতা এবং তাঁহার শাসনকালে প্রথমদিকে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। দলিলপত্রের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেওয়া এবং দিল্লী ও আগ্রায় প্রাপ্ত ধন-দৌলত মুক্তহস্তে অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্তী সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকালে এই আর্থিক দুরবস্থার কুফল প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুত, বাবর অভ্যন্তরীণ শাসনের কাঠামোকে নূতনভাবে গঠন করা দূরে থাকুক উহাকে দুর্বলতর করিয়া গিয়াছিলেন।

বাবরের শাসনব্যবস্থা—তুর্ক-আফগান শাসনের অনুকরণ

তাঁহার শাসনব্যবস্থার ত্রুটি

বাবর মধ্যযুগীয় ইতিহাসের যাবতীয় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সামরিক প্রতিভা, বীরসুলভ দুঃসাহসিকতা, লৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মানুরাগ, বন্ধুপ্রীতি, আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা, সঙ্গীতানুরাগ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু চিঙ্গিজ্ খাঁ ও তৈমুরের বংশোদ্ভূত হইলেও নৃশংসতা, ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন বা ধ্বংস সাধনের তিনি কোনকালেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার দৈহিক বল যেমন ছিল অসাধারণ তাঁহার মানসিক বল, ধৈর্য, আত্মপ্রত্যয় ও কার্যক্ষমতাও ছিল তেমনি অপরিসীম। সামরিক নেতা হিসাবে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। বিজিত শত্রুর প্রতি উদারতা, স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব, সন্তানের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রকে শ্রদ্ধার্হ করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্র

সমরকুশল, বীর যোদ্ধা হইলেও বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল সুগভীর। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ফার্সী ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত 'জীবন-স্মৃতি' (Memoirs) তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' পাঠ করিলে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগ —'জীবন-স্মৃতি' রচনা

হুমায়ুন ও শের শাহ্ (Humayun & Sher Shah) : মৃত্যুশয্যায় বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং হুমায়ুনকে তাঁহার ভ্রাতাদের প্রতি উদারতা ও স্নেহ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

বাবর কর্তৃক হুমায়ুন উত্তরাধিকারী মনোনীত

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই (ডিসেম্বর ২৯, ১৫৩০) হুমায়ুন তাঁহার তিন ভ্রাতা কামরান, হিন্দাল ও আস্করীকে সাম্রাজ্যের তিন অংশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কাবুল ও কান্দাহারের শাসনভার কামরানকে দেওয়া হইল। কামরান পূর্ব হইতেই এই দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত ছিলেন। হিন্দালকে আল্ওয়ার এবং আস্করীকে সম্বলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু কামরান্ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব ও হিসার ফিরুজা নিজ এলাকাভুক্ত করিলেন। হুমায়ুন ভ্রাতৃবিরোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে কামরান্ কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহে নিজ দাবি ত্যাগ করিলেন।

হুমায়ুনের ভ্রাতৃপ্রীতি : ভ্রাতাদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন

হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট আইন বা রীতি না থাকায় হুমায়ুনের ভ্রাতারা সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিপত্তি শুধু ভ্রাতাদের সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল এমন নহে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র আফগান দলপতিগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। রাজপুতগণ বাবর কর্তৃক সামরিকভাবে পরাজিত হইলেও তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তিনি বিনাশ করিতে পারেন নাই। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ও মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুরু করিলেন। তিনি রাজপুতদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া ক্রমেই আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাংলার আফগান দলপতিগণও হুমায়ুনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা শুরু করিলেন। রাজসভার অভিজাতবর্গও সিংহাসন-সংক্রান্ত অধিকার লইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্যের উপরও সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাবাহিনী কোনরূপ দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে স্বভাবতই উদ্বুদ্ধ ছিল না। স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হুমায়ুনের বিপত্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে প্রয়োজন ছিল একজন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন দূরদর্শী শাসকের। কিন্তু হুমায়ুনের এই সকল গুণের কোন কিছুই ছিল না। প্রথমেই তিনি নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া নিজের দুর্বলতা প্রকট করিয়া তুলিলেন। কামরান্ বলপূর্বক পাঞ্জাব, হিসার ফিরুজা প্রভৃতি স্থান দখল করিলে তিনি ঐ সকল স্থানের উপর কামরানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ভ্রাতার প্রতি স্নেহ ও ভ্রাতৃবিরোধের অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার শেষ অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের, বিশেষত কামরানকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহতি বা নিরাপত্তার দিক দিয়া তিনি যে মারাত্মক ভুল করিলেন সে-বিষয়ে দ্বিমত নাই। হিসার ফিরুজা দখল করিবার ফলে কামরান পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। সিন্ধু অঞ্চলে এইভাবে হুমায়ুনের প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত হইলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।

হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

দিল্লী-পাঞ্জাব সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন ও সৈন্য সংগ্রহের স্থান হইতে বঞ্চিত

আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুন প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। লোদীবংশের মামুদ লোদীকে আফগান দলপতি ও অভিজাতগণ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজাও আফগানদের সাহায্য দান করিতেছিলেন। হুমায়ুন প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের প্রসিদ্ধ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগানগণ অত্যধিক উদ্ধত হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কালিঞ্জর দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। লক্ষ্ণৌর নিকটে দৌরাহ্ (Dourah) নামক স্থানে তিনি আফগানদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি জৌনপুর হইতে সুলতান মামুদ লোদীকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন। তারপর তিনি চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গটি তখন শের খাঁর অধিকারে ছিল। শের খাঁ হুমায়ুনের নিকট মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া রক্ষা পাইলেন। হুমায়ুন চুণারের দুর্গটি শের খাঁর অধীনে রাখিয়া গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চুণার দুর্গটি শের খাঁর অধীনে রাখিয়া হুমায়ুন তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ, শের খাঁ এই সুযোগে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ

'দৌরাহ্'-এর যুদ্ধে জয়লাভ

চুণার দুর্গ অবরোধ—হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ছিলেন হুমায়ুনের অন্যতম প্রধান শত্রু। তিনি মালব রাজ্য জয় করিয়া এবং খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগরের সুলতানদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ্ প্রথম হইতেই হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি হুমায়ুনের শত্রু বহু আফগান

দলপতিকেও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, মাহদী খাজা নামে হুমায়ুনের এক শ্যালককে দিল্লী সিংহাসনের দাবিদার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ্ যখন মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন তখন রাণী কর্ণাবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন নিজ অদূরদর্শিতাহেতু নিজ শত্রু বাহাদুর শাহ্‌কে দমনের এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। বাহাদুর শাহ্ যখন তুর্কী, পোর্তুগীজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় গোলন্দাজদের সাহায্য লইয়া চিতোর দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া রাজপুতগণকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন তখন হুমায়ুনের তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইবার সময় হইল। মান্দাসোর-এর নিকট বাহাদুর শাহ্ ও হুমায়ুনের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহ্ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন এবং মুঘল সেনাবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দিউ-তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। মালব এবং গুজরাটের একাংশ হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হইল। এই বিজয়ের পর হুমায়ুন কিছুকাল আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ্ পোর্তুগীজদের সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের পক্ষে বাহাদুর শাহ্‌কে বাধা দিবার কোন সময় ছিল না। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আফগান দলপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে সেদিকে মনোযোগ দিতে হইল। বাহাদুর শাহ্ সেই সুযোগে মালব ও তাঁহার রাজ্যের যে অংশ হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ ও হুমায়ুনের সংঘর্ষ

হুমায়ুনের সামরিক সাফল্য

বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করিয়া শের খাঁর মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা করেন নাই। শের খাঁ ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। গুজরাটে হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত তখন শের খাঁ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অতর্কিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। বাংলাদেশের সিংহাসনে তখন মামুদ শাহ্ অধিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা শাসক, দেশরক্ষার জন্য আফগান শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিবার মত শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। তিনি তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও কিউল হইতে সক্রিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে আফগান আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা পাইল না। শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন (১৫৩৭) এবং বাংলার রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের খাঁর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের সুলতানের সহিত একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সামরিক সুবিধা উপলব্ধি না করিয়া শের খাঁর

শের খাঁ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণ

শের খাঁর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ

কর্মকেন্দ্র চুণার আক্রমণ করিলেন। শের খাঁ তখন গৌড় অবরোধে ব্যস্ত। তথাপি দীর্ঘ ছয় মাসের পূর্বে হুমায়ুনের পক্ষে চুণার দুর্গটি জয় করা সম্ভব হইল না।

হুমায়ুন কর্তৃক শের খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান—তাঁহার অদূরদর্শিতা

এদিকে ঐ দীর্ঘ সময়ের সুযোগ লইয়া শের খাঁ গৌড় জয় সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। তারপর তিনি রোটাস্ দুর্গটি জয় করিয়া ক্রমেই নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য-ভাগে চুণার দুর্গটি জয় করিয়া হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। শের খাঁ ছিলেন দূরদর্শী সামরিক নেতা। তিনি হুমায়ুনের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। বর্ষা নামিবার ফলে হুমায়ুন বাংলাদেশে দীর্ঘ ছয় মাস বাধ্য হইয়াই যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন শের খাঁ চুণার দুর্গটি পুনরধিকার করিলেন। ইহা ভিন্ন, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

শের খাঁ কর্তৃক চুণার পুনরুদ্ধার, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি অধিকার

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)

এই সকল স্থান জয় করিবার ফলে হুমায়ুনের বাংলা হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হইল। হুমায়ুন এই সংবাদে আশঙ্কিত হইয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ হুমায়ুনকে বাধা দান করিলেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৫৩৯)। বহুসংখ্যক মুঘল সৈন্য গঙ্গা নদী অতিক্রম করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল, অনেকে শের খাঁর সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হইল। হুমায়ুন কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খাঁর রাজ্য কনৌজ হইতে আসামের সীমা, রোটাস্ হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে শের খাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি 'শের শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিলেন।

শের খাঁর 'শের শাহ্' উপাধি ধারণ

চৌসার যুদ্ধে অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া হুমায়ুনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইহার পর বৎসর তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া কনৌজের নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহ্‌কে আক্রমণ করিলেন (১৫৪০)। কিন্তু এই যুদ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। এইবারও কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হুমায়ুন হিন্দুস্তানের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে দেশবিদেশে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভ বাবর-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটাইয়া পুনরায় আফগান প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০)—হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত

মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনেও হুমায়ুনের ভ্রাতাগণ সংঘবদ্ধভাবে শের শাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন না। হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা

কামরানের সাহায্য লাভের আশায় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কামরান্ শের শাহের সাফল্যে ভীত হইয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন এবং শের শাহ্‌কে পাঞ্জাব দান করিয়া তাঁহার সহিত চুক্তিবন্ধ হইলেন। হৃতসর্বস্ব, হতভাগ্য হুমায়ুন সিন্ধুদেশে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। মাড়বারের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে অমরকোটের রাণা প্রসাদ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলে সেখানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এখানে অবস্থানকালেই তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রাণা প্রসাদ হুমায়ুনকে সিন্ধুদেশ জয় করিতে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে রাণা প্রসাদ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন। ইহার পর হুমায়ুন কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা আস্‌করীর সাহায্য লাভের আশায় গমন করেন। কিন্তু আস্‌করীর রাজ্যে তাঁহার জীবন নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া হুমায়ুন অবশেষে পারস্যের শাহ্ তহ্‌মাস্প্ (Shah Tahmasp)-এর সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ্ তহ্‌মাস্প্ হুমায়ুনকে ১৪,০০০ হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করিলেন। এই সামরিক সাহায্য লইয়া হুমায়ুন কাবুল ও কান্দাহার জয় করিলেন (১৫৪৫)। কামরান হুমায়ুনের হস্তে বন্দী হইলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে মক্কায় প্রেরণ করা হইল। আস্‌করীও মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, হিন্দাল এক নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন। এইভাবে প্রাথমিক বিজয় সম্পন্ন করিয়া ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ হিন্দুস্তানের প্রভুত্ব লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত থাকিবার ফলে হুমায়ুনের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কাজ সহজ হইল। তিনি অনায়াসে লাহোর অধিকার করিলেন (১৫৫৫)। বিদ্রোহী আফগানগণ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সিকন্দর শূরকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন সিকন্দর শূরকে শির্‌হিন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিলেন (১৫৫৫)। এইভাবে জীবনের শেষদিকে তিনি তাঁহার হৃত সাম্রাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া পুনরায় মুঘল প্রাধান্যের সূত্রপাত করিলেন। পর বৎসর (১৫৫৬) গ্রন্থাগার হইতে নামিবার সময় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি আহত হন এবং তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আশ্রয়ের সন্ধানে হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ

অমরকোটে আশ্রয়-লাভ—আকবরের জন্ম (১৫৪২)

পারস্য সম্রাট তহ্‌মাস্প্-এর সহায়তা লাভ

কাবুল ও কান্দাহার জয়

শের শাহের উত্তরাধি-কারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

শির্‌হিন্দ-এর যুদ্ধে জয়লাভ (১৫৫৫)—মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন

হুমায়ুনের মৃত্যু (১৫৫৬)

হুমায়ুন শান্তস্বভাব, দয়াবান্ ও স্নেহপ্রবণ সম্রাট ছিলেন। নিজ ভ্রাতাদের প্রতি

তাঁহার মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। কামরানের শত্রুতার প্রমাণ পাইয়াও তিনি তাঁহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী হন নাই। রাজসভার অভিজাতবর্গ হুমায়ুনকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু কামরানের প্রাণনাশ করিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলে হুমায়ুন উত্তর দিয়াছিলেন যে, যদিও বুদ্ধির বিচারে তিনি এ-বিষয়ে অভিজাতবর্গের সহিত একমত তথাপি অন্তরের দিক দিয়া তিনি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণে অক্ষম।* সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক দিয়াও হুমায়ুন প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। পিতার সামরিক অভিযানে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল তাঁহার আলস্য, অহিফেন সেবন ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। উপস্থিত পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনে এবং দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য সম্পাদনে তিনি অপারগ ছিলেন। দয়াপ্রদর্শনে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার করিতেন না। নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার এবং আফগানদের বিরোধিতা দমন করিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় দূরদর্শিতা, কূটকৌশল বা ধৈর্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু হুমায়ুনের চরিত্রে সাহিত্যানুরাগ, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রভৃতি গুণের অভাব ছিল না। জীবনের ঘোর দুর্দিনেও তাঁহার অমায়িকতা, দয়াপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

হুমায়ুনের চরিত্র

হুমায়ুনের কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Humayun): বাবরের মৃত্যুকালে মুঘল সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব, উত্তর-বিহার এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ভিন্ন, রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মেবার রাজ্যটি বাবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সংহতি স্থাপনের পূর্বেই বাবরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। স্বভাবতই এই দায়িত্ব তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর পড়িয়াছিল। হুমায়ুন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার সমস্যা ছিল নানাবিধ। বাবর আফগান নেতৃবর্গকে সাময়িকভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের শক্তি নির্মূল করিতে পারেন নাই। রাজপুতদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু। তদুপরি নিজ ভ্রাতাগণও সিংহাসন লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন। এই সকল জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিমাণ কূটনৈতিক জ্ঞান, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সামরিক সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, হুমায়ুনের সেই সকল গুণ মোটেই ছিল না।

হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণকালে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

হুমায়ুনের সমস্যা

*"......Though my head inclines to your words, my heart does not." *Humayun*, Vide, *A Short History of Muslim Rule*, Ishwari Prasad, Vol. II, p. 347.

(১) প্রথমেই তিনি সাম্রাজ্যের তিন অংশে তিন ভ্রাতাকে একপ্রকার স্বাধীন শাসক হিসাবে স্থাপন করিলেন। ভ্রাতৃত্বের বিচারে ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। তদুপরি কামরান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব ও হিসার ফিরুজা দখল করিলে হুমায়ুন এই দুই স্থানেও কামরানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ এড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি কেবল পাঞ্জাব ও দিল্লীর যোগাযোগ পথের অধিকারই হারাইলেন না, সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঞ্চলটিও তাঁহার অধিকারচ্যুত হইল। সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার দিক হইতে বিচার করিলে হুমায়ুন যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কামরানের প্রতি উদারতা—হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

(২) কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া তিনি আফগান দমনের জন্য সেই অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চান্দেরী দুর্গ জয় করিবার কালে বাবর ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দুর্গটির জয় সমাধা করিয়া তারপর আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চুণার দুর্গটি অবরোধ করিতে গিয়া হুমায়ুন শের খাঁর মৌখিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই দুর্গের অধিকারে রাখিয়া আসিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শের খাঁ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কালিঞ্জর দুর্গের অবরোধ উন্মোচন

চুণার দুর্গ শের খাঁর অধীনে স্থাপনের ত্রুটি

(৩) গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ যখন মেবারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন মেবারের রাণী কর্ণাবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন নিজ শত্রু বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে মেবারের সহিত যুগ্মভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া বাহাদুর শাহ্‌কে চিতোর জয়ের সুযোগ দান করিয়া নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর বাহাদুর শাহ্ যখন রাজপুতদিগকে পরাভূত করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন হুমায়ুন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিতে সক্ষম হইলেও হুমায়ুন তাঁহাকে মালব ও গুজরাটের একাংশ পুনরধিকারে বাধা দিতে পারেন নাই।

হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা

(৪) শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াও হুমায়ুন সামরিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শের খাঁকে বাংলাদেশে আক্রমণ না করিয়া চুণার দুর্গ জয় করিতে অগ্রসর হওয়া তাঁহার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইয়াছে। চুণার দুর্গ অবরোধে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াও তিনি শের খাঁকে বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় জয়ের সুযোগ দিয়াছিলেন। তারপর স্বয়ং গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সহজেই যখন গৌড় অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন তখনও সময়ের

সামরিক অদূরদর্শিতা

মূল্য না বুঝিয়া তিনি অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বর্ষা নামিলে স্বভাবতই তিনি গৌড়েই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে শের খাঁ চুণার দুর্গটি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা ভিন্ন, রোটাস, বাণারস প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আগ্রা ফিরিয়া যাওয়ার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া হুমায়ুনের আলস্য কাটিল। তিনি সসৈন্যে আগ্রায় ফিরিবার পথে শের খাঁ কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। শের খাঁকে পরাজিত করিয়া শেষ চেষ্টাও তাঁহার বিফলতায় পর্যবসিত হইল। কনৌজের বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন। এইভাবে দৃঢ়সংকল্প, সামরিক ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব এবং পরাজিত শত্রুর প্রতি অবিবেচকের ন্যায় দয়াপ্রদর্শন প্রভৃতির ফলে হুমায়ুন রাজ্যহারা হইলেন। অবশ্য শের খাঁর ন্যায় বিচক্ষণ এবং সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন শত্রুর সহিত যুঝিবার মত সামরিক প্রতিভাও হুমায়ুনের ছিল না, একথাও স্বীকার্য।

শের শাহের সহিত যুদ্ধ : রাজনৈতিক ও সামরিক অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত

কনৌজ ও বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজয়—রাজ্যচ্যুতি

দীর্ঘ পনর বৎসর রাজ্যহারা অবস্থায় দেশ হইতে দেশান্তরে নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে পারস্যের সম্রাট তহ্মাস্প্-এর সাহায্যে তিনি নিজ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাঁহার চরিত্রের কতক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। তিনি অকৃতজ্ঞ ভ্রাতা কামরানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার চক্ষু উৎপাটনের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানের সিংহাসন পুনরধিকার তাঁহার সামরিক দক্ষতার পরিচয় অপেক্ষা শের শাহের উত্তরাধিকারীদের আত্মকলহ ও ব্যাপক অরাজকতার পরিণামই পরিলক্ষিত হয়। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই হুমায়ুন পিতৃরাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দীর্ঘ পনর বৎসরের দুঃখ-দুর্দশা তাঁহাকে কতদূর বাস্তববাদী ও দূরদর্শী করিতে পারিয়াছিল সেই পরিচয় দিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজ্য পুনরুদ্ধার

অহিফেনসেবী, সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অদূরদর্শী হুমায়ুন দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহপরায়ণতা, অমায়িকতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীরও অধিকারী ছিলেন।

চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী

শের শাহ্, ১৫৩৯-১৫৪৫ (Sher Shah) : শের শাহের জীবনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক। পানিপথ ও গোগ্‌রা-র যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত আফগান শক্তি শের শাহ্‌কেই কেন্দ্র করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। শের শাহের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আফগানদের অন্তরে মুঘল প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া আফগান প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনের প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

শের শাহের জীবনীর গুরুত্ব

শের শাহের আদি নাম ছিল ফরিদ। তিনি ছিলেন আফগান জাতির শুর উপদলসম্ভূত। ফরিদের পিতামহ ইব্রাহিম প্রথমে মহাবৎ খাঁ ও দাউদ খাঁ নামক পাঞ্জাবের দুইজন জায়গীরদারের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই সূত্রে তিনি বাজওয়ারায় (Bazwara or Bejoura) বসবাস করিবার কালে তাঁহার পৌত্র ফরিদের জন্ম হয় (১৪৭২)। ফরিদের পিতার নাম ছিল হাসান। কিছুকাল পরে হাসান স্বয়ং সাসারামের জায়গীর প্রাপ্ত হন। ঐ সময় হইতে ফরিদ পিতার সহিত সাসারামেই বাস করিতেন।

পিতৃপরিচয়

ফরিদের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। হাসান তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ফরিদের বিমাতার প্রভাবাধীন থাকায় ফরিদ পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির পক্ষে পিতার এইরূপ উপেক্ষা এবং বিমাতার বিদ্বেষ ফরিদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। অল্পকালের মধ্যেই উভয় ভাষায়-ই তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সিকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, বীরত্বের কাহিনী প্রভৃতি পাঠে তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিতেন। ফরিদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিহারের শাসনকর্তা জামাল খাঁ হাসানকে ফরিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইলেন। হাসান ফরিদকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে সাসারাম ও খোয়াসপুরের শাসনকার্যের দায়িত্ব দান করিলেন। কিন্তু এই দুই স্থানের শাসনকার্যে ফরিদের পারদর্শিতা তাঁহার বিমাতার হিংসার উদ্রেক করিল। ফলে, ফরিদ স্বেচ্ছায় সাসারাম ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে পিতা হাসানের মৃত্যু হইলে ফরিদ দিল্লীর সুলতানের নিকট হইতে পিতার জায়গীর লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি বিহারের স্বাধীন সুলতান বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে একবার বহর খাঁর সহিত শিকারে বাহির হইয়া কাহারও বিনা সাহায্যে একটি 'শের' অর্থাৎ বাঘ মারিয়াছিলেন বলিয়া বহর খাঁ ফরিদকে 'শের খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময় হইতেই তিনি শের খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেন। বহর খাঁ শের খাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ 'ভকীল' অর্থাৎ সহকারী নিযুক্ত করেন এবং নিজ পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষার দায়িত্ব শের খাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অভিজাতবর্গের কয়েকজন বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে নানাপ্রকার অভিযোগ করিলে শের খাঁকে সাসারামের জায়গীরচ্যুত করা হয়। তখন শের খাঁ বহর খাঁর রাজসভা ত্যাগ করিয়া মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। বাবর তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাসারামের জায়গীর

বাল্যজীবন

শিক্ষা

সাসারামের শাসক হিসাবে পারদর্শিতা

বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি ঃ 'শের খাঁ' উপাধি লাভ

যাহাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা করেন। অল্পকাল পরেই বহর খাঁর মৃত্যু হইলে শের খাঁকে জালাল খাঁর অভিভাবক হিসাবে বিহারের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইল।

নাবালক জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব করিতে গিয়া শের খাঁ নিজেই বিহারের সুলতান হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে চুণার দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁর বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া শের খাঁ চুণার দুর্গটি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৫৩০)। পর বৎসর (১৫৩১) সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে চুণার দুর্গটি অবরোধ করেন। সুচতুর শের খাঁ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌কে দমন করিতে অগ্রসর হইলে শের খাঁ নিজ ক্ষমতাবৃদ্ধির সুযোগ পাইলেন। এদিকে তাঁহার উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে জালাল খাঁ এবং বিহারের লোহানী অভিজাতবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের সুলতান মামুদ শাহের সাহায্য লইয়া শের খাঁকে দমন করিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। শের খাঁ অনায়াসে মামুদ শাহ্‌ ও লোহানী অভিজাতবর্গের যুগ্ম-বাহিনীকে কিউল নদীর তীরে সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করিয়া বিহারের সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতান হইলেন। সুরজগড়ের যুদ্ধ শের খাঁর জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে একদিকে যেমন তিনি নামে এবং কার্যত বিহারের সুলতানপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, অপর দিকে এই যুদ্ধে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াই আফগান অভিজাতবর্গ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইলেন।

জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত ঃ চুণার দুর্গ অধিকার

সুরজগড়ের যুদ্ধ জয় (১৫৩৪)

হুমায়ুনের কর্মব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শের খাঁ আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের নিকট সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বাংলার দুর্বলচেতা সুলতান মামুদশাহ্‌ শের খাঁকে বাধাদানে তেমন কোন চেষ্টা না করিয়াই তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হইতে সক্রিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইহাতেই মামুদ শাহের বিপদ কাটিল না। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় অবরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে দমন করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শের খাঁর ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মামুদ শাহের সহিত যুগ্মভাবে শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তিনি প্রথমেই চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। দীর্ঘ ছয় মাস ধরিয়া অবরুদ্ধ চুণার দুর্গটি আত্মরক্ষা করিয়া চলিল। সেই সুযোগে শের খাঁ গৌড় জয় করিতে সমর্থ হইলেন (১৫৩৮)। চুণার দুর্গ জয় করিয়া হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সামরিক কূটকৌশলী

গৌড় আক্রমণ ঃ তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও কিউল হইতে সক্রিগলী পর্যন্ত স্থান লাভ

দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ (১৫৩৭)

হুমায়ুনের চুণার অধিকার ও গৌড় জয়

শের খাঁ হুমায়ুনের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিলেন এবং রোটাস, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। চুণার দুর্গটিও তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সকল স্থান শের খাঁর অধিকারভুক্ত হওয়ায় হুমায়ুনের আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইল। দীর্ঘ ছয়মাস গৌড়ে অতিবাহিত করিয়া হুমায়ুন তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্বেই আগ্রা ফিরিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দুইমাস ধরিয়া মুঘলবাহিনী ও শের খাঁর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলিল। অবশেষে শের খাঁ কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি হুমায়ুনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রস্তাব যখন বিবেচনাধীন তখন তিনি অতর্কিতে মুঘল শিবির আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে মুঘল পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল (১৫৩৯)। বহু-সংখ্যক মুঘল সৈন্য শের খাঁ কর্তৃক ধৃত হইল, ততোধিক সৈন্য গঙ্গা অতিক্রম করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। কিন্তু হুমায়ুন কোনপ্রকারে নিজ প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। চৌসার যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে শের খাঁর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। তিনি 'শের শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। পর বৎসর (১৫৪০) হুমায়ুন পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে কনৌজের অনতিদূরে বিলগ্রাম নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইল। এইবারও শের শাহ্ হুমায়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই যুদ্ধ কনৌজ, বিলগ্রাম, গঙ্গানদীর যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের শাহ্ হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইলেন, আর হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

শের খাঁ কর্তৃক রোটাস, বাণারস ও জৌনপুর জয়—চুণার পুনরুদ্ধার

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)

'শের শাহ্'-উপাধি ধারণ

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০)

হুমায়ুনের ভ্রাতাগণ এই দুর্দিনে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন না। কামরান্ পাঞ্জাব প্রদেশটি শের শাহের নিকট ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত ইতিপূর্বেই সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিন্ধু এবং মুলতানও শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এই সময়ে (১৫৪১) বাংলার শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শের শাহ্ দ্রুত বাংলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে অপসারিত করিয়া তাঁহারই এক বিশ্বস্ত অনুচরকে বাংলার শাসনভার দান করিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ যাহাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহ ঘোষণা না করিতে পারে সেজন্য বাংলাদেশের সীমা হ্রাস করিয়া তথাকার শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতির তিনি পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি বাংলাদেশকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিলেন

সিন্ধু ও মুলতান জয়

বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন ঃ বাংলার শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন

এবং বাংলার শাসনকর্তাকে 'আমীন-ই-বাংলা' উপাধি দান করিলেন। এই উপাধি হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলার শাসনব্যবস্থার সামরিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং উহা সম্পূর্ণভাবে বে-সামরিক শাসনে পরিণত হইয়াছিল।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার যথাযথ পরিবর্তন সাধন করিয়া শের শাহ্ গোয়ালিওর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর যুঝিয়া তিনি গোয়ালিওর দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। মালবের রায়সিন দুর্গটির অধিপতি পূরণমল তখনও শের শাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। শের শাহ্ স্বভাবতই এই দুর্গটি আক্রমণ করিলেন। দুই মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পূরণমল বিনা বাধায় পরিবার-পরিজন ও নিজ সেনাবাহিনীসহ মালবের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন এই প্রতিশ্রুতি শের শাহের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দুর্গটি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শের শাহের সেনাবাহিনী পূরণমল ও তাঁহার অনুচরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাজপুত সৈনিকগণ নিজেদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণ মুসলমানদের হস্তে পতিত হইবার পূর্বে নিজেরাই তাহাদের হত্যা করিলেন এবং প্রত্যেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শের শাহের এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ তাঁহার চরিত্র মসিলিপ্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

গোয়ালিওর, মালব ও রায়সিন দুর্গ জয়

শের শাহের প্রতারণার সাহায্য গ্রহণ

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ মেবারের রাণা মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। শের শাহ্ কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ইহার পর শের শাহ্ আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত যাবতীয় স্থান নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। পর বৎসর (১৫৪৫) কালিঞ্জর দুর্গ জয় করিতে গিয়া এক বিস্ফোরণের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

রাজপুতনা জয় ঃ মৃত্যু (১৫৪৫)

শের শাহের শাসনব্যবস্থা (Sher Shah's Administrative System): শের শাহ্ সাহসী বীর, সমরকুশল সেনাপতি, সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শাসক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা তাঁহার অপরাপর গুণাবলীকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি শাসনব্যবস্থার যে পরিমাণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ভারত-ইতিহাসে শের শাহ্‌কে অমরত্ব দান করিয়াছে। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার জনকল্যাণমূলক সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভার সহিত এইরূপ শাসনদক্ষতার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কার্যাদির সুফল তাঁহার রাজত্বকালে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন, তাঁহার নীতি

শের শাহের অসাধারণ শাসনদক্ষতা

অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে মুঘল সম্রাট আকবর অধিকতর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শের শাহ্ আলা-উদ্দিনের শাসন-পদ্ধতির কতক মূলনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন। ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয়, হিন্দু এবং মুসলমান শাসন-পদ্ধতির কতক কতক মৌলিক নীতি গ্রহণ করিয়া শের শাহ্ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা সেগুলিকে আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক কীন (Mr. Keene) শের শাহের শাসন-পদ্ধতির প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন শাসকই—এমন কি ব্রিটিশ সরকারও শাসনকার্যে শের শাহের ন্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই।* হিন্দু ও মুসলমান শাসন-পদ্ধতি এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল শের শাহের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি।†

হিন্দু ও মুসলমান শাসন-পদ্ধতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ

শের শাহের শাসনব্যবস্থা যে স্বৈরতান্ত্রিক ছিল সে-বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। রাজ্যের সমগ্র শাসনক্ষমতা শের শাহের নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র হইলেও শের শাহের শাসনব্যবস্থা স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল না। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার কোনও সুযোগ ছিল না বা সেইরূপ কোন নীতির স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু জনকল্যাণ সাধনই ছিল শের শাহের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। মুসলমান শাসনের ইতিহাসে শের শাহ্-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণের কল্যাণ ও তাহাদের সমর্থনের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী শাসক। ইওরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সকল প্রজাহিতৈষী, জ্ঞানদীপ্ত, স্বৈরাচারী শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়, ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে শের শাহ্ তাঁহাদের অগ্রদূত হিসাবে নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছিলেন।‡

স্বৈরতন্ত্র হইলেও স্বেচ্ছাতন্ত্র নহে

প্রজাহিতৈষী শাসন

---

*"No government—not even the British has shown so much wisdom as did his Pathan." Mr. Keene, Vide, *An Advanced History of India*, pp. 439-40.

†"The whole of his brief administration was based on the principle of union." Mr. Keene, Vide, Lane-Poole, *Medieval India under Mohammedan Rule*, p. 233.

‡"In spite of limitation which hampered a sixteenth century king in India he brought to bear upon his task, the intelligence, the ability, the devotion of the eighteenth century in Europe." Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, p. 334.

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শের শাহ্ তাঁহার সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি 'সরকার' আবার বহুসংখ্যক পরগণায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরগণায় একজন করিয়া শিকদার, আমীন, মুন্সীফ্, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু হিসাব-লেখক ও ফার্সী হিসাব-লেখক ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার সামরিক অধিকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ কার্যকরী করা, প্রয়োজনবোধে আমীনকে সামরিক সাহায্য দান করা ছিল তাঁহার কর্তব্য। আমীন ছিলেন সর্বোচ্চ বে-সামরিক কর্মচারী। পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভার ছিল তাঁহার উপর।

৪৭টি সরকার ঃ পরগণা

পরগণার রাজকর্মচারিগণ—শিকদার, আমীন, মুন্সীফ্, খাজাঞ্চী, হিন্দু ও ফার্সী হিসাব-লেখক

প্রত্যেকটি সরকারের উপর একজন করিয়া শিকদার-ই-শিক্দারান, মুন্সীফ্-ই-মুন্সীফান্ থাকিতেন। সরকারের অধীন পরগণাগুলির শাসনকার্য পরিদর্শনের ভার ছিল তাঁহাদের উপর। সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিদর্শন করিতেন শের শাহ্ স্বয়ং।

সরকারের রাজকর্মচারিগণ ঃ শিকদার-ই-শিকদারান্, মুন্সীফ্-ই-মুন্সীফান্

একই স্থানে অধিককাল কাজে নিযুক্ত থাকিবার ফলে রাজকর্মচারিগণের মধ্যে যাহাতে স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মিতে না পারে সেইজন্য প্রতি তিন বৎসর অন্তর তাঁহাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি করিবার রীতি ছিল।

রাজস্ব-কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা

রাজস্ব আদায় সম্পর্কে শের শাহ্ কতকগুলি যুক্তিসম্মত উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণে জমি জরিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কানুনগো নামক রাজকর্মচারীদের মৌখিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া জমির রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইত, কিন্তু শের শাহ্ জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুপাতে, বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণ করিলেন। মকদ্দম, চৌধুরী পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীদের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু প্রজাবর্গ সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে পারিত। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। শের শাহ্ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা'র প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করিয়া 'কবুলিয়ত' নামক দলিল সম্পাদন করিয়া দিত আর সরকারের পক্ষ হইতে জমির উপরে কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করিয়া 'পাট্টা' দেওয়া হইত। রাজস্ব নির্ধারণে যথাসম্ভব উদারতা প্রদর্শন করা হইত, কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে কোন-প্রকার বিলম্ব বা অবহেলা প্রদর্শনের অবকাশ ছিল না। অবশ্য কোন প্রাকৃতিক দুর্দৈবের ফলে ফসল না জন্মিলে কৃষকদের রাজস্ব মকুব করা হইত, এমন কি

শের শাহের রাজস্ব-নীতি ঃ

জমি জরিপ

'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা'

রাজস্ব ঃ ফসলের এক-তৃতীয়াংশ

প্রয়োজনবোধে সরকার হইতে ঋণদানের ব্যবস্থাও ছিল। শের শাহের ভূমি-বণ্টন, রাজস্ব-নির্ধারণ ব্যবস্থা ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান. অধিকার করিয়া আছে। পরবর্তী কালের ভূমিবণ্টন ও রাজস্ব-নীতি বহুলাংশে শের শাহ্ প্রচলিত রাজস্ব-নীতির উপরই

শের শাহের রাজস্ব-নীতির সাফল্য

গড়িয়া উঠিয়াছিল। শের শাহের রাজস্ব-নীতির উৎকর্ষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরকারী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শের শাহ্ আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি মুদ্রা-নীতিরও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

শুল্ক মুদ্রানীতির সংস্কার

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এক স্থান হইতে দ্রুত অপর স্থানে যাইবার সুবিধার জন্য শের শাহ্ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে 'গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড্' নামক রাস্তাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাস্তাটি পশ্চিমবঙ্গ হইতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত একটানা চলিয়া গিয়াছে। 'গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড্' ভিন্ন আগ্রা হইতে যোধপুর, আগ্রা হইতে বুরহানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাস্তা নির্মাণের ফলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ—'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড্'

পথিকদের সুবিধার জন্য শের শাহ্ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন এবং সরাইখানা স্থাপন করাইয়াছিলেন। সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোড়ার পিঠে করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শের শাহ্ বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, গুপ্তচর নিয়োগ

শের শাহের সামরিক পদ্ধতি আলা-উদ্দিন খল্জীর সামরিক সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া সৈন্য মোতায়েন রাখিবার নীতি শের শাহ্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লী এবং রোটাসের সেনানিবাস ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সেনানিবাসে যে সৈন্যদল মোতায়েন থাকিত উহা 'ফৌজ' নামে অভিহিত হইত। ফৌজদার ছিলেন 'ফৌজে'র অধিনায়ক। আফগান দলপতিদের কেহ কেহ নিজস্ব সেনাবাহিনী পোষণের অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন সম্রাটের সরাসরি অধীনে পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং দেড় লক্ষ অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী ছিল। এই সেনাবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা ও সমরদক্ষতা ছিল অসাধারণ। যুদ্ধের সময় অথবা সেনাবাহিনী যাতায়াতের ফলে কৃষকদের ফসলের কোন ক্ষতি হইলে শের শাহ্ সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতেন।

সামরিক ব্যবস্থা

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য শের শাহ পুলিস-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গ্রামের মোড়ল এবং গ্রামের সাধারণ লোকের উপর তিনি গ্রামের এলাকার অধীনে অপরাধমূলক কার্যাদির খবরাখবর সংগ্রহের এবং অপরাধীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

পুলিস-ব্যবস্থা

শের শাহের বিচার-ব্যবস্থাও ছিল খুবই উন্নত ধরনের। প্রতি পরগণায় দেওয়ানী বিচারের ভার ছিল আমীনদের উপর। ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল কাজী ও মীর আদলের উপর। কয়েকটি পরগণার উপর একজন করিয়া মুন্সীফ-ই-মুন্সীফান্ দেওয়ানী বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এবং

বিচার-ব্যবস্থা

কাজী-ই-কাজাতান্‌ বা প্রধান কাজী ছিলেন ফৌজদারী বিচারের ভারপ্রাপ্ত। বিচার-ব্যবস্থার সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনের চক্ষে সকলেই ছিল সমান। বিচার-ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বা ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য করা হইত না। শের শাহের দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এমন কি, চুরি, ডাকাতির অপরাধেও প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা ছিল।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

ধর্মের ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর শের শাহ্‌ তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন শের শাহের সেনাপতি। শের শাহ্‌-ই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট যিনি জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা

শের শাহের কৃতিত্ব (Estimate of Sher Shah) : মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসে শের শাহের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক অন্য কেহ ছিলেন না। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিজেতা, শাসক এবং সংস্কারক হিসাবে শের শাহ্‌ সমভাবে সুদক্ষ ছিলেন। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়াও একমাত্র নিজ কর্মপ্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ বিভিন্ন গুণাবলীর এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সামরিক প্রতিভা ও সাহিত্যানুরাগের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সিকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি নিজে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পরধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের মত উদারতা তাঁহার চরিত্রে ছিল। নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নিরলসতা, প্রজার প্রতি বাৎসল্য, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সম-ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য শের শাহ্‌ ভারত-ইতিহাসে এক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্র

বহুবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া তিনি নিজেকে ভারত-সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ অবস্থার এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন তাঁহার চরিত্রে কোন ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করে নাই। যুদ্ধ জয় করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়সিন দুর্গের অধিপতি পুরণমল আত্মসমর্পণ করিলে তিনি তাঁহাকে নিজ সেনাবাহিনী ও পরিবার-পরিজন লইয়া মালব ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পুরণমলের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন। শের শাহের চরিত্রে এই বিশ্বাসঘাতকতা

পুরণমলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে। বিজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, বিজিত দেশ ও জনসাধারণের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁহার বিজয়-গৌরবকে অধিকতর গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। একমাত্র মুঘল সম্রাট আকবরকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন শের শাহ্, একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় নহে

শের শাহ্ অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সামরিক নেতা ছিলেন। তাঁহার সামরিক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। মুঘল সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বিজয়লাভ করা সহজ হইবে না মনে করিয়া তিনি বাংলাদেশে হুমায়ুনকে বাধা দান করেন নাই। চুণার দুর্গ অবরোধকালে যেমন তিনি মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়াইয়াছিলেন, তেমনি তিনি বাহাদুর শাহের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আবার তিনি প্রায় সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াই হুমায়ুনকে বিনা বাধায় বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ করিতে দিয়া সেই অবকাশে রোটাস, বাণারস প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চৌসা এবং বিলগ্রামের যুদ্ধেও শের শাহ্ তাঁহার সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে তিনি কূটকৌশলের আশ্রয় লইতেন। মারবাড়ের মালদেবকে তিনি কূটকৌশলের সাহায্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অপরাপর রাজপুত নেতাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত কতকগুলি জাল চিঠি মালদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজ কার্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। মানবতার দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হইলেও বিজেতার ভূমিকায় এইরূপ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে, একথা বলা চলে না। বরং ইহা শের শাহের সামরিক কূটকৌশলেরই পরিচায়ক। শক্তি ও সামর্থ্যহীন জায়গীরদারের অবহেলিত পুত্র শের শাহের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া বিজেতা হিসাবে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। শাসক হিসাবে শের শাহ্ মুঘল সম্রাট আকবরের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি গ্রহণ করিয়া নিজ প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এক আধুনিক ও যুক্তিসম্মত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, সুদক্ষ ও জনহিতকর করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সামান্য পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াই তিনি এ-বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্ব-নীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত তেমনি জনহিতৈষী। জমির উর্বরতার উপর রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রজাবর্গের মৌলিক কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

সামরিক নেতা হিসাবে শের শাহ্

প্রজাবর্গের হিতসাধন—শাসনের মূল আদর্শ

শের শাহ্-ই ছিলেন সর্বপ্রথম সুলতান যিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান শর্ত-ই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা। স্বয়ং ধর্মপরায়ণ মুসলমান হইয়াও তিনি শাসনকার্যে কোনরূপ ধর্মান্ধতা প্রদর্শন করেন নাই। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল করিয়া শের শাহ্ মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার তাঁহার আমলে ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহু যোগ্য ব্যক্তি শের শাহের শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি। শের শাহের বিচার-ব্যবস্থায় জাতিধর্মের কোন প্রভেদ করা হইত না।

ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা

প্রজামাত্রেই সমান অধিকার

তাঁহার শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ঐতিহাসিক কীনি (Mr. Keene) বলেন যে, শের শাহ্ শাসনকার্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভারতের অপর কোন শাসক এমন কি ব্রিটিশ সরকারও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।*

ঐতিহাসিক কীনির মন্তব্য

জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে শের শাহ্ শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠাইয়া দিয়া এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া আধুনিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে নির্মিত 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্' অদ্যাপি তাঁহার কার্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ভিন্ন সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্যও এই রাস্তা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, পুলিস-ব্যবস্থার সংগঠন, সামরিক বাহিনীর উন্নতিবিধান, বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া শের শাহ্ তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

জনকল্যাণকর কার্যাদি

ধর্মাধিষ্ঠান ও ধর্মজ্ঞানীদের সাহায্যার্থে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। দরিদ্র অবলম্বনহীন নরনারীদের সাহায্যের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। রাজকর্মচারিবর্গের অবহেলায় কোন ধর্মজ্ঞানী ধর্মাধিষ্ঠান বা দরিদ্র প্রজা যাহাতে সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হইতে পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন।

তাঁহার দানশীলতা

শের শাহের অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা, তাঁহার প্রজাহিতৈষণা, তাঁহার স্থাপত্য-শিল্পানুরাগ

*Vide: *An Advanced History of India*, pp. 439-40.

এবং সর্বোপরি প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার পিতৃতুল্য দায়িত্ববোধ তাঁহাকে ভারত-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে।

প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (Benevolent despotism)

তিনি স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয় নাই। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী (benevolent despot)। একমাত্র সম্রাট আকবর ভিন্ন অপর কোন মুসলমান শাসক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাবর্গের এইরূপ সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করেন নাই। ঐতিহাসিক ডক্টর স্মিথ্ (Dr. Smith) বলেন যে, শের শাহ্ যদি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে মুঘল সম্রাটদের আর অভ্যুত্থান ঘটিত না।*

---

* "If Sher Shah had been spared he would have established his dynasty and the great Moghuls would not have appeared on the stage of history." Smith, *Oxford History of India*, p. 329.

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর
(Akbar the Great Mughal)

আকবরের প্রথম জীবন (Early life of Akbar) : শের শাহের হস্তে পরাজিত, হৃতসর্বস্ব, হুমায়ুন যখন নিজ ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে অমরকোটের রাণা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন (১৫৪২) আকবরের জন্ম হয়। রাজ্যহারা, গৃহহারা পিতার চরম দুর্দশাকালে জন্মগ্রহণকারী এই শিশু-ই যে একদিন ভারত-সম্রাট আকবর হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন একথা কোন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কল্পনায়ও সম্ভবত আসে নাই।

জন্ম (২৩ নভেম্বর, ১৫৪২)

হৃত সাম্রাজ্যের একাংশ—পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা—পুনরুদ্ধার করিবার অব্যবহিত পরেই যখন হুমায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৬) তখন আকবরের বয়স তের বৎসর কয়েকমাস মাত্র। শিরহিন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই (১৫৫৫) হুমায়ুন পুত্র আকবরকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, হুমায়ুন বালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা-পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর বৈরাম খাঁ ছিলেন আকবরের অভিভাবক। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ামাত্র সুচতুর বৈরাম খাঁ কালবিলম্ব না করিয়া আকবরকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬)। তের বৎসরের বালক আকবর স্বভাবতই শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁহার নাবালকত্বে তাঁহার পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

আকবরের সিংহাসন লাভ (১৫৫৬, ১৪ই ফেব্রুয়ারি) : বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব

আকবরের সমস্যা (Akbar's Problems) : হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মুঘল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হুমায়ুন তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। সেইজন্য হিন্দুস্তানের সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করিতে তাঁহার পুত্র আকবরকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দিকে তখন বিরুদ্ধ শক্তির উত্থান ঘটিয়াছে। পশ্চিম দিকে কাবুল অঞ্চলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মিরজা মোহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাশ্মীর ও হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলি তখন নিজ নিজ স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। সিন্ধু ও মুলতান শের শাহের দুর্বল বংশধরদের আমলে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ ও গঙ্গা-উপত্যকায় তখনও আফগান প্রাধান্য বজায় ছিল।

হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা

মালব, গুজরাট, উড়িষ্যা প্রভৃতিও দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে তখন খান্দেশ, বেরার, আহ্মদনগর, বিদর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পোর্তুগীজ বণিকগণ গোয়া ও দিউ নামক স্থানে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যগ্র। এদিকে শের শাহের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁহারই বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মকলহেরও অন্ত ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহ্-ই ছিলেন প্রধান। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন হিমু। আগ্রার উপকণ্ঠ হইতে মালবদেশ ও জৌনপুর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আদিল শাহ্ চুণারে অবস্থান করিতেছিলেন। আর শের শাহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দর শূর পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজ বাহুবলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বল শাসনের সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জনসাধারণকে শাসনের নামে শোষণ করিয়া তাঁহারা দেশের সর্বত্র এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তদুপরি ঐ সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ফলে জনসাধারণের দুর্দশার আর অন্ত ছিল না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

আদিল শাহ্ শূর ও মন্ত্রী হিমু

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬ (Second battle of Panipaih) : হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ লইয়া আদিল শাহ্ শূরের হিন্দু মন্ত্রী হিমু মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি অনায়াসে তর্‌দী বেগ্‌কে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা দখল করিলেন। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ তর্‌দী বেগকে আগ্রা ও দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তর্‌দী বেগকে পরাজিত করিয়া হিমু আদিল শাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া 'রাজা বিক্রমজিৎ' উপাধি ধারণ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন। কাজেই বৈরাম খাঁ ও আকবব হিমুর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পাথিপথের প্রান্তরে আকবর ও হিমুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হিমুর দক্ষিণ চক্ষু তীরবিদ্ধ হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি ধৃত হইলেন এবং বৈরাম খাঁর আদেশে নিহত হইলেন। কাহারও কাহারও মতে বৈরাম খাঁর নির্দেশে আকবর হিমুর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। অনেকের মতে আকবর পরাজিত, আহত ও শৃংখলিত শত্রু হিমুর শিরশ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিলে বৈরাম খাঁ স্বয়ং হিমুকে হত্যা করেন।*

হিমু কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয় (১৫৫৬)

*"How can I strike a man who is as good as dead ?"—*Akbar*, Vide, Lane-Pool, p. 241.

পানিপথের প্রান্তরে ত্রিশ বৎসর পূর্বে আকবরের পিতামহ বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। আবার এই প্রান্তরেই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আফগানদের হিন্দুস্তানের প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে নির্বাপিত হইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধের ফলাফল

পরবৎসর (১৫৫৭) সিকন্দর শূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর তাঁহাকে জায়গীর দান করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সিকন্দর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে জায়গীরচ্যুত করা হইল। তখন সিকন্দর আত্মরক্ষার্থ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৫৫৯)। ইতিমধ্যে (১৫৫৬) আদিল শাহ্ শূরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করিতে আফগানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কেহই রহিল না।

আফগান শক্তি বিধ্বস্ত

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৫৫৮-৬০) গোয়ালিওর, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রণথম্ভোর নামক রাজপুতশক্তির অন্যতম কেন্দ্রটিও ঐ সময়ে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা অধিকার করা সম্ভব হয় নাই।

গোয়ালিওর, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান পুনরধিকার

বৈরাম খাঁ (Bairam Khan): পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার সময় হইতেই বালক আকবর পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খাঁর সাহায্যেই আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পরও চারি বৎসর (১৫৫৬-৬০) আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার ব্যাপারেও আকবর ছিলেন বৈরাম খাঁর নিকট সম্পূর্ণ ঋণী। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবরের ব্যক্তিত্বও যে বিকাশলাভ করিতেছিল তাহা বৈরাম খাঁ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অভিভাবকরূপে শাসন-ক্ষমতা লাভ করিবার ফলে ক্রমেই ক্ষমতালিপ্সু হইয়া উঠিলেন। কিশোর আকবর তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। বৈরাম খাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ক্রমেই তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। আকবরের মাতা হামিদা

বৈরাম খাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব

বান্ ও ধাত্রী মাহম্ অনগ বা অনখ এবং অপরাপর অনেকের প্ররোচনায় বৈরাম খাঁর প্রতি আকবরের বিতৃষ্ণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৈরাম খাঁকে মক্কায় প্রেরণ করা স্থির হইল। পীর মহম্মদ নামে জনৈক রাজকর্মচারীর উপর বৈরাম খাঁকে সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিবার ভার দেওয়া হইলে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কারণ পীর মহম্মদ ছিলেন বৈরামের ব্যক্তিগত শত্রু। ইহা ভিন্ন, তিনি বৈরামের অধীনে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁকে সহজেই দমন করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব কার্যাদির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন।

তাঁহার পদচ্যুতি (১৫৬০)

অবশ্য বৈরাম খাঁ মক্কা পর্যন্ত পেঁছিবার অবকাশ পাইলেন না। গুজরাটের পাটন নামক স্থানে এক গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করা এবং পীর মহম্মদের উপর তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কারের ভার দেওয়া আকবরের পক্ষে কতদূর উচিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, বৈরাম খাঁ প্রধানত রাজপরিবারে তাঁহার বিরোধী দলের চক্রান্তেই ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁর নিকট নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈরাম খাঁর ক্ষমতালিপ্সা ও সর্বময় কর্তৃত্বের অবসানেরও যে প্রয়োজন ছিল সে-বিষয়ে আকবর উদাসীন না থাকিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, বৈরাম খাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার করিলে আকবর যে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

আততায়ীর হস্তে মৃত্যু

বৈরাম খাঁর প্রতি আকবরের ব্যবহার

বৈরাম খাঁর অধীনতামুক্ত হইলেও আকবর নিজ ধাত্রী মাহম্ অনগ ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁ এবং অপরাপর আত্মীয়-পরিজনের প্রভাবাধীন অবস্থায় আরও দুই বৎসর কাটাইতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে পীর মহম্মদ ও আদম খাঁর ঔদ্ধত্য এমন বৃদ্ধি পাইল যে, ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আদম খাঁকে হত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই আদম খাঁর মাতা মাহম্ অনগের মৃত্যু হইলে আকবর শাসনকার্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য শাসনকার্যাদি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করায়ত্ত হইতে আরও দুই বৎসর লাগিল। এইভাবে অন্তঃপুরের প্রভাবমুক্ত হইয়া আকবর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরের প্রভাবাধীনে আকবর (১৫৬০-৬৪)

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার (Expansion of Akbar's Empire) : আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই স্বল্পপরিসর সাম্রাজ্য ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিল না। সমগ্র হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া-ই ছিল আকবরের

উদ্দেশ্য। তাঁহার নাবালকত্বে বৈরাম খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ্যবিস্তারের সুযোগ তখনও উপস্থিত হয় নাই। বৈরাম খাঁর পদচ্যুতির পর আকবরের সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব রাজ্য জয় করেন (১৫৬১)। মালবের স্বাধীন শাসক বাজবাহাদুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ফলে, মালবদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বাজাবাহাদুর মালব পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। পরে অবশ্য বাজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মালব বিজয় (১৫৬১)

আকবর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্য সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে অসীরগড় নামক দুর্গটি জয় করা পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ক্রমাগত তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছিলেন। কৌটিল্য-নীতিতে বিশ্বাসী আকবর মনে করিতেন যে, 'রাজা মাত্রেরই প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করিতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, নতুবা তাঁহার নিজ রাজ্যই প্রতিবেশী রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবে।'*

আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতি

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ্ খাঁকে গণ্ডোয়ানা জয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা-ই ছিল এই যুদ্ধের একমাত্র যুক্তি। ডক্টর স্মিথ্ বলেন, গণ্ডোয়ানার স্বাধীনতা-ই ছিল উহার একমাত্র অপরাধ। গণ্ডোয়ানার রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। রাণীমাতা দুর্গাবতী বীরনারায়ণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। মুঘলবাহিনীর সহিত যুঝিবার মত সামরিক বল না থাকিলেও তাঁহার মনোবলের অভাব ছিল না। ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে রাণী দুর্গাবতী অন্যতমা। দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণবিসর্জনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি আসফ্ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের আশা যখন আর রহিল না তখন তিনি আত্মহত্যা করিয়া শত্রুর কবলে পড়িবার অপমান এড়াইলেন।† বালকপুত্র বীরনারায়ণ বীরের ন্যায়ই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রমাণ করিলেন। গণ্ডোয়ানা রাজ্যের একাংশ মুঘল শাসনাধীনে স্থাপিত হইল ; আর

গণ্ডোয়ানা অধিকার (১৫৬৭)

রাণী দুর্গাবতী ও বীরনারায়ণ

*"A monarch should be ever intent on conquest, otherwise his neighbours rise in arms against him. The army should be exercised in warfare lest from want of training they become self-indulgent"—*Akbar*, Vide, Smith's *Oxford History of India*, p. 347 ; *An Advanced History of India*, p. 448.

†"Choosing death rather than dishonour she stabbed herself to the heart so that 'her end was as noble and devoted as her life had been useful'." Vide, Smith : *Akbar the Great Mogul* p. 51.

অপরাংশ তথাকার রাজপরিবারেরই জনৈক উত্তরাধিকারীর হস্তে মুঘল সাম্রাজ্যাধীনে রাখা হইল।

এই সময়ে মালবের শাসনকর্তা আব্দুল্লা খাঁ, উজবেগ্ ও জৈনপুরের শাসনকর্তা খান জামান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিমও নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আকবর একে একে এই তিনটি বিদ্রোহই সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া বিদ্রোহীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিলেন।

আবদুল্লা খাঁ, খান জামান ও মির্জা হাকিমের বিদ্রোহ

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের হস্তে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরও রাজপুতশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় নাই। আকবর এই শৌর্যশালী রাজপুতজাতিকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে এবং সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার ও নিরাপত্তা বিধানে রাজপুত জাতির সৌহার্দ্যের মূল্য উপলব্ধি করিবার মত দূরদর্শিতা সম্রাট আকবরের ছিল। ইহা ভিন্ন, রাজপুতানার মধ্য দিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সহিত ভারতের অপরাপর অংশের বাণিজ্যপথ ছিল। তিনি এই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রথম হইতেই রাজপুত জাতির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বরের (জয়পুর) বিহারীমল্ল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি আকবরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া মুঘলদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিহারীমল্ল, তাঁহার পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ আকবরের সেনাবাহিনীতে উচ্চ কর্মচারি-পদ গ্রহণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিন রাজপুত শক্তির নেতা ও প্রতীকস্বরূপ মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ আকবরের পিতামহ বাবরের বিরুদ্ধে ভারতের প্রভুত্বলাভের আশায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে মেবারের সেই শক্তি ও মর্যাদাবোধ আর ছিল না। সংগ্রাম সিংহের পুত্র রাণা উদয় সিংহ যেমন ছিলেন দুর্বলচেতা তেমনি অকর্মণ্য। অবশ্য বিহারীমল্লের ন্যায় তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বা তাঁহার নিকট নিজ কন্যা সম্প্রদানে রাজী হইলেন না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ করিলে রাণা উদয় সিংহ পলায়ন করিলেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু রাজপুত বীর জয়মল্ল ও পত্ত অসামান্য বীরত্ব সহকারে মুঘলবাহিনীর সহিত শেষ পর্যন্ত যুঝিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজপুত সৈনিকগণও দেশের স্বাধীনতার জন্য একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ 'জৌহরব্রত' অবলম্বন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আকবর যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং চিতোর মুঘলবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইল।

অম্বরের বিহারীমল্ল কর্তৃক আকবরের বশ্যতা স্বীকার (১৫৬২)

চিতোর আক্রমণ: জয়মল্ল ও পত্তের বীরত্ব

চিতোরের পতন অপরাপর রাজপুত রাজগণের মধ্যে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। তাঁহাদের অনেকেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন। রণথম্ভোর, বিকানীর, কালিঞ্জর, জয়সল্মীর প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর বিধ্বস্ত হইলেও মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল না। ইতিমধ্যে উদয় সিংহের মৃত্যুর পর (১৫৭২) তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসে রাণা প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর রাণা প্রতাপ সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া এবং সকল বিপদ ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুঝিয়া চলিলেন। যে মাতৃস্তন্য তিনি পান করিয়াছেন তাহার মর্যাদা রক্ষা করিবেন, এই শপথ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ও আসফ্ খাঁ প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। হল্‌দিঘাটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও রাণা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মুঘলবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইলেন। প্রতাপ তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হইল না। মুঘলবাহিনী একে একে মেবারের দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইল। দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছিয়াও রাণা প্রতাপ মুহূর্তের জন্যও আত্মসমর্পণের কথা কল্পনায়ও আনিলেন না। আশ্রয়হীনভাবে পর্বতারণ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে মুঘল সেনা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও তিনি নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন না। মৃত্যুর (১৫৯৭ খ্রীঃ) পূর্বে তিনি মুঘলদের হাত হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরধিকার করিয়া তিনি যে মাতৃস্তন্য বৃথা পান করেন নাই, সেই প্রমাণ দিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রতাপ রাজপুত দলপতিদের নিকট হইতে দেশের জন্য প্রাণবিসর্জনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা অমর সিংহের বিরুদ্ধে মানসিংহ মুঘলবাহিনীসহ অভিযানে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে অমর সিংহ পরাজিত হইলেন (১৫৯৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহাতেও সমগ্র মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধের পর আকবর মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নাই।

রণথম্ভোর, বিকানীর, কালিঞ্জর, জয়সল্মীর প্রভৃতির বশ্যতা স্বীকার

রাণা প্রতাপ: হল্‌দিঘাট-এর যুদ্ধ (১৫৭৬)

রাণা প্রতাপের মৃত্যু (১৫৯৭)

রাণা অমর সিংহের পরাজয়

---

*"The magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pratap who vowed in the words of the bard to make his Mother's milk resplendent and he amply redeemed his pledge." Vide, *An Advanced History of India*, p. 450.

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কালিঞ্জর ও রণথম্ভোর মুঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ইহার পর মুঘলবাহিনী গুজরাট জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গুজরাট উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আকবরের গুজরাট জয়ের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়াছিল। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজফ্ফর শাহ্ অতি অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। দেশে প্রকৃত শাসন বা শৃঙ্খলা বলিয়া কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় মুজফ্ফর শাহের বিরোধী পক্ষের নেতা ইত্তিমাদ খাঁ আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ফলে, আকবরের গুজরাট জয়ের সুযোগ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে তৃতীয় মুজফ্ফর শাহ্ অতি সহজেই পরাজিত হইলেন এবং গুজরাট মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

গুজরাট জয় (১৫৭২)

গুজরাট জয় করিয়া আকবর সুরাট অধিকার করিলেন (১৫৭৩)। ঐ সময়ে পোর্তুগীজগণ আকবরের বন্ধুত্ব অর্জন করিল এবং তাহারা মক্কাযাত্রীদের পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ইহার পর আকবর দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলে গুজরাটে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। আকবর দ্রুত এই বিদ্রোহ দমন করিয়া গুজরাটে নিজ প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করিলেন। ডক্টর স্মিথের মতে গুজরাট জয় আকবরের রাজত্বকালের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুজরাটের সম্পদ, গুজরাটের সমৃদ্ধ বন্দর প্রভৃতি আকবরের সাম্রাজ্যাধীন হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক দিয়া গুজরাট জয় এক যুগান্তর আনিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ইওরোপীয় বণিকদের সহিতও মুঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু গুজরাট জয়ের ফলে যে নৌ-শক্তি গঠনের সুযোগ আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের কেহই গ্রহণ না করিয়া যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার ফলেই নৌ-শক্তিতে বলীয়ান ইওরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

সুরাট জয় (১৫৭৩), পোর্তুগীজদের মিত্রতা লাভ

গুজরাট জয়ের গুরুত্ব

গুজরাট জয়ের পর আকবর বাংলাদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। বাংলাদেশে তখন সুলেমান কররাণী নামে জনৈক আফগান সর্দার রাজত্ব করিতেন। সুলেমান কররাণী উড়িষ্যা রাজ্যও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আকবরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলেমানের পুত্র দাউদ রাজা হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। এমন কি, তিনি গুজরাটে আকবরের যুদ্ধ-ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তবর্তী জামানিয়া দুর্গটি অধিকার করিয়া লইলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দাউদকে পাটনা ও হাজীপুর হইতে সহজেই বিতাড়িত করিয়া আকবর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল্লের

সেনাপতিত্বে মুঘলবাহিনী একে একে মুঙ্গের, তেলিয়াগড়ী, কোলকঙ্গ বা কোলগাঁ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তুকারই নামক স্থানে তিনি মুঘলবাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে রাজমহলের নিকট আর এক যুদ্ধে (১৫৭৬) মুঘলবাহিনীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ফলে, বাংলাদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এইভাবে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ঢাকা ও মৈমনসিংহের ঈশা খাঁ, যশোরের প্রতাপ রায় বা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভৃতি স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া চলিলেন।* উড়িষ্যা আরও কিছুকাল একপ্রকার স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

বাংলাদেশ (১৫৭৪-৭৬) ও উড়িষ্যা বিজয় (১৫৯২)

ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি

আকবরের ধর্মনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের (১৫৭৮-৮০) ফলে বাংলাদেশ ও জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা দিল। দেওয়ান শাহ্ মুনসুর সম্রাট আকবরের আদেশে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বে-আইনিভাবে দখলীকৃত সরকারী ভূমির পুনরুদ্ধারকল্পে তদন্ত শুরু করিলেন। ফলে, বাংলাদেশের মোট রাজস্বের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ এবং বিহারের রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পাইল। বাংলার শাসনকর্তা মুজফ্ফর খাঁ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর ভাতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বিহারের সৈনিকদের ভাতা মাত্র ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করায় বিহারের সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন, আকবরের 'সুল্‌হ্-ই-কুল' (*Sulh-i-kul*) বা সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার নীতি গোঁড়া মুসলমানদের একাংশের মনঃপূত হইল না। ফলে, জৌনপুরের কাজী আকবরের এইরূপ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ইসলাম ধর্মাবলম্বীমাত্রেরই উচিত বলিয়া এক ফতোয়া জারি করিলেন। বাংলাদেশ ও জৌনপুরের বিদ্রোহিগণ আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মহম্মদ হাকিমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। বাংলা ও জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা দিলে মির্জা মহম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। টোডরমল, আজিজ কোকা এবং শাহ্‌বাজ খাঁ বাংলাদেশ ও জৌনপুরের বিদ্রোহ দৃঢ়হস্তে দমন করিলেন। আকবর স্বয়ং মির্জা মহম্মদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। একদিকে মির্জা মহম্মদ সসৈন্যে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং লাহোরে মানসিংহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। আকবর কাবুলের

আকবরের ধর্মনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলে বাংলা ও জৌনপুরের বিদ্রোহ (১৫৮০-৮৪)

কাবুলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মহম্মদের বিদ্রোহ

---

* কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য বা প্রতাপ রায় প্রভৃতি ঐ সময়কার বারজন স্থানীয় জমিদার 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত।

দিকে অগ্রসর হইলে মির্জা মহম্মদ পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। কাবুল পুনরায় আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মির্জা মহম্মদ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে পুনরায় তাঁহাকে কাবুলের শাসনভার দেওয়া হইল। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে কাবুল সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

কাবুলের মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত চিরকালই ভারতবর্ষের শাসকদের এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পথেই বারবার মোঙ্গল আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বলবনের আমল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার নীতি দিল্লী সুলতানদের শাসনব্যবস্থার মূলনীতির অন্যতম হিসাবে পরিগণিত ছিল। আকবর কর্তৃক কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যের অংশরূপে অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের উপকূলরেখা পর্যন্ত দীর্ঘ বারশত মাইল বিস্তৃত সীমার নিরাপত্তা বিধান করা সহজসাধ্য ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ আফগান জাতিকে দমন করিতে পারিলেই উহার নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব ছিল। আকবর উজবেগ দলপতি আবদুল্লা খাঁর আনুগত্য লাভে এবং ইয়সুফ্ জাই ও রোশ্নিয়া প্রভৃতি আফগান উপদলগুলিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিহারীমল্লের পুত্র ভগবান দাস ও কাসিম খাঁকে কাশ্মীর রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। কাশ্মীরের সুলতান ইয়সুফ্ শাহ্ ও তাঁহার পুত্র ইয়াকুবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভগবান দাস ও কাসিম খাঁ কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

আফগান উপদলগুলির দমন

কাশ্মীর জয় (১৫৮৬)

১৫৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু এবং ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলুচিস্তান মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কান্দাহার অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করে। এইভাবে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আকবরের সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র হইতে হিন্দুকুশ এবং হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

সিন্ধু (১৫৯০-৯১), বেলুচিস্তান (১৫৯৫) জয় : কান্দাহারের মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৫৯৫)

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর, বিদর ও খান্দেশ এই কয়টি মুসলমান সুলতানী রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া খান্দেশ জয় করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। খান্দেশের অসীরগড় দুর্গটি ছিল দাক্ষিণাত্যের

দাক্ষিণাত্য বিজয়

প্রবেশপথে অবস্থিত। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ, আহ্‌ম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চারিটি রাজ্যে পৃথক দূত প্রেরণ করিয়া তাহাদের আনুগত্যলাভের চেষ্টা করিলেন। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ইচ্ছার পশ্চাতে এক অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন এবং দাক্ষিণাত্যে পোর্তুগীজ শক্তি দমনের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার প্রেরিত দূতগণ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। একমাত্র খান্দেশের সুলতান আলি খাঁ ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপর কোন সুলতান বিনা যুদ্ধে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু দেশরক্ষার ইচ্ছা থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। দীর্ঘকাল আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় তাঁহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবর কূটনীতির দ্বারা দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আবদুর রহিমের নেতৃত্বে আহ্‌ম্মদনগরের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন।

খান্দেশ ভিন্ন অপরাপর রাজ্য আকবরের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত

মুঘল সৈন্য ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর অবরোধ করিল। আহ্‌ম্মদনগরের সুলতানের নাবালকত্বে বিজাপুরের বিধবা রাণী ও আহ্‌ম্মদনগরের সুলতানের পিতৃষ্বসা (পিসি) চাঁদবিবি আহ্‌ম্মদ-নগরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। চাঁদবিবি ছিলেন কূটনীতি ও রণনীতিতে অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘলদের সহিত চাঁদবিবির সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে বেরার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং আহ্‌ম্মদনগর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিল। ইহার কিছুকাল পরে আহ্‌ম্মদনগরের স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে চাঁদবিবি ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। চাঁদবিবির সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আকবরের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করিলেন। তাঁহারা বিজাপুর হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া বেরার হইতে মুঘল প্রভুত্ব দূর করিতে চাহিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের চক্রান্তে চাঁদবিবি নিহত হইলেন। ফলে, আহ্‌ম্মদনগরের দুর্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর মুঘল-বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল এবং আহ্‌ম্মদনগরের একাংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

আহ্‌ম্মদনগর অবরোধ ও চাঁদবিবির কৃতিত্ব

আহ্‌ম্মদনগরের বশ্যতা স্বীকার

আহ্‌ম্মদনগর কর্তৃক চুক্তি-ভঙ্গ

আহ্‌ম্মদনগরের একাংশের মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি (১৬০০)

ইতিমধ্যে খান্দেশের নূতন সুলতান বাহাদুর শাহ্ মুঘল আধিপত্যে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তিনি তাঁহার সুরক্ষিত অসীরগড় দুর্গ হইতে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়া সেই দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসীরগড়ের ন্যায় সুরক্ষিত দুর্গ তখন ভারতবর্ষে খুব বেশী ছিল না। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমেই তিনি খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করিলেন

খান্দেশের বিদ্রোহ ঘোষণা

এবং তারপর অসীরগড় দুর্গটি অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই দুর্গটি জয় করা সহজসাধ্য নহে দেখিয়া আকবর বাহাদুর শাহ্‌কে সন্ধি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানাইলেন। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া আকবর তাঁহাকে নিজ শিবিরে আনিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তিনি তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এমন কি, তাঁহাকে নিজ সামরিক কর্মচারীদের নিকট যুদ্ধ ত্যাগ করিবার নির্দেশ-সংবলিত এক পত্র লিখিতেও বাধ্য করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া আকবর অবশেষে খান্দেশের রাজকর্মচারীদিগকে প্রভূত পরিমাণ উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া অসীরগড় দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইলেন। আহ্‌মদনগরের বিজিত অংশ, বেরার ও খান্দেশকে তিনটি সুবায় সংগঠিত করিয়া যুবরাজ দানিয়ালের অধীনে স্থাপন করা হইল। ইহাতে আকবরের সাম্রাজ্য দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল। এদিকে পিতার অনুপস্থিতিতে যুবরাজ সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আকবর দিল্লী ফিরিয়া আসিয়া শীঘ্রই পুত্রকে স্ববশে আনিতে সক্ষম হইলেন।

অসীরগড় দুর্গ জয় (১৬০১)

সেলিমের বিদ্রোহ দমন

আকবরের শাসনব্যবস্থা (Akbar's Administration) : হিমালয় হইতে কৃষ্ণানদী এবং হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট আকবর কেবলমাত্র সমরবিজয়ী নেতা হিসাবেই নিজ পরিচয় রাখিয়া যান নাই, বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুদক্ষ শাসনের জন্য তিনি এক অতি উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী প্রবর্তন করিয়া নিজ অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়ে শের শাহের শাসন-পদ্ধতির অনুকরণ পরিলক্ষিত হইলেও তিনি নিজ প্রতিভাবলে ভারতীয় এবং আরবীয়-পারসিক (Perso-Arabic) শাসন-পদ্ধতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই শাসনব্যবস্থার মূল উদ্ভাবক তিনি ছিলেন না, একথা সত্য, কিন্তু ভারতীয় ও বৈদেশিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অতি সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য যে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন আকবরের তাহা ছিল। আকবরের শাসন-পদ্ধতি সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে তাঁহার শাসননীতি ইংরেজ শাসকগণও আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের শাসন-ব্যবস্থা জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল ; কারণ উদারতা, ধর্মসহিষ্ণুতা ও প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। প্রচলিত রীতি-নীতি, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি চিরাচরিত প্রথার সব কিছুই আকবরের শাসন-ব্যবস্থায় স্বীকৃত ছিল।

ভারতীয় ও বৈদেশিক শাসন-পদ্ধতির অভূতপূর্ব সমন্বয়

আকবরের শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি

শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনত তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের আদেশ আইনের ন্যায়ই বলবৎ ছিল। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি ও সর্বপ্রধান সেনাপতি। কিন্তু কার্যত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পরামর্শ ও

স্বীয় প্রজাহিতৈষণা তাঁহার শাসনকার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিত। আকবর স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করেন
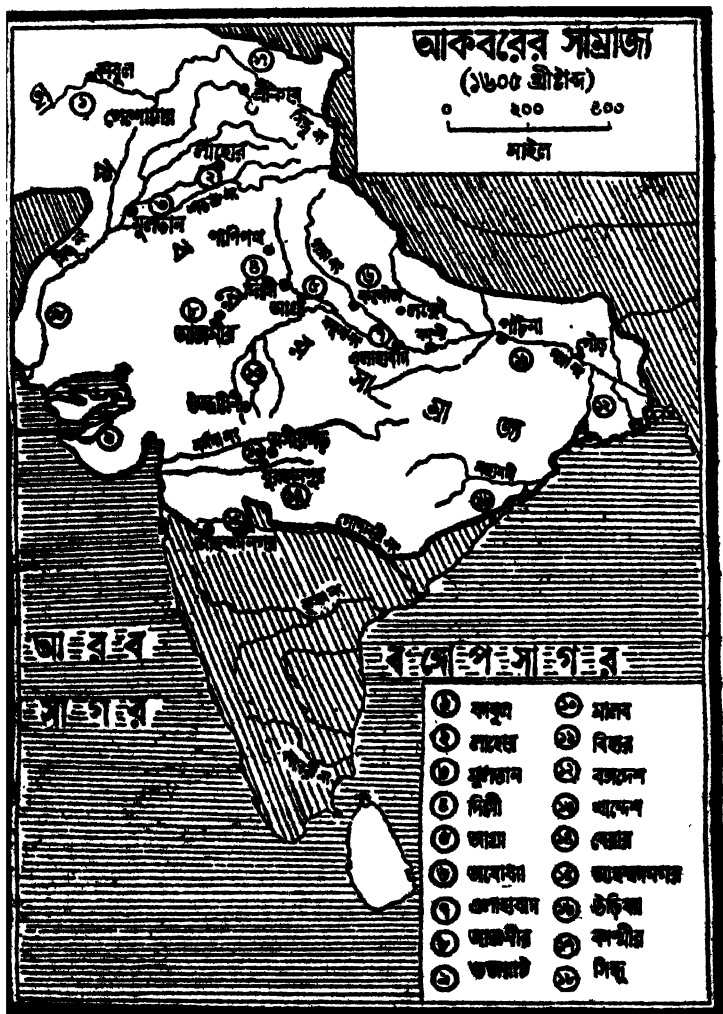
নাই। মুঘল তথা মুসলমান যুগে সর্বোচ্চ শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্র ও মানসিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রভাব সমগ্র শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইত। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মাত্রেই একথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। আকবরের চরিত্রের স্বাভাবিক উদারতা সর্বধর্মের প্রতি তাঁহার চরম সহিষ্ণুতা, প্রজাবর্গের প্রতি

সম্রাটের ক্ষমতা

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সম-ব্যবহারের নীতি তাঁহার শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। উলেমাদের প্রভাবমুক্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া আকবর প্রকৃত ভারত-সম্রাটের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার দক্ষতা, সংস্কার-নীতি প্রভৃতি সব কিছুর উৎসস্বরূপ।

দেওয়ান, মীর বক্‌শী

(১) 'ওয়াজীর' বা 'দেওয়ান' ছিলেন রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান। রাজস্ব আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব বিভাগ ভিন্ন আকবরের শাসনব্যবস্থায় আরও বহু বিভাগ ছিল। (২) 'মীর বক্‌শী' ছিলেন সামরিক বিভাগের বেতন-বণ্টন ও হিসাবপত্রের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মচারী। সৈনিক সংগ্রহের এবং মনসব্‌দার প্রভৃতি কর্মচারিবর্গের তালিকা রক্ষা করাও তাঁহার দায়িত্ব ছিল। (৩) 'খান-ই-সামান' ছিলেন সম্রাটের গৃহপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। (৪) 'কাজী-উল্‌-কাজাৎ' বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। (৫) 'সদর-ই-সুদূর' নামক কর্মচারী ধর্ম এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী দান বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। (৬) 'মুহ্‌তসিব' জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মভাবের প্রসার সাধন করিতেন। ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মনীতি যাহাতে কোন ইসলাম ধর্মাবলম্বী কর্তৃক অবহেলিত না হয় ইনি সে-বিষয়ে নজর রাখিতেন। (৭) এই সকল প্রধান কর্মচারী ভিন্ন 'দারোগা-ই-তোপখানা', 'দারোগা-ই-ডাকচৌকি', মুস্তাফী, মীর বাহ্‌রি, ওয়াকু-ই-নবীশ, মীর আরজ, মীর মঞ্জিল, মীর তোজক প্রভৃতি আরও নানা পর্যায়ের বহু রাজকর্মচারী ছিলেন।

খান্‌-ই-সামান, কাজী-উল্‌-কাজাৎ, সদর-ই-সুদূর, মুহ্‌তসিব

অপরাপর রাজ-কর্মচারিগণ

শহর এলাকায় শান্তিরক্ষার ভার ছিল 'কটোয়াল' নামক রাজকর্মচারিগণের উপর। আইন-ই-আকবরীতে কটোয়ালের কর্তব্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে।* কটোয়াল আধুনিক কালের পুলিস সুপারের কাজ করিতেন। রাত্রিতে শহর এলাকায় পাহারা, শহর এলাকায় নির্মিত প্রত্যেক বাড়ীর এবং রাস্তার হিসাব, অপরিচিত লোকের উপর নজর রাখিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা প্রভৃতি ছিল কটোয়ালের কর্তব্য। ইহা ভিন্ন, নাগরিকদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে খোঁজ রাখা, চোর ধরা, বেওয়ারিশ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করা, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিধবাকে বলপূর্বক মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে বাধ্য করা হইতেছে কিনা এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব ছিল কটোয়ালের উপর। কিন্তু কটোয়ালের কর্তব্য ইহাতেই শেষ হইত না। তাঁহার উপর আরও বহুবিধ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এই পরিমাণ দায়িত্বপালন কোন কটোয়ালের পক্ষেই সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্যার্ যদুনাথ সরকার এই

শহর এলাকায় শান্তি-রক্ষক: কটোয়াল

কটোয়ালের বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য

* Vide, Akbari; Vol. II. pp. 41-46 Jarret.

কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আইন-ই-আকবরীতে কটোয়ালের কর্তব্যের তালিকা কটোয়ালের কর্তব্যের আদর্শ হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নাগরিকদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করা-ই ছিল কটোয়ালের প্রধান কর্তব্য। চুরি-ডাকাতি হইলে অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহার কর্তব্য ছিল এবং এই কর্তব্য পালনে কোনপ্রকার ত্রুটি হইলে কটোয়ালকে হৃত সম্পত্তি পূরণ করিয়া দিতে হইত।

জেলার শান্তিরক্ষা : ফৌজদার

জেলারশান্তিরক্ষার ভার ছিল ফৌজদারের উপর। ফৌজদারের অধীনে 'ফৌজ' অর্থাৎ সৈন্য থাকিত। যে-কোন বিদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গের চেষ্টা ফৌজদার তাঁহার ফৌজের সাহায্যে দমন করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

গ্রামাঞ্চলের শান্তি-রক্ষা : গ্রাম-প্রধান

গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার ছিল গ্রাম্য মোড়লের উপর। এ-বিষয়ে মুঘল যুগে কোন নূতন পন্থা অনুসৃত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে গ্রামের নিরাপত্তার ভার গ্রাম্য-প্রধানের উপর ন্যস্ত ছিল।

বিচার-ব্যবস্থা : সম্রাট সর্বোচ্চ বিচারক

সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রেরিত বিশেষ কতকগুলি মোকদ্দমার বিচার সম্রাট স্বয়ং করিতেন। ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের যে-কোন অংশে বা যে-কোন বিচারালয়ের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল তিনি শুনিতেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে জনসাধারণের যে-কেহ সম্রাটের নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত।

সদ্‌র-ই সুদূর ও কাজী-উল্-কাজাৎ

সম্রাটের নিম্নে বিচারকার্যের ভার ছিল সদ্‌র-ই-সুদূরের উপর। ধর্ম-সংক্রান্ত এবং দেওয়ানী বিচার-ই ছিল তাঁহার প্রধান দায়িত্ব। কাজী-উল্-কাজাৎ সাম্রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিচালক ছিলেন। বিচারকার্যে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সে-বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখিতেন।

কাজী, মুফ্‌তি, মীর আদ্‌ল

কাজী, মুফ্‌তি ও মীর আদ্‌ল ছিলেন বিচার বিভাগের অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারী। কাজী সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতি করিতেন, মুফ্‌তি আইন বিশ্লেষণ এবং দণ্ডাদেশ দান করিতেন।

আইন-কানুন

মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে কোনপ্রকার লিখিত আইন-কানুন ছিল না। বিচারকগণ কোরাণের নির্দেশ ও নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর প্রবর্তিত বারোটি আইন এবং ঔরংজেবের আমলে রচিত 'ফতোয়া-ই-আলমগীর' ভিন্ন কোন লিপিবদ্ধ আইন-কানুন মুঘলযুগে ছিল না।

সম্রাট স্বয়ং বিচারকার্যে ন্যায়, সততা ও আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার এই সকল নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। খ্রীষ্টধর্মযাজক ফাদার মন্‌সেরেট (Father Monserrate) আকবরের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিচারকার্যের ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছেন। রাজকর্মচারিবর্গের কর্তব্যকর্মে অবহেলা অথবা কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ তিনি ক্ষমা করিতেন না। ব্যভিচার, স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রভৃতির কোন ক্ষমা ছিল না। আকবরের বিচার ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত ছিল। ন্যায় ও সততা-ই ছিল তাঁহার বিচারের মূল নীতি। অযথা বা অপাত্রে দয়া প্রদর্শনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আকবর বলিতেন যে, তিনি স্বয়ং যদি কোন অন্যায় কার্য করেন তাহা হইলে তিনি নিজেকে শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।*

বিচার ব্যাপারে ন্যায়, সততা ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা

মুঘল শাসনব্যবস্থায় ন্যায্য বিচার করিবার নীতি অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কাজীগণ ন্যায্য বিচার করিতেন, একথা বলা চলে না। সার্ যদুনাথ সরকার বলেন যে, কাজীগণ সর্বদাই বিচার-বিভ্রাট করিতেন বলিয়াই 'কাজীর বিচার' কথাটির উদ্ভব হইয়াছিল। কাজীর বিচারে জনসাধারণের যে কোনপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল না তাহাই 'কাজীর বিচার' কথাটিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সে-সময়ে কোন জেলখানা ছিল না, সুতরাং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইত।

'কাজীর বিচার'

গ্রামাঞ্চলের বিচারকার্যাদি গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ কর্তৃক সম্পন্ন হইত। এই ব্যবস্থা মুঘল যুগের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের বিচার

আকবরের রাজস্ব-নীতি সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। শাসনব্যবস্থার অপরাপর সকল বিভাগে যেমন আকবরের ব্যক্তিগত প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হইত, তেমনি রাজস্ব বিভাগেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শের শাহের আমলে যে রাজস্ব-নীতির সংস্কার সাধিত হইয়াছিল উহার সুফল পরবর্তী কালের অব্যবস্থায় লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং আকবর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমলকে দেওয়ান-ই-আস্‌রফ্‌-এর পদে নিযুক্ত করিলে পুনরায় রাজস্ব-নীতির সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করা হইল। টোডরমলের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান নীতিই ছিল জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা। তিনি সমগ্র জমি জরিপ করাইয়া উর্বরতা এবং কতকাল যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র চাষের জমিকে চারিভাগে ভাগ করিলেন। যথা: (১) 'পোলাজ' অর্থাৎ যে-সকল জমি প্রতি বৎসর চাষ করা চলিত; (২) 'পরাউতি' অর্থাৎ যে-সকল জমি কিছুকাল চাষের পর উর্বরতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল পতিত রাখিতে হইত; (৩) 'চাচর' অর্থাৎ যে-সকল জমি তিন বা চারি বৎসর যাবৎ পতিত পড়িয়া আছে; এবং (৪) 'বঞ্জর' অর্থাৎ যে-সকল জমি পাঁচ বৎসরের অধিক কাল পতিত পড়িয়া আছে।

আকবরের রাজস্ব-নীতি

টোডরমলের দক্ষতা

চাষের জমি চারি পর্যায়ে বিভক্ত—'পোলাজ', 'পরাউতি', 'চাচর' ও 'বঞ্জর'

*"If I were guilty of an unjust act, I would rise in judgement against myself." Akbar, Vide, An Advanced History of India, p. 559.

'পোলাজ' ও 'পরাউতি' জমিকে টোডরমল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কৃষকের অধীনেই এই তিন পর্যায়ের জমি থাকিত। টোডরমল এই তিন প্রকার জমির মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করিলেন। আর 'চাচর' ও 'বঞ্জর' এই দুই প্রকার জমির রাজস্ব অতি সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হইল, কিন্তু জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও ক্রমবর্ধিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইল। জমির রাজস্ব উৎপন্ন ফসলে অথবা অর্থের দ্বারা দেওয়া চলিত। উপরি-উক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং গুজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রচলন করা হয়।

রাজস্ব ঃ মোট ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে ধার্য

রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে পনরটি সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুবার শাসনকর্তা সাহেব সুবা, সুবাদার বা নাজিম নামে অভিহিত হইতেন। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত। দেওয়ান ও নাজিম বা সুবাদার পরস্পর পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন পরস্পরের অধীন। দেওয়ান আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে শাসনকার্যের প্রয়োজনীয় ব্যয় সুবাদারকে দিতেন এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সুবাদার এবং দেওয়ান উভয়ই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। সুতরাং একে অপরের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইতেন না। ফলে, দেওয়ান বা সুবাদার কেহই অত্যধিক শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পাইতেন না।

আকবরের সাম্রাজ্য পনরটি সুবায় বিভক্ত

সুবাদার ও দেওয়ান

মনসব্‌দারী প্রথা ছিল আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আকবর কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী পোষণ করিতেন না। প্রয়োজনবোধে দেশের যাবতীয় সুস্থ ও সবল ব্যক্তি দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে ইহাই ছিল আকবরের সামরিক নীতির মূল কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতির কোন সার্থকতা ছিল না। প্রকৃতক্ষেত্রে আকবরের মনসব্‌দারগণই সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতেন। আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন যুদ্ধবিগ্রহের কালে প্রয়োজনবোধে সৈনিক সংগ্রহ করা হইত, তখন তন্তুবায়, ছুতার, মুদী প্রভৃতি নানা বৃত্তির লোক সেনাবাহিনীতে যোগদান করিত। ফলে, সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। আকবর সামরিক সংস্কার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে শাহ্‌বাজ খাঁকে মীর বক্‌শী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং এজন্য স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। ইহা মনসব্‌দারী প্রথা নামে পরিচিত। মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মনসব্‌দারী ছিল। প্রত্যেক মনসব্‌দার তাঁহার পর্যায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য,

মনসব্‌দারী প্রথা

ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সর্বনিম্ন মনসবদার মোট দশজন সৈন্য প্রস্তুত রাখিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মনসবদারগণ সামরিক কর্তব্য ভিন্ন বেসামরিক কর্তব্য করিতেও বাধ্য ছিলেন। এজন্য তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন। মনসবদারগণ পর্যায় অনুযায়ী সম্মানের অধিকারী ছিলেন। মানসিংহ, টোডরমল, কিলিচ্ খাঁ ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার। যুদ্ধবিগ্রহের কালে মনসবদারগণ সৈন্যসহ উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। মনসবদারী প্রথা ছিল ইওরোপের সামন্ত প্রথারই অনুরূপ।

মনসবদারগণের পর্যায় ভাগ

তাঁহাদের কর্তব্য

মনসবদারগণ ভিন্ন 'দাখিলী' (Dakhili) ও 'অহদী' (Ahadi) নামে অপর দুই শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন। 'অহদী' নামক সামরিক কর্মচারিগণকে সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে মনোনীত করা হইত। ইহারা প্রধানত সম্রাটের দেহরক্ষীর কাজ করিত।

'দাখিলী' ও 'অহদী'

আকবরের আমলে মুঘল সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী—এই চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। মুঘল সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোকও গ্রহণ করা হইত। কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় বাহিনী ছিল, একথা বলা চলে না। মুঘলবাহিনী যুদ্ধের সময়েও অতিশয় মন্থর গতিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অগ্রসর হইত। অসংখ্য দাসদাসী, স্ত্রীলোক, হাতী, উট প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মুঘল সম্রাট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব করিতে অগ্রসর হইতেন। ফলে, সেনাবাহিনীর গতিশীলতা ব্যাহত হইত।

মুঘলবাহিনী—পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী

আকবরের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল উহার ধর্ম ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা। আকবর ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তিনি তাঁহার রাজনীতিকে ধর্ম হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজামাত্রেই সমমর্যাদা ও সমান অধিকার লাভ করিত। বিচারকার্যেও প্রজায় প্রজায় কোন প্রভেদ করা হইত না। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। মানসিংহ, টোডরমল প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আকবর ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে এক জাতীয়-শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার অপূর্ব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আকবরের শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি

আকবরের ধর্মনীতি (Religious policy of Akbar) : ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দূরদর্শিতা শের শাহ্ ও আকবর ভিন্ন অপর কোন সুলতান বা সম্রাটের ছিল না। আকবর বুঝিয়াছিলেন যে, সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাটকে কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিলেই

চলিবে না ; হিন্দুস্তানের সম্রাটকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে হইবে। আকবরের শাসনব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, ধর্মনীতি সবকিছুই এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের ব্যাপারে আকবর সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্মনীতি বিভিন্ন প্রভাবাধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি সুফি ধর্মমতের প্রভাবে আসেন এবং ধর্মবিষয়ে উদারতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। পূর্বপুরুষদের ধর্মমতের দিক দিয়া বিচার করিলেও একথা উল্লেখ করিতে হয় যে, আকবর তৈমুর বংশের সন্তানসুলভ উদারতা সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবেই লাভ করিয়াছিলেন। তৈমুর বংশের সকলেই ছিলেন দুর্ধর্ষ সমরবিজয়ী নেতা, তাঁহাদের শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ ছিল অপরিসীম, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁহারা উৎকট সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তৈমুর বংশোদ্ভূত আকবর স্বভাবতই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে ধর্মান্ধতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ধর্মবিষয়ে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিজেকে এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জনৈক পারসিক মনীষীর কন্যা হামিদা বানুর মানসিক উৎকর্ষ, উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ পুত্র আকবরের চরিত্রকে স্বভাবতই প্রভাবিত করিয়াছিল। আকবরের হিন্দু পত্নীদের প্রভাবও এ-বিষয়ে নেহাত কম ছিল না।

ধর্মবিষয়ে আকবরের দূরদর্শিতা

আকবরের চরিত্রে বিভিন্ন প্রভাব

বাল্যকাল হইতেই আকবর সিয়া-সুন্নী ও মেহ্‌দি-সুফি ধর্মসম্প্রদায়গুলির ধর্মদ্বন্দ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। বদাউনীর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, আকবর স্বয়ং গভীর ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষে তিনি মর্মাহত হইতেন। উলেমাদের ধর্মান্ধতা তাঁহার অন্তরকে পীড়া দিত। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আকবর ক্রমেই সর্বধর্ম-সারগ্রাহী হইয়া উঠিলেন। বিভিন্ন ধর্ম একই স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র—এই ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল। ফলে, তাঁহার অন্তরে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মব্যাপারে চরম উদারতার ভাব সৃষ্টি হইল। তিনি হিন্দু, জৈন, ইরানী ও খ্রীষ্টধর্মের সার সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। খ্রীষ্টধর্মের মূলকথা কি সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি গোয়ার পোর্তুগীজ ধর্মযাজকদের নিকট একজন যাজককে তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানান। দুইজন জেসুইট্‌ ধর্মযাজক (Jesuit missionaries)—ফাদার রিডোল্‌ফো একোয়াভাইভা (Father Ridolfo Aquaviva) ও ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেট্‌ (Father Antonio Monserrate)-কে গোয়ার জেসুইট্‌ যাজকসংঘ হইতে আকবরের রাজসভায়

আকবরের ধর্মমতের মূলনীতি সর্বধর্মের সার গ্রহণ

জেসুইট্‌ যাজকদের আগমন

এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মনসেরেট্ আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজ্ঞানীদের আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুনিতে ভালবাসিতেন এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ইবাদৎখানায় সর্বদাই আলোচনা হইত। তাঁহার ইবাদৎখানায় পুরুষোত্তম, দেবী, হরিবিজয় সুরী, বিজয়সেন সুরী, ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু ও জৈন দার্শনিকগণ স্থান পাইয়াছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা—'সুল্‌হ্-ই-কুল'

আকবর ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ আবুল ফজল ধর্মসম্পর্কে একই নীতি ও ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধর্মনীতির মূল কথা-ই ছিল সহিষ্ণুতা বা 'সুল্‌হ্-ই-কুল' (toleration)। পরধর্মসহিষ্ণুতা আকবরের নিকট কেবলমাত্র মুখের কথা ছিল না, প্রকৃতক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infalli ble De re.)

উলেমাদের মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আকবর তাঁহার 'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible Decree) দ্বারা নিজেকে রাষ্ট্র ও ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন (১৫৭৯)। এ-বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর 'এ্যাক্ট্ অব্ সুপ্রিম্যাসি' (Act of Supremacy)-এর সহিত আকবরের ঘোষণার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ঘোষণার দ্বারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে-কোন সমস্যার চরম সমাধানের ক্ষমতা আকবর নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'দীন-ইলাহী'

পরস্পর ধর্ম-বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আকবর 'দীন-ইলাহী' (Din Ilahi) নামে এক নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন (১৫৮২)। সকল ধর্মের সার লইয়া 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত গঠিত হইয়াছিল। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই সর্ব-ধর্ম-সার 'দীন-ইলাহী'কে জাতীয় ধর্মে পরিণত করা। এই ধর্মমতে কোন বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য বা কোন বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতা আকবর স্বীকার করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই যাহাতে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্যই তিনি 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত জনসাধারণের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমব্যবহার—হিন্দুরমণী বিবাহ

আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্ব-ধর্ম-সারে বিশ্বাস কেবলমাত্র তাঁহার 'দীন-ইলাহী' ধর্মমতের প্রচার হইতেই বুঝা যায় না, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব হইতেও এই পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের আমলেই হিন্দুগণ সর্বপ্রথম নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘৃণ্য জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া এবং হিন্দুদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আকবর এই দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজপুতকন্যা বিবাহ

করিয়াছিলেন এবং নিজপুত্র সেলিমের সহিত এক রাজপুতকন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর নিজ পরিবারস্থ হিন্দুনারীদের তাহাদের নিজ ধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, একথা সমসাময়িক চিত্রাদি হইতে প্রমাণিত হয়। রাজ্যজয়ের সময় তাঁহার সেনাবাহিনী কোন ধর্মস্থান যাহাতে কলুষিত না করে সেজন্য আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজপুত নীতি (Akbar's Rajput Policy): রাজপুত জাতিকে দমন করিয়া আকবর সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা-সম্পন্ন সম্রাট আকবর রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য লাভের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুত, রাজপুত জাতির সহযোগিতার ফলেই আকবর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায়ও রাজপুত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান বিজেতাগণ বিজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিজিত শত্রুকে নির্মম শাস্তিদান, বিজিত শত্রুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ, তাহার মর্যাদা নাশ করা প্রভৃতিই ছিল তাঁহাদের নীতি। কিন্তু সমরকুশলী সম্রাট আকবর প্রকৃত সংগঠক ছিলেন। বিজিত শত্রুর উপযুক্ত মর্যাদা দান, বিজিত শত্রুর গুণ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। রাজপুত জাতির সহযোগিতা ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনে অপরিহার্য একথা আকবর ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর জয়ের পর তিনি রাজপুতদের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তিনি রাজপুত জাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দানে কার্পণ্য করেন নাই। রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আকবর ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু রাজপুতদের প্রতি তাঁহার উদারতারও অন্ত ছিল না। পরাজিত শত্রুকে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া আকবর তাঁহার সামরিক জয়কে অন্তর বিজয়ে পরিণত করিতেন। ফলে, বিজিত শত্রু চির-মিত্রে পরিণত হইত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজপুতদের প্রতি বা হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে আকবর এই নীতির ব্যতিক্রম করেন নাই। হিন্দুমন্দির অপবিত্রীকরণ, ধর্মান্ধতাবশত পরধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার বা অবিচার প্রভৃতি দ্বারা আকবর তাঁহার বিজয়-গৌরবকে ম্লান করেন নাই। তাঁহার এই উদার, প্রকৃত সম্রাট-সুলভ নীতির সুফল আমরা দেখিতে পাই তাঁহার প্রতি সমগ্র রাজপুত জাতি তথা ভারতবাসীর অকপট আনুগত্যে। আকবরের

আকবরের দূরদৃষ্টির সুফল—রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য লাভ

রণথম্ভোর জয়ের পর পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা

রাজপুত জাতির আনুগত্য

দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার সর্বাংশিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু রাজপুত জাতি তাঁহার অনুগত মিত্রতে পরিণত হইয়াছিল।

আকবর ও তাঁহার পুত্র সেলিম রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়া রাজপুত জাতিকে সম্রাটের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বহু রাজপুত নেতা তাঁহার অধীনে উচ্চ কর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা বিহারীমল্ল, তাঁহার পুত্র ও পৌত্র ভগবানদাস ও মানসিংহের নাম এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত জাতি ছিল সমসাময়িক ভারতের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি। আনুগত্যে ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়াও আকবরের রাজপুত কর্মচারিগণ মুসলমান রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। আকবর এই রাজপুত বীরগণের অক্লান্ত, আন্তরিক সহায়তায় মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরের স্বজাতীয় অনুচরবৃন্দ ছিল স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী, কিন্তু রাজপুত কর্মচারীদের নিকট হইতে আকবর অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। আকবর রাজপুত জাতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন রাজপুত জাতি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিল।

রাজপুতরমণী বিবাহ

রাজপুত জাতির উপর আকবরের বিশ্বাস স্থাপন

আকবর-অনুসৃত রাজপুত-নীতির সুফল জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের আমলেও সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ঔরংজেবের আমলে এই দূরদর্শী নীতি পরিত্যক্ত হইয়া এক সংকীর্ণ, ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। ঔরংজেবের হিন্দু তথা রাজপুত বিদ্বেষ সমগ্র রাজপুত জাতিকে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী আকবর রাজপুত জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার, তাহাদিগকে উপযুক্ত মর্যাদা দান ও তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তাহাদের মনের গ্লানি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের উৎকট ধর্মান্ধতা ও অ-মুসলমান-নির্যাতন নীতির ফলে আকবরের নীতির সুফল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌-জাহানের আমলের আকবর-অনুসৃত রাজপুত নীতির সুফল

ঔরংজেবের ধর্মান্ধতা—রাজপুত শক্তির শত্রুতা

হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি : তাঁহার সংস্কার (Akbar's policy towards the Hindus : His Reforms) : উদার মনোবৃত্তির সহিত দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটিলে যে সুফল পাওয়া যায় তাহা আকবরের সংস্কারকার্যাদি হইতে প্রমাণিত হয়। আকবরের সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক তেমনি ছিল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক। তাঁহার সংস্কারগুলি হইতেই হিন্দুদের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আকবর প্রায় দুই কোটি মুদ্রার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি ঘৃণ্য জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া

তাঁহার সংস্কার নীতির উদারতা

(১৫৬৪) মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রজার মধ্যে কৃত্রিম প্রভেদ দূর করেন। আকবরের যুদ্ধগুলি প্রধানত হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্বে যুদ্ধে জয়লাভের পর পরাজিত সৈন্যগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত, কিন্তু আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু হিন্দু সৈনিক ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই সকল সংস্কারকার্য সম্পাদনে আকবর অপর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতেই তাঁহার উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় লাভ করা যায়। সকল ধর্মের প্রতি পরম-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানের সম্রাটের পক্ষে এইরূপ উদার নীতি অনুসরণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

তীর্থকর, জিজিয়া প্রভৃতি বৈষম্যমূলক করের অবসান

সর্বধর্ম-সহিষ্ণুতা

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সাহিত্যের অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আবুল ফজল বর্ণিত একুশ জন রাজপণ্ডিতদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু। হিন্দুমন্দির স্থাপন, হিন্দুদের উৎসব উপলক্ষে মেলা বসান প্রভৃতির পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দিয়াছিলেন। এইভাবে আকবর প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ নীতির অবসান ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহারই অধীনে সর্বপ্রথম হিন্দু তথা অ-মুসলমান প্রজাবর্গ নাগরিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। আকবর ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ সেলিম রাজপুত তথা হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আকবরের এই নীতি পূর্ণ মাত্রায় সাফল্য লাভ করিলে ভারতের পরবর্তী ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করিত। আকবরের শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমান মিলিত চেষ্টার চরম সাফল্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হিন্দু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতির স্বাধীনতা

আকবরের হিন্দু-রমণী বিবাহ

আকবর কেবলমাত্র ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। হিন্দু সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা সেকালে এক অতি নিষ্ঠুর প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু বিধবাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্বক স্বামীর সহমৃতা হইতে বাধ্য করা হইত। আকবর এই বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ

আকবরের অপরাপর সংস্কার (Other Reforms of Akbar): উপরি-উক্ত সংস্কার ভিন্ন আকবর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোক ও অল্প বয়স্ক

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

পুরুষের মধ্যে যাহাতে বিবাহ ঘটিতে না পারে সেজন্য আকবর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর এ-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। তিনি বহু-বিবাহ প্রথারও সমর্থন করিতেন না।

বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ নিবিদ্ধকরণ

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Akbar) : যে রাজগণ তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য এবং জনহিতৈষণার দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন, মুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর তাঁহাদের অন্যতম। আকবর ছিলেন একাধারে সাহসী বীর, অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সেনাপতি, প্রজারঞ্জক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। বিজেতা হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। তিনি নিজ চরিত্রের মাধুর্য এবং কার্য-নিপুণতায়, সর্বোপরি তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের দ্বারা প্রজাবর্গের অন্তর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ছিলেন। ন্যায় এবং সততার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। পরচরিত্র বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মত মানসিক উৎকর্ষ ও উদারতা আকবরের ছিল। পরগুণগ্রাহিতা, অপরকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিবার মত মনোবলও তাঁহার ছিল। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণে তিনি আনন্দ পাইতেন। রাজকর্তব্যের এক অতি উচ্চ আদর্শও তিনি অনুসরণ করিতেন।

চরিত্র

আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অপরের মুখে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থাদি শ্রবণ করিয়া তিনি স্মরণ রাখিতে পারিতেন। তিনি সকল ধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রাজসভা ফৈজী, আবুল ফজল, দেবী, পুরুষোত্তম, ভানুচন্দ্র, হরিবিজয়, বিজয়সেন, একোয়াভাইভা, মনসেরেট্ প্রভৃতি হিন্দু, পারসিক, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনীষীদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

শাসক হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভাবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গঠন করিয়াছিলেন, সংগঠনী প্রতিভা দ্বারা উহাকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। শাসনকার্যের ক্ষুদ্রতম বিষয়ও আকবরের দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবর বুঝিয়াছিলেন ভারতবর্ষে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের একমাত্র শর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমান অখণ্ড ও অকপট আনুগত্য লাভ। তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের ন্যায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন নাই। হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করিয়া সমগ্র মধ্যযুগে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় সম্রাটের মর্যাদালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাম্রাজ্য সংগঠন

আকবরের শাসননীতি ছিল যেমন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তেমনি ধর্ম-নিরপেক্ষ। তাঁহার শাসনাধীনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ধর্ষ

রাজপুত জাতি আকবরের বিশ্বস্ত মিত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। শাসনব্যবস্থায় হিন্দুগণ উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতানগণের ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া আকবর সকলের প্রতি সমব্যবহার দ্বারা প্রজাবর্গের অন্তর জয় করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে ক্রমে বিভেদ দূর করিয়া আকবর জাতীয় ঐক্যের যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে অনুসৃত হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। আকবরের শাসন হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র ভারতবাসীর অকপট, স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় এবং পারসিক-আরবীয় (Perso-Arabic) শাসন-নীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। আকবর শের শাহের আমলের রাজস্বনীতি, হিন্দুগণের প্রতি প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, শাসনব্যবস্থায় হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ, প্রজার মঙ্গলসাধন প্রভৃতির অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু দেশ ও জনসমাজের হিতসাধনে গ্রহণযোগ্য তাহা আকবর গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

শাসনদক্ষতা

জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন

আকবর অ-মুসলমানদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজাকেই ধর্মপালনের চরম স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক সংস্কারগুলিও উল্লেখযোগ্য। বলপূর্বক সতীদাহের নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিবার জন্য কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহমরণে বাধ্য করা নিষিদ্ধ বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু-সৈনিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করিবার রীতি তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রথা প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন সংস্কার

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল। হুমায়ুনের সমাধি, ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদাদি প্রভৃতি আকবরের স্থাপত্য-শিল্পানুরাগের নিদর্শন-স্বরূপ। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু চিত্রশিল্পিগণ পারসিক চিত্রশিল্পে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।*

স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্র-শিল্প

আবুল ফজলের মতে আকবর স্বয়ং নূতন নূতন প্রাসাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু কেল্লা, প্রমোদভবন, মিনার, সরাইখানা, বিদ্যালয় তাঁহার নির্মাণ-শিল্পপ্রীতি ও জনকল্যাণের ইচ্ছার পরিচায়ক। বুলন্দ-দরওয়াজা, পাঁচ-মহল প্রভৃতি আকবরের স্থাপত্য-শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আবুল ফজল প্রদত্ত একুশ জন প্রথম পর্যায়ের মনীষীদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু।

*"The ancient art of Indian painting which had always continued to exist, received a new direction from Akbar who induced the Hindu artists to learn Persian technique and imitate Persian style." Vide, Smith's *Oxford History of India*, p. 373.

তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন আকবরের রাজসভার সঙ্গীত-শিল্পী। আর আবুল ফজল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। ডক্টর স্মিথ্ তাঁহাকে ফ্রান্সিস্ বেকন (Francis Bacon)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আবুল ফজল 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশদ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নল-দময়ন্তী উপাখ্যান ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিজাম-উদ্দিন ও বদাউনী আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের আদেশে কথাসরিৎসাগর, রামায়ণ-মহাভারত, অথর্ববেদ, হরিবংশ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বীরবল ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাকবি। তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতি হিন্দি কবিগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। আকবর তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা, রাজকীয় মর্যাদা, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম

আকবরের শেষ জীবন (Last days of Akbar): আকবরের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সুখের ছিল না। তাঁহার প্রিয় সুহৃদ আবুল ফজলের মৃত্যু (১৫৯৫), পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ, পোর্তুগীজদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নানাকারণে আকবরের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহ এবং মন যখন ভারাক্রান্ত এমন সময়ে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭ই অক্টোবর)।

মৃত্যু (১৬০৫)

———

অষ্টম অধ্যায়

জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান
(Jahangir & Shah Jahan)

জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ (Accession of Jahangir): আকবরের মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র সেলিম জীবিত। সেলিম আকবরের জীবদ্দশায় সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবর পুত্রকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেলিম আকবরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আবুল ফজলকে হত্যা করাইয়াছিলেন। এই সকল কারণে আকবর সেলিমের প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেলিমের পুত্র খুস্‌রভ্‌ ছিলেন আকবরের প্রিয়পাত্র। মানসিংহ ও অপরাপর অভিজাতগণ বিদ্রোহী সেলিমের পরিবর্তে খুস্‌রভ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সাধারণ্যে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, আকবর হয়ত খুস্‌রভ্‌কেই সিংহাসনাধিকার দান করিয়া যাইবেন। কিন্তু আকবর শেষ পর্যন্ত পুত্র সেলিমের দাবিই স্বীকার করিয়া নিজ পোশাক ও তরবারি উত্তরাধিকারের চিহ্নস্বরূপ সেলিমকেই দিয়া গিয়াছিলেন।

সেলিমের বিদ্রোহ: উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা

আকবর কর্তৃক সেলিম উত্তরাধিকারী মনোনীত

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে (অক্টোবর ২৪) সেলিম 'নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ গাজী' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গীর বুদ্ধি-বিবেচনা বা শিক্ষার দিক দিয়া সম্রাটপদের যোগ্য ছিলেন। সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই জাহাঙ্গীর ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত ত্রিশ গজ লম্বা একটি সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ হইতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিলেন। বিচারপ্রার্থী যে-কোন ব্যক্তি এই শিকল টানিলেই তাঁহার প্রার্থনা সম্রাটের নিকট পৌঁছাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বারোটি আইনও জারি করা হইয়াছিল। এই সকল আইন বা 'দস্তুর-উল্‌-আমল' তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে মানিয়া চলা হয় সে-বিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দু ও অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে মুক্তহস্তে দান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইবারও চেষ্টা করিলেন। যে-সকল অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীর তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। সম্রাট আকবরের আমলের রাজকর্মচারীদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও তিনি ত্রুটি করিলেন না।

সিংহাসনারোহণ: ন্যায়-বিচারের জন্য শিকলের ব্যবস্থা

বারোটি আইন জারি

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের পুত্র খুসরু বা খুস্‌রুভ্‌ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মথুরার হুসেন বেগ, লাহোরের আব্দুর রহিম, শিখগুরু অর্জুন তাঁহাকে সাহায্য দান করেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং সসৈন্যে নিজপুত্রের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। খুস্‌রুভ্‌ জাহাঙ্গীরের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে স্বভাবতই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গসহ ধৃত হইলেন। খুস্‌রুভ্‌কে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং বন্দিদশায় তাঁহার মৃত্যু হইল। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন খুস্‌রুভ্‌কে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই অদূরদর্শিতার ফলে শিখজাতি জাহাঙ্গীরের চিরশত্রুতে পরিণত হইল।

খুসরু বা খুস্‌রুভের বিদ্রোহ দমন

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নামে এক অসামান্যা রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। মেহেরুন্নিসা ছিলেন মির্জা গিয়াস বেগ নামে জনৈক ইরানীর কন্যা। প্রথমে আলি-কুল বেগ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীর আলি-কুল বেগকে 'শের আফগান' উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায় জায়গীর দান করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শের আফগান উদ্ধত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। শের আফগান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। মেহেরুন্নিসার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার নাম হয় 'নূরজাহান' (Light of the World)। কেহ কেহ মনে করেন যে, জাহাঙ্গীর পূর্ব হইতেই মেহেরুন্নিসার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

মেহেরুন্নিসার সহিত বিবাহ—মেহেরুন্নিসার 'নূরজাহান' নামকরণ

নূরজাহান অসামান্যা রূপবতী মহিলাই ছিলেন না, ফারসী সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতিতেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহের পর হইতে নূরজাহান শাসনব্যবস্থায় এক অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। তাঁহার ভ্রাতা আসফ্‌ খাঁ এবং তাঁহার পিতা উভয়েই রাজসভার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তদুপরি নূরজাহান তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ার-এর বিবাহ দিয়াছিলেন।

নূরজাহানের চরিত্র ও শাসনব্যবস্থায় প্রভাব

জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার (Jahangir's Conquest): জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের আফগান দলপতিগণ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন নাই। তদুপরি পুনঃপুনঃ শাসনকর্তা পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপনের

ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্‌লাম খাঁ ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা।

বাংলাদেশের আফগান বিদ্রোহ দমন

এই সময়ে বাংলার আফগান জমিদারগণ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিলেন। মুঘল শক্তির সহিত পুনরায় যুঝিয়া তাঁহারা বাংলাদেশে আফগান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। আফগান নেতা ঈশা খাঁর পুত্র উস্‌মান খাঁর নেতৃত্বে বাংলার আফগান অভিজাতগণ মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুরু করিলেন এবং 'ভদ্রক' নামক স্থানে প্রথমে মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করিতেও সক্ষম হইলেন। কিন্তু ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে উস্‌মান পরাজিত ও নিহত হইলেন। উস্‌মানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আফগান শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইল এবং বাংলাদেশ মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল।

আকবর চিতোর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেবারের বীরকেশরী রাণা প্রতাপ মুঘল প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ মুঘল অধিকার হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেবারের রাণা ছিলেন রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ। জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়াই মেবারের বিরুদ্ধে আকবর-অনুসৃত যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি যুবরাজ পর্‌বেজকে অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হইল। অতঃপর জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করিলেন। মহাবৎ খাঁ অমর সিংহকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু ইহার পর বারবার সেনাপতি পরিবর্তনের ফলে মেবারকে পদানত করা সম্ভব হইল না। অবশেষে সম্রাটের

মেবার বিজয় (১৬১৫)

তৃতীয় পুত্র খুর্‌রমের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হইলে অমর সিংহ পরাজিত হইলেন। অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র করণ সিংহ দিল্লী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাঙ্গীর বিজিত শত্রুর প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শনে কার্পণ্য করিলেন না। অমর সিংহকে চিতোর ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং অতি উদার শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। যুবরাজ করণ সিংহ পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীরের এই রাজপুত নীতি তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পূর্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তিনি অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ করণ সিংহের প্রতি যে উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এমন কি, মেবারের রাণার আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়া জাহাঙ্গীর এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি অমর সিংহ ও তাঁহার পুত্র করণ সিংহের মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়া আগ্রার মুঘল উদ্যানে স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাংড়া বা নগরকোট দুর্গ জয়। উত্তর-পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য

কাংড়া বিজয় (১৬২০)

কাংড়া দুর্গটি ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তজা খাঁকে কাংড়া জয় করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ

হইল। অবশেষে খুর্‌রমের নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর অবরোধের পর এই দুর্গটি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অসীরগড় দুর্গ জয় করিবার পর আকবর সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ গ্রহণের পূর্বেই যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহ দমনের জন্য উত্তর-ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া পিতার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে আহ্‌ম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। দীর্ঘ বিশ বৎসরের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল। মালিক অম্বর মূলত হাব্‌সী জাতির লোক ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যেই স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ-ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। শাসনকার্য, যুদ্ধপরিচালনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সর্বদিক দিয়াই মালিক অম্বর নিজ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি টোডরমলের রাজস্বনীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মুঘলশক্তিকে প্রতিহত করিতে হইলে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন এই কথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। কেবলমাত্র ভাড়াটিয়া মুসলমান সৈন্যের দ্বারা মুঘলশক্তি প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি দুর্ধর্ষ মারাঠা সৈনিকদের আহ্‌ম্মদনগরের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতেই মারাঠাগণ সর্বপ্রথম 'গরিলা যুদ্ধকৌশল' (guerilla method of warfare) শিক্ষা করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রাধান্য বিস্তার মালিক অম্বর কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল।

মালিক অম্বর

জাহাঙ্গীর আহ্‌ম্মদনগরের সহিত এক দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। আকবর আহ্‌ম্মদনগরের একাংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরাংশে নিজামশাহী বংশের দ্বিতীয় মুর্তজা তখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। আহ্‌ম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর আহ্‌ম্মদনগরের হৃত রাজ্যাংশ পুনরধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল কর্মচারিগণের অযোগ্যতার সুযোগে তিনি মুঘলগণ কর্তৃক আহ্‌ম্মদনগরের হৃত অংশ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুর্‌রমকে মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে খুর্‌রম মালিক অম্বরকে পরাজিত করিয়া আহ্‌ম্মদনগরের দুর্গ এবং বালাঘাট অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিস্তৃত ছিল উহা অপেক্ষা এক মাইলেরও অধিক বিস্তার লাভ

জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা

সাময়িক সাফল্য

করিল না। জাহাঙ্গীর মালিক অম্বরের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া খুর্‌রমকে 'শাহ্‌জাহান' (*Lord of the World*) উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পর মালিক অম্বর দমিলেন না। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতাচুক্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় মুঘল-অধিকৃত স্থান দখল করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বুরহানপুর অবরোধ করিলে শাহ্‌জাহানকে পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করা হইল। মালিক অম্বর পরাজিত হইলেন, আহ্‌মদনগরের নূতন রাজধানী খর্‌কী মুঘলবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। মালিক অম্বর বুরহানপুরের অবরোধ উঠাইয়া লইতে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বিজিত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সাহায্য লইয়া মালিক অম্বর আবার বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্‌জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিলেন। মালিক অম্বর ও শাহ্‌জাহানের যুগ্মবাহিনী বুরহানপুর আক্রমণ করিল। জাহাঙ্গীর যুবরাজ পর্‌বেজ ও মহাবৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্যের দিকে এক বিশাল বাহিনীসহ প্রেরণ করিলে শাহ্‌জাহান বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন বাধ্য হইয়া মালিক অম্বর যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুকাল পর মহাবৎ খাঁকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার পর দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য বিস্তারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

আহ্‌মদনগরের সহিত দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের বাণিজ্যপথ ছিল। ইহা ভিন্ন, কান্দাহারের রাজনৈতিক গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। এই কারণে এই স্থানের অধিকার লইয়া মুঘল ও পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই গোলযোগের সৃষ্টি হইত। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুস্‌রভ্ বা খুস্‌রু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সেই সুযোগে পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস্ কান্দাহার আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন। সুচতুর শাহ্ আব্বাস্ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়া মুঘল সম্রাটের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যেই দৌত্য বিনিময় হইল। একাদিক্রমে চারিবার পারস্য-সম্রাটের নিকট হইতে জাহাঙ্গীরের নিকট দূত প্রেরিত হইল। এইভাবে জাহাঙ্গীর যখন পারস্য-সম্রাট কর্তৃক কান্দাহার আক্রমণের কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে (১৬২২) আকস্মিকভাবে শাহ্ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করিয়া উহা জয় করিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে নূরজাহান নিজ জামাতা এবং জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছেন। শাহ্‌জাহান এমতাবস্থায় কান্দাহারের ন্যায় দূরদেশে যুদ্ধ করিতে যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বিমাতা নূরজাহানের ক্রীড়নক পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

পারস্য-সম্রাট কর্তৃক কান্দাহার জয়

করা-ই স্থির করিলেন। শাহ্‌জাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং পর্‌বেজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন স্থির করিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌রিয়ারকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা স্থির হইল। কিন্তু বিদ্রোহী শাহ্‌জাহান আহ্‌মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিয়া বুরহানপুর আক্রমণ করিলে জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যের দিকে অধিক মনোযোগ দিলেন। কাজেই কান্দাহার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা আর কার্যকরী করা সম্ভব হইল না।

কান্দাহার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

এদিকে শাহ্‌জাহান মুঘল রাজকর্মচারী খান-ই-খানান আব্দুল রহিমের সাহায্যলাভ করিয়া প্রথমেই আগ্রা দখল করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু যুবরাজ পর্‌বেজ ও মহাবৎ খাঁর হস্তে দিল্লীর নিকটবর্তী বালোচপুর নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৬২৩)। মুঘলবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং রাজমহল ও পাটনা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদ অবরোধ করিলে মহাবৎ খাঁর হস্তে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এলাহাবাদ অধিকার করিতে ব্যর্থকাম হইয়া শাহ্‌জাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। সেখানে মালিক অম্বরের সহিত যোগদান করিয়া তিনি বুরহানপুর অবরোধ করেন। পর্‌বেজ ও মহাবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলে শাহ্‌জাহান আত্মসমর্পণ করেন এবং মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উদারহৃদয় জাহাঙ্গীর অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেন।

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ

শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ-দমনে মহাবৎ খাঁর কৃতিত্বে নূরজাহান সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। পর্‌বেজ ও মহাবৎ খাঁ অত্যন্ত শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া নূরজাহান মহাবৎ খাঁকে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে ক্রমেই মহাবৎ খাঁ নূরজাহানের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। সাময়িকভাবে তিনি জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু নূরজাহানের কৌশলে উভয়েই বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। রোটাস নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার অনুচরদের সাহায্যে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে মহাবৎ খাঁ পলাইয়া গেলেন এবং শাহ্‌জাহানের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটিলে (১৬২৭) এক নূতন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে পর্‌বেজ ও খুসরু ইতিপূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ফলে, শাহ্‌জাহান ও জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ার উভয়েই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে এক আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭)

হকিন্স ও টমাস্ রো-এর দৌত্য (Embassies of Capt. William Hawkins & Thomas Roe) : ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের নিকট হইতে এক অনুরোধপত্র লইয়া জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। এই পত্রে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ জাহাঙ্গীরের নিকট ইংরাজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা চাহিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিন্সকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না। হকিন্সের ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইংরাজদের প্রার্থিত সকল সুযোগ-সুবিধা জাহাঙ্গীর মঞ্জুর করিলেন। হকিন্স মুঘল দরবারের রীতি-নীতি, আইন-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি বিশদ বিবরণ রচনা করিয়াছিলেন। হকিন্সের দৌত্য আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী হইলেও পোর্তুগীজদের বিরোধিতায় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হকিন্সের প্রাথমিক সাফল্য

পোর্তুগীজ বিরোধিতায় হকিন্সের দৌত্য বিফল

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ পুনরায় সার টমাস্ রো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা-ই ছিল এই দৌত্যের উদ্দেশ্য। পোর্তুগীজ বণিকগণ ইংরাজ বণিকদের কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের পক্ষপাতী ছিল না। তাহাদের বিরোধিতায় টমাস্ রো-এর কাজ বহুল পরিমাণে জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টায় টমাস্ রো ইংরাজ বণিকদের জন্য বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য-চালনার অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। টমাস্ রো এবং তাঁহার সহকারী এডোয়ার্ড টেরি উভয়েই জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন।

টমাস্ রো কর্তৃক নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ

জাহাঙ্গীরের চরিত্র (Character of Jahangir) : জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে অলস, ব্যভিচারী, আরামপ্রিয় ও অত্যাচারী শাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজ পিতা আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য এবং তাঁহার চরিত্রের অপকর্ষতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগ, সৌন্দর্য ও মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি অনেক পরিমাণে স্খালন করিয়াছিল, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। শাসন-সংক্রান্ত জটিলতম সমস্যা উপলব্ধি করিবার মত মানসিক ক্ষমতা তাঁহার ছিল। অত্যধিক মাদকদ্রব্যাদি সেবনের ফলে জীবনের শেষভাগে অবশ্য তাঁহার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি সম্রাটসুলভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক

শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি অপর কোন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না এবং কেহ তাঁহার মতের বিরোধিতা করিলে তিনি তাহাও সহ্য করিতেন না। কিন্তু রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার এই উম্ধত প্রকৃতির কতকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সামরিক অভিযানের যাবতীয় পরিকল্পনা জাহাঙ্গীর স্বয়ং প্রস্তুত করিতেন। সেনাপতি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিচার-ব্যাপারে তিনি ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। ধনী, দরিদ্র সকলেই যাহাতে তাঁহার নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হইতে পারে সেজন্য তিনি ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত একটি সোনার শিকল প্রস্তুত করিয়া উহা আগ্রার প্রাসাদ হইতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। এই শিকল টানিলেই বিচারপ্রার্থীর আবেদন সম্রাটের নিকট পেঁৗছিবার ব্যবস্থা করা হইত। জাহাঙ্গীরই মুঘলযুগের সর্বপ্রথম লিখিত বারোটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সর্বময় কর্তৃত্ব ও ঔন্ধত্য

বিচার বিষয়ে ন্যায় ও সততা

জাহাঙ্গীরের অন্তর ছিল শিশু অপেক্ষাও কোমল। আত্মীয়-স্বজন এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও তাঁহার দয়া ও মমত্ববোধের সীমা ছিল না, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হইলে তিনি নৃশংসতার চূড়ান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন এবং পারসিক ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি নিজ জীবন-স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি অকপটে লিপিবন্ধ হইয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত প্রভৃতি পাঠে তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। চিত্রশিল্পের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজসভায় হিন্দি কবি এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজ্ঞানী ও সাধুসন্ত যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার মত মানসিক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল। আগ্রার প্রাসাদের দেওয়াল-চিত্রগুলির কতকাংশ জাহাঙ্গীর স্বয়ং অঙ্কন করিয়াছিলেন। স্থাপত্য-শিল্পেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি ছিল অসাধারণ। ধর্মব্যাপারে তিনি ছিলেন এক রহস্যস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন্ ধর্ম পালন করিতেন সে-বিষয়ে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ও ধর্মোন্মত্ততার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিলেন। কোন সময়ে পরধর্মের প্রতি চরম উদারতা প্রদর্শন, কখনও বা অসহিষ্ণুতাবশত চরম নির্যাতন ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন গুণাগুণ

এইভাবে নানাবিধ সদ্‌গুণের সহিত জাহাঙ্গীরের চরিত্রের অপকর্ষতাও মিশিয়াছিল। এই কারণে টেরি প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনায় তাঁহাকে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণাবলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলা হইয়াছে।*

বিরুদ্ধ গুণের সংমিশ্রণ

*"Now for the disposition of that king, it ever seemed unto me to be composed of extremes : for sometimes he was barbarously cruel and at other times he would seem to be exceedingly fair and gentle." *Edward Terry*, Vide, *Oxford History of India*, Smith, p. 387.

শাহ্‌জাহান, ১৬২৮ (Shah Jahan): কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে (অক্টোবর, ১৬২৭) শাহ্‌জাহান ও শাহ্‌রিয়ার-এর মধ্যে এক উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুকালে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগে নূরজাহানের সাহায্যে যুবরাজ শাহ্‌রিয়ার লাহোর হইতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শাহ্‌রিয়ার ছিলেন নূরজাহানের জামাতা। অপর পক্ষে শাহ্‌জাহান নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর কন্যা মমতাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আসফ্ খাঁ স্বভাবতই শাহ্‌জাহানের সিংহাসনলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব জটিলতর হইয়া উঠিল। এদিকে আসফ্ খাঁ শাহ্‌জাহান আগ্রা পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত সিংহাসন যাহাতে শূন্য না থাকে সেজন্য খসরুর পুত্র দাওর বক্স্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। যুবরাজ শাহ্‌রিয়ার নূরজাহানের সাহায্যেও আসফ্ খাঁর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। আসফ্ খাঁর হস্তে তিনি পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া সিংহাসন লাভের অযোগ্য করিয়া রাখা হইল। শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রা পৌঁছিবার মধ্যপথ হইতেই আদেশ দিলেন যে, দিল্লীর সিংহাসন দাবি করিতে পারে এইরূপ যাবতীয় পুরুষকে যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয়। আসফ্ খাঁর তৎপরতায় এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইল। একমাত্র দাওর বক্স্ পারস্য দেশে পলাইয়া গিয়া প্রাণে বাঁচিলেন। এইভাবে রক্তস্নানের পর শাহ্‌জাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

শাহ্‌জাহানের সিংহাসনলাভ (১৬২৮)

তাঁহার বিপত্তি (His difficulties): সিংহাসন দাবি করিতে পারে এইরূপ কোন উত্তরাধিকারীকে জীবিত অবস্থায় না রাখিয়া শাহ্‌জাহান যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন আপাতদৃষ্টিতে সব কিছুই সহজ ও শান্ত বলিয়া মনে হইল। পরম আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া শাহ্‌জাহান শাসনকার্য শুরু করিলেন। প্রথমেই তিনি আসফ্ খাঁ ও মহাবৎ খাঁকে উপযুক্ত সম্মানে পুরস্কৃত করিলেন। আসফ্ খাঁ সম্রাটের 'ওয়াজীর' বা মন্ত্রিপদে উন্নীত হইলেন আর মহাবৎ খাঁ আজমীরের শাসনকর্তার পদ লাভ করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত জাতির বুন্দেলা নেতা জুঝর সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য সহজেই দমন করা হইল, কিন্তু জুঝর সিংহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হইল না। কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য বুন্দেলাগণ আর কোন বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই।

বুন্দেলা নেতা জুঝর সিংহের বিদ্রোহ

শাহ্‌জাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে আফগান নেতা খান জাহান লোদী আহ্‌মদনগরের নিজামশাহী সুলতান নিজাম-উল্-মুল্‌কের সহিত যোগদান করিয়া

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহ্‌জাহান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া আফগান নেতা খান জাহান একপ্রকার সমভাবেই মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অবশেষে কালিঞ্জরের নিকটে তাল সেহণ্ডা (Tal Sehonda)-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং নৃশংসভাবে নিহত হইলেন।

খান জাহানের বিদ্রোহ

দুর্ভিক্ষ (Famine): শাহ্‌জাহানের সিংহাসনলাভের দুই বৎসর পর (১৬২৮-৩০) দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজসভার ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এই দুই স্থানের জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা জানিতে পারা যায়। 'সামান্য রুটির জন্য মানুষ বিক্রয় করিতেও লোকে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই মূল্যেও কোন ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস অবধি খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণে মানুষের কোন দ্বিধা ছিল না। মৃতদেহের স্তূপে রাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে এক অতি উর্বর শস্য-শ্যামল দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।'* ইংরাজ পর্যটক পিটার মাণ্ডি (Peter Mundy) স্বচক্ষে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায়ও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। হতভাগ্যদের মৃতদেহ এমনভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল যে, পিটার মাণ্ডি ক্ষুদ্র একটি তাঁবু খাটাইবার মত স্থানও পান নাই।

দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের চরম দুর্দশা

পিটার মাণ্ডির বর্ণনায় শাহ্‌জাহান দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাবর্গের সাহায্যার্থে কোন কিছু করেন নাই বলা হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে শাহ্‌জাহান সরকারী ব্যয়ে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মোট সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব মকুব করিয়া দিয়াছিলেন। জায়গীরদারগণকেও অনুরূপ উদারতা প্রদর্শনের জন্য সম্রাটের অনুরোধ জানান হইয়াছিল। এই সকল তথ্য 'বাদশাহ্‌-নামা' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। সার্‌ রিচার্ড টেম্পল্‌ (Sir Richard Temple) পিটার মাণ্ডির বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন এবং সার্‌ রিচার্ড টেম্পল্‌-এর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর স্মিথ্‌ মুঘল যুগ অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসী অধিক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল

শাহ্‌জাহান কর্তৃক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্য দান

---

* "The inhabitants of these two countries (the Deccan and Gujrat) were reduced to the direct extremity, Life was offered for a loaf but none would buy; rank was to be sold for a cake but none cared for it...Destitution at last reached such a pitch that men began to devour each other, and the flesh of a son was preferred to his love. The number of the dying caused obstruction on the roads..." Abdul Hamid Lahori, Vide, Smith's *Oxford History of India*, p. 393. *An Advanced History of India*, p. 472.

এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। রিচার্ড টেম্পল্ ও ভক্টর স্মিথের মন্তব্য পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, বলা বাহুল্য।

পোর্তুগীজ দমন (Suppression of the Portuguese): ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া পোর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের সাতগাঁ বা সাতগাঁও নামক স্থানে নদীর তীরে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ক্রমে তাহারা হুগলী নামক স্থানে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। পোর্তুগীজ বণিকগণ স্বভাবতই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। শুল্কে ফাঁকি দিয়া বাণিজ্য পরিচালনা, নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের উপর অত্যাচার, বলপূর্বক ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং সুযোগ পাইলে যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় অপকর্মে তাহারা ছিল সিদ্ধহস্ত।

পোর্তুগীজ বণিকদের আচরণ

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাহ্‌জাহান পোর্তুগীজদের অন্যায় অত্যাচারের বিষয় অবগত ছিলেন। শাহ্‌জাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত তখন মমতাজমহলের দুইজন ক্রীতদাসী বালিকাকে হুগলীর পোর্তুগীজগণ বলপূর্বক লইয়া গিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পোর্তুগীজদের দমন করিবার তাঁহার সুযোগ হইল। শাহ্‌জাহান বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পোর্তুগীজদের উচিত শিক্ষা দিবার আদেশ করিলেন। কাসিম খাঁর পুত্র এনায়েৎ-উল্লাহ্ পোর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী আক্রমণ করিলেন এবং তিন মাসেরও অধিককাল যুদ্ধ করিয়া পোর্তুগীজদের সমুচিত শিক্ষা দিলেন। দশ হাজার পোর্তুগীজের মৃত্যু হইল, ৪,৪০০ মুঘলবাহিনী কর্তৃক ধৃত হইল এবং ইহাদিগকে বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য হইল আর অনেকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া প্রাণ হারাইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদিগকে পুনরায় হুগলীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

পোর্তুগীজদের শাস্তিবিধান

শাহ্‌জাহানের ধর্মনীতি (Religious policy of Shah Jahan): সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সর্ব-ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি মোটামুটিভাবে জাহাঙ্গীরের আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। যদিও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে হিন্দুমন্দিরাদি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল তথাপি তাঁহার আমলে হিন্দু তথা অপর কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করা শাসন-নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ধর্মবিষয়ে উদারতার জন্যই বরঞ্চ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পূর্বে অনুসৃত পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তেমন ভবিষ্যতে ধর্মান্ধনীতি ও পরধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের ইঙ্গিত দিয়াছিল। ঔরংজেবের আমলে সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার পূর্বে-ছায়াপাত শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি পরিত্যক্ত

সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি (Policy of Imperial Expansion) :

(১) **দাক্ষিণাত্য-নীতি (Deccan Policy) :** শাহ্‌জাহান চিরাচরিত মুঘল নীতির অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলি জয়ে মনোনিবেশ করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-নীতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির পশ্চাতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমানদের তিনি বিধর্মী বলিয়া মনে করিতেন। 'সিয়া' সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধন ছিল তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক

মুঘলসম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের সুলতানী সাম্রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খান্দেশ এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। অসীরগড় জয় করিবার কালে যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে অসীরগড় জয় সমাপ্ত করিয়াই দাক্ষিণাত্য-বিজয় তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে আহ্‌ম্মদনগর জয়ের চেষ্টা মালিক অম্বর কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যুঝিয়াও আকবরের রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিস্তৃত ছিল তদপেক্ষা অতি সামান্যও জাহাঙ্গীর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

আকবর ও জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়

কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল হইতে মুঘল সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য-নীতির এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে আহ্‌ম্মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অম্বরের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ফতে খাঁ ছিলেন মালিক অম্বরের অযোগ্য পুত্র। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই আহ্‌ম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবাহিনী আহ্‌ম্মদনগরের পরিন্দা নামক দুর্গটি জয় করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হয়। বস্তুতপক্ষে মালিক অম্বরের ন্যায় স্বাধীনতাকামী কোন মন্ত্রীর অধীনে আহ্‌ম্মদনগর মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিতে হয়ত সক্ষম হইত। কিন্তু ফতে খাঁ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুলতান নিজাম-উল্‌-মুল্‌ককে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং মুঘলসম্রাট শাহ্‌জাহানের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। শাহ্‌জাহানের ইঙ্গিতে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজাম-উল্‌-মুল্‌ককে হত্যা করাইয়া তাঁহার দশ বৎসরের নাবালক পুত্র হুসেন শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন

শাহ্‌জানের আমলে মুঘল সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য নীতির পরিবর্তন

ফতে খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা

করিয়া নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ফতে খাঁ কেবল মুখেই মুঘলসম্রাটের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হইয়া উঠিলে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবাহিনী দৌলতাবাদ দুর্গটি অবরোধ করিল। প্রথমে তিনি মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, কিন্তু পরে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দুর্গটি মুঘল সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

উৎকোচ গ্রহণপূর্বক ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ

মালিক অম্বরের অপদার্থ পুত্র ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ আহ্‌ম্মদনগর সুলতানির অবসান ঘটাইল। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌ম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং নিজামশাহী বংশের শেষ সুলতান নাবালক হুসেন শাহ্‌ গোয়ালিওর দুর্গে জীবনের অবশিষ্ট কাল বন্দিদশায় কাটাইলেন।

আহ্‌ম্মদনগরের মুঘল সাম্রাজ্যভুক্তি

আহ্‌ম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া শাহ্‌জাহান গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বিজাপুরের ঐশ্বর্যশালী আদিলশাহী বংশের স্বাধীনতা শাহ্‌জাহানের নিকট অসহ্য ছিল। এই সময়ে মারাঠা নেতা শাহ্‌জী (শিবাজীর পিতা) নিজামশাহী বংশের এক বালককে আহ্‌ম্মদনগরের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে শাহ্‌জাহান জানিতে পারিলেন যে, বিজাপুরের সুলতান আহ্‌ম্মদনগরের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান করিতেছেন। শাহ্‌জাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণকে শাহ্‌জীর পক্ষ অবলম্বন না করিতে আদেশ দিলেন এবং মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিয়মিত করদানে চুক্তিবন্ধ হইতে বলিলেন।

শাহ্‌জী কর্তৃক আহ্‌ম্মদনগরের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

শাহ্‌জাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘল সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বিজাপুরের সুলতান কাপুরুষতা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণদান শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তখন মুঘল সেনাবাহিনী তিন দিক হইতে বিজাপুর আক্রমণ করিল। বিজাপুর রাজ্যের যে-সকল স্থানে মুঘলবাহিনী প্রবেশ করিল সেই সকল স্থান শ্মশানে পরিণত হইল। অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা ও ততোধিক নর-নারীকে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করিয়া মুঘলবাহিনী বিজাপুর সুলতানের স্বাধীনতা-স্পৃহার উপযুক্ত শাস্তি দান করিল। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ্‌ শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। আহ্‌ম্মদনগর রাজ্যটি

গোলকুণ্ডা কর্তৃক বিনা যুদ্ধে মুঘল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার

বিজাপুরের বিরুদ্ধে শাহ্‌জাহানের অভিযান

বিজাপুর সুলতান ও মুঘলসম্রাটের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। পঞ্চাশটি পরগণা বিজাপুর সুলতানের রাজ্যভুক্ত হইল। ক্ষতিপূরণ এবং কর হিসাবে কুড়ি লক্ষ মুদ্রা বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে আদায় করা হইল। বিজাপুর সুলতানকে বাৎসরিক কোন নির্দিষ্ট করদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইল না বটে, কিন্তু মুঘলসম্রাটকে প্রতি বৎসর উপঢৌকন প্রেরণের শর্ত তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল।

বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার

দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের চারিটি প্রদেশ—খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গানা ও দৌলতাবাদ যুবরাজ ঔরংজেবের অধীনে স্থাপন করা হইল। ১৬৩৬ খ্রীঃ হইতে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নাসিকের নিকটে বাগ্‌লানা (Baglana) নামক স্থানটি দখল করেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নী জাহানারা আগুনে পুড়িয়া মরণাপন্ন হইলে ঔরংজেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। কি কারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য শাসন (১৬৩৬-৪৪)

ঔরংজেবের পদচ্যুতি (১৬৪৪)

কয়েক বৎসর পর শাহ্জাহান পুনরায় ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইবার ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। কারণ এই দুই রাজ্যের প্রায় স্বাধীন মর্যাদাভোগ ঔরংজেবের মনঃপূত ছিল না। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর সুলতানগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করাই ছিল সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত পরধর্ম-অসহিষ্ণু ঔরংজেবের আন্তরিক ইচ্ছা। তদুপরি এই দুই রাজ্যের অপর্যাপ্ত ধনরত্নের প্রতিও তাঁহার লোভ ছিল।

দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্তৃপদে ঔরংজেবের পুনর্নিয়োগ

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত কর অনাদায়ের অজুহাতে ঔরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে সম্রাট শাহ্জাহানের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মুঘলবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত দুর্বলচেতা গোলকুণ্ডা সুলতান কুতব শাহ্ শান্তির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ঔরংজেব সমগ্র গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া তিনি শান্তির প্রস্তাব এড়াইয়া গেলেন। এদিকে দারা ও জাহানারার পরামর্শে শাহ্জাহান ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার আদেশ দিলে ঔরংজেব বাধ্য হইয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি জেলা কুতব শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। সুচতুর ঔরংজেব নিজ পুত্র মহম্মদের সহিত কুতব শাহের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ গোলকুণ্ডার সিংহাসন লাভ করিবেন এই স্বীকৃতিও আদায় করিয়া লইলেন।

গোলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ (১৬৫৬)

বিজাপুর রাজ্যের সুলতান একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির ফলে তাঁহার স্বাধীন মর্যাদা তেমন ক্ষুন্ন হয় নাই। তিনি ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জিঞ্জী দুর্গটি দখল করেন এবং পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু সুলতান আদিল শাহের মৃত্যুর পর (১৬৫৬) তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র সুলতান হইলে বিজাপুর রাজ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে ঔরংজেব মীরজুম্‌লার সাহায্য লইয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭)। বিজাপুর মুঘলবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। সমগ্র বিজাপুর রাজ্যজয় যখন ঔরংজেবের প্রায় সমাপ্ত তখন শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবকে বাধ্য হইয়া বিজাপুর সুলতানের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে হইল। বিজাপুর সুলতান বিদর, কল্যাণী, পরীন্দা ও আরও কয়েকটি স্থান মুঘলদের সমর্পণ করিতে এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন।

বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ (১৬৫৭)

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না বা দাক্ষিণাত্যের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি শাসনকার্যের সুবিধার দিক দিয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল না। তদুপরি ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তাপদে নিযুক্ত ছিলেন তখন এতদঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাও নেহাত কম ছিল না। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা যে ছিল না, একথা বলা বাহুল্য। পররাজ্য-অপহরণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা এবং ধনরত্নের লোভই ছিল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর আক্রমণের প্রকৃত যুক্তি। যৌক্তিকতা বা নৈতিকতার দিক দিয়া যেমন এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করা যায় না, তেমনি বিজয়ের মুহূর্তে ঔরংজেবকে নিরস্ত করিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় এই দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত রাখাও যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। শাহ্‌জাহানের আমলে যে দাক্ষিণাত্য-নীতি অনুসৃত হইয়াছিল উত্তরকালে তাহাই ঔরংজেব অধিকতর দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্যকরী করিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতির সমালোচনা

(২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি (North-Western Frontier Policy): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২২) পারস্য-সম্রাট শাহ্ আব্বাস মুঘল সাম্রাজ্য হইতে কান্দাহার জয় করিয়া লইয়াছিলেন (৫৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পুনরায় শুরু হয়। কূটকৌশলে শাহ্‌জাহান কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা আলী মর্দানকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দ্বারা বশ করিয়া কান্দাহার দখল করিতে সমর্থ হন। পরবর্তী দশ বৎসর কান্দাহার মুঘলসম্রাটের অধীনে ছিল, কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করিলেন। শীতকালে

কূটকৌশলে কান্দাহার অধিকার

তুষারপাতহেতু শাহ্‌জাহান সময়মত সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন না, ফলে কান্দাহার রক্ষা করা সম্ভব হইল না। মুঘল শাসনকর্তা দৌলত খাঁ শত্রুহস্তে কান্দাহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৬৪৯)। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ ও ঔরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল (১৬৪৯), কিন্তু সেই চেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল। এইভাবে ১৬৫২ হইতে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইবার কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও বিফল হইল। দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্বও সাদুল্লা খাঁ ও ঔরংজেবের উপর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় অভিযানে শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কান্দাহার জয় করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার পর আর কোন মুঘলসম্রাট কান্দাহার জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের অভিযানের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

> শাহ্‌ আব্বাস কর্তৃক কান্দাহার পুনরধিকার

> কান্দাহার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা—১৬৪৯, ১৬৫২, ১৬৫৩

(৩) **মধ্য এশিয়া জয়ের চেষ্টা** (**Attempt at Conquest of Central Asia**) : কাফ্রিস্তানের উত্তরে অবস্থিত বাদাখ্‌শান্‌ এবং বখ্‌ নামক মধ্য-এশিয়াস্থ স্থানগুলি জয় করিবার ইচ্ছা শাহ্‌জাহানের পিতা ও পিতামহের ছিল। মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দ ছিল তৈমুরের রাজধানী। তৈমুর-বংশসম্ভূত মুঘলসম্রাটগণ স্বভাবতই বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয় করিয়া ক্রমে সমরকন্দ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। শাহ্‌জাহান পিতা-পিতামহের আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদ ও আলী মর্দান খাঁকে বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল এবং মুরাদ ও আলী মর্দান বখ্‌ ও বদাখ্‌শান্‌ অধিকার করিলেন। অল্পকাল পরে মুরাদ বখ্‌-এর আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। শাহ্‌জাহান ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁকে বখ্‌-এ প্রেরণ করিলেন। পর বৎসর (১৬৪৭) নব-বিজিত স্থানগুলির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ঔরংজেবকে এক সেনাবাহিনীসহ সেখানে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু দুর্ধর্ষ উজবেগদের পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ঔরংজেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তিনি বখ্‌ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারে মুঘল রাজকোষ হইতে সাড়ে চারি কোটি মুদ্রা ব্যয় এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

> বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ জয়

> বদাখ্‌শান্‌ ও বখ্‌ অধিকারে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন (**The Last days of Shah Jahan**) : সম্রাট শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না

করিয়াই তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারযুদ্ধ শুরু হয়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দারা ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ; দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুজা, ঔরংজেব ছিলেন তৃতীয় এবং মুরাদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আর জাহানারা ও রৌশনারা নামে তাঁহার দুই কন্যা ছিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্র-কন্যাগণ

জ্যেষ্ঠ-পুত্র দারা শিকোহ্‌ ছিলেন শাহ্‌জাহানের সর্বাধিক প্রিয়। শাহ্‌জাহানের মৃত্যুর পর দারা-ই সিংহাসন লাভ করিবেন ইহাই ছিল সকলের ধারণা। শাহ্‌জাহানও মনে মনে দারাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, চরিত্রের গুণ, অমায়িকতা, সর্বদিক দিয়াই দারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত, বাইবেল, সুফী ধর্মজ্ঞানীদের রচনা, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ট্যালমাদ্‌ প্রভৃতি সব কিছুই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত ছিল আকবরের ধর্মমতেরই অনুরূপ। তিনিও সর্বধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তিনি অসহিষ্ণু গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ববেদ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি ফার্‌সী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদা পিতৃস্নেহাধীনে থাকায় দারা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা কোন কিছুই ভালভাবে অর্জন করিবার সুযোগ পান নাই।

দারা

দ্বিতীয় পুত্র সুজা সুদক্ষ যোদ্ধা, তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক আরামপ্রিয়তা ও আলস্য তাঁহাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কূটকৌশল, সামরিক দক্ষতা, স্বার্থপরতা, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিভিন্ন দোষ-গুণের এক অত্যাশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। শাসনকার্যে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ সরল হৃদয়, উদার, সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু মাদকদ্রব্যে অত্যধিক আসক্ত হইয়া উঠায় তিনি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ

শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার কালে সুজা বাংলাদেশে, মুরাদ গুজরাটে এবং ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাই ছিলেন আগ্রায়। স্বভাবতই অপর তিন ভ্রাতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, হয়ত পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং দারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সংবাদ গোপন রাখিয়াছেন। সুজা নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে দারার পুত্র সুলেমান শিকোহ্‌ তাঁহাকে পরাজিত করেন। ফলে, সুজা বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে মুরাদ আহ্‌ম্মদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঔরংজেব তাঁহাকে কূটকৌশলে নিজ দলভুক্ত করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার এক চুক্তিও

সুজার পরাজয়

স্বাক্ষরিত হইল। ঔরংজেব ও মুরাদের যুগ্মবাহিনী ক্রমে উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদেশে যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খাঁ তাঁহাদিগকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের সমরবাহিনী আঁটিয়া উঠিতে পারিল না আর কাসিম খাঁ যুদ্ধে কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না। ফলে ঔরংজেবেরই জয় হইল। ধর্মাট-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঔরংজেবের মর্যাদা এবং স্পর্ধা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ের প্রান্তরে দারা শিকোহ্‌ এবং ঔরংজেবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে রাজপুত নেতা রামসিংহ দারার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। বিশ্বাসঘাতক মুঘল সেনাপতি খলিল উল্লাহ্‌ খাঁর পরামর্শে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দারা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে শুরু করিলেন। তাঁহার হস্তিপৃষ্ঠে হাওদা শূন্য দেখিয়া মুঘলবাহিনী যুদ্ধে দারার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রণকৌশলী ঔরংজেবের হস্তে দারা শেষ পর্যন্ত হয়ত পরাজিত হইতেন কিন্তু খলিল উল্লাহ্‌ খাঁর কুপরামর্শের ফলে দারা অতি সহজেই পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে-ই উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পর দারা, সুজা বা মুরাদের পক্ষে ঔরংজেবকে পরাজিত করিবার আর কোন সামর্থ্যই রহিল না। সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই ঔরংজেব হিন্দুস্তানের সিংহাসন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সরাসরি আগ্রায় উপস্থিত হইয়া আগ্রার দুর্গ অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহান ও ভগিনী জাহানারার শত অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও ঔরংজেব কোন আপস-মীমাংসায় রাজী হইলেন না। বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহানকে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ রাখিয়া ঔরংজেব স্বয়ং সিংহাসন দখল করিলেন।

ধর্মাট এর যুদ্ধ (১৫ই এপ্রিল, ১৬৫৮)

সামুগড়ের যুদ্ধ

শাহ্‌জাহান সিংহাসন-চ্যুত ও কারারুদ্ধ

আগ্রা অধিকার করিয়া ঔরংজেব কূটকৌশলে মুরাদকে বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। হতভাগ্য মুরাদ গোয়ালিওর দুর্গে দুই বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর ঔরংজেবের আদেশে নিহত হইলেন। সুজাও ঔরংজেবের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। খাজওয়ার যুদ্ধে (জানুয়ারি ৫, ১৬৫৯) তিনি ঔরংজেবের হস্তে পরাজিত হইয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মীরজুমলা কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরাকানে খুব সম্ভবত তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন। এদিকে দারার পক্ষে ঔরংজেবকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। দারা ও তাঁহার পুত্র সুলেমান দিল্লী হইতে লাহোর এবং তথা হইতে গুজরাটে পলায়ন করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা দারাকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিলে তিনি দাক্ষিণাত্যের

মুরাদের হত্যা

সুজার পলায়ন ও মৃত্যু

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সাহিত যোগদান করিয়া ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময়ে রাজপুতকুলকলঙ্ক যশোবন্ত সিংহ দারাকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করাইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারাকে কোন সাহায্যই দিলেন না। এদিকে ঔরংজেব দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এমতাবস্থায় দারাকে ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওরাই-এর যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া দারা সপরিবারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিবার পথে বোলান গিরিপথের অনতিদূরে দদর নামক স্থানে জীহন খাঁ নামে জনৈক আফগান দলপতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই জীহন খাঁকে পূর্বে একবার দারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইতে রক্ষা করিলেও সেই জীহন খাঁ-ই এখন তাঁহাকে মুঘলহস্তে সমর্পণ করিলেন। দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আনীত হইলে দারাকে প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত করা হইল। ভ্রাতৃহস্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতভাগ্য যুবরাজ দারার জন্য সেইদিন দিল্লীবাসী নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছিল। কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকিবার পর ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। (আগষ্ট ৩০,১৬৫৯)।

দারার সহিত দেওরাই-এর যুদ্ধ (১৬৫৯)

দারার হত্যা

এদিকে বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্জাহান ঔরংজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া দীর্ঘ আট বৎসর পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মরিয়া বাঁচিলেন।

শাহ্জাহানের মৃত্যু (১৬৬৬)

শাহ্জাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Shah Jahan's Character & Estimate): শাহ্জাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া একাধিক ইওরোপীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিক তাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, বিলাসপ্রিয় ও ব্যভিচারী বলিয়াছেন। টমাস্ রো, টেরী, বার্ণিয়ে, ডি লিয়েৎ প্রভৃতি ইওরোপীয় পর্যটক ও যাজকদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া ডক্টর স্মিথ্ও শাহ্জাহান সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল লেখকদের মন্তব্য যে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট তাহা নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই প্রমাণিত হইবে।

ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

শাহ্জাহান কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ধর্মবিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করেন নাই। খ্রীষ্টানদের প্রতি অত্যাচার, পোর্তুগীজদের প্রতি নির্মম ব্যবহার, হিন্দু মন্দিরাদি নির্মাণে বাধাদান প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের অপকর্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়াও শাহ্জাহানের চরিত্র ত্রুটিহীন ছিল না। সর্বোপরি সিংহাসন লাভ ও উহার নিরাপত্তার জন্য তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি

কিন্তু এই সকল ত্রুটি যেন আমাদের বিচার-বিবেচনাকে বিভ্রান্ত না করে। বিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে বিচার করিলে সিংহাসন নিরাপদ করিতে গিয়া শাহ্জাহান যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা নিন্দনীয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমসাময়িক ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর অপরাপর দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত যে একেবারে নাই, এমন বলা যায় না। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের মুসলমান যুগের ইতিহাসে এইরূপ হত্যাকাণ্ড নূতন ছিল না। ধর্মব্যাপারে অসহিষ্ণুতার জন্য পোর্তুগীজরাই যে দায়ী ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্বোপরি নূরজাহানের চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই সকল অবাঞ্ছিত পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। পোর্তুগীজ বণিকদের ধর্মের নামে অধর্মের অনুষ্ঠান, ভারতীয়দের বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং সুযোগ পাইলে জলদস্যুতা করা ও ধৃত ব্যক্তিদিগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা প্রভৃতি অপকর্মের ফলেই ইওরোপীয়দের প্রতি শাহ্জাহানের মনে সন্দেহ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি তেমন উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার রাজসভায় জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ তখনও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। অবশ্য ধর্মব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংকীর্ণতামুক্ত ছিলেন না। হিন্দুদের উপর তীর্থ কর তিনি পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুমন্দির নির্মাণে বাধাদান এবং নব-নির্মিত মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধনও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের ত্রুটি মমতাজমহলের প্রতি তাঁহার প্রেমের গভীরতার দ্বারা বহুলাংশে স্খলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

নিরপেক্ষ বিচার

পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

বস্তুতপক্ষে শাহ্জাহান যেমন ছিলেন সর্বাধিক জাঁকজমকপ্রিয় সম্রাট, তেমনি তাঁহার শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শাহ্জাহানের সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে আসামের সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্ত দুর্গ হইতে দাক্ষিণাত্যের অউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসনব্যবস্থার কাঠামো ছিল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ। শাহ্জাহানের শাসনব্যবস্থার দক্ষতা এবং তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা ও সততা সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা ঔরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বে কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ঘটে নাই। ইতালীয় পর্যটক মানুচি (Manucci) বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারী ও বিলাসপ্রিয় হইলেও শাহ্জাহান সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ডক্টর স্মিথ্ মানুচির উক্তি অস্বীকার করিয়া শাহ্জাহানের বিচার-ব্যবস্থাকে এশিয়ার স্বৈরাচারী শাসকসুলভ নিষ্ঠুর বর্বরতার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এল্‌ফিন্‌স্টোন, আলেকজাণ্ডার ডাও

মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত

শাহ্জাহানের শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রশংসা

(Alexander Dow) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। যাহা হউক, ডক্টর স্মিথের সমালোচনা যে অযথা রূঢ় হইয়াছে, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

শাহ্‌জাহান স্বভাবত নিষ্ঠুর ছিলেন, একথা সত্য নহে। তাঁহার সন্তানবাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম তাঁহার অন্তরের কোমলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। দীর্ঘ উনিশ বৎসরের ক্রমবর্ধমান পত্নীপ্রেমের শেষ স্মৃতি* হিসাবে সম্রাট শাহ্‌জাহান মমতাজের দেহাবশেষের উপর বিখ্যাত মর্মর সৌধ 'তাজমহল' নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাজমহল পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম হিসাবে আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

শাহ্‌জাহানের সন্তান-বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেম

শাহ্‌জাহান বাল্যকালে মোল্লা কাসিমবেগ তবরেজী, সেখ্ সূফী প্রভৃতি তদানীন্তন বিখ্যাত মনীষীদের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুল হামিদ লাহোরী তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস-সাহিত্য 'বাদশাহ্‌নামা' রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কাফী খাঁ তাঁহার 'মুন্তাখাব-উল্‌-লুবাব' গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঔরংজেবের আমলেরও বহু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। শাহ্‌জাহানের আমলে বহু হিন্দী কবির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে তুলসীদাস ও বিহারীলাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার শিক্ষা

শাহ্‌জাহান ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট। টেভার্নিয়ে, বার্নিয়ে, মানুচি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক শাহ্‌জাহানের দরবারের আড়ম্বরপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে মুঘল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ প্রভৃতিতে শাহ্‌জাহানের আমলের স্থাপত্য-শিল্প উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। পিতামহ আকবর কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ-দুর্গগুলির বিভিন্ন অংশ শাহ্‌জাহানের আমলে পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত 'মুসম্মান বুরুজ', 'খাসমহল', 'শিশমহল' প্রভৃতিও শাহ্‌জাহানের স্থাপত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শাহ্‌জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হইল 'তাজমহল'। কুড়ি হাজার শিল্পী ও শ্রমিকদের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হইয়াছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পিগণও

স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ

তাজমহল

* "হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল॥"

শা-জাহান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাজমহল নির্মাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ওস্তাদ ঈশা ও বাঙ্গালী কারুশিল্পী বলদেব দাস গুলতরাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

ময়ূর সিংহাসন

শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসনটি তাঁহার শিল্পানুরাগের এক অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ ছিল। শিল্পী বেবাদল খাঁর দীর্ঘ আট বৎসরের পরিশ্রমে মোট আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এই মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনটি নির্মিত হইয়াছিল। এই সিংহাসনের চারিটি পায়া ছিল স্বর্ণনির্মিত। পারস্যসম্রাট নাদির শাহ্‌ ভারত আক্রমণকালে এই বহুমূল্য অপূর্ব শিল্পনিদর্শনটি পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান নিজ নামানুকরণে 'শাহ্‌জাহানাবাদ' নামে একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই বর্তমানে 'নূতন দিল্লী' নামে পরিচিত।

চিত্র-শিল্প

শাহ্‌জাহানের আমলে চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় চিত্র-শিল্পিগণ পারসিক চিত্র-শিল্পের অনুকরণে চিত্র অঙ্কন করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধিত না হওয়ায় শিল্পিগণ হিন্দু চিত্র-শিল্প-রীতি ও ইওরোপীয় চিত্র-শিল্প-রীতির সংমিশ্রণে এক নূতন রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গীর রচনা করিয়াছিলেন।

বাহ্যিক সমৃদ্ধির অন্তরালে জনসাধারণের দুর্দশা

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধন-সম্পদ, আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের জন্য শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল ছিল বিখ্যাত। মণিমুক্তা মরকত-খচিত ময়ূরসিংহাসন এবং তাজমহল প্রভৃতি মর্মরসৌধ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সম্রাট শাহ্‌জাহানের মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত কোহিনুর মণি শোভা পাইত। কিন্তু সম্রাটের এই ঐশ্বর্য জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বার্থলোলুপতা ও অত্যাচার জনসাধারণ বিশেষভাবে কৃষক ও শিল্প শ্রমিকের চরম দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে জনসমাজ মুঘল সম্রাটের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কারণ ছিল এবং যাহাদের উৎপাদিত সম্পদ মুঘল সম্রাটের আড়ম্বর ও বিলাস-প্রিয়তার অর্থ যোগাইত, তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতেও বঞ্চিত ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাহ্‌জাহানের আমলের সমৃদ্ধির পশ্চাতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল।

প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের অত্যাচার

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত

দশম অধ্যায়

ঔরংজেব আলমগীর

(Aurangzeb Alamgir)

ঔরংজেবের সিংহাসনারোহণ (Aurangzeb's Accession to the Throne) : বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাহ্জাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া ঔরংজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, এই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদনের অবকাশ ছিল না, কারণ তখনও তাঁহার সিংহাসন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় নাই। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজওয়া ও দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর দিল্লী ফিরিয়া আসিলে ঔরংজেবের অভিষেক-ক্রিয়া উপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। ঔরংজেব 'আলমগীর বাদশাহ্ গাজী' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুস্তানের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৬৫৯)।

আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক (১৬৫৯)

সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গের আনুগত্য ও সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে ঔরংজেব তাহাদের মোট দেয় করের পরিমাণ হ্রাস করিলেন এবং মোট আশী প্রকারের কর মকুব করিয়া দিলেন। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, স্থানীয় রাজকর্মচারীদের দুই-একজন ভিন্ন কেহই সম্রাটের কর মকুবের আদেশ পালন করেন নাই।

কর মকুব

ঔরংজেব ছিলেন গোঁড়া পরধর্ম-অসহিষ্ণু সুন্নী মুসলমান। ভ্রাতৃবিরোধে তাঁহার জয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের তাঁহার প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি। স্বভাবতই, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কতিপয় গোঁড়াপন্থী সংস্কার সাধন করিলেন। মদ্যপান, আকবর-প্রবর্তিত 'নওরোজ' অনুষ্ঠান প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পুরাতন মসজিদগুলির সংস্কার, নূতন মসজিদ স্থাপন, দরগা, মসজিদ প্রভৃতির ইমাম ও মোয়াজ্জেমগণকে নিয়মিতভাবে বেতন দান প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। অপরদিকে সুফি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ করিলেন।

সুন্নী সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা

ঔরংজেব ও উত্তর-পূর্ব ভারত (Aurangzeb & North-Eastern India) : মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সময় হইতে ক্রমশ রাজ্যসীমা বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঔরংজেবও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা দাউদ খাঁ পালামৌ জয় করিলেন। ঐ বৎসর ঔরংজেব মীরজুমলাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। কুচবিহার ও আসামের অহোম রাজা মুঘল সাম্রাজ্য হইতে একাংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং অহোম রাজাকে দমন করা ছিল মীরজুমলার প্রধান দায়িত্ব। ঐ বৎসরই মীরজুমলা

পালামৌ অধিকার (১৬৬১)

কুচবিহার ও আসামের রাজাকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মীরজুমলার সেনাবাহিনী আসামের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মীরজুমলা এইরূপ অবস্থায়ও অহোমদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অহোমরাজ মুঘলসেনার সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না দেখিয়া মীরজুমলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও বাৎসরিক কর দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহা ভিন্ন, দরং জেলার অধিকাংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আসামে অবস্থান-কালে মীরজুমলা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ইহার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু মুঘল সেনাবাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্যের এবং মীরজুমলার ন্যায় অনন্যসাধারণ সেনাপতির প্রাণের বিনিময়ে আসামের যে অংশ জয় করা সম্ভব হইয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই অহোমরাজ তাহা পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কুচবিহার ও আসামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সামরিক সাফল্য : মীরজুমলার মৃত্যু

মীরজুমলার মৃত্যুর পর ঔরংজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিলেন। শায়েস্তা খাঁ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে পোর্তুগীজদের দমন করিয়া তাহাদের কর্মকেন্দ্র সন্দীপ অধিকার করেন। ইহা ভিন্ন, আরাকানী রাজার নিকট হইতে তিনি চট্টগ্রামও দখল করিয়াছিলেন (১৬৬৬)।

শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত : সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার

ঔরংজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি (North-West Frontier Policy of Aurangzeb) : ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতীয় দলগুলি চিরকালই ভারতীয় সুলতান ও সম্রাটদের বিপত্তির কারণ ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগান উপজাতিগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী স্থানগুলিতেও প্রবেশ করিয়া হত্যা-লুণ্ঠনাদি করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আফগান উপজাতির ইউসুফ্‌জাই শাখার দলপতি কয়েকটি উপজাতীয় দলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মহম্মদ শাহ্‌ নামে জনৈক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই উপজাতীয় দলগুলি সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া হাজারা জেলা দখল করিতে সমর্থ হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিতে লাগিল। ইহা ভিন্ন, মুঘল ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না। ঔরংজেব আফগান উপজাতিগুলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনজন সেনানায়ককে প্রেরণ করিলেন। মুঘল সেনাবাহিনী আফগান দলপতিদিগকে উপযুক্ত শাস্তিদানে ত্রুটি করিল না। তাহাদের অনেকেই মুঘল সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশও কতকটা শান্ত হইল। অতঃপর রাজা

ইউসুফ্‌জাই নামক আফগান উপজাতি শাখার বিদ্রোহ

যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের সামরিক ঘাঁটির অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইল।

আফ্রিদি জাতির বিদ্রোহ

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিদি জাতি তাহাদের নেতা আকমল খাঁর অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং মুঘলদের উপর আক্রমণ শুরু করিল। রাজা যশোবন্ত সিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া পেশওয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দশ হাজার মুঘলসৈন্য আফ্রিদিগণ কর্তৃক ধৃত হইল এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে ইহাদের বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইল।

'খতক' উপজাতির বিদ্রোহ

পেশওয়ার, বান্নু ও কোহাট জেলার দুর্ধর্ষ 'খতক' জাতি (Khatiaks) তাহাদের নেতা খুশ্-হল্ খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুঘল কর্তৃপক্ষ খুশ্-হল্ খাঁকে এক দরবারে আহ্বান করিয়া কৌশলে বন্দী করেন। কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকিয়া তিনি অবশ্য মুঘলসম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র মুঘল সেনাবাহিনীতে চাকুরি গ্রহণ করেন। 'খতক' জাতি ছিল ইউসুফ্জাই উপজাতিদের চিরকালের শত্রু। ঔরংজেব এই কারণে খুশ্-হল্ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে ইউসুফ্জাই উপজাতি দলকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া খুশ্-হল্ খাঁ ও তাঁহার পুত্র আফ্রিদি নেতা আকমল খাঁর সহিত মিলিত হইয়া মুঘলসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তখন ঔরংজেব পর পর কয়েকজন সেনাপতিকে আফগান উপজাতিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি স্বয়ং হাসান আব্দাল নামক স্থানে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন (১৬৭৪)। আফগান উপজাতীয় নেতৃগণের অনেককেই ভাতা, জায়গীর প্রভৃতি প্রলোভনের দ্বারা তিনি অবশ্য ভুলাইতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও কতক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কাবুলের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা আমীর খাঁর প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে আফগান উপজাতিগুলি সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইল।

আফগান উপজাতি দমনে ঔরংজেবের অভিযান

আফগান উপজাতি-গুলির দমন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ফলাফল

ঔরংজেবের শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির উপর আফগান উপজাতিগুলির বিদ্রোহের প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য ঔরংজেবের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে সমরকুশল সেনাপতিদের মধ্যে অনেককে তথায় প্রেরণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সুযোগে শিবাজী নিজ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। আফগান জাতিকে রাজপুত-শক্তি দমনে ব্যবহার করিবার সুযোগ ঔরংজেব সেই সময়

হইতে চিরতরে হারাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আফগান উপজাতিগুলিকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও স্বাধীনতাকামী আফগান জাতির সৌহার্দ্য তিনি চিরতরে হারাইয়াছিলেন।

ঔরংজেবের ধর্ম-নীতি (Religious Policy of Aurangzeb) : সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ছিল উদারতা ও ধর্ম-বিষয়ে চরম সহিষ্ণুতার যুগ। জাহাঙ্গীরের আমলেও পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতি বজায় ছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল হইতেই ধর্ম-বিষয়ে সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু নীতির অনুসরণ শুরু হয়। এই প্রতিক্রিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতায় পরিণত হয়। ঔরংজেব ছিলেন সংকীর্ণমনা সুন্নী মুসলমান। তিনি কোরাণের নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে গিয়া অ-মুসলমান ও সিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং গোঁড়া সুন্নী মুসলমানসুলভ আচার-আচরণ মানিয়া চলিতে লাগিলেন। মুঘল দরবারের পূর্বেকার বহু অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির তিনি পরিবর্তন সাধন করিলেন। দরবারে সঙ্গীতানুষ্ঠান তাঁহার আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 'নওরোজ' নামক অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। প্রচলিত মুদ্রায় 'কলিমা'র যে দুই-একটি কথা ছাপ দেওয়া হইত তাহাও তিনি উঠাইয়া দিলেন, কারণ অ-মুসলমানদের স্পর্শে 'কলিমা'র পবিত্রতা নষ্ট হইবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনাও তিনি ইসলাম ধর্ম-বিরোধী বলিয়া নিষেধ করিলেন। মদ, ভাঙ্ প্রভৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া তিনি আদেশ জারি করিলেন। বলপূর্বক সতীদাহ-প্রথাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হয় নাই। ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির প্রয়োগে ঔরংজেব উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ-মুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপন করিলেন।

ধর্ম বিষয়ে ঔরংজেবের সংকীর্ণ অসহিষ্ণু নীতি

'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপিত

ঔরংজেব স্বয়ং যে অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন স্বীয় ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের সম্রাটের পক্ষে ধর্মের গোঁড়ামি শাসন-নীতিতে প্রয়োগ করা যে অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ, ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই ধর্মান্ধতা বশতই নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের ধর্ম-নীতি তাঁহার ধর্মানুরাগের পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের নর-নারী অধ্যুষিত হিন্দুস্তানের সম্রাট-পদের দায়িত্বের কোন পরিচয়ই যে ছিল না, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঔরংজেব ধর্মের দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মান্ধ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ধর্মান্ধ নীতির কুফল

স্বরূপ-ই মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

সিয়া, খোজা, বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা

ঔরংজেবের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার নীতি কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে ; সিয়া, খোজা ও বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতিও সেই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল।

ঔরংজেবের ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Aurangzeb's Religious Policy) : ঔরংজেবের ধর্মান্ধনীতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথমে মথুরার জাঠগণ তিলপৎ-এর জমিদার

জাঠ বিদ্রোহ

গোক্‌লার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৬৬৯) এবং তাহারা মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে। গোক্‌লাকে দমন করিতে অবশ্য মুঘলশক্তিকে বেশী বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। কয়েক বৎসর পরে জাঠগণ পুনরায় (১৬৮৬) বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নেতা রাজারামও মুঘলবাহিনীর হাতে নিহত হন। কিন্তু তাহাতে জাঠগণকে দমন করা সম্ভব হইল না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর জাঠগণ তাহাদের নেতা চূড়ামন-এর অধীনে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুতগণ তাহাদের নেতা ছত্রশালের অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছত্রশাল কিছুকাল ঔরংজেবের রাজকর্মচারী হিসাবে দাক্ষিণাত্যে

বুন্দেলা বিদ্রোহ : ছত্রশাল

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিবাজীর স্বাধীনতা-স্পৃহা, হিন্দুধর্ম রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও দুঃসাহসিকতা ছত্রশালের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঔরংজেবের হিন্দু-নির্যাতন ও হিন্দু মন্দির অপবিত্রীকরণ নীতির প্রতিবাদকল্পে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দীর্ঘকাল মুঘল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ছত্রশাল মালবদেশের পূর্বাংশ লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের বর্তমান পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলে 'সৎনামী' হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস

'সৎনামী' বিদ্রোহ

ছিল। ঔরংজেবের অ-মুসলমান নির্যাতন নীতির ফলে যখন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল ঐ সময়ে জনৈক মুঘলসৈন্য একজন 'সৎনামী' ভক্তকে হত্যা করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রথমে সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহে সাফল্যলাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত মুঘলবাহিনীর হস্তে তাহাদের প্রায় সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

ঔরংজেবের অদূরদর্শী ধর্ম-নীতি শিখজাতির মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া দিল। গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুস্‌রুকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল একথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ঐ সময় হইতে শিখজাতি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করিতেছিল। গুরু হরগোবিন্দ তাঁহার পিতা গুরু অর্জুনের উপর ধার্য অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মুঘলসম্রাট কর্তৃক দীর্ঘ বারো বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর গুরু হরগোবিন্দ শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু মুঘলবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হন। এইভাবে শিখ গুরুদের মধ্যে মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নবম শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুর ঔরংজেবের হিন্দু-বিরোধী নীতির প্রতিবাদ করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের ঔরংজেব-প্রবর্তিত হিন্দু-বিরোধী নীতি অমান্য করিতে উপদেশ দেন। এজন্য ঔরংজেব তেগ্‌বাহাদুরকে বন্দী হিসাবে দিল্লী আনিতে আদেশ দিলে তাঁহাকে ঔরংজেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তাঁহাকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলা হইলে তিনি ধর্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। তিনি 'শির' দিয়াছিলেন কিন্তু 'সর্' দেন নাই—মস্তক দিয়াছিলেন, ধর্ম দেন নাই (শির দিয়া সর্ ন দিয়া)। তেগ্‌বাহাদুরই ছিলেন শিখদের 'খাল্‌সার' সংগঠক। তিনি শিখজাতির মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার এক নবচেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

শিখদের প্রতি অদূরদর্শী নীতির অনুসরণ

গুরু তেগ্‌বাহাদুরের হত্যা—শির দিয়া সর্ ন দিয়া

তেগ্‌বাহাদুরের এই নির্মম হত্যা শিখদের মনে মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহার উদ্রেক করিল। ফলে, তেগ্‌বাহাদুরের পুত্র গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখজাতি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইল।

গুরুগোবিন্দের অধীনে মুঘল-শিখ সংঘর্ষ

ঔরংজেবের রাজপুত-নীতি (Rajput policy of Aurangzeb): সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুসৃত রাজপুত-নীতির দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক জ্ঞান ঔরংজেবের ছিল না। যে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ঔরংজেবের অদূরদর্শী ধর্মান্ধ-নীতি সেই রাজপুত জাতিকেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রুতে পরিণত করিল।

ঔরংজেবের রাজপুত-নীতির অদূরদর্শিতা

১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ জামরুদে মুঘল সামরিক ঘাঁটির অধিকর্তা পদে নিযুক্ত থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঔরংজেব সেই সুযোগে তাঁহার রাজ্য দখল করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাড়বার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মুঘল রাজকর্মচারিগণ ও সেনাবাহিনী তথাকার দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করিল। মাড়বারের অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর স্থাপিত হইল। ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যশোবন্ত সিংহেরই এক আত্মীয়কে যোধপুরের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুকালে

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু: ঔরংজেব কর্তৃক মাড়বার দখল

তাঁহার দুই রাণীই ছিলেন সন্তানসম্ভবা। কিছুকালের মধ্যেই দুই রাণীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই দুইটি শিশুর মধ্যে একটির মৃত্যু হইল। অপর পুত্র অজিত সিংহ কেবল বাঁচিয়া রহিলেন। শিশু অজিত সিংহকে লইয়া যশোবন্ত সিংহের দুই রাণী ও এক অতি বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গাদাস দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। যশোবন্তের সিংহাসন তাঁহার পুত্র অজিত সিংহকে দেওয়া হউক, তাঁহারা এই দাবি জানাইলে, অজিত সিংহ দিল্লীর প্রাসাদে মুঘল হারেমে প্রতিপালিত হইবেন, এই শর্তে ঔরংজেব যশোবন্তের সিংহাসনে অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইতে রাজী হইলেন। দুর্গাদাস ও অপরাপর রাজপুত নেতৃবর্গ ঔরংজেবের এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল্লী ত্যাগ করিতে উদ্যোগ করিলে ঔরংজেব অজিত সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহের দুই রাণীকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। রাজপুত বীর দুর্গাদাসের বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে শিশুপুত্রসহ রাণীদ্বয় দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ঔরংজেব জনৈক দুগ্ধ-বিক্রেতার শিশুপুত্রকে অজিত সিংহ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাহাকেও ভুলান সম্ভব হইল না। মাড়বারে ফিরিয়া গিয়া বীর দুর্গাদাস ঔরংজেবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অজিত সিংহ

রাজপুত বীর দুর্গাদাস

ঔরংজেব মাড়বার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আজমীরে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব তিনি নিজপুত্র আকবরের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং আজমীর হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। রাজপুতবাহিনী মুঘলসেনার হস্তে পরাজিত হইল। ঔরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একজন করিয়া মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে মেবার রাজ্যে জিজিয়া কর স্থাপনের আদেশ দিলেন। রাজসিংহ এই আদেশে অপমানিত বোধ করিয়া ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তিনি মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষ: ঔরংজেব কর্তৃক মাড়বার পুনর্দখল

এমতাবস্থায় রাজসিংহ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া মাড়বার রাজ্য রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। কারণ মাড়বার সম্পূর্ণভাবে মুঘল অধিকারভুক্ত হইলে মেবারের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, ইহা তিনি ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দুর্গাদাস ও রাজসিংহ যুগ্মভাবে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে ঔরংজেবও এক বিশাল বাহিনীসহ মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে ঔরংজেবের পক্ষে মেবার রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হইল না। রাজসিংহ আত্মরক্ষার্থে নিজ প্রজাবর্গসহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্বতারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ

মেবার আক্রমণ: উদয়পুর ও চিতোর অধিকার

করিলেন। উদয়পুর ও চিতোর মুঘলবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। মোট দুই শতেরও অধিক দেবমন্দির মুঘলবাহিনীর হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

এই ঘোর দুর্দিনেও রাজপুতগণ তাহাদের সাহস ও সংকল্প হারাইল না। তাহারা মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চলিল। যুবরাজ আকবরকে তাহারা একাধিকবার অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলে ঔরংজেব আকবরকে মেবার হইতে মাড়বারে স্থানান্তরিত করিলেন এবং সেই স্থলে যুবরাজ আজমকে নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজ আকবর ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া রাজপুত বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিলেন। রাজপুতদিগের সাহায্যে তিনি ঔরংজেবকে সিংহাসনচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বয়ং 'হিন্দুস্তানের সম্রাট' উপাধি ধারণ করিলেন। এই সময়ে ঔরংজেব আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কূটকৌশলে যুবরাজ আকবরের সহিত রাজপুতগণের মিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। আকবরের প্রশংসা করিয়া তিনি এই মর্মে একখানি জাল চিঠি লিখিলেন যে, আকবর রাজপুত নেতৃবৃন্দকে ঔরংজেবের সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয়। এই চিঠিখানি যাহাতে রাজপুতদের হস্তগত হয় ঔরংজেব সেই ব্যবস্থাও করিলেন। এই চিঠির মর্ম অবগত হওয়ামাত্রই রাজপুতগণ আকবরকে মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিল এবং এইভাবে আকবরের সহিত রাজপুতগণের মিত্রতা বিনষ্ট হইল। বীর দুর্গাদাস অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঔরংজেবের কূটকৌশল বুঝিতে পারিয়া আকবরকে নিরাপদে শিবাজীর পুত্র শম্ভূজীর রাজসভা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। এইভাবে মুঘলবাহিনী যখন আকবরের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন জয়সিংহ মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। তিনি জয়সিংহের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং জয়সিংহ জিজিয়া করের পরিবর্তে ঔরংজেবকে তিনটি জেলা দান করিয়া সমগ্র মেবার রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ

ঔরংজেবের কূটকৌশল

মাড়বারের বীরযোদ্ধা দুর্গাদাস আরও কিছুকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইলেন। অবশেষে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মুঘলসম্রাট অজিত সিংহের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন (১৭০৯)। ঔরংজেবের রাজপুত জাতির মিত্রতার মূল্য উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার রাজপুতনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। নিজ জীবনেই তিনি মেবারের সহিত যুদ্ধ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবের রাজপুতনীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, একথা বলা চলে না। উপরন্তু

মেবার ও মাড়বারের বিরুদ্ধে ঔরংজেবের নীতির বিফলতা

তিনি সমগ্র রাজপুত জাতিকে মুঘল সাম্রাজ্য ও সম্রাটের এক ঘোর শত্রুতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি (Deccan policy of Aurangzeb) : ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির অনুসরণ বলা যাইতে পারে। সম্রাট আকবরের আমল হইতেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই।

পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের নীতির অনুসরণ

ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখন হইতেই তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করিবার চেষ্টা শুরু করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব্ শাহের মন্ত্রী মীরজুমলার সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল গোলকুণ্ডা রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা। তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া যখন তথাকার সুলতানকে কঠোর শর্তাধীনে আবদ্ধ করিতে উদ্যত তখন কুতব্ শাহ্ গোপনে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়া শাহ্‌জাহানের নিকট ঔরংজেবের দারুণ উৎপীড়নের কথা জানাইয়া শান্তি স্থাপনের অনুরোধ করেন। জাহানারা ও দারার অনুরোধে শাহ্‌জাহান ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডার সহিত শান্তি স্থাপনের আদেশ দিলে তিনি বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ মিটাইয়া লন। কিন্তু কুতব্ শাহের নিকট হইতে তিনি দশলক্ষ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন এবং তাঁহাকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিলেন। ইহা ভিন্ন, রঙ্গার নামক স্থানটিও তিনি দখল করিলেন। নিজপুত্র মহম্মদের সহিত কুতব্ শাহের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া কুতব্ শাহের মৃত্যুর পর গোলকুণ্ডা মহম্মদের অধিকারভুক্ত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতিও ঔরংজেব কুতব্ শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্য শাসনকর্তা হিসাবে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে নীতি

গোলকুণ্ডা জয়ের চেষ্টা

বিজাপুর রাজ্য তখন আদিল শাহ্ নামক জনৈক দৃঢ়চেতা সুলতানের অধীন ছিল। তাঁহার আমলে ঔরংজেব বিজাপুর রাজ্যের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। আদিল শাহ্ মুঘল শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া চলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঔরংজেব শাহ্‌জাহানের অনুমতি লইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭)। মীরজুমলা এই যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য দান করেন। বিজাপুর রাজ্য যখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে করতলগত এই সময়ে শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবকে শান্তি স্থাপন করিতে হইল। বিদর, কল্যাণী, পরিন্দা প্রভৃতি স্থান এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া বিজাপুর সুলতান তখনকার মত রক্ষা পাইলেন।

বিজাপুরে আক্রমণ

দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে দেওয়ার বিপদ যুবরাজ দারা ও জাহানারা বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই ঔরংজেব গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে দখল না করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ঔরংজেবের উৎপীড়নও দারা ও জাহানারার অন্তরে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দারা ও জাহানারার অনুরোধেই শাহ্‌জাহান ঔরংজেবকে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের আদেশে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি ব্যাহত

বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঔরংজেব সম্রাট-পদ লাভ করিলে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতির পূর্ণ অনুসরণের সুযোগ আসিল। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহাকে দুর্ধর্ষ মারাঠা বীর শিবাজীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঔরংজেব শিবাজীকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না। দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালীনই ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা বীর শিবাজী সেই বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাটপদ লাভের পরও ঔরংজেবের মারাঠা শক্তি দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর হস্তে নিজেই শায়েস্তা হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেনাপতি আফজল খাঁও শিবাজীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অতঃপর ঔরংজেবের সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ অবশ্য সাময়িকভাবে শিবাজীর বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা বীরকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা ঔরংজেবের সেনাপতিদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে শিবাজী মুঘল-অধিকৃত মারাঠা রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

মারাঠা-বীর শিবাজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ

শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সহিত ঔরংজেবের সংঘর্ষ

মারাঠা শক্তি ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধেও ঔরংজেব অভিযান শুরু করিলেন। তিনি বিজাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুর সুলতানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। অতঃপর গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে গিয়া ঔরংজেব আবদুল্লা পানি নামে গোলকুণ্ডার জনৈক রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গোলকুণ্ডা অধিকার করিতে সক্ষম হন। গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঔরংজেব সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া পুনরায় মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার তিনি

মারাঠা রাজধানী রায়গড় দখল করিতে সমর্থ হইলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহু মুঘলহস্তে বন্দী হইলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মারাঠা রাজ্যের কতকাংশ দখল করিয়া ঔরংজেব ত্রিচিনপল্লী এবং তাঞ্জোরের হিন্দু রাজগুলি আক্রমণ করিলেন। ঐ দুইটি স্থানেরই হিন্দুরাজগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজ্যজয়ের ফলে ঔরংজেব এক অতি বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। ইহার পূর্বে অপর কোন মুঘল সম্রাট এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন নাই।*

ঔরংজেব কর্তৃক বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মারাঠা রাজ্যের একাংশ, ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর অধিকার

সমালোচনা (Criticism) : ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। ডক্টর স্মিথ্, এল্ফিন্স্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলি জয় করিয়া ঔরংজেব অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ঔরংজেব মারাঠা শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। এই দুইটি সুলতানী রাজ্য স্বাধীন থাকিলে নিজ নিরাপত্তার জন্যই এগুলি মারাঠা শক্তিকে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এই দুইটি রাজ্যের স্বাধীনতা-বিলুপ্তির ফলে মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত কোন স্থানীয় শক্তি আর রহিল না। কিন্তু সার্ যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার, ডক্টর দত্ত প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে ডক্টর স্মিথ্, এল্ফিন্স্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় থাকিলেও মারাঠা শক্তির উত্থান রোধ করা সম্ভব হইত না, কারণ দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলির মধ্যে কোনপ্রকার ঐক্য ছিল না। দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তিকে প্রতিহত করিতে হইলে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন ছিল, পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত দাক্ষিণাত্যের সুলতানগুলির পক্ষে সেই শক্তি সঞ্চয় করা কখনও সম্ভব হইত না। ইহা ভিন্ন, মারাঠা জাতি ধর্ম ও গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক স্বাধীন শক্তিশালী সামরিক সাম্রাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বিজাপুর বা গোলকুণ্ডার সুলতান কোনপ্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং এই দুইটি রাজ্য দখল করিয়া ঔরংজেব যে কোন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই।

ডক্টর স্মিথ্ ও এল্ফিন্স্টোনের অভিমত

সার্ যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর মজুমদার প্রভৃতির অভিমত

* ঔরংজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য একুশটি সুবায় বিভক্ত ছিল। যথা : (১) আগ্রা, (২) এলাহাবাদ, (৩) আজমীর, (৪) বাংলা, (৫) বিহার, (৬) দিল্লী, (৭) কাশ্মীর, (৮) লাহোর, (৯) গুজরাট, (১০) মালব, (১১) মুলতান, (১২) সিন্ধু, (১৩) উড়িষ্যা, (১৪) বেরার, ১৫) খান্দেশ, (১৬) ঔরঙ্গাবাদ, (১৭) বিদর, (১৮) হায়দ্রাবাদ, গোলকুণ্ডা, (১৯) বিজাপুর, (২০) অযোধ্যা ও (২১) কাবুল।

কিন্তু ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার ফলে উত্তর-ভারতে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সম্রাটের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মুঘল শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মুঘল সেনাবাহিনীর দক্ষতাও হ্রাস পাইয়াছিল। নানাপ্রকার অসুবিধাভোগ এবং যুদ্ধজনিত ক্লান্তির ফলে মুঘলবাহিনীর সামরিক ক্ষমতাই যে কেবল হ্রাস পাইয়াছিল এমন নহে, সৈনিকদের সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ও লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করিয়াও ঔরংজেব সেই অনুপাতে লাভবান হন নাই। সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনের দিক দিয়া এই কারণগুলি যে যথেষ্ট দায়ী ছিল, সন্দেহ নাই। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন যেমন 'স্পেনীয় ক্ষত' (Spanish ulcer) তাঁহার সর্বনাশের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন তেমনি 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' (Deccan ulc.r) ঔরংজেবের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উপসংহার

ঔরংজেবের শেষ জীবন (The Last days of Aurangzeb): বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া ঔরংজেব যে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল অক্লান্তশ্রমে যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন উহার কোন কিছুই তাঁহাকে শেষ জীবনে শান্তি দান করিতে পারিল না। তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি পুনরায় দুর্বার হইয়া উঠিল। ফলে, বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। নিজের জীবনের ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ তাঁহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল। ভগ্নহৃদয়ে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে জীবনের শেষ দিনগুলি যাপন করিয়া স্পর্ধিত মুঘল সম্রাট ঔরংজেব আলমগীর বাদশা গাজী আহ্মদনগরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন (৩ মার্চ, ১৭০৭)।

মৃত্যু (মার্চ ৩, ১৭০৭)

ঔরংজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Aurangzeb's character and achievements): ঔরংজেব মুঘলবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ইহা অনস্বীকার্য। তাঁহার চরিত্রের জটিলতা ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাঁহার দোষগুণের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় নাই। বৃদ্ধ পিতার প্রতি তাঁহার আচরণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত বিচারকে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু তৈমুর বংশের ইহা-ই ছিল চিরাচরিত রীতি। সুতরাং ভ্রাতৃহত্যা বা পিতার প্রতি নির্মম ব্যবহার ঔরংজেবের চরিত্র-বিচারে যেন আমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে।

বিভ্রান্তকারী চরিত্রের জটিলতা

ঔরংজেব সুদক্ষ সমরনায়ক, ক্ষমতাবান শাসক এবং সূক্ষ্ম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। বিপদে সাহস ও ধৈর্য সহকারে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় ত্রুটি তিনি কোন দিনই করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসাবে তিনি দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সাহায্যে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাট-পদ লাভের পরও তিনি কোন সময়েই শাসনকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর তিনি ছিলেন সমসাময়িক। লুই-এর ন্যায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। লুই-এর মতই তিনি নিজেই ছিলেন নিজের প্রধানমন্ত্রী। শাসনকার্যের খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না এবং প্রত্যেক বিষয়েই তিনি স্বয়ং আদেশ দিতেন। আইন-কানুন যাহাতে কেহ অমান্য না করিতে পারে সেবিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাজ্যশাসন ব্যাপারে ঔরংজেব কাহারো প্রভাবে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হইতেন না। মধ্যযুগীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহার সাম্রাজ্য-লিপ্সার অন্ত ছিল না। শাসন-ব্যাপারেও তিনি নিজের সর্বাত্মক প্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

চরিত্রের গুণাবলী

আইন-কানুনে প্রয়োগে কঠোরতা

ঔরংজেবের সাহস ছিল অপরিসীম, তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। গেমেলি-ক্যারেরী (Gemelli-Careri) নামে জনৈক ইতালীয় চিকিৎসক ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ঔরংজেবকে শাসনকার্যের যাবতীয় কাগজ-পত্র নিজে পাঠ করিয়া সেগুলির উপর নিজ আদেশ লিখিয়া দিতে দেখিয়াছিলেন। গেমেলি ঔরংজেবের কর্মক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কর্মনিষ্ঠা

ইসলাম ধর্মনীতি সম্পর্কে ঔরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল। ফারসী সাহিত্য, আরবীয় আইন-কানুন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। মুসলমান আমলের সর্ববৃহৎ আইন সংকলন 'ফতোয়া আলমগীরী' ঔরংজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ধর্মবিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। নিজহস্তে কোরাণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া তিনি মক্কায় প্রেরণ করিতেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। মিতাহার, স্বল্পনিদ্রা, মাদক দ্রব্যাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা

ধর্মসম্পর্কে গোঁড়ামি

কিন্তু উপরি-উক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইলেও ঔরংজেব যে শাসক হিসাবে সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়-অধ্যুষিত ভারত-সম্রাটের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি অ-মুসলমানদের আনুগত্য হারাইয়াছিলেন। জনকল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং জনকল্যাণের মধ্যেই যে রাষ্ট্রকল্যাণ

শাসক হিসাবে ব্যর্থতা

দূরদৃষ্টির অভাব

নিহিত, উহা উপলব্ধি করিবার মত অন্তর্দৃষ্টিও তাঁহার ছিল না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র-ই যে প্রকৃত শক্তির অধিকারী, একথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। শুধু পরমধর্ম-অসহিষ্ণুতা-ই যে তাঁহার ছিল এমন নহে, অপরের প্রতি তিনি সন্দিহানও ছিলেন। এই সন্দিগ্ধ ভাবের ফলেই তিনি অপর কাহারও উপর কখনও কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি রাজকর্মচারিগণের স্বাভাবিক উদ্যোগ-উদ্যমের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাটের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলেই স্বাধীনভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতাই তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত রাখিয়া তিনি তাহাদের সামরিক দক্ষতাও ক্ষুন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির ও দূরদৃষ্টির অভাবহেতুই মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পাইলেও উহার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট আকবরের দূরদর্শিতায় গঠিত মুঘল সাম্রাজ্য ঔরংজেবের অদূরদর্শিতায় দ্রুত পতনের পথে ধাবিত হইয়াছিল।

সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু ধর্মনীতি

রাষ্ট্রক্ষমতা নিজহস্তে কেন্দ্রীকরণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত

একাদশ অধ্যায়

ছত্রপতি শিবাজী
(Chhatrapati Shivaji)

মারাঠা শক্তির উত্থান (Rise of the Maratha Powers): সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মারাঠা শক্তির উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র অঞ্চল সাতবাহন ও চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে এই দেশে যাদববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া আলা-উদ্দিন এই অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মারাঠাগণ পুনরায় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করে। প্রথমে বহমনী রাজ্য এবং উহার পতনের পর আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানী রাজ্যগুলিতে মারাঠা দলপতিগণ সামরিক কার্য করিতেন। সেই সময়ে বহু মারাঠা দলপতি দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের নিকট হইতে জায়গীর, উচ্চ সম্মান এবং সামরিক শক্তি লাভ করেন। শিবাজীর পিতা শাহজীর নাম এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রের পূর্ব-ইতিহাস

দীর্ঘকাল নানাপ্রকার সামরিক দায়িত্ব-পালন ও যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতার ফলে মারাঠাজাতি এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। নাসিক, পুণা, সাতারা, সোলাপুর এবং আহম্মদনগরের একাংশ লইয়া তখন মহারাষ্ট্র দেশ গঠিত ছিল। কোঙ্কণেও মারাঠাদের বসতি ছিল।* কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মারাঠাদের দলপতিগণ স্থানীয় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইলেও তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মারাঠাবীর শিবাজী মারাঠা জাতিকে এক গভীর জাতীয়তা ও ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ মহারাষ্ট্র-দেশ গঠনে সমর্থ হন।

রাজনৈতিক অনৈক্য

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতি শিবাজীর অধীনে ঐক্যবদ্ধ

কিন্তু শিবাজীর সংগঠনী-শক্তি ও নেতৃত্ব ভিন্ন অপর কয়েকটি প্রভাব পূর্ব হইতেই মারাঠা জাতিকেই ঐক্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং শিবাজীর উত্থান মারাঠা জাতির ইতিহাসের কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, উহা ছিল বিভিন্ন প্রভাবের এক অতি স্বাভাবিক পরিণতি।† যে সকল প্রভাব ও ঘটনা মারাঠা জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয় চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্ম ও

অপরাপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্ম ও সামরিক শিক্ষা

---

* Vide, *Shivaji and His Times*: Sir J. N. Sarkar.

† "Sivaji's rise to power cannot be treated as an isolated phenomenon in Maratha history." Ishwari Prasad, *A History of the Muslim Rule in India*, p. 649.

দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অধীনে মারাঠা জাতির সামরিক শিক্ষালাভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্র পর্বতসঙ্কুল দেশ। সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী, তাপ্তী ও নর্মদা নদী মহারাষ্ট্র-দেশকে এক প্রাকৃতিক দুর্গস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। সহ্যাদ্রি-বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতের উত্তুঙ্গ প্রাচীর তাপ্তী ও নর্মদা নদীর গভীর পরিখা মহারাষ্ট্র-দেশকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্বতসঙ্কুল দেশে প্রকৃতির কৃপণতা মারাঠা জাতিকে স্বভাবতই কঠোর, পরিশ্রমী, সাহসী ও ধৈর্যশীল করিয়া তুলিয়াছিল। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে তেমন ছিল না, ফলে সেদেশে সামাজিক ঐক্যবোধ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ছিল।* সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মপ্রত্যয় ও সরলতা ছিল তাহাদের চরিত্রের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাহাদের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর ও তাহাদের দেহ ছিল সবল ও সুস্থ। প্রকৃতি কর্তৃক মহারাষ্ট্র-দেশ সুরক্ষিত থাকিবার ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায়ই গভীর স্বাধীনতা-স্পৃহা জন্মিয়াছিল। তাহারা ছিল 'ভারতীয়-স্পার্টান' (Indian Spartans)। যোদ্ধা হিসাবে স্পার্টানদের ন্যায় তাঁহারাও ছিল দুর্ধর্ষ। অতর্কিত আক্রমণ এবং পর্বতসঙ্কুল দেশের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা ছিল আফগান উপদলগুলির মতই দুঃসাহসী।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উহার প্রভাব

মারাঠা জাতির বৈশিষ্ট্য—'ভারতীয় স্পার্টান'

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-দেশে ধর্মের এক প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছিল। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ প্রভৃতি ধর্মগুরু হিন্দুধর্মের যাবতীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া 'ভক্তিবাদ' নামক সাম্যবাদী ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মমতে, বিশেষত রামদাস প্রচারিত ধর্মে এক গভীর জাতীয়তাবাদী আবেদনও ছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম—সর্বক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনই ছিল এই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। এই ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হইবার এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তিরও অভাব হইল না। মারাঠাবীর শিবাজীর মনে এই সকল প্রভাব ও আদর্শ এক গভীর রেখাপাত করিল। তিনি 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' মারাঠা জাতিকে 'এক রাজ্যপাশে' আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন।

ধর্মের প্রভাব: তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ

ধর্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবও মারাঠা জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। তুকারাম রচিত 'ভজন' মারাঠা জাতির সকল সম্প্রদায় কর্তৃকই গীত হইত। এইভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক গভীর একতা-বোধ জাগরিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব

---

* *cf.* "Though poor the peasant's hut, his feast tho' small
He sees his little lot the lot of all."—Goldsmith (on the Swiss), *The Traveller*.

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অধীনে সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতি নিজেদের স্বাভাবিক দুর্ধর্ষতার সহিত মুসলমান যুদ্ধ-নীতির সংমিশ্রণে এক অসাধারণ শক্তিশালী সামরিক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বেসামরিক শাসনকার্যে বহুসংখ্যক মারাঠা কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। এই শাসন-সংক্রান্ত কার্যে অভিজ্ঞতাও পরবর্তী কালে মারাঠাদের বহু উপকারে আসিয়াছিল।

সামরিক শিক্ষা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে বহু মারাঠা দলপতি জায়গীর ও উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শাসক হিসাবে ঔরংজেব যখন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন তখন মারাঠা জায়গীরদারগণ তাঁহাদের সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের নিকট হইতে নানাপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এই মারাঠা জায়গীরদারগণের অন্যতম শাহজী ভোঁসলা প্রথমে আহম্মদনগরের এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন; পুণা ও কর্ণাটে তাঁহার বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। এই মারাঠা জায়গীরদার শাহজীর পুত্র-ই বিখ্যাত শিবাজী।

দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে মারাঠা দলপতিদের জায়গীর লাভ

শাহজী ভোঁসলা

শিবাজীর জন্ম ও বাল্যজীবন (Birth & Early life of Shivaji): শিবাজী ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে* (৬, এপ্রিল) জুন্নারের নিকটবর্তী শিবনের দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর মাতা জীজাবাঈ ছিলেন শাহজীর উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা পত্নী। শাহজী তাঁহার অধিকতর সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রী তুকাবাঈ ও তুকাবাঈ-এর পুত্র ব্যাঙ্কোজীসহ নিজ কর্মস্থল বিজাপুরে বাস করিতেন। আর শিবাজীসহ জীজাবাঈ দাদাজী বা দাদোজী কোণ্ডদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুণায় বাস করিতেন। জীজাবাঈ ছিলেন স্বভাবতই ধর্মপরায়ণা। স্বামীর অবহেলাজনিত মর্মবেদনা তাঁহাকে ধর্মানুরাগিণী তপশ্চারিণীতে পরিণত করিয়াছিল। মাতার এই ধর্মানুরাগ ও তপশ্চারণ শিবাজীর মনে গভীর রেখাপাত করিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের স্নেহ ও শিক্ষায় শিবাজীর মনে এক বিরাট আদর্শ গড়িয়া উঠিল। জীজাবাঈ ছিলেন প্রাচীন যাদব বংশসম্ভূতা। দাদাজী ছিলেন রাজপুত বংশজাত। যাদব বংশ, রাজপুত জাতি এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করিয়া শিবাজীর মনে সাহস ও দেশপ্রেম উভয়ই সঞ্চারিত হইয়াছিল। দাদাজী কোণ্ডদেবের ধর্মপরায়ণতা ও তাঁহার মুখে দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শিবাজী দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এ যাবৎ প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াই জানা যায় তবে সম্ভ

শিবাজীর জন্ম (১৬২৭)

মাতা জীজাবাঈ ও দাদাজী কোণ্ডদেবের প্রভাব

বাল্যশিক্ষা

* কাহারও কাহারও মতে ১৬৩০ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

রামদাসের নিকট লিখিত একটি পত্রের নিম্নে কয়েকটি কথা শিবাজীর হস্তাক্ষর বলিয়া 'রামদাসী পত্র ব্যবহার' গ্রন্থে দাবি করা হইয়াছে। সার্ যদুনাথের মতে, অপর কোন ঐতিহাসিক সমর্থনাভাবে এই পত্রে লিখিত কয়েকটি কথা শিবাজীর হস্তাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যাহা হউক, সম্রাট আকবর, হায়দর আলি, রঞ্জিৎ সিংহের ন্যায় শিবাজীও নিরক্ষর ছিলেন। এই কথা-ই সাধারণ্যে প্রচলিত। নিরক্ষর হইলেও শিবাজীর মানসিক ক্ষমতার যে পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছিল তাহা শিবাজীর জীবনের কার্যাবলী এবং শাসনদক্ষতা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। দৈহিক ক্ষমতার দিক দিয়াও শিবাজী নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা এবং অনুরূপ কার্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী।

মাওল বা মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা

দাদাজী কোণ্ডদেবের মাধ্যমে বাল্যকাল হইতেই পুণার মাওল* বা মাওয়ালী জাতির সহিত শিবাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে। পরবর্তী কালে এই মাওয়ালী জাতির অনুচর লইয়াই শিবাজী তাঁহার দুর্ধর্ষ এবং বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

দাদাজীর মৃত্যু ঃ শিবাজীর অবাধ স্বাধীনতা

উচ্চ আদর্শের সহিত দুঃসাহসিকতা ও দৈহিক শক্তির সমন্বয় সাধিত হইলে যে অদম্য উদ্যম ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, শিবাজীর ক্ষেত্রেও তাহা-ই ঘটিয়াছিল। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের জীবদ্দশায় শিবাজী দুঃসাহসিকতার পথে সম্পূর্ণভাবে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যু হইলে শিবাজী নিজ পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন।

শিবাজী কর্তৃক তোরণা দুর্গ জয়, রায়গড় আক্রমণ, চকন দুর্গ জয়, বড়মতি ও ইন্দ্রপুর ঘাঁটি অধিকার

উত্তর-ভারতে মুঘল সম্রাটের কর্মব্যস্ততা এবং বিজাপুর সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে বিজাপুর রাজ্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে শিবাজী পুণার দক্ষিণ-পশ্চিমে তোরণা নামক দুর্গটি দখল করিলেন। ইহা ভিন্ন, তোরণা দুর্গের নিকটবর্তী রায়গড় দুর্গটিও তিনি আক্রমণ করিলেন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবাজী চকন দুর্গ এবং বড়মতি ও ইন্দুপুরের সামরিক ঘাঁটিগুলিও দখল করিয়া লইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি সিংহগড়, কোন্দন ও পুরন্দর দুর্গগুলি দখল করিয়া নিজ কর্মকেন্দ্র পুণার নিরাপত্তা বিধান করিলেন।

কল্যাণ দুর্গ অধিকার ঃ শাহজী কারারুদ্ধ

বিজাপুরের সুলতান প্রথমে শিবাজীর এইরূপ কার্যাবলীতে তেমন বিচলিত না হইলেও শিবাজী যখন কল্যাণ দুর্গটি দখল করিয়া বসিলেন এবং কোঙ্কণ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন তখন বিজাপুর সুলতানের টনক নড়িল। সেই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুর

* সার্ যদুনাথ মাওল 'Maval' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। Vide, *Shivaji & His Times*, p. 32.

সুলতানের সেনাপতি মুস্তাফা কর্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। জিঞ্জি দুর্গ অবরোধ* করিতে গিয়া উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শিবাজীর কার্যকলাপ যে ইহার মূল কারণ ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতঃপর শাহজীর জায়গীরও কাড়িয়া লওয়া হইল। পিতা কর্তৃক অবহেলিত পুত্র হইলেও শিবাজী শাহজীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

আক্রমণাত্মক কার্য হইতে শিবাজীর সাময়িক বিরতি

সুতরাং কিছুকালের জন্য বাধ্য হইয়াই তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করিলেন এবং পিতার মুক্তির জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র মুরাদের সহিত মুঘলপক্ষে যোগদান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন বিজাপুরের সুলতান এই সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইয়া শিবাজীর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য শাহজীকে মুক্তি দিলেন। স্যর্‌ যদুনাথের মতে বিজাপুরের কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অনুরোধে শাহজীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য শিবাজী ভবিষ্যতে বিজাপুরের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক কার্য করিবেন না এই শর্ত শাহজীকে মানিয়া লইতে হইল। সুতরাং শিবাজী কিছুকাল শান্তভাবেই কাটাইলেন এবং নিজ শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন।

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সেই সুযোগে শিবাজী জাওলী নামক মারাঠা রাজ্যটি দখল করিয়া নিজ রাজ্যসীমা ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। পর বৎসর (১৬৫৭) তিনি আহ্‌মদনগরে মুঘল অধিকৃত স্থানগুলির মধ্যে জুন্নার ও অপর কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। তখন ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে এক মুঘলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিবাজী ও মুঘল সেনার মধ্যে এই সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটিল। শিবাজী এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টিপাত শুরু হইলে ঔরংজেবের সেনাবাহিনী শিবাজীর তেমন ক্ষতিসাধন করিতে পারিল না।

জাওলী, জুন্নার ও অপরাপর স্থান অধিকার

মুঘল হস্তে শিবাজীর পরাজয়

ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলে শিবাজীর সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে (১৬৫৭-'৫৯) তিনি উত্তর-কোঙ্কণ এবং অপরাপর কয়েকটি স্থান দখল করিলেন। বিজাপুর সুলতান মুঘল আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেনাপতি আফ্‌জল খাঁকে এক বিশাল বাহিনীসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। শিবাজীকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হউক ধরিয়া আনিবার আদেশ সেনাপতি আফ্‌জলকে দেওয়া হইল।

উত্তর-কোঙ্কণ ও অপরাপর স্থান অধিকার

---

* Vide, Ishwari Prasad: *A Short History of Muslim Rule*, p. 657.

আফ্‌জল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ বিজাপুরে লইয়া আসিবেন মনস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ শিবিরে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান করিলেন। মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণজী ভাস্কর দূত হিসাবে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি আফ্‌জল খাঁর দুরভিসন্ধি সম্পর্কে শিবাজীকে ইঙ্গিত দিয়া আসিলেন। শিবাজী প্রস্তুত হইয়াই আফ্‌জলের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে শিবাজী কৃষ্ণজী ভাস্করের মাধ্যমে বিজাপুর যাইবার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আমন্ত্রণের পশ্চাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা জানিবার উদ্দেশ্যে পান্তাজী পন্থকে বিজাপুর প্রেরণ করেন। পান্তাজী আফ্‌জল খাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিলে আফ্‌জল খাঁ ও শিবাজীর মধ্যে আলোপ-আলোচনার জন্য এক শিবির স্থাপন করা হইল। এই শিবিরে আলোচনার জন্য আফ্‌জল খাঁ ও শিবাজী উপস্থিত হইলেন।* আফ্‌জল খাঁ শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিতে চেষ্টা করিলে শিবাজী তাঁহার লৌহনির্মিত 'বাঘনখ' নামক অস্ত্রদ্বারা আফ্‌জলের বক্ষ ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

সেনাপতি আফ্‌জলের হত্যা

শিবাজীকে মৃত অবস্থায় বিজাপুরে লইয়া যাইতে আসিয়া আফ্‌জল নিজ মৃতদেহই রাখিয়া গেলেন। সেনাপতি আফ্‌জল খাঁর মৃত্যুতে বিজাপুরের বিশাল সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শিবাজী অনায়াসেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া বিজাপুর রাজ্য হইতে কোলাপুর ও দক্ষিণ-কোঙ্কণ দখল করিয়া লইলেন।

কোলাপুর ও দক্ষিণ-কোঙ্কণ জয়

আফ্‌জলের হত্যার জন্য কাফি খাঁ শিবাজীকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করিয়াছেন। গ্র্যাণ্ট ডাফ্‌ ও অপরাপর ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কাফি খাঁর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া শিবাজীকেই বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠিতে (Factory) রক্ষিত কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বন্ধুত্বের ভান করিয়া শিবাজীকে বন্দী করিবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আফ্‌জল খাঁকে দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজী আফ্‌জলের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।†

আফ্‌জল খাঁর হত্যা সম্পর্কে কাফি খাঁর মন্তব্য

ইতিমধ্যে ঔরংজেব বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। শায়েস্তা খাঁ পুণা ও চকন এবং উত্তর-কোঙ্কণ ও কল্যাণ অধিকার

শায়েস্তা খাঁ

* S. N. Sen : Life of Shivaji Chhatrapati, p. 18.

† Vide, Sir J. N. Sarkar's *Shivaji & His Times*, p. 69, also footnote of the same page.

করিতে সমর্থ হইলেন। এই পরিস্থিতিতে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তিসহ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চকন দুর্গটি জয় করিয়া শায়েস্তা খাঁ যখন পুণার শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন ঐ সময়ে শিবাজী একদিন রাত্রের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে শায়েস্তা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিলেন এবং প্রায় চল্লিশ জন দেহরক্ষীকে হত্যা করিয়া শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত আক্রমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া শায়েস্তা খাঁ পলায়ন করিলেন। পলায়নের কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার হাতের একটি অঙ্গুলী হারাইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর এইরূপ শোচনীয় পরাজয়ে ঔরংজেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁর দাক্ষিণাত্য হইতে পলায়ন ও বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত (১৬৬৩)

এদিকে শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে দমন করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কূটকৌশলে শিবাজী বিজাপুরের বিরুদ্ধে মুঘলবাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহা ছাড়া, অল্পকালের মধ্যেই জয়সিংহ কূটকৌশলে শিবাজীর অনুচরবর্গের কয়েকজনকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। তারপর তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার শিবাজী মুঘলবাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার মোট ৩৬টি দুর্গের মধ্যে ২৩টি মুঘলদের নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশিষ্ট ১৩টি দুর্গের জন্যও পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবাজী নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জয়সিংহকে সাহায্য করিলেন। সেই সময়ে কুচক্রী জয়সিংহ সরলপ্রাণ শিবাজীকে নানাপ্রকার মিথ্যা প্ররোচনায় প্ররোচিত করিয়া আগ্রায় ঔরংজেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া গেলেন।

শিবাজী কর্তৃক সুরাট বন্দর লুণ্ঠন (১৬৬৪)

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ: শিবাজীর পরাজয়

পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫)

শিবাজী আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলে (১২ই মে, ১৬৬৬) তাঁহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হইল না। এমনকি পাঁচ হাজার সৈনিকের মনসবদারগণের সহিত তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। শিবাজী ঔরংজেবকে ধূর্তামি ও কপটতার জন্য প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিলেন। ফলে, তাঁহাকে পুত্র শম্ভুজীসহ নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিন্তু শিবাজী কৌশলে মুঘল প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া নিজ পুত্রসহ দিল্লী হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি নিজরাজ্য সংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি পুনরায় মুঘলদের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন এবং ক্রমাগত

শিবাজী-ঔরংজেব সাক্ষাৎকার

যুদ্ধ করিয়া একে একে মুঘল অধিকার হইতে নিজরাজ্যের মুঘল অধিকৃত অংশগুলি প্রায় সবই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগান দলপতিগণের বিদ্রোহের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে দিলীর খাঁ ও অপরাপর মুঘল সেনাপতিকেও তথায় প্রেরণ করিতে হইল। ফলে, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিয়া গেল।

শিবাজীর অভিষেক (১৬৭৪): ছত্রপতি-গোব্রাহ্মণ-প্রজাপালক উপাধি ধারণ

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর নিজ অভিষেকক্রিয়া মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইল। তিনি 'ছত্রপতি-গোব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুঘল সেনাবাহিনীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কর্মব্যস্ততার সুযোগে শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করিলেন। মহীশূরের অধিকাংশও তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। এইভাবে যখন শিবাজী নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছিলেন তখন আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৬৮০)। তাঁহার মৃত্যুকালে মারাঠা রাজ্য উত্তরে রামনগর হইতে দক্ষিণে কারওয়ার, পূর্বে বাগনালা হইতে দক্ষিণে কোলাপুর এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য এই অঞ্চলের মধ্যে পোর্তুগীজ, ইংরেজ ও আফ্রিকার বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র দমন, সলসেট্, চৌল, বোম্বাই, বেসিন প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মৃত্যু (১৬৮০)

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা (Shivaji's Administrative System): শিবাজী কেবলমাত্র দুঃসাহসী বীর এবং সমরকুশল সেনাপতি হিসাবেই ইতিহাসে পরিচিত নহেন, অনন্যসাধারণ সংগঠক এবং সুদক্ষ শাসক হিসাবেও তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিই ছিল জনকল্যাণ-সাধন এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে নিজ দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।

শাসক হিসাবে শিবাজী

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক কিন্তু স্বৈরতন্ত্র হইলেও উহা স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হয় নাই। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। কিন্তু রাজা 'অষ্টপ্রধান' নামক আটজন মন্ত্রীর এক সভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। এই আটজন মন্ত্রীর মধ্যে পেশওয়া-ই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ। অষ্টপ্রধানদের প্রত্যেকেই এক-একটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজস্ব বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, সামরিক বিভাগ, পরিবহন বিভাগ, বিচার বিভাগ, ধর্ম বিভাগ, ডাক বিভাগ ও জনকল্যাণ বিভাগ—এই আটটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য এক-একজন মন্ত্রী বা 'প্রধান' দায়ী থাকতেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ভার ছিল পেশওয়া বা প্রধানমন্ত্রীর উপর। ন্যায়াধীশ ছিলেন বিচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পণ্ডিত রাও ছিলেন ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভারপ্রাপ্ত। মুঘল শাসনব্যবস্থার সদর-ই-সুদুর-এর যে সকল কর্তব্য ছিল পণ্ডিত রাওকেও অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন করিতে হইত। উপরি-উক্ত আটটি প্রধান বিভাগ

রাজা ও অষ্টপ্রধান'

শাসন বিভাগ

ভিন্ন আরও দশটি অর্থাৎ মোট আঠারটি বিভাগে শাসনকার্যাদি বিভক্ত ছিল। 'অষ্টপ্রধানগণ' রাজার আদেশাধীনে এই সকল বিভিন্ন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনা করিতেন। রাজকর্মচারিপদ পূর্বে বংশানুক্রমিক ছিল, কিন্তু শিবাজী এই প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রথার উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার জায়গীর প্রথারও অবসান ঘটিয়াছিল।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শিবাজীর সমগ্র রাজ্য তিনটি প্রদেশে বা প্রান্তে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রান্তে একজন করিয়া রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা রাজার ইচ্ছামত মনোনীত ও পদচ্যুত হইতেন। রাজপ্রতিনিধিকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রান্তে আটজন রাজকর্মচারীর এক-একটি করিয়া সভা ছিল। প্রদেশ বা প্রান্তগুলি ছিল পরগণা বা তরফে বিভক্ত এবং এগুলি ছিল আবার গ্রামে বিভক্ত।

প্রদেশ বা প্রান্ত—
পরগণা বা তরফ—
গ্রাম

গ্রামের শাসনভার গ্রামপঞ্চায়েতের উপর-ই ন্যস্ত থাকিত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক-একজন দেশপাণ্ডে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজকর্মচারিগণ বেতন ভোগ করিতেন। প্রধানমন্ত্রী পেশওয়া, পণ্ডিত রাও এবং ন্যায়াধীশ ভিন্ন অপরাপর সকল রাজকর্মচারীকেই সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকার কার্যাদি করিতে হইত।

রাজকর্মচারিগণের সামরিক ও বে-সামরিক দায়িত্ব

শিবাজী নিজ রাজ্যের সকল জমি জরিপ করাইয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির অনুপাতে রাজস্ব ধার্য করিতেন। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। জমির রাজস্ব ভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করা হইত। মুঘল অধিকৃত স্থান ও বিজাপুর রাজ্যের কতকাংশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করা হইত। মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবাজীর রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসিগণ ফসলের 'চৌথ' অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ দিতে বাধ্য ছিল। সরদেশমুখী বা ফসলের দশমাংশ শিবাজী মরাঠা রাজ্যের সরদেশমুখ বা প্রধান হিসাবে মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কালক্রমে সরদেশমুখী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। চৌথ ও সরদেশমুখীর মূল প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতদ্বৈধ রহিয়াছে।*

রাজস্ব—ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত

চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজী সর্বপ্রথম পার্বত্য মাওয়ালী জাতির লোক লইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। পার্বত্যাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য মাওয়ালী জাতি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যাহা হউক, শিবাজীর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইলে তিনি একটি সুসংগঠিত স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনীর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা।

সেনাবাহিনী

শিবাজীর সেনাবাহিনী প্রধানত লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক ও অশ্বারোহী এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করিবার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। অশ্বারোহী সৈন্য শিলাদার ও বর্গী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিলাদারগণ সরকার হইতে অর্থ পাইত বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ অশ্ব এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে হইত। বর্গীরা সরকার হইতে নিয়মিত বেতন, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব প্রভৃতি পাইত। অশ্বারোহী সৈন্যদের পাঁচজন করিয়া এক-একজন হাওয়ালদার বা হাবিলদারের অধীনে ছিল। এইরূপ পাঁচজন হাবিলদার একজন জুমলাদারের অধীনে থাকিত। প্রতি দশজন জুমলাদার আবার এক-একজন হাজারীর অধীনে, প্রতি পাঁচজন হাজারী এক-একজন পাঁচ হাজারীর অধীনে এবং সকল

লঘু অস্ত্রধারী পদাতিক ও অশ্বারোহী

শিলাদার ও বর্গী

* Vide, Sir J. N. Sarkar: *Shivaji & His Times*, p. 457.
Ranade: *Maratha History*, Vol. I, pp. 231 ff.
An Advanced History of India, p. 519.

পাঁচ হাজারী সার্‌নোবৎ-এর অধীনে থাকিত। পদাতিক সৈন্যের প্রতি পাঁচজন একজন 'নায়েক' এবং পাঁচজন নায়েক একজন হাবিলদারের অধীনে থাকিত। দুই বা তিনজন হাবিলদারের উপর একজন জুমলাদার, দশজন জুমলাদারের উপর একজন হাজারী বা সাতজন হাজারীর উপর একজন সার্‌নোবৎ থাকিতেন।

সামরিক সংগঠন

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার সেনাবাহিনীতে ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং একলক্ষ পদাতিক ছিল। সভাসদ্ বখর-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিবাজীর হস্তিবাহিনীতে ১,২৬০টি যুদ্ধহস্তী এবং উষ্ট্রবাহিনীতে ১,৫০০ হইতে ৩০০৯টি উট ছিল। ইহা ভিন্ন, তাঁহার মোট দুইশত যুদ্ধ জাহাজও ছিল। সুরাটের ফরাসী বণিকদের নিকট হইতে শিবাজী ৮০টি কামান এবং তাঁহার গাদাবন্দুকের জন্য প্রচুর পরিমাণ সীসা ক্রয় করিয়াছিলেন, এই প্রমাণ পাওয়া যায়।* শিবাজীর সামরিক সংগঠনে দুর্গগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিত। তোরণা, জিঞ্জি, কল্যাণ, রায়গড়, পান্‌হালা প্রভৃতি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হস্তীবাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী ও নৌবহর

দুর্গ

সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে পালন করা হইত। সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা আদেশ অমান্য করিবার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর। সৈন্যশিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের সময় শিশু, স্ত্রীলোক, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মস্থান প্রভৃতির কোনপ্রকার ক্ষতি বা কোনপ্রকার অমর্যাদা করা নিষিদ্ধ ছিল।

সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Shivaji): কাফি-খাঁ ও তাঁহার অনুকরণে ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে তাহা কতক পরিমাণে অপসৃত হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায় কাফি খাঁ এবং ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।†

কাফি খাঁ ও ইওরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য

---

* Vide, Ishwari Prasad: *A Short History of Muslim Rule in India*, p. 677.

† "বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস,
এই জানে সবে ॥
অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
আজি হবে জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?"

শিবাজী উৎসব—রবীন্দ্রনাথ।

শিবাজী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি এক অসাধারণ সম্মোহনী শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যাহারাই আসিয়াছিল তাহারাই মুগ্ধ, অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া শিবাজী নিজ শ্রম ও অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হায়দর আলি ও রণজিৎ সিংহের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। আদর্শের সহিত বাস্তবতার, গভীর ধর্মপরায়ণতার সহিত চরম পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সহিত কূটকৌশলের এক অতি অদ্ভুত সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। শিবাজীর বিরুদ্ধ সমালোচক কাফি খাঁও শিবাজীর পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও শাসনদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। যুদ্ধের কালে কোন মসজিদ বা মন্দির ধ্বংস করা, কোন ধর্মগ্রন্থের অবমাননা বা অশ্রদ্ধা করা তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। শিবাজীর অনন্যসাধারণ সংগঠনী শক্তির পরিচয় তাঁহার সামরিক সংগঠনে প্রকাশ পাইয়াছিল। কাফি খাঁ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ শিবাজীকে তৈমুর ও আলাউদ্দিনের হিন্দুসংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চ আদর্শবাদিতা পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ তুলনা যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চরিত্রের গুণাবলী

শিবাজী সমসাময়িক কলুষতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম কিন্তু তিনি কোন মুসলমান, শিশু, হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোক বা ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। কাফি খাঁর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, যুদ্ধজয়ের কালে বা কোন দুর্গ বা শহর লুণ্ঠনের সময় যদি কোরাণ তাঁহার হাতে পড়িত তাহা হইলে তিনি উহা তাঁহার কোন মুসলমান অনুচরকে দান করিতেন।* ঐতিহাসিক রওলিনসন (Rawlinson)-এর মতে শিবাজী অযথা হত্যা বা অত্যাচার দ্বারা নিজের বিজয়গৌরবকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। স্ত্রীজাতির প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম এবং মুসলমানদের ধর্মস্থান রক্ষা করা তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। হিন্দু আদর্শ ও বীরত্বের এক চরম বিকাশ আমরা শিবাজীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

তাঁহার মানবতা

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

শিবাজী নিঃসম্বল অবস্থা হইতে একমাত্র নিজ অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এক বিস্তীর্ণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজাপুর ও মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুঝিয়া শিবাজী শেষ পর্যন্ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন;

রাজ্যস্থাপন

* "But he made it a rule that whenever his followers went plundering, they should do no harm to mosques, the Book of God, or woman of any one. Whenever a copy of sacred Koran came into his hands he treated it with respect and gave it to some of his Musalman followers." Khafi Khan, Vide, Ishwari Prasad, p. 683.

ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সামরিক বাহিনী সংগঠন ব্যাপারেও শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার শাসনব্যবস্থা, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। শিবাজী হয়ত নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই ঘটিয়াছিল। ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি গুণের ভিত্তিতে তিনি শাসন পরিচালনা করিয়া নিজ প্রজাবর্গের পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবিতে শিবাজী ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

তাঁহার অমরত্ব

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Shivaji): শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০) পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজা হইলেন। শম্ভুজী সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন অলস তেমনি বিলাসপ্রিয়। কবি কুলশ নামে জনৈক উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। শম্ভুজীও নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান করিয়া কিছুকাল মুঘলদের সহিত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পোর্তুগীজ ও জাঞ্জিবারের সিদ্দিগণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শক্তির অপচয় করিতে লাগিলেন। ঔরংজেব যখন তাঁহার সমগ্র শক্তিসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ে প্রবৃত্ত তখন শম্ভুজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত একযোগে ঔরংজেবের বিরোধিতা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। উপরন্তু তিনি বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহার শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় সমাপ্ত করিয়া আকস্মিকভাবে শম্ভুজীর রাজ্য আক্রমণ করিলে শম্ভুজীর পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। শম্ভুজী, কবি কুলশ ও অপরাপর বহু প্রধান কর্মচারী বন্দী হইলেন। কয়েক সপ্তাহ অকথ্য অত্যাচারের পর তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইল। ঔরংজেবের সেনাবাহিনী শম্ভুজীর রাজধানী রায়গড় ও আরও বহু দুর্গ অধিকার করিল। শম্ভুজীর শিশুপুত্রসহ তাঁহার সমগ্র পরিবার ঔরংজেব কর্তৃক বন্দী হইল।

শম্ভুজী

শম্ভুজীর হত্যা

এইভাবে মারাঠা শক্তি পর্যুদস্ত হইলেও উহার পতন ঘটিল না। অল্পকালের মধ্যেই মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং পুনরায় মুঘলদের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইল। এই দ্বন্দ্বে মুঘল শক্তি চিরতরে হীনবল হইয়া গেল। মারাঠা শক্তির এই পুনরুজ্জীবনের মূলে রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্কর মলহার, পরশুরাম ত্রিম্বক প্রভৃতি নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি মারাঠা জাতির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। মারাঠা সৈন্য মুঘলবাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সেনাপতি রুস্তম খাঁকে বন্দী করিল। মুঘল সেনা পানহালা দুর্গটি অবরোধ করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। এইভাবে মুঘলবাহিনী সর্বত্র মারাঠাদের হস্তে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতে লাগিল। মারাঠা সেনাপতি শান্তাজী ও ধনাজী ক্রমাগত মুঘলবাহিনীকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শান্তাজীর নামে মুঘলদের মনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে তাহারা কতক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে শান্তাজীরও মৃত্যু ঘটিল। মুঘলবাহিনী সুযোগ বুঝিয়া জিঞ্জি দুর্গটি অধিকার করিয়া লইল (১৬৯৮)। দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া জিঞ্জি দুর্গটি মুঘলবাহিনীর অবরোধ প্রতিহত করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে মুঘল সেনাপতি জুলফিকার খাঁ জিঞ্জি দুর্গটি দখল করিতে সক্ষম হইলেন। রাজারাম জিঞ্জি হইতে সাতারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে তিনি মারাঠাশক্তির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে মুঘলবাহিনী একে একে মারাঠা দুর্গগুলি জয় করিতে লাগিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অক্লান্ত যুদ্ধ করিয়া ঔরংজেবের সেনাবাহিনী মাত্র আটটি মারাঠা দুর্গ দখল করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণীমাতা তারাবাঈ তৃতীয় শিবাজীর নাবালকত্বে শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন এবং মারাঠা জাতির চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হানা দিতে লাগিল। কেবল দক্ষিণ-ভারতেই নহে, উত্তর-ভারতে মালব ও গুজরাট অঞ্চলেও মারাঠাগণ হানা দিতে লাগিল। ঔরংজেবের মারাঠা শক্তি দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, উপরন্তু মারাঠা আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সমগ্র ভারতে মারাঠাগণ এক প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিল।

রাজারামের আমলে মারাঠা-মুঘল দ্বন্দ্ব

মুঘলবাহিনীর সামরিক সাফল্য

তৃতীয় শিবাজী ঃ তারাবাঈ

মারাঠাশক্তির পুনরুত্থান

দ্বাদশ অধ্যায়

আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা

(Bengal under the Afghans & the Mughals)

[শের শাহ্ কর্তৃক বাংলাদেশ জয় ও তাঁহার আমলে বাংলা সম্পর্কে আলোচনা ৪৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

শূরবংশীয় আফগান সুলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ (Bengal under the Sur Afghans) : শের শাহের সুলতানির পাঁচ বৎসর ও তাঁহার পুত্র ইস্‌লাম শাহ্ শূর-এর অধীনে আট বৎসর বাংলাদেশ দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লাম শাহের মৃত্যুর (১৫৫৩) সঙ্গে সঙ্গে শের শাহ্ প্রতিষ্ঠিত আফগান সুলতানির পতন শুরু হইলে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম স্বাধীন হইয়া যায়। বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ শামস্-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ 'গাজি' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন। ইহার পর তিনি আরাকান আক্রমণ করেন। ইহা ভিন্ন, জৌনপুর দখল করিয়া ক্রমে তিনি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আদিল শাহ্-এর সেনাপতি হিমুর হস্তে তিনি ছাপরাঘাটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। আদিল শাহ্ শাহ্‌বাজ খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শাম্‌স-উদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁ এলাহাবাদে অবস্থানকালে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র 'গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন (১৫৫৬) এবং অল্পকালের মধ্যেই শাহ্‌বাজ খাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশ নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম হন।*

শামস্-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গাজি (১৫৫৩-'৫৬)

গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্ (১৫৫৬-'৬০)

ঐ বৎসর (১৫৫৬) হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকন্দর শূর-এর নিকট হইতে পাঞ্জাব ও দিল্লী পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় (১৫৫৬) বাংলাদেশ বা অপরাপর অঞ্চলে মুঘল অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ তিনি আর পান নাই। তাঁহার পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শূরবংশীয় আফগান নেতৃবর্গকে একে একে দমন করিতে অগ্রসর হন। পানিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হইলে আদিল শাহ্ শূরের দুর্বলতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেই

আদিল শাহ্ শূর-এর পরাজয় ও মৃত্যু (১৫৫৭)

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 179-'80.

সুযোগে বাংলার সুলতান গিয়াস্-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্ তাঁহাকে সুরজগড়ের অনতিদূরে ফত্পুর নামক স্থানে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইহার পর গিয়াস্-উদ্দিন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জামান এর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। কূটকৌশলী গিয়াস্-উদ্দিন খান-ই-জামানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মুঘল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি মুঘলদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করিয়া ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা জালাল-উদ্দিন শূর দ্বিতীয় গিয়াস্-উদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও মুঘলদের প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশকে মুঘল আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। কর্রাণী বংশীয় আফগান দলপতিদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমনে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, এজন্য মুঘলদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়োজন ছিল আরও বেশী। এইভাবে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিয়া জনৈক আফগান দলপতি তৃতীয় গিয়াস্-উদ্দিন উপাধি ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্রাণী বংশের জনৈক আফগান দলপতি তাজ খাঁ কর্রাণী তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এইভাবে দ্বিতীয় গিয়াস্-উদ্দিনের মৃত্যুর পরবর্তী এক বৎসর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরাজকতার পর বাংলার সুলতানি কর্রাণী আফগানদের হস্তগত হয়।

খান-ই-জামানের হস্তে গিয়াস্-উদ্দিনের পরাজয়—মুঘলদের সহিত মিত্রতা-নীতি

দ্বিতীয় গিয়াস্-উদ্দিন (১৫৬০-'৬৩)

অরাজকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব: কর্রাণী বংশের সিংহাসন লাভ

কর্রাণী বংশীয় আফগানদের অধীনে বাংলা (Bengal under the Karrani Afghans): তাজ খাঁ কর্রাণী বা কর্লাণী প্রথম জীবনে শের শাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ—ইমাদ, সুলেমান ও ইলিয়াস—মিলিতভাবে গঙ্গানদীর তীরে খোওয়াসপুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন, ঐ অঞ্চলে দিল্লী সুলতানের যে হস্তীবাহিনী মোতায়েন ছিল উহাও দখল করিয়া লইলেন। বহু সংখ্যক আফগান ভাগ্যান্বেষী দলপতি ও সৈন্য তাঁহাদের সহিত যোগ দিলে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের অবসান ঘটাইলেন। তাজ খাঁ ও সুলেমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী দশ বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার অসদুপায়ে এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ গৌড়ের অধিকাংশ ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশ অধিকার করিতে তাঁহারা সমর্থ

কর্রাণী বংশের ক্ষমতালাভ

হন।* তৃতীয় গিয়াস্-উদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করিয়া তাজ খাঁ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পর বৎসরই (১৫৬৫) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পর সুলেমান কর্‌রাণী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাজ খাঁ কর্‌রাণী (১৫৬৪-'৬৫)

সুলেমান কর্‌রাণী আট বৎসর (১৫৬৫-'৭২) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আট বৎসরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়া গিয়াছিলেন। বাংলাদেশ তখন এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলেমান কর্‌রাণীর অধীনে বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনে যেমন শান্তি বিরাজিত ছিল, বাংলার রাজ্যসীমার নিরাপত্তাও তেমনি অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহা ভিন্ন, সুলেমান কর্‌রাণীর রাজ্যবিস্তার নীতি, কূটকৌশল প্রভৃতির ফলে বাংলার রাজ্যসীমা যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিওর, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মুঘল সম্রাটের অধীনে হইবার পর সেই সকল অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবার ফলে সুলেমান কর্‌রাণী এক দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী গঠন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। শের শাহের আমলের সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অনেকে সুলেমানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সুলেমান কর্‌রাণী বাংলার যে-সকল অঞ্চল তখনও স্বাধীন ছিল সেই সকল অঞ্চলে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কোচবিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল আক্রমণ করিয়া তিনি প্রভূত পরিমাণ ধনদৌলত হস্তগত করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার রাজকোষ ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে এক দুর্ধর্ষ আফগানবাহিনী প্রেরণ করিয়া পুরীর জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠন করাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মোট পাঁচ মণ সোনা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।†

সুলেমান কর্‌রাণী (১৫৬৫-'৭২)

বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত

সুলেমান কর্‌রাণী তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ হস্তীবাহিনী গঠন করিয়া বাংলার সামরিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, শ্রেষ্ঠ হস্তীবাহিনী এবং পরিপূর্ণ রাজকোষ যাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বীকৃত হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুলেমান কর্‌রাণীর শাসন ছিল প্রজাহিতৈষী ও পক্ষপাতশূন্য। বিচারব্যবস্থায় ন্যায় এবং সততা অনুসৃত হইত। মুসলমান বিদ্বজ্জন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সামরিক শক্তি

---

* "Taj and Sulaiman fled to Bengal, when in the course of ten years, by combined force and fraud they gained possession of much of western Bengal (Gaur) in addition to the south-eastern districts of Bihar, which had fallen into a state of anarchy." Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 181.

† Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 183-'84.

সুলেমান ছিলেন দূরদর্শী শাসক। নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখিতে হইলে মুঘলদের সহিত কূটনৈতিক মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে (অযোধ্যা অঞ্চলের) শাসন-কর্তা খান্-ই-জাহান, খান্-ই খানান প্রভৃতিকে মিত্রতামূলক পত্রালাপ ও উপহার প্রেরণ করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি আকবরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।*

মুঘলদের প্রতি মৈত্রী-নীতি

আকবরের আনুগত্য স্বীকার

সুলেমান কর্‌রাণীর শাসনকালের কৃতকার্যতা প্রধানত তাঁহার উজীর মিঞা লোদীর দূরদর্শিতা ও কর্মকুশলতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সুলেমান কর্‌রাণীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বায়াজিদ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মিঞা লোদী

বায়াজিদ্ তাঁহার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের দ্বারা অতি অল্প কালের মধ্যেই আফগান অভিজাতবর্গকে শত্রুতে পরিণত করিলেন। ফলে, সুলেমান কর্‌রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা হান্সু বায়াজিদের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিল। শেষ পর্যন্ত বায়াজিদ্ এই সকল ষড়যন্ত্রকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। সুলেমান কর্‌রানীর বিশ্বস্ত উজীর মিঞা লোদী হান্সুকে হত্যা করিয়া বায়াজিদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

বায়াজিদ্ (১৫৭২-'৭৩)

পরবর্তী সুলতান হইলেন সুলেমান কর্‌রাণীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কর্‌রাণী। দাউদ কর্‌রাণী ছিলেন সুলতান-পদের অযোগ্য। ব্যাভিচার, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি দোষে তাঁহার চরিত্র দুষ্ট ছিল। স্বভাবতই তিনি স্বার্থান্বেষী আফগান অভিজাত কুৎলু লোহানী ও গুজর কর্‌রাণী প্রভৃতির কুপরামর্শে পিতৃবন্ধু বিশ্বস্ত উজীর মিঞা লোদীর বিরোধিতা শুরু করিলেন এবং তাঁহার জামাতা ইয়ুসুফ্কে হত্যা করাইলেন। মিঞা লোদীর সহিত স্বভাবতই দাউদের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্মকুশল, দূরদর্শী উজীরের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে কর্‌রাণী বংশের পতন শুরু হইল।

দাউদ কর্‌রাণী (১৫৭৩-'৭৬)

এদিকে মুঘলসম্রাট আকবর মুনিম খাঁকে বিহার জয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে মিথ্যা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া মুনিম খাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা আর কার্যকরী হইল না। এই সময়ে দাউদ কুৎলু ও গুজর খাঁর পরামর্শে মিঞা লোদীকে কর্‌রাণী বংশের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মিঞা লোদী দাউদের এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলে অপরিণামদর্শী দাউদ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হত্যা করাইলেন। ইহার ফলভোগ করিতেও বেশি বিলম্ব হইল না। মুঘলসৈন্য

মুঘলবাহিনী কর্তৃক বিহার ও বাংলাদেশ অধিকার

* *Ibid*, p. 182.

বিহার আক্রমণ করিয়া কর্‌রাণী শাসনের অবসান ঘটাইয়া উহা অধিকার করিয়া লইল। ইহার পর মুনিম খাঁ বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিহার অঞ্চল হইতে বিতাড়িত আফগানদের মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। মুনিম খাঁ বিনা বাধায় বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় রাজা টোডরমল বাংলাদেশে আসিয়া দাউদ খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার পরামর্শ দান করিলে তুকারয়-এর যুদ্ধে দাউদ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন।

বাংলায় মুঘল অধিকার স্থাপিত (১৫৭৬)

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত হইবার পর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এইভাবে সর্বশেষ আফগান সুলতানের হাত হইতে বাংলাদেশ মুঘল শাসনাধীনে চলিয়া গেল। কিন্তু তখনও বাংলাদেশের সর্বত্র নিরঙ্কুশ মুঘল শাসন স্থাপিত হয় নাই। বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় হিন্দু রাজগণ ও আফগান নেতৃবর্গ তখনও স্বাধীনভাবেই শাসন চালাইতেছিলেন।

বাংলার মুঘল শাসনকর্তা মুনিম খাঁ

মুনিম খাঁ ছিলেন বাংলার সর্বপ্রথম মুঘল প্রতিনিধি। তুকারয়-এর যুদ্ধের অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে খান্-ই-জাহান বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজা টোডরমল ছিলেন তাঁহার সহকারী। খান-ই-জাহান ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া মুসলমান। অথচ বাংলাদেশে তদানীন্তন সরকারী কর্মচারী মাত্রেই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কী। স্বভাবতই খান্-ই-জাহানের প্রভুত্ব তাঁহারা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেন না। যাহা হউক, রাজা টোডরমলের কূটকৌশল ও খান্-ই-জাহানের ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। বাংলার সুন্নী তুর্কী কর্মচারিগণ খান্-ই-জাহানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে স্বীকৃত হইলেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর খান্-ই-জাহান বাংলার শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করিবার পূর্বেই দাউদ কর্‌রাণী উড়িষ্যায় পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে ঈশা খাঁ মুঘল নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছেন। বিহারে জুনিয়াদ কর্‌রাণী ও গজপতি শাহ্ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় পুনরায় মুঘল অধিকার স্থাপনের সমস্যা দেখা দিল। খান্-ই-জাহান ও টোডরমলের চেষ্টায় রাজমহলের নিকট এক যুদ্ধে দাউদ কর্‌রাণী পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল।

দাউদ কর্তৃক বাংলা পুনরাধিকার

জুনিয়াদ কামানের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে আহত হইয়া পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহী আফগানদের মধ্যে একমাত্র কুৎলু লোহানী তখনও টিকিয়া রহিলেন। বাংলাদেশে পুনরায় মুঘল শাসন স্থাপিত হইল। দক্ষিণ বিহারে মুঘল সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁ গজপতি শাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। বাংলাদেশে খান্-ই-জাহান সাতগাঁও অর্থাৎ হুগলী অঞ্চলে আফগান

মুঘল শাসনকর্তা খান্-ই-জাহান ও তাঁহার সহকারী টোডরমল কর্তৃক বাংলা পুনরুদ্ধার

অভিজাতবর্গকে দমন করিলেন। ইহার পর তিনি ভাওয়াল অর্থাৎ ঢাকার উত্তরাংশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। সেই অঞ্চলে মুঘল নৌসেনাপতি শাহ্ বর্দি মুঘল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া ইব্রাহিম ও করিম নামে দুইজন আফগান নেতার সহিত যুগ্মভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। খান্-ই-জাহান এই তিনজনকেই পরাজিত করিয়া মুঘলসম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খাঁও তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন।* ইহার অল্পকাল পরেই খান-ই-জাহানের মৃত্যু হইল (১৫৭৮)।

খান-ই-জাহানের মৃত্যু (১৫৭৮)

পরবর্তী শাসনকর্তা ছিলেন মুজফ্ফর খাঁ। তিনি মুঘলসম্রাট আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। বিহার অঞ্চলে তিনি এককালে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশে শাসনকর্তার পদে নিযুক্তির কালে তাঁহার দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে, মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অধীন সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। মুজফ্ফর খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসেন সেই সময়ে সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবায় একজন সিপাহ্শালার বা সুবাদারের সঙ্গে এক-একজন দেওয়ান, বক্শী, মীর আদল, সদ্র, কটোয়াল, মিরবাহার, ওয়াকিনবীশ প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করেন। মুজফ্ফর খাঁর সহিতও এই সকল রাজকর্মচারী দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারিবৃন্দ এবং মুঘল সেনাবাহিনী: বহুসংখ্যক পদস্থ কর্মচারী বাংলা ও বিহারের বিভিন্নাংশ হইতে নানা অজুহাতে এবং জোর-জবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। কর্‌রাণী সুলতানদের আমলে বিশেষত সুলেমানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজিত ছিল। শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মুঘল কর্মচারীদের বিশেষভাবে সামরিক কর্মচারীদের স্বার্থপরতা ও অর্থশোষণ বাংলা ও বিহারে এক ব্যাপক হতাশা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আকবর কর্তৃক প্রেরিত বেসামরিক কর্মচারিগণ সামরিক কর্মচারীদের অর্থশোষণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনেকে উদ্ধত ব্যবহার শুরু করিলেন। কেহ কেহ আবার সামরিক কর্মচারীদের অন্যায় অর্থশোষণ বন্ধ করিতে গিয়া নিজেই অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় বিহার ও বাংলাদেশের সামরিক কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মুজফ্ফর খাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। বিদ্রোহিগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিহার ও বাংলা কবলিত করিল। কিন্তু বিদ্রোহিগণ তাহাদের সাফল্যের ফল ভোগ করিবার পূর্বেই মুঘল সেনাবাহিনী বিহার পুনরধিকার

মুজফ্ফর খাঁর শাসন-কালের দুর্বলতা

আকবর কর্তৃক নূতন শাসন পদ্ধতির প্রচলন

সামরিক কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণ

বিদ্রোহ

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 194-'95.

করিয়া লইল। তরসুন খাঁ ও টোডরমল ছিলেন মুঘলবাহিনীর সেনাপতি। এদিকে সম্রাট আকবর খান্-ই-আজমকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৫৮২)। বিহার ও অযোধ্যার শাসনকর্তা-দিগকে খান্-ই-আজমকে সাহায্যদানের আদেশও তিনি দিলেন। খান্-ই-আজম এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও বিহারের মুঘল সেনাবাহিনীসহ বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং যুদ্ধে কালাপাহাড়ের পরাজয় বাংলার বিদ্রোহী আফগান নেতৃবর্গের পতন ঘটাইল। খান্-ই-আজম বাংলা পুনরুদ্ধার করিলেন (১৫৮৩)। কিন্তু খান্-ই-আজমের বাংলাদেশের জলবায়ু পছন্দ হইল না। তিনি সম্রাট আকবরের অনুমতি লইয়া বিহার প্রদেশে তাঁহার নিজ জায়গীরে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী শাসনকর্তা শাহ্‌বাজ খাঁর বাংলায় আসিয়া পৌঁছিতে কয়েক মাস বিলম্ব ঘটিল। সেই সময়ে ওয়াজীর খাঁ ছিলেন বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনকর্তা। সুযোগ পাইয়া বাংলাদেশের বিদ্রোহিগণ পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি করিল। ১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সামরিক অভিযান করিয়া শাহ্‌বাজ খাঁ বাংলাদেশে মুঘল শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মুঘল শাসনকর্তা খান্-ই-আজম কর্তৃক বাংলা পুনরুদ্ধার

শাহ্‌বাজ খাঁ

বাংলাদেশের পরবর্তী শাসনকর্তা ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া (১৫৯৪) রাজমহলে বাংলার এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন জমিদার ঈশা খাঁ দীর্ঘকাল যাবৎ মুঘলদের বিরোধিতা করিতেছিলেন। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহিগণের অনেককে তিনি আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁর ন্যায় সুদক্ষ শাসনকর্তাও ঈশা খাঁকে দমন করিতে পারেন নাই। মানসিংহ সসৈন্যে ঈশা খাঁকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। উত্তর-বঙ্গের ঘোড়াঘাটে পৌঁছিবার পর মানসিংহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেই অভিযান ব্যর্থ হইল। এদিকে কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব ঈশা খাঁর সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মানসিংহ রঘুদেব-এর বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজপুত্র দুর্জন সিংহের অধিনায়কত্বে এক স্থল ও নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। রঘুদেব যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ ঈশা খাঁ বিক্রমপুরের অনতিদূরে মুঘলবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া মুঘলবাহিনীর অনেককে বন্দী করিতে সমর্থ হন। দুর্জন সিংহ ও আরও অনেকে এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ঈশা খাঁ মুঘলদের সহিত আর যুঝিয়া চলা সমীচীন হইবে না বিবেচনা করিয়া সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন (১৫৯৭)। ইহার দুই বৎসর পর ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়।

মানসিংহ ঃ ঈশা খাঁ

ঈশা খাঁ কর্তৃক সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার

তাঁহার মৃত্যু (১৫৯৯)

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ দক্ষিণ-ঢাকার শেরপুর নামক স্থানের স্বাধীন জমিদার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিমধ্যে মালদহ অঞ্চলে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু হইলে মানসিংহ তাঁহার পুত্র মহাসিংহকে তথায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে কুৎলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান ময়মনসিংহের মুঘল থানাদারকে বিতাড়িত করিয়া সেই অঞ্চল অধিকার করেন। মানসিংহ দ্রুত ওসমানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ কেদার রায়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুগণ (মগ) ঢাকা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলে কেদার রায় তাহাদিগকে নিজপক্ষে টানিয়া লইলেন। মানসিংহ কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করিলে বিক্রমপুরের নিকট দুই পক্ষের মধ্যে এক দারুণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কেদার রায় আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় মুঘল সেনার হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু ঢাকায় মানসিংহের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিবার পূর্বেই পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৪)। কেদার রায় ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর ও সুদক্ষ সামরিক সংগঠক। বহু পোর্তুগীজ জলদস্যুকে তিনি তাঁহার নৌবাহিনীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পর বৎসর মুঘলসম্রাট আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে মানসিংহ আগ্রায় ফিরিয়া যান। পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও সাময়িকভাবে তিনি পুনরায় বাংলার শাসনকর্তা-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কেদার রায়

বাংলার বারভুঁইয়া (Bara Bhuiyas of Bengal): বাংলাদেশে 'বারভুঁইয়া'র কাহিনী দেশাত্মবোধের উদাহরণস্বরূপ স্বীকৃতি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ 'বারভুঁইয়া' মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ ও দশের রক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একথা স্বীকার করেন না।* সার যদুনাথের মতে ইঁহারা ছিলেন সকলেই ভুঁইফোঁড় স্থানীয় জমিদার। কররাণী বংশের পতনোন্মুখতার সুযোগ লইয়া ইঁহারা বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কতক স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন। যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যকে রাণাপ্রতাপের সম্মান দান করিবার যে প্রবণতা কোন কোন লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল ইতিহাসসম্মত নহে, সার যদুনাথের মতে হাস্যকরও বটে।

বারভুঁইয়ার প্রকৃত পরিচয়

যশোরের প্রতাপাদিত্যের ন্যায় ভাটির ঈশা খাঁ ও তাঁহার পুত্র মুশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায় ও তাঁহার পুত্র চাঁদ রায়† প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্থানীয় জমিদার। মির্জা

* "A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the *Barabhuiyas* of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort." *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, *Edtd.* by J. N. Sarkar, p. 225.

† Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, p. 226.

নাথন রচিত বহারিস্তান গ্রন্থে পুনঃপুনঃ বাংলার বারভুঁইয়ার উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু এই বারভুঁইয়া কাহারা সে-বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। মাত্র একটি স্থানে কয়েকজন জমিদারের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা: বাহাদুর গাজি, সোনা গাজি, আনোয়ার গাজি, শেখ পির, মির্জা মোমিন, মধু রায়, বিনোদ রায়, পালোয়ান এবং হাজি শামস্-উদ্দিন বাগ্দাদী।* যাহা হউক, সাধারণ্যে, ঈশা খাঁ, মুশা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র, আনোয়ার গাজি প্রভৃতি বারভুঁইয়াদের মধ্যে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত।

বারভুঁইয়ার কয়েকজন

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য (Raja Pratapaditya of Jessore): যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার স্বাধীন জমিদারগণের অন্যতম প্রধান ছিলেন। বহারিস্তান, আব্দুল লতিফ-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও জেসুইট্ মিশনারীদের বিবরণে প্রতাপাদিত্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা, ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা, সামরিক সংগঠন শক্তি প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ উপরি-উক্ত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমরবাহিনী ও নৌবহর, সর্বোপরি তাঁহার ঐশ্বর্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে সমসাময়িক স্বাধীন জমিদারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছিল। তাঁহার রাজ্য যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া গঠিত ছিল। যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সাধারণ্যে যে উচ্চ ধারণা আছে, তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটি যুদ্ধেও তিনি মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন, তিনি বিনা শর্তে মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে সার যদুনাথ বলেন যে, হল্দিঘাটের যুদ্ধের বীর রাণা প্রতাপের সহিত রাজা প্রতাপাদিত্যের তুলনা করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি হাস্যকর।†

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র

তাঁহার রাজ্যসীমা

পরাজয় ও মুঘল প্রাধান্য স্বীকার

রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র (Raja Kandarpanarayan & His son Ramchandra): রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্বসীমায় রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য ছিল। বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার একাংশ লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র ছিলেন প্রতাপাদিত্যের জামাতা। নাবালক অবস্থায়ই রামচন্দ্র নিজ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জেসুইট্

কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র

* *Ibid*, p. 239.

† *Ibid*, pp. 225-26.

মিশনারীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি একবার ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ (Musa Khan, son of Isa Khan) : ভাটির দুর্ধর্ষ স্বাধীন ভূঁইয়া (জমিদার) ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের ভূঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। তিনিও পিতার অনসৃত মুঘলদের সহিত শত্রুতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ প্রয়োজন-বোধে অন্তত মৌখিকভাবে মুঘল আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। কিন্তু মুশা খাঁ মুঘল প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া মুঘলদের সহিত আজীবন যুঝিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বর্তমান ঢাকা জেলা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের অধিকাংশ লইয়া গঠিত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। খিজিরপুর, কদম রসুল ও নারায়ণগঞ্জের নিকট যাত্রাপুর নামে তাঁহার তিনটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কাত্রাভু ছিল তাঁহার পরিবার-পরিজনের বসবাসের স্থান। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর মুশা খাঁ তাঁহার রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মুঘলদের সহিত দ্বন্দ্বে মুশা খাঁ বাংলার বারভূঁইয়ার সাহায্য পাইয়াছিলেন।

মুশা খাঁর মুঘল-বিরোধিতা

বাহাদুর গাজি (Bahadur Ghazi) : ভাওয়ালের জমিদার বাহাদুর গাজি সমসাময়িক ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে মুশা খাঁকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছিলেন। মুঘলদের হস্তে মুশা খাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিলে বাহাদুর গাজি মুঘলদের পক্ষে যোগদান করেন এবং যশোর ও কামরূপ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম ভূঁইয়া আনোয়ার গাজি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বাহাদুর গাজির মুঘল আধিপত্য স্বীকার

সোনা গাজি (Sona Ghazi) : ত্রিপুরার উত্তর সীমায় সরাইল নামক স্থানের জমিদার ছিলেন সোনা গাজি। তাঁহারও বহুসংখ্যক যুদ্ধ-নৌকা ছিল। তিনি মুশা খাঁকে মুঘলদের বিরুদ্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন এরূপ কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত তিনি পূর্বাহ্নেই মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

সোনা গাজির মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার

[ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতির সম্পর্কে আলোচনা ৫৮৬-৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

রাজা মানসিংহ যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন বাংলার স্বাধীন জমিদারগণের নিকট হইতে কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্যের স্বীকৃতিই লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার চেষ্টাও সেই সময়ে করা হয় নাই। জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হইলে পর বাংলার স্বাধীন জমিদারগণকে সম্পূর্ণভাবে পদানত করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মানসিংহকে পুনরায় বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু পর বৎসরই (১৬০৬) তাঁহাকে বিহারের

মানসিংহের তৃতীয়বার বাংলার শাসনভার গ্রহণ (১৬০৫-৬)

শাসনকর্তা রোটাসের গিরিদুর্গে প্রেরণ করিলেন। কুতব-উদ্দিন খাঁ কোকা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কুতব-উদ্দিন খাঁ কোকা ও তাঁহার পরবর্তী শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ উভয়েরই শাসনকালের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কুতব-উদ্দিন কোকা বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর সহ্য হয় নাই। শাসনকর্তা-পদ গ্রহণ করিবার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী শাসনকর্তা ইস্‌লাম খাঁ ছিলেন যেমন সুদক্ষ শাসক, দুর্ধর্ষ সেনাপতি, তেমনি বিচক্ষণ রাজনীতিক। তিনি বাংলার বারভুঁইয়াদিগকে দমন করিয়া তাঁহাদিগকে মুঘলসম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মুশা খাঁ, রাজা প্রতাপাদিত্য, ওস্‌মান আফগান প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ইস্‌লাম খাঁ সিলেট্ বা শ্রীহট্ট, কাছাড়, ধুব্‌ড়ী প্রভৃতি অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইস্‌লাম খাঁ বাংলাদেশে মুঘল অধিকার নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্য গঠনে তাঁহার অবদান অপরিসীম। বাংলার ইতিহাসে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল শাসনকর্তা।

কুতব-উদ্দিন কোকা (১৬০৬-৭)

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ (১৬০৭-৮)

ইস্‌লাম খাঁ (১৬০৮-১৩) তাঁহার কৃতিত্ব

ইস্‌লাম খাঁর পরবর্তী শাসনকর্তা কাসিম খাঁ ছিলেন অকর্মণ্য শাসক। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশের কোন কোন অংশ মগ ও ফিরিঙ্গীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ইস্‌লাম খাঁর আমলে যে শান্তি, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি মুঘলগণ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেওয়ান মির্‌জা হুসেন বেগ-এর সহিত বিবাদ-বিসংবাদের ফলে এই অব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কাসিম খাঁর সামরিক অভিযানগুলিও বিফল হইয়াছিল। কিন্তু কাসিম খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসিলে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য, বিবেচনা-বুদ্ধি, তাঁহার কর্মদক্ষতা প্রভৃতি তাঁহাকে ইস্‌লাম খাঁ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরা ও আরাকানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার নীতির পক্ষপাতী। উন্নয়নমূলক কার্যাদি সুশাসন, শান্তি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কাসিম খাঁ (১৬১৩-১৭)

ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭)

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাহ্‌জাহান নূরজাহানের বিরোধিতায় দিল্লী সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মুঘল সেনাপতি ও পরভেজ্ তাঁহাকে

দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করিলে শাহ্‌জাহান বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে নিজ পক্ষে টানিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম খাঁ মুঘলসম্রাটের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। শাহ্‌জাহান সাময়িকভাবে বাংলাদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। উড়িষ্যাও তাঁহার অধিকারে আসিল। তারপর তিনি বিহার জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। বিহার প্রদেশটিও সহজেই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে ক্রমে জৌনপুর, বাণারস, চুণার, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া তিনি যখন অভিযানে ব্যস্ত সেই সময়ে সম্রাটের সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফলে, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ জাহাঙ্গীরের অধিকারে আসিল।

বিদ্রোহী শাহ্‌জাহান কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত (১৬২৪)

শাহ্‌জাহানের পরাজয়, জাহাঙ্গীরের অধিকার পুনঃস্থাপিত

বাংলাদেশের ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁহার দীর্ঘ বাইশ বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে ইস্‌লাম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁর চেষ্টায় বাংলার সর্বত্র মুঘল অধিকার নিরঙ্কুশভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া অহোম ও আরাকান রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, আরাকান ও অহোম রাজ্যের সহিতও মুঘলসম্রাটের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত

শাহ্‌জাহান ও ঔরংজেবের দীর্ঘ আশী বৎসরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি অব্যাহতই ছিল। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সর্বশেষ শাসনকর্তা ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া কাসিম খাঁ যুইনিকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনকর্তা। তাঁহার শাসনকালের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হুগলীর পোর্তুগীজদের দমন।

ফিদাই খাঁর পদচ্যুতি —কাসিম খাঁ যুইনির নিয়োগ

পোর্তুগীজ বণিকগণই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রতি বৎসর আসিত এবং ব্যবসায়ের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আবার দেশে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবসায়ে অত্যধিক লাভ হওয়াতে তাহারা ক্রমে সাতগাঁও অঞ্চলে স্থায়িভাবে বাস করিতে শুরু করে। স্থানীয় জমিদারগণ ও বাংলার শাসকবর্গও পোর্তুগীজদের সহিত ব্যবসায় উভয় পক্ষেই লাভজনক দেখিয়া তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার শুরু করিলেন। ক্রমেই সাতগাঁও অঞ্চলে পোর্তুগীজগণ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। সাতগাঁও অঞ্চল

পোর্তুগীজ বণিকদের আগমন

সাতগাঁও অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন

ব্যবসায়ের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠিলে তাহারা হুগলীতে সরিয়া গেল। এইভাবে পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর-ভারতে এক অতি ব্যাপক ব্যবসায় শুরু করিল। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদের নেতা পেড্রো ট্যাভারে (Pedro Tavares) সম্রাট আকবরের আদেশে দিল্লী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ব্যবহারে সম্রাট আকবর এত প্রীত হইলেন যে, তিনি পেড্রো ট্যাভারেকে বাংলাদেশে পোর্তুগীজগণকে একটি শহর স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহাদিগকে তিনি ধর্মাচরণের, খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার এবং গির্জা স্থাপনের স্বাধীনতাও দান করিলেন। এই অনুমতি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগীজগণ হুগলীতে এক পোর্তুগীজ উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। অবশ্য পোর্তুগীজগণকে সম্রাটের আইন-কানুন ও আদেশ মানিয়া চলিতে ও করদান করিতে হইত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে হুগলী পোর্তুগীজদের রাজার অধীন উপনিবেশে পরিণত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলীর অধিবাসীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল উহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। মুঘলসম্রাট পোর্তুগীজগণকে হুগলীর অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা ও উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব দানে অস্বীকৃত ছিলেন না। অবশ্য সর্বোপরি মুঘলসম্রাটের আধিপত্য তাহারা মানিয়া চলিবে, এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। হুগলীর অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য স্পেন-পোর্তুগালের রাজা (পোর্তুগাল সেই সময়ে স্পেন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল) একজন ক্যাপ্টেন্ (Captain or Connidor) নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন্-এর আদেশ সাধারণ লোকে মানিয়া চলিলেও বিত্তশালী পোর্তুগীজগণ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিত না। উপরন্তু তাঁহারা ব্যভিচারে নিমজ্জিত থাকিত এবং নানাপ্রকার অন্যায়-আচরণে পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইত। হুগলীর সামরিক অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ব্যভিচার দেখা দিবার ফলে সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা চরমে পৌঁছিয়াছিল।

হুগলীতে স্থায়িভাবে বসবাস

পেড্রো ট্যাভারের সম্রাট আকবরের সভায় গমন ঃ বাংলাদেশে শহর স্থাপনের অনুমতিলাভ

হুগলীর পোর্তুগীজদের ব্যভিচার ও অনৈতিকতা

হুগলীর পোর্তুগীজ অধিবাসিগণ মুঘল সাম্রাজ্যের কোন অংশে কোন প্রকার আক্রমণ করিত না।* কিন্তু আরাকানের রাজার সহিত সহযোগী অপরাপর বহু পোর্তুগীজ

* "The portuguese settlers of Hughli did not themselves commit piracy in the Mughal territorial waters, nor raid Bengal villages for capturing slaves. But they shared the odium of their fellow countrymen who lived in Arakan as allies of the Magh King and made annual raids in the rivers of lower Bengal, commiting unspeakable atrocities on the Indians who fell into their hands." *History of Bengal* (D. U.), Vol. II. pp. 301-2.

জলদস্যু বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইত। তাহারা গ্রামাঞ্চল হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া হুগলীতে বিক্রয় করিত। এইভাবে পোর্তুগীজ (ফিরিঙ্গী) নামের প্রতিই ক্রমে ভারতীয়দের এক তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। হুগলীতে স্থায়িভাবে বসবাসকারী পোর্তুগীজগণও এই অপবাদ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পাইল না। ইহা ভিন্ন, হুগলীর পোর্তুগীজগণ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদিগকে নানাপ্রকার অন্যায় উপায়ে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিতে থাকিলে তাহাদের প্রতি বাঙালী তথা ভারতীয়দের বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহাদের উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় ও সংখ্যাবৃদ্ধিও মুঘল সম্রাটের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কারণে সম্রাট শাহ্‌জাহান বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খাঁকে হুগলী অধিকার করিতে এবং পোর্তুগীজশক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন।

পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার

শাহ্‌জাহানের আদেশে কাসিম খাঁ কর্তৃক হুগলী অধিকার

ফাদার জন ক্যাব্রাল (Father John Cabral) শাহ্‌জাহানের আদেশে হুগলী অধিকারের তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমত, শাহ্‌জাহান যখন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বাংলাদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন ম্যানোয়েল ট্যাভারে (Manoel Tavares) তাহার প্রতি নানাপ্রকার অন্যায়মূলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, শাহ্‌জাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে পর হুগলী হইতে কোনপ্রকার উপঢৌকন বা দূত প্রেরণ করা হয় নাই। তৃতীয়ত, হুগলীর পোর্তুগীজগণ মুঘলসম্রাটের শত্রু আরাকানরাজকে গোলাবারুদ, বন্দুক প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেছিল।

হুগলী অধিকারের কারণ

যাহা হউক, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাসিম খাঁ হুগলী অবরোধ করিয়া পোর্তুগীজদের নিকট যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সেই শহরটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। এই আক্রমণে একশত হইতে সামান্য বেশী সংখ্যক পোর্তুগীজ স্ত্রী, পুরুষ প্রাণ হারাইয়াছিল এবং চারিশত ফিরিঙ্গীকে শাহ্‌জাহানের দরবারে বন্দী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল।* এই সকল বন্দীকে ইসলামধর্মে দীক্ষাগ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ করিতে বলা হইলে অধিকাংশই ইহাতে অস্বীকৃত হয়। যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।†

ফলাফল

পরবর্তী শাসনকর্তা যুবরাজ সুজার অধীনে (১৬৩৯-৬০) বাংলাদেশে দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজিত ছিল। সুজা স্বয়ং রাজমহলে বাস করিতেন; এবং তাঁহার সহকারী ঢাকা হইতে শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। যুবরাজ হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সাধারণ পর্যায়ের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অপেক্ষা বহু বেশী ছিল, এই কারণে তাঁহার আমলে

বাংলার শাসনকর্তা সুজা (১৬৩৯-৬০)

* Vide, *History of Bengal* (D. U.), Vol. II, pp. 327-28.

† *Idem.*

কোন বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। বহিরাগত আক্রমণও তাঁহার সময়ে ঘটে নাই বলিলেই চলে। সুজার নামই তখন সমগ্র জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার করিত। উড়িষ্যার শাসনভারও সুজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ১৬৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুজা দুইবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাংলার শাসনব্যবস্থায়ও তেমনই শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। খাজওয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) পরাজিত হইলে সুজার সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিরজুমলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলে বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার অবসান ঘটে।

খাজওয়ার যুদ্ধ—সুজার পরাজয়—মিরজুমলার শাসন-কর্তৃপদ লাভ

আপাতদৃষ্টিতে অরাজকতা দূর হইলেও সমরকুশলী শাসনকর্তা মিরজুমলা বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। মগ জলদস্যুদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য সেই সময়ে শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মিরজুমলা আসাম অভিযানে যাত্রার ফলে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, জলদস্যুর উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া-ই চলিয়াছিল। পরবর্তী শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে এজন্য একটি নূতন নৌবহর গঠন করিতে হইয়াছিল। মিরজুমলা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিসের একচেটিয়া আড়তদারী সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদের জাহাজে করিয়া তিনি পারস্যদেশে নানাপ্রকার সামগ্রী রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ-গণকে তিনি যুবরাজ সুজার বিরুদ্ধে সাহায্যদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। মিরজুমলার শাসনকালে বাংলাদেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ দুই বৎসরকাল ধরিয়া অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল। মিরজুমলা সেই সময়ে আসাম অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। মিরজুমলার শাসনকাল কুচবিহার জয় ও আসাম জয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আসাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই অসুস্থতার ফলে ঢাকার অনতিদূরে খিজির-পুর নামক দুর্গে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৩)।

মিরজুমলার শাসনব্যবস্থা

কুচবিহার ও আসাম জয়—মৃত্যু (১৬৬৩)

মুঘলযুগে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি (Economy, Society & Culture of Bengal under the Mughals): মুঘল শাসনকালে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। বাংলা ও বাঙালীর জীবন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মুঘল যুগেই বহির্জগতের, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য-দেশের সহিত বাংলাদেশের যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাহার মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়া বর্তমান বাংলা ও বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। বিশাল সামুদ্রিক

বাংলার নূতন রূপ পরিগ্রহণ

বাণিজ্য, বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি, হিন্দু-মুসলমান শিল্পী, সাহিত্যিক ও ধর্মজ্ঞানীদের উদ্ভব, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি মুঘল আমলের দান বলা যাইতে পারে।

মুঘল আমলে শাসন, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি (Administration, Economy, Society and Culture under the Mughals):

শাসনব্যবস্থা (Administrative System): বাবর ও হুমায়ুনের আমলে শাসনব্যবস্থা ছিল সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার অনুসরণ মাত্র। এই দুইজনের কেহই শাসনব্যবস্থার কোন সংস্কার সাধন বা নূতন কিছুর উদ্ভাবন করেন নাই। অবশ্য এজন্য তাঁহারা অবকাশও পান নাই। মুঘল শাসনব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বস্তুত সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হইয়াছিল। আকবর-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা মুঘল আমলে কার্যকরী ছিল বটে, কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমল হইতে আকবরের শাসনব্যবস্থার মৌল নীতিগুলির পরিবর্তন ঘটে. আকবরের উদার, সর্বধর্ম-সহিষ্ণু. জাতীয়তাবাদী নীতির স্থলে ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতির প্রয়োগের সূত্রপাত শাহ্‌জাহানের আমল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ঔরংজেবের অধীনে ইহা চরমে পৌঁছে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়।

সমাজ জীবন (Social Life): ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত রাজা ও সম্রাটদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। অবশ্য মধ্যযুগীয় ইওরোপের ইতিহাসেও এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ ঐ সময়কার ঐতিহাসিকের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল। রাজা, মহারাজা, সুলতান বা সম্রাটের কাহিনী বর্ণনায় জনসাধারণের সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন হইত উহা ভিন্ন, তাহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপাংক্তেয় ছিল। একমাত্র আবুল ফজল এবং ইওরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণনায় সমসাময়িক জনসমাজ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যালফ্, ফীচ্, উইলিয়াম হকিন্স, সার টমাস রো, ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট, বার্ণিয়ে, টেভার্নিয়ে, থেভেনো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসে জনসাধারণ সম্পর্কে বিবরণের অভাব

সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। অভিজাত শ্রেণী এবং রাজকর্মচারী ভিন্ন অপর কেহই তেমন সম্মানিত ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত ছিল। বিলাসব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্রাট ভিন্ন বর্ধিষ্ণু অভিজাতগণেরও 'হারেম' থাকিত। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সম্রাটের হারেমে পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক থাকিত। সেই যুগে

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ: অভিজাত শ্রেণী

অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

অভিজাত সম্প্রদায়ের নীচে মধ্যবিত্ত সমাজেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা যেমন ছিল অল্প, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল তেমনি সাধারণ। মাদক দ্রব্যাদিতে আসক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি হইতে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বণিকগণ অবশ্য অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল খুব উচ্চ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থা ঊর্ধ্বতন শ্রেণীর তুলনায় অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, জুতা প্রভৃতি তাহাদের ক্রয়ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদিও ছিল অতি সাধারণ। পেলসার্ট (Francisco Palsaert)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় তাহাদের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা না থাকিলেও দুর্ভিক্ষ বা কোনপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিলে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না।

সাধারণ শ্রেণী

বিদেশী পর্যটক পেলসার্ট ভারতবর্ষে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন সমাজ সম্পর্কে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে তিন শ্রেণীর লোক ছিল যাহারা নামেমাত্রই স্বাধীন প্রজা বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুত, তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না। এই তিন শ্রেণী হইল: শ্রমিকশ্রেণী, দোকানদার শ্রেণী এবং বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী। সেই সময়ে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল এবং খোজা ও ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় নির্বিবাদে চলিত।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে পেলসার্টের বর্ণনা

দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা মাটির ঘরে বাস করিত এবং তাহাদের উপর নানাপ্রকার জুলুম চলিত। শাহ্জাহানের আমল হইতে সাধারণ শ্রেণী, বিশেষত কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয়। ফলে, তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন।

সাধারণ শ্রেণীর দুরবস্থা

অমিতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যাইত। সাধারণ লোকের মধ্যে এই সকল দুরাচার মোটেই ছিল না। তাহারা যেমন ছিল মিতাচারী তেমন ধর্মপরায়ণ। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা ঐ সময়কার সমাজ-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর বাল্য-বিবাহ এবং বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বোল্ট, ক্র্যাফটন, ক্র্যাফোর্ড প্রভৃতি ইওরোপীয় লেখক তদানীন্তন সমাজের উপরি-উক্ত কুসংস্কারগুলির উল্লেখ

সামাজিক রীতি-নীতি

করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ প্রথা কেবলমাত্র মারাঠা, জাঠ ও অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের নৈতিকতা সম্পর্কে টেভার্নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনকার হিন্দু সম্প্রদায় মিতব্যয়ী, সৎ এবং সচ্চরিত্র ছিল।

হিন্দু সমাজের নৈতিকতা

অর্থনৈতিক জীবন (Economic Life) : মুঘল যুগে প্রজাবর্গের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপন্ন হইত। বাংলা ও বিহারেই আখ বেশী জন্মাইত বলিয়া এই দুই দেশেই চিনি প্রস্তুত হইত এবং ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে সেই চিনি প্রেরিত হইত। পেলসার্টের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমুনা উপত্যকা এবং মধ্য-ভারতে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন, রেশম, তুলা, তামাক প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। যে বৎসর ফসল ভাল হইত সেই বৎসর কৃষকদের মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই চলিত, কিন্তু অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কালে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না। দুর্ভিক্ষও যে না ঘটিত এমন নহে, কয়েক বৎসর পর পরই দুর্ভিক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি দেখা দিত।

কৃষি : উৎপন্ন শস্যাদি

মুঘল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য। এই সকল সামগ্রী সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হইত। ভারতীয় সূতীবস্ত্রাদি বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। ঐ সময়ে কুটির-শিল্প ভিন্ন বড় বড় সরকারী কারখানাও ছিল। বার্ণিয়ে বাংলাদেশকে রেশম ও সূতীবস্ত্রের আড়ং বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লাহোর ও কাশ্মীর শাল, গালিচা প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল দ্রব্যও বিদেশে সমাদৃত ছিল। বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে সোরা (Saltpetre) উৎপন্ন হইত এবং বিদেশীয় বণিকগণ উহা ইওরোপে চালান দিত।

শিল্প : শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি

রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোরা, রেশমবস্ত্র, সূতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি, আফিং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমদানি সামগ্রীর মধ্যে চীনামাটির বাসন, ঘোড়া, মূল্যবান মণিমুক্তা, কাঁচামাল হিসাবে রেশম এবং আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমদানি ও রপ্তানি

মসুলীপট্টম, সুরাট, বোম্বাই, কালিকট, চট্টগ্রাম, ভারুচ প্রভৃতি মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর ছিল। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য দ্রব্যাদি স্থল ও জলপথে বহন করা হইত। সেই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ রাজপথও ছিল। পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য সরাইখানা ও বিশ্রামঘর থাকিত। জলপথ বা স্থলপথে বণিকগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত।

বাণিজ্যবন্দর, জল ও স্থলপথ

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে শিল্পজীবীদের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও কৃষিজীবীদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে। ঔরংজেবের রাজত্বকালে জনসাধারণের

অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লোপ পাইতে থাকে। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক অব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবন পর্যুদস্ত হইয়া পড়ে। দেশের কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অবনতি দেখা দেয়। ১৬৯০-৯৮ এই কয়েক বৎসর ইংরেজ বণিকগণ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্রাদি যোগাড় করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই তখনকার অর্থনৈতিক অবনতির ধারণা জন্মে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবনতি

বাংলাদেশ ঐ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইতে মুক্ত ছিল বটে, তথাপি ঔরংজেবের দীর্ঘকালব্যাপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ব্যয় বাংলা সুবার রাজস্ব হইতেই সঙ্কুলান করা হইত। ফলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হ্রাস পাইয়াছিল। তদুপরি নাদির শাহের লুণ্ঠন, ইংরেজ বণিকগণের প্রতিযোগিতা দেশের অর্থনৈতিক জীবনেও এক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছিল।

শিল্প ও সাহিত্য (Art & Literature): তুর্কী-আফগান যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সূচনা হইয়াছিল আকবরের আমলে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাহ্‌জাহান বিশেষত ঔরংজেবের আমলের সংকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতি এই পরস্পর সৌহার্দ্য বিনাশ করিতে পারে নাই। এই দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে যে নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সমসাময়িক স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে সেকালে এক নূতন বলিষ্ঠ শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ

বাবর ভারতীয় শিল্পরীতি পছন্দ করিতেন না। তিনি কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌ল হইতে সিনা নামে জনৈক স্থপতিকে তাঁহার মসজিদ ও অপরাপর সৌধাদি নির্মাণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু পারসি ব্রাউন (Mr Percy Brown) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌লের শিল্পরীতির কোন পরিচয় বাবরের শিল্প-নিদর্শনে দেখিতে পান নাই। উপরন্তু বাবর যে অসংখ্য ভারতীয় স্থপতি ও প্রস্তর-শিল্পীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের আমলে শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে সম্বলের 'জামি মসজিদ', আগ্রায় একটি মসজিদ এবং পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে একটি মসজিদ এখনও বিদ্যমান।

বাবরের শিল্পানুরাগ

মুঘলসম্রাটগণ, শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। হুমায়ুনের আমলেরও দুইটি মসজিদ তাঁহার স্থাপত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ঐ সময়কার স্থাপত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে শের শাহের দান নেহাত কম ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত 'পুরান কিলা', 'কিলা-ই-কুহ্‌না মসজিদ' এবং সাসারামে শের শাহের সমাধি-সৌধ প্রভৃতি এক অতি উন্নত এবং আলঙ্কারিক ধরনের শিল্পরীতির পরিচায়ক।

হুমায়ুন ও শের শাহের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

সম্রাট আকবর শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে আকবরের শিল্পজ্ঞান ও নির্মাণকার্যাদির ব্যাপারে ব্যবসায়ীসুলভ পরিদর্শন-ক্ষমতার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

আকবরের আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপত্যের সংমিশ্রণ

আকবরের আমলে নির্মিত প্রাসাদ-দুর্গ, মসজিদ ও সমাধি-সৌধগুলির মধ্যে ফতেপুর সিক্রি, জাহাঙ্গীরী মহল, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদৎখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা আকবরের জীবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল।

আকবরের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

আকবরের স্থাপত্য কীর্তির তুলনায় তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্যকার্যাদি নগণ্য ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি ইতিমাদ্-উদ্-দৌলার সমাধি-সৌধটি তাঁহার শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার আমলে মুঘল শিল্পরীতির সহিত রাজপুত শিল্পরীতির যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিমাদ্-উদ্-দৌলার সমাধি-দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়।

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য-শিল্প

মুঘল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পানুরাগের উৎকর্ষের জন্য সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকাল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মৌলিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে শাহ্জাহানের আমলে শিল্পকৌশল আকবরের আমলের শিল্পকৌশল অপেক্ষা নিম্নস্তরের ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আলংকারিক শিল্পকৌশলে উহা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। শাহ্জাহানের আমলে 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জামি মসজিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তাজমহল' সমাধি-সৌধটি হইল শাহ্জাহানের জগদ্বিখ্যাত শিল্পকীর্তি। ইহা শাহ্জাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের দেহাবশেষের উপর নির্মিত। শিল্পকৌশলেও শাহ্জাহানের আমল যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পরিতাপের বিষয় এই সিংহাসনটি পারস্যের নাদির শাহ্ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ঔরংজেবের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির ফলে মুঘল স্থাপত্য বা শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও শিল্পের প্রতি স্বভাবতই কোন অনুরাগ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবলমাত্র হায়দরাবাদ ও অযোধ্যায় উন্নত ধরনের শিল্পরীতি আরও কিছুকাল ধরিয়া টিঁকিয়াছিল।

শাহ্জাহানের স্থাপত্য শিল্পানুরাগ—তাজমহল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

ঔরংজেবের আমলে শিল্পের অবনতি

যেমন স্থাপত্যে তেমনি চিত্রশিল্পে মুঘল যুগে ভারতীয় শিল্পরীতির সহিত চৈনিক, ইরানীয়, গ্রীক (ব্যাক্ট্রীয়) এবং মোঙ্গলীয় শিল্পরীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চীন শিল্পের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক নূতন চিত্রশিল্প-কৌশলের পরিচয় আকবরের আমল হইতেই পাওয়া যায়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রশিল্পানুরাগ শাহ্জাহানের

চিত্রশিল্প

আমলে কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমসামরিক কালে রাজপুত চিত্রশিল্প বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

সঙ্গীতশিল্প

একমাত্র ঔরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান প্রভৃতি মুঘলসম্রাট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তানসেন ছিলেন আকবরের সভাসদ্‌। মালবের শাসনকর্তা বাজবাহাদুরও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। ঔরংজেবের আমলে দরবারে সঙ্গীতশিল্প নিষিদ্ধ হওয়ায় উহার অবনতির সূত্রপাত হয়।

শিক্ষা

মুঘল যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না বটে, তথাপি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধরনের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না একথা বলা চলে না। মক্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি ছিল ঐ যুগের শিক্ষায়তন। স্থানীয় শাসক এবং জমিদারগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাবরের আমলে বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণের ভার 'সুহরৎ-ই-আম' (Public Works Department) নামে সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সময়ে আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিত। বহু হিন্দু ঐ সময়ে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। উপনিষদ্‌, ভগবদ্‌গীতা এবং 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' ঐ যুগে সংস্কৃত হইতে ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সম্রাটগণ ও যুবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষানুরাগ যে না ছিল এমন নহে। শাহ্‌জাহান তুর্কী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুবরাজ দারা ছিলেন মুঘল রাজপরিবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি। অভিজাত পরিবারেও বিদ্বানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীশিক্ষাও সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে রাজপরিবারের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, জেব উন্নিসা প্রভৃতি মহিলাগণ আরবী এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

মুঘলসম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক বিদ্বান মনীষীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা বাঙালী কবি মাধবাচার্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আকবরের সাহিত্যানুরাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি, কবিতা এবং অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'তারিখ-ই-আলফি', 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবরনামা', 'মাসির-রহিমী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবরের আমলে রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং অথর্ববেদ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কয়েকখানি গ্রীক ও আরবী গ্রন্থও ঐ যুগে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। ফৈজী, ফিজালী, হুসেন নাজিরী,

জামাল-উদ্দিন উরফি ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের রাজত্বকাল ভিন্ন বাবরের জীবনস্মৃতি, জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, 'ইক্‌বালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী', 'মা-আসীর-ই-জাহাঙ্গীরী', 'জুব্‌দ-উৎ-তোওয়ারিখ্‌', 'পাদশাহ্‌-নামা', 'শাহ্‌জাহান-নামা', 'আলমগীর-নামা', 'মুন্তাখাব-উল্‌-লুবাব' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশেও মুঘল যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঐ সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ত্রিলোচন দাস, ভক্তি-রত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের উদ্ভব ঐ যুগে ঘটিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাশীদাস-রচিত মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতিও ঐ যুগের সাহিত্য-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বাংলার মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ, আলীবর্দী খাঁ, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বীরভূমের আসাদুল্লা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

———

পরিশিষ্ট (ক)

বংশ-পরিচয়

(১)

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)

(২)

খল্জী বংশ (১২৯০-১৩২০)

(৩)

তুঘ্‌লক বংশ (১৩২০-১৪১৩)
তুঘ্‌লক শাহ্‌ (১৩২০-২৫)
রজব
মহম্মদ জোনা (বিন্‌-তুঘ্‌লক) (১৩২৫-৫১)
ফিরুজ শাহ্‌ (১৩৫১-৮৬)
ফত খাঁ
জাফর খাঁ
নাসির-উদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ (১৩৯০-৯৪)
আবুবক্‌র (১৩৯০)
গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক (১৩৮৮-৮৯)
নুসরৎ-শাহ্‌ (১৩৯৬-৯৯)
আলা-উদ্দিন সিকন্দর (১৩৯৪)
মাহ্‌মুদ-শাহ্‌ (১৩৯৯-১৪১৩)

(৪)

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)
খিজ্‌র খাঁ (১৪১৪-২১)
মুইজ্‌-উদ্দিন মোবারক (১৪২১-৩৪)
ফরিদ খাঁ
মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৪-৪৫)
আলা-উদ্দিন আলম শাহ্‌ (১৪৪৫-৫১)
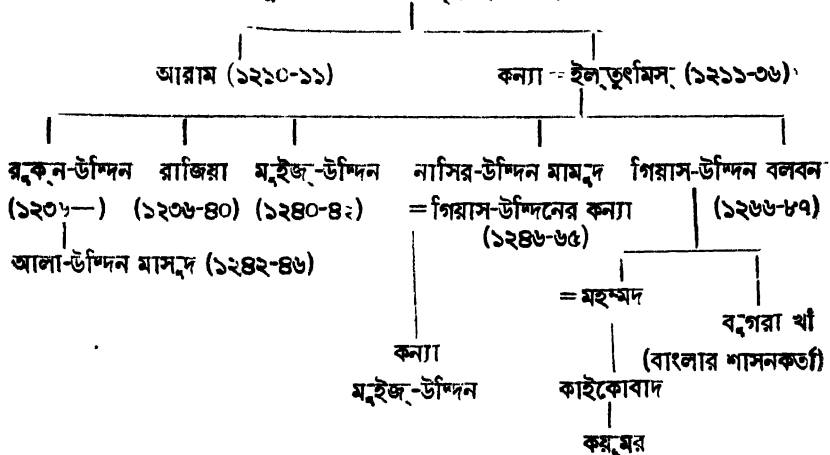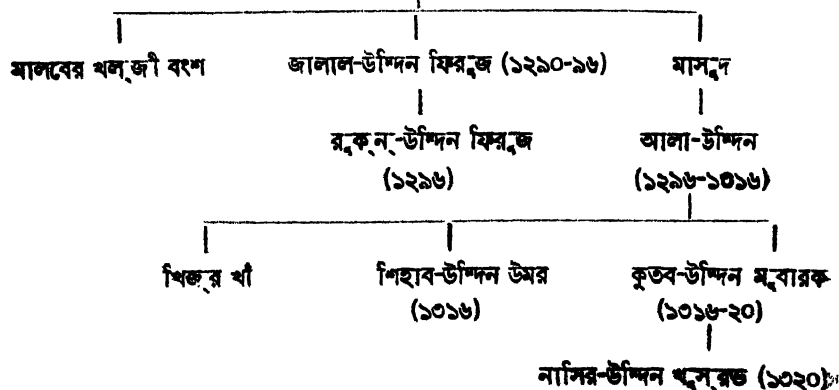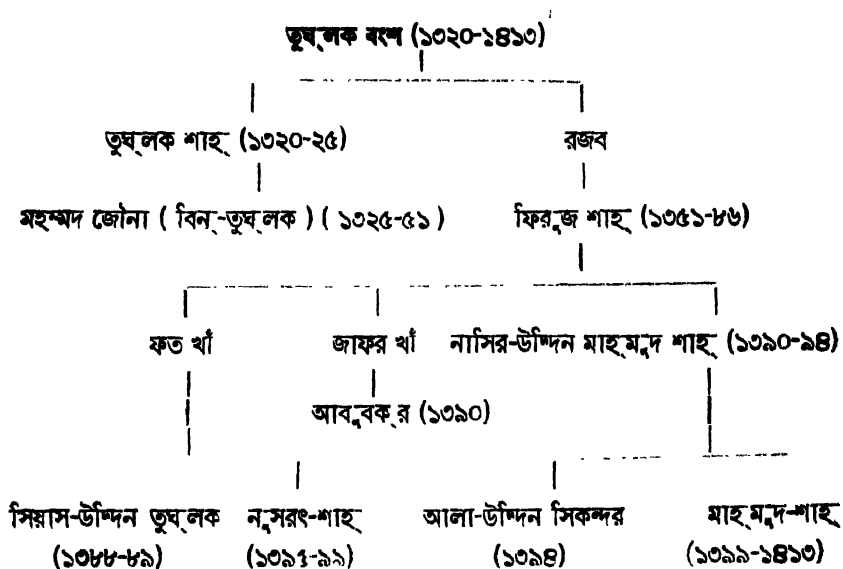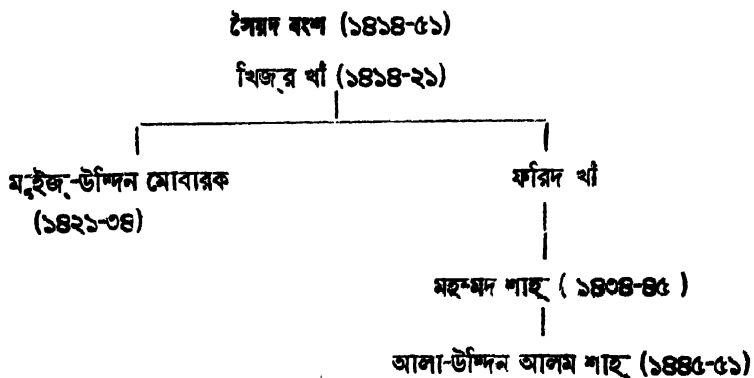
(৫)

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬)

বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
|
সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
|
ইব্রাহিম লোদী(১৫১৭-২৬)

বাংলার স্বাধীন সুলতানি বংশ

(১)

ইলিয়াসশাহী বংশ

হাজী শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস্‌ (১৩৪৫-৫৭)

- সিকন্দর শাহ্‌ (১৩৫৭-৮১)
  - গিয়াস-উদ্দিন আজম (১৩৮৯-১৪০৯)
    - সৈইফ-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ (১৪০৯-১০)
      - শামস্‌ উদ্দিন (২) (১৪৩১-৪২)
      - শিহাব-উদ্দিন বায়াজিদ্‌ (১৪১২-১৪)
- (?) নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌ (১) (১৪৪২-৬০)
  - রুক্‌নু-উদ্দিন বারবক্‌ (১৪৬০-৭৪)
    - শামস্‌-উদ্দিন ইয়ুসুফ (১৪৭৪-৮১)
      - (?) সিকন্দর শাহ্‌ (২) (১৪৮১)
  - জালাল-উদ্দিন ফত শাহ্‌ (১৪৮১-৮৯)
    - (?) নাসির-উদ্দিন মামুদ (২) (১৪৮৯-৯০)

* রাজা গণেশ (১৪১১—?)
|
যদু ঃ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত
= জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌
(১৪১৪-৩১)

* দনুজ-মর্দন (১৪১৭)

(?) মহেন্দ্র (১৪১৮-১৯)

* হাবসী শাসন
(১৪৮৬-৯৩)

বারবক্‌ শাহ্‌
(১৪৮৬)

* ইন্দিল শাহ্‌
(১৪৮৬-৮৯)

* সিদি বদর্‌ (১৪৯০-৯৩)

(২)

সৈয়দ বংশ

(৩)

কর্‌রাণী বংশ

জামাল কর্‌রানী

তাজ খাঁ কর্‌রানী (১৫৬৪-৭২)

সুলেমান কর্‌রানী (১৫৭২)

বায়াজিদ্ কর্‌রানী (১৫৭২)

দাউদ কর্‌রানী (১৫৭২-৭৬)

বহ্মনী বংশ
(১) আলা-উদ্দিন বহ্মন শাহ্
(২) মহম্মদ (১)
(৪) দাউদ খাঁ
আহ্ম্মদ খাঁ
মাহমুদ খাঁ
(৩) মুজাহদ্
(৫) মহম্মদ (২)
(৮) ফিরুজ
(৯) আহম্মদ
(৬) গিয়াস্-উদ্দিন
(৭) শামস-উদ্দিন
মোবারক
(১০) আলা-উদ্দিন আহ্ম্মদ
কন্যা = (১১) হুমায়ুন
(১২) নিজাম
(১৩) মহম্মদ (৩)
জামসিদ্
(১৪) মহম্মদ
(১৫) আহ্ম্মদ
(১৬) আলা-উদ্দিন
(১৭) ওয়ালী-উল্লা
(১৮) কলিম-উল্লা
বিজয়নগর
(১)
যাদব বংশ
সঙ্গম
হরিহর
বুক্ক
হরিহর (২য়) (১৩৭৯-১৪০৪)
বিরুপাক্ষ
দেবরায় (১ম) (১৪০৬-২২)
বীর বিজয়
দেবরায় (২য়) (১৪২২-৪৬)
মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫)
বিরুপাক্ষ (২য়) (১৪৬৫-৮৬)

(২)

সালুভ বংশ

নরসিংহ (১৪৮৬-৯৩)
|
ইম্মাদি নরসিংহ (১৪৩৯-১৫০৫)

মুঘল বংশ

জহির-উদ্দিন বাবর (১৫২৬-৩০)
হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬)
কামরাণ
হিন্দাল
আসকরী
আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
মির্জা হাকিম
সেলিম (জাহাঙ্গীর) (১৬০৫-২৭)
মুরাদ
দানিয়াল
খসরু
পর্বেজ
খুররম (শাহজাহান) (১৬২৮-৫৮)
শাহরিয়ার
দারা শিকোহ
সুজা
ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
মুরাদ
মোয়াজ্জেম (১৭০৭-১২)
জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৩)
আজিম-উস-শান
রফি-উস-শান
জাহান শাহ
আলমগীর (২য়) (১৭৫৪-৫৯)
ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯)
রফি-উদ-দৌলা (১৭১৯)
মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮)
আলি গোহর (দ্বিতীয় শাহ আলম) (১৭৫৯-১৮০৬)
মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
রফি-উদ-দরাজাত (১৭১৯)
আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪)
আকবর শাহ (২য়) (১৮০৬-৩৭)
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮)

মেবারের রাণা বংশ

রাণা কুম্ভ (১৪৩০-১৪৬৯)
উদয়করণ (১৪৬৯-৭৪)
রায়মল্ল (১৪৭৪-১৫০৮)
পৃথ্বীরাজ
সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ (১)
(১৫০৯-১৫২৭)
বনবীর (১৫৩৫-৩৭)
রত্নসিংহ (১৫২৭-৩২)
বিক্রমজিৎ (১৫৩২-৩৫)
উদয়সিংহ (১৫৩৭-৭২)
প্রতাপসিংহ (১৫৭২-৯৭) (১)
অমরসিংহ (১৫৯৭-১৬২০)
করণসিংহ (১৬২০-২৮)
জগৎসিংহ (১৬২৮-৫২)
রাজসিংহ (১৬৫২-৮০) (১)
জয়সিংহ (১৬৮০-৯৮)
অমরসিংহ (২য়) (১৬৯৯-১৭১০)
সংগ্রামসিংহ (২য়) (১৭১১-৩৪)
জগৎসিংহ (১৭৩৪-৪১)
প্রতাপসিংহ (২য়) (১৭৫২-৫৪)
অরিসিংহ (১৭৬১-৭৩)
রাজসিংহ (২য়) (১৭৫৪-৬১)
হামীর (২য়) (১৭৭৩-৭৮)
ভীমসিংহ (১৭৭৮-১৮২৮)

শূর বংশ (১৫৪০-১৫৫৫)

ছত্রপতি বা ভোঁসলে বংশ

মালোজী
শাহ্‌জী
শম্ভুজী
শিবাজী
শম্ভুজী
শাহু
তারাবাঈ = রাজারাম = রাজস্ বাঈ
তৃতীয় শিবাজী
শম্ভুজী (২য়)
রামরাজা
শাহু
প্রতাপসিংহ
শাহ্‌জী রাজা

পেশওয়া বংশ

বালাজী বিশ্বনাথ
বাজী রাও
আপ্পা রাও
বালাজী বাজী রাও
রঘুনাথ রাও
বিশ্বনাথ রাও
মাধব রাও
নারায়ণ রাও
দ্বিতীয় বাজী রাও
চিম্‌নজী আপ্পা
(২য়) মাধব রাও
নানা সাহেব

— —